বিশ্ববরেণ্যদের

কালজয়ী ভাষণ

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা

ইঞ্জিনিয়ার এ কে এম মুজিবুর রহমান

যাঁদের ভাষণে সমৃদ্ধ এই বইটি

নবী-রাসূলদের মধ্যে–
হযরত মুহাম্মদ সা. ও হযরত ঈসা আ.

যে সকল ব্যক্তিত্বদের ভাষণ, প্রবন্ধ ভাষণ, বাণী ও কবিতা নিয়ে গ্রন্থিত এই বইটি তাঁরা হলেন–
(জন্ম সাল হিসেবে)
অতীশ দীপঙ্কর, মাওলানা রুমী, মহাকবি মিল্টন,
জর্জ ওয়াশিংটন, মহাকবি গ্যাটে, অব্রাহাম লিঙ্কন, কার্ল মার্কস,
লিও টলস্ট্রয়, জামাল উদ্দিন আফগানী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,
স্বামী বিবেকানন্দ, বার্নাড শ', মহাত্মা গান্ধী,
ভ.ই. লেনিন, স্যার সলিমুল্লাহ, আল্লামা ইকবাল, বার্ট্রান্ড রাসেল,
শেরে বাংলা, উইলস্টন চার্চিল, কায়েদে আযম,
আলবার্ট আইনস্টাইন, বেগম রোকেয়া, কমরেড মুজাফফর,
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মাওলানা ভাসানী, এম.এন রায়,
মাও সে তুং, কাজী নজরুল ইসলাম, আয়াতুল্লাহ খোমেনী,
নাজিব মাহফুজ, নেলসন মেন্ডেলা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান,
ড. মাহাথির মুহাম্মদ, প্রফেসর সালাম, চে গুয়েভারা,
মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র, শহীদ জিয়াউর রহমান,
বারাক হোসেন ওবামা প্রমুখ।

এছাড়া পরিশিষ্টে রয়েছে তিনজন বিখ্যাত অধ্যাপকের প্রবন্ধ ভাষণ। তাঁরা হলেন– কে.এস রামাকৃষ্ণ রাও (ভারত), ড. মোহাম্মদ আলী আজাদী (বাংলাদেশ) ও কিং আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয় মক্কা'র প্রফেসর মুহাম্মদ কুতুব (মিসর)।

প্রচ্ছদ :: হামিদুল ইসলাম

www.nagorikpathagar.org

বিশ্ববরেণ্যদের কালজয়ী ভাষণ

(A Collection of Eon-supersede Speeches of the World Great Celebrities)

www.nagorikpathagar.org

দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল আজীবন একটি বিষয় নিয়ে আক্ষেপ করেছেন। তিনি বলতেন আমি জীবনে একটি আলোর মুখামুখী হয়েছি, কিন্তু সামনে একটি পর্দা থাকায় আলোটাকে দেখতে পাচ্ছিনা। দেখতে না পাওয়ায় এ ব্যার্থতা তাকে সব সময় তাড়িয়ে বেড়াতো। এ আলোটা কী, আর পর্দাটাই বা কী? যারা আলোকিত মানুষ তারাই সে পর্দা উন্মোচন করতে পারেন। নিজেরা যেমন আলোকিত হন তেমনি সে আলো ছড়িয়ে দেন চার পাশের মানুষের মাঝে।

www.nagorikpathagar.org

বিশ্ববরেণ্যদের

কালজয়ী ভাষণ

ইঞ্জিনিয়ার এ কে এম মুজিবুর রহমান

অন্যপ্রকাশ

www.nagorikpathagar.org

প্রথম প্রকাশ | একুশের বইমেলা ২০১০

© | সম্পাদক

প্রচ্ছদ | হামিদুল ইসলাম

প্রকাশক | মাজহারুল ইসলাম
অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৮০২ ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬৪৬৮১

মুদ্রণ | গানিম প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস
৪৪/জি, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫।

মূল্য | ৩৫০ টাকা

আমেরিকা পরিবেশক | মুক্তধারা
জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক

যুক্তরাজ্য পরিবেশক | সঙ্গীতা লিমিটেড
২২ ব্রিক লেন, লন্ডন

কানাডা পরিবেশক | এটিএন বুক এন্ড ক্রাফটস
২৯৭০ ড্যানফোর্থ এভিনিউ, টরেন্টো
www.muktadhara.com

Bishwaborenyeder Kaljoyee Bhasan | By Engr. A K M Muzibur Rahman
Published by Mazharul Islam
Anyaprokash
Cover Design : Hamidul Islam
Price : Tk. 350.00 only
ISBN : 984 868 555 3

www.nagorikpathagar.org

শ্রদ্ধেয় বড় ভাই

আলহাজ্ব আব্দুস ছালাম

যিনি আমাকে দূরগামী হতে শিখিয়েছেন
এবং
তিনি বন্দনার এই প্রাচীন রীতিটি
আমাদের ঐতিহ্য মনে করেন-

পরথমে বন্দনা করি আল্লা নিরঞ্জন,
তারপরে বন্দনা করি রাসুলের চরণ।
পূর্বেতে বন্দনা করি পুবের ভানুশ্বর,
একদিকে উদয় ভানু চৌদিকে পশর।
পশ্চিমে বন্দনা করি খানে-কাবা ঘর,
যেখানেতে বিরাজ করে দ্বীন পয়গাম্বর।
উত্তরে বন্দনা করি কৈলাস পরবত,
যেখানে আছে আলী-মালমের পাত্থর।
দক্ষিনে বন্দনা করি ক্ষীর-নদী-সাগর,
যেখানেতে বিরাজ করে শাহ্-সওদাগর।
আসমানের জমিনে বন্দলাম সুরুয আর চাঁন,
আলাম কালাম বন্দুম কিতাব আর কুরান।
চৌদিকে বন্দনা করে মধ্যে করলাম খিতি,
এরপর করলাম শুরু মহামানবের গীতি।

দীনেশ চন্দ্র সেন সংকলিত
ময়মনসিংহ গীতিকা (মহুয়া) অবলম্বনে

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

মুখবন্ধ

মহাকাল ধাবিত হচ্ছে নীরবে। মানবজাতির বহমান সময় এ মহাকালেরই অংশ। পৃথিবীতে মানুষের কলতান অনিবার্য ভাবে সুখ-দুঃখে গাঁথা। যুগে যুগে মানব সমাজকে গতিমান করেছ ধর্ম, দর্শন, প্রকৃতি, তথা সাহিত্য, সংস্কৃতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দিয়ে। এসব হয়েছে মানবতা, মানবমনের বিকাশ, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষার প্রয়োজনে। এ মহা কর্মকান্ডে মানব জাতিকে পাড়ি দিতে হয়েছে অনেক চড়াই উৎরাই। আর এ দুর্গম পথের নাবিকগন ছিলেন বিশ্ব বরেণ্য ব্যক্তি বর্গ, যাহারা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে ছিলেন নক্ষত্রের মত তাঁদের জ্ঞানও প্রজ্ঞা নিয়ে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নবী–রাসূল, ধ্যানী, দার্শনিক, কবি–সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁদের চিন্তাধারা, কমামালা, লেখনী ও সৃষ্টিকর্ম মানুষকে করেছে দীপ্ত, মানব সামজকে করেছে গতিমান, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে। সভ্যতার এই বিবর্তনে সেই সব মহা–মহিমগণ ইতিহাসকে করেছে ঔজ্জল্য। তাঁদের সেই সব জ্ঞানগর্ব কথা, লেখা, ভাষণ, কালের গতিতে আজ উপেক্ষিত। প্রকৃত পক্ষে কখনও যা বিলীন হবার নয়। আগামীর অনিবার্যতায় আমাদেরকে বার বার ফিরে যেতে হয় সেই সব শ্বাশ্বত বানীর ছায়াতলে। এ উদ্দেশ্যে দরকার উদ্ধার, রোমন্থন, গ্রহন ও বিচরণ। অন্যথায় মানব সভ্যতা আধাঁরের চাদরে ঢেকে যাবে। আর এ মহতী লক্ষ্যেই এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরুতেই ছিল শব্দ। শব্দ ছিল সৃষ্টিকর্তার সাথে মহিমান্বিত, সৃষ্টিকর্তার শব্দ হয়ে, আর সে শব্দটি ছিল সৃষ্টি। কথাটি বলেছেন সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী নারডিন গারর্ডিমার তাঁর নোবেল ভাষণে। পবিত্র আল কুরআনও বলে আল্লাহ্ যখন সৃষ্টির ইচ্ছা করেন তখন বলেন **কুন্ (হও) ফাইয়া কুন্ (তখনই হয়ে যায়)। (আল কুরআন,** ৩৬:৮১) এই শব্দই ছিল সৃষ্টির প্রথম ভাষণ। অতঃপর মহামানবদের বিরাজমান ভাষণ –নক্ষত্রমালা সত্যতথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ যা মানব সভ্যতার নির্যাস। এই সব উপেক্ষা করা খুবই অদূরদর্শী। এই ক্ষেত্রে আলেকজান্ডার সলজেনেৎসিন এর কথায় বলা যায় **"সত্যের একটি শব্দ তাবৎ পৃথিবীর ভারকে বহন করতে পারে।"** কথাটি বলেছিলেন তিনি তাঁর নোবেল ভাষণে। পৃথিবীর ইতিহাস সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্বের ইতিহাস। সত্য ও মিথ্যার মধ্যে নিরপেক্ষতা শব্দটি কুহেলিকাময়-পলায়নপর-সত্যের অপলাপ-মিথ্যার আহ্বান-পরিণতিতে ধ্বংস। পক্ষান্তরে সত্যের পক্ষই উৎসমূখী-সুন্দরম-প্রকৃতিগত-শান্তিকামী-দ্রোহী-দূরগামী আলোকিত মানুষের গতি পরিনীতিতে পূর্ণতা। সত্য কথা শক্তিশালী ও কালান্তরে বিজয়ী।

যুগে যুগে সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্থান–কালের প্রেক্ষাপটে বিশ্ব বরেণ্য গণ যে সমস্ত মহৎ বানী দিয়েছেন সে সব বানী কালকে অতিক্রম করেছে। ইহাই মহাকালের বানী, কালজয়ী ভাষণ (Eon-supersede Speech)। বিশ্বের এ সকল বরেণ্য ব্যক্তিদের ভাষণ সমূহ গ্রন্থিত করে রাখার কোথাও কোন উদ্যোগ হয়েছে কিনা জানা নেই। পরম করুনাময় আমাকে এ কাজটি করার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষণের সজ্ঞা আপেক্ষিক। এখানে গ্রন্থিত বানী সমূহের মধ্যে সরাসরি প্রক্ষেপিত ভাষণ, কিছু কিছু প্রবন্ধ–ভাষণ, বানী, কবিতা–ভাষণ ও চিঠি–ভাষণ থেকে গ্রন্থিত। শ্রদ্ধেয় পাঠক সমাজ সামগ্রিক ভাবে এই বইটি একটি পৃথ্বি-ভাষণ (Earth-Speech) বলতে পারেন।

www.nagorikpathagar.org

এখানে যেন মহাকালে ধ্বনি-প্রতিধ্বনিকে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। একক ভাবে এই চেষ্টা কতটুকু পূর্ণতার দাবী রাখে সেটা পাঠকদেরই বিবেচনায় থাকল। এখানে গ্রন্থিত ভাষণ ছাড়াও পৃথিবীতে আরও সম্ভবত মূল্যবান ভাষণ রয়েছে যা আমার আয়ত্তে নেই, ক্ষুদ্র এই পরিসরে সবই ধারন করা কতটুকুই বা সম্ভব। গ্রন্থিত ভাষণগুলি নির্ভর যোগ্য বই, পত্র-পত্রিকা, সংকলন ও ওয়েব-সাইট থেকে সংগৃহীত। অধিকাংশ ভাষণই অনেক জনের অনুবাদ, এক্ষেত্রে অনুবাদকদের নিকট আমি গভীর ভাবে কৃতজ্ঞ। এখানে সকল অনুবাদকের নাম ও তথ্য-সূত্র বিনীত ভাবে উল্লেখ করেছি।

বইটির শুরুতেই রয়েছে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) ও হযরত ঈসা (আ:) এর মূল্যবান ভাষণ ও বাণী দিয়ে। পরবর্তী বরেণ্য ব্যক্তি বর্গের ভাষণ সমূহ জন্ম সাল (সিনিয়ারিটি) হিসাবে গ্রন্থিত হয়েছে। সার্বিক ভাবে শ্রদ্ধেয় পাঠক সমাজের আলোচনা সমালোচনা মহা-সম্পদ হিসাবে ধারন করা হবে।

পরিশিষ্টে তিনটি প্রবন্ধ-ভাষণ এর মধ্যে পরিশিষ্ট-১, পরিশিষ্ট-২ এর দুইজন বিখ্যাত আধ্যপকের মূল চিন্তাধারা পরিশিষ্ঠ-৩ এ প্রোথিত থাকায় সেটি মূল ভাষা ইংরেজীতেই রাখা হয়েছে। সংগত কারনে কিছু ভাষণ কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

যাদের প্রেরণা এই কাজকে গতিমান করেছে, তাদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় জনাব মো: ওয়ালিউল্লাহ্ এফ,সি,এ, বড় ভাই জনাব আব্দুস ছোবহান ছোটাভাই যথাক্রমে মো: মাহবুবুর রহমান মান্নান (সংবাদিক), মো: মাহ্সুদুর রহমান এফ,সি,এ এফ, সি, এম, এ মো: মাহমুদুর রহমান মিজান, জহরুল হক জুয়েল উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সময়ে যাহারা পরামর্শ দিয়েছেন তাদের মধ্যে জনাব মিজানুর রহমান আকন, (বিশিষ্ট আঁকিয়ে) জনাব শফিকুল ইসলাম, জনাব জিয়াউল করিম, জনাব সাইদুর রহমান, মো: আব্দুল ওহাব, স্নেহের আব্দুল খালেক, জাহিদুল ইসলাম বুলবুল নাম স্বরণ করতে হয়।

প্রযুক্তিতে যারা সহযোগীতা করেছেন তাদের মধ্যে সরোয়ার হোসেন, শিফা আক্তার শোভা, সাব্বির রহমান সাকিব, নিশাত শারমিন রহমান মিলা, নুসরাত রুবাইয়াৎ তৃনা, মাহফুজা রহমান মুন্নী, সাহ্লা তাস্নীম মীম উল্লেখ্য। অন্যান্য আনুসাঙ্গিক কাছে আমার সহধর্মিনী ফাহমিদা রহমান শিল্পী অনুপ্রেরনা এই কাজকে গতিমান করতে সাহায্য করেছে।

পরিশেষে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

ইঞ্জিনিয়ার এ কে এম মুজিবুর রহমান

তারিখ: ০১/০১/২০১০ইং

সাগরভিলা, পলাশগড়
জামালপুর।
মোবা: ০১৫৫২৩৫৫১৪৭

৯, জয়নাগ রোড, বকশীবাজার
ঢাকা-১১১২।
ফোন: ৯৬৭৪৯৪৮

www.nagorikpathagar.org

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

নবী-রাসূলদের মধ্যে–

১।	হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর বিদায় হজ্বের ভাষণ	১
২।	হযরত ঈষা (আ:) এর শেষ ভাষণ	১৩
অন্যান্য বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিগণের ভাষণ, প্রবন্ধ-ভাষণ, বাণী ও কবিতা-ভাষণ।		
৩।	অতীশ দীপংকর	১৭
৪।	মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী	২০
৫।	মহাকবি জন মিল্টন	২৯
৬।	জর্জ ওয়াশিংটন	৩১
৭।	মহাকবি গ্যাটে	৩৩
৮।	আব্রাহাম লিংকন	৩৫
৯।	কার্ল মার্কস	৩৭
১০।	লিও টলস্ট্রয়	৪১
১১।	জামালউদ্দিন আফগানী	৪৪
১২।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫১
১৩।	স্বামী বিবেকানন্দ	৬৩
১৪।	জর্জ-বানার্ড শ'	৬৬
১৫।	মহাত্মা গান্ধী	৬৮
১৬।	ভ, ই, লেনিন	৭২
১৭।	নওয়াব স্যার সলীমুল্লাহ্	৮০
১৮।	আল্লামা ড. মুহাম্মদ ইকবাল	৮৫
১৯।	বারট্রান্ড রাসেল	১০০
২০।	শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক	১০৫
২১।	উইনস্ট্রন চার্চিল	১০৮
২২।	কায়েদেআযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্	১১০
২৩।	আলবার্ট আইনস্ট্রাইন	১১৯
২৪।	বেগম রোকেয়া	১২৭
২৫।	কমরেড মুজাফ্ফর আহ্মেদ	১৩৪
২৬।	ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্	১৩৬
২৭।	মওলানা ভাসানী	১৪৫
২৮।	এম, এন রায়	১৫০
২৯।	মাও সে তুং	১৫৫
৩০।	কাজী নজরুল ইসলাম	১৬৪
৩১।	আয়াতুল্লা খোমেনী	১৭৫
৩২।	নাজিব মাহফুজ	১৮২
৩৩।	নেলসেন মেন্ডেলা	১৮৮
৩৪।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	১৮৯
৩৫।	ড. মাহথির মুহাম্মদ	১৯৪
৩৬।	প্রফেসর আব্দুস সালাম	২০৩
৩৭।	আর্নেস্তা চে গুয়েভারা	২০৬
৩৮।	মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র	২০৯
৩৯।	শহীদ জিয়াউর রহমান	২১১
৪০।	বারাক হোসেন ওবামা	২১৮
পরিশিষ্ট প্রবন্ধ-ভাষণসমূহ		
৪১।	মহাবিশ্বকোষ ও বিজ্ঞান	২৩৪
	প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আলী আজাদী	২৫১
৪২।	সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব	
	দার্শনিক কে, এস, রামাকৃষ্ণ রাও (ভারত)	
৪৩।	The complete code of life	
	Professor Mohammad Qutb (Egypt)	২৬৯

www.nagorikpathagar.org

"আউয়ালা মা খালাকাল্লাহু নূরী"- আল হাদীস
অর্থাৎ "সর্বপ্রথমেই আল্লাহ্ যাহা সৃষ্টি করেন তাহা
আমার (মুহাম্মদ সঃ) এর নূর (আলো)।

লঙ্ঘি এ সিন্ধুরে প্রলয়ের নৃত্যে
ওগো কার তরী ধায় নির্ভীক চিত্তে

নহে এরা শঙ্কিত বজ্র-নিপাতেও;
কান্ডারী আহ্‌মদ, তরী ভরা পাথেয়! —নজরুল

www.nagorikpathagar.org

হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর

বিদায় হজ্বের কালজয়ী ভাষণ

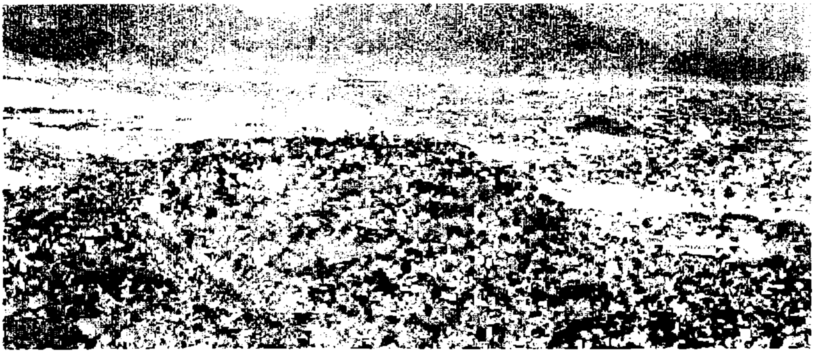

১৯৮২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান প্রকাশনা সংস্থা গেলহার্ট পাবলিকেশন Michael H. Hart রচিত "THE 100' A ranking of the most influential persons in History প্রকাশের পর বিশ্বজুড়ে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। বইয়ের লেখক এইচ. হার্ট একদল লেখক গবেষক নিয়ে দীর্ঘ গবেষণার পর বিশ্ব ইতিহাসে সর্বাধিক আলোচিত ও প্রভাব বিস্তারকারী একশত ব্যক্তিত্বকে বাছাই করেন। যাঁদের মধ্যে মুহাম্মদ (সা:) কে সর্বাধিক আলোচিত ও প্রভাব বিস্তারকারী প্রধান ব্যক্তিত্ব হিসাবে নির্বাচিত করে প্রথম স্থান দেন। সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয় ছিল বইয়ের প্রকাশক ও লেখক উভয়ই খৃষ্টান ধর্মাবলী হওয়া সত্ত্বেও মুহাম্মদ (সা:) কে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে প্রথমে স্থান দেয়া। এখানে মাইকেল এইচ বার্টের The 100 বইয়ের MUHAMMAD অধ্যায়ের অনুবাদ।

দুনিয়ার সব চাইতে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকায় মুহাম্মদের নাম প্রথমে রেখেছি বলে অনেক পাঠকই আশ্চর্য হতে পারেন; কিন্তু একথা নি:সন্দেহে সত্য যে, ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উভয়ক্ষেত্রে সর্বাধিক সফল ব্যক্তিত্ব। তাঁর জন্ম অতি সাধারণ পরিবারে; অথচ তিনি বিশ্বের প্রধান ধর্মের প্রবর্তক এবং পরবর্তীতে হয়ে উঠেন পৃথিবীর সর্বাধিক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তার মৃত্যুর তের শত শতাব্দীর পরে আজও তাঁর প্রভাব অত্যন্ত শক্তিশালী ও ব্যপক।

এ বইয়ে অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তিদের অধিকাংশের সৌভাগ্য হয়েছে সভ্যতার কেন্দ্র-প্রচলিতে কিংবা যথেষ্ট সংস্কৃতিবান অথবা রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তির মধ্যে জন্মগ্রহণের কিন্তু মুহাম্মদ ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মেছিলেন দক্ষিণ আরবের মক্কা শহরে-যা ছিল সমকালীন বিশ্বে একটি পশ্চাৎপদ এলাকা; যেখান থেকে ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্পকলা এবং শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্র অনেক দুরে ছিল। ছয় বৎসর বয়সে তিনি এতিম

www.nagorikpathagar.org

হন, পালিত হন অত্যন্ত দরিদ্র পরিবেশে। ইসলামের ইতিহাস থেকে জানা যায় তিনি নিরক্ষর ছিলেন। পঁচিশ বছর বয়সে এক ধনী বিধবা মহিলাকে তিনি বিবাহ করলে তার আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তথাপি চল্লিশ বৎসর বয়সের পূর্ব পর্যন্ত তার মধ্যে একজন উল্লেখযোগ্য বক্তিত্বের তেমন কোন বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ পায়নি।

সে সময় অধিকাংশই আরব ছিল পৌত্তলিক, তারা বহু দেব-দেভীর অস্তিত্ব বিশ্বাস করতো তখন মক্কায় সামান্য সংখ্যক ইহুদী ও খৃষ্টান ছিল যাদের কাছ থেকে নি:সন্দেহে মুহাম্মদ প্রথম সর্বশক্তিমান একক আল্লাহর ধারণা পেয়েছিলেন। যখন তিনি চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হন তখন তিনি অভিজ্ঞতা লাভ করলেন একক প্রকৃত ঈশ্বরই আল্লাহ, যিনি তাঁর নিকট বানী প্রেরণ করেছেন এবং প্রকৃত দ্বীন প্রচারের জন্য তাঁকে মনোনীত করেছেন।

প্রথম তিন বছর তিনি তাঁর আত্নীয়-স্বজন ও নিকটতম বন্ধু-বান্ধবের নিকট ইসলাম প্রচার সীমাবদ্ধ রাখেন। এরপর ৬১৩ খৃষ্টাব্দের দিকে তিনি প্রকাশ্যে প্রচার কাজ শুরু করেন। ধীরে ধীরে সমর্থন পেতে থাকেন কিন্তু এদিকে মক্কার প্রধানগণ তার এসব কার্যক্রমকে বিপদজনক উপদ্রব হিসাবে গণ্য করতে থাকেন। ৬২২ খৃষ্টাব্দে তিনি নিরাপত্তার কারণে মক্কা থেকে মদিা (মক্কা থেকে প্রায় ২০০ মাইল উত্তর) গমন করেন। সেখানে তিনি পর্যাপ্ত রাজনৈতিক শক্তি লাভ করেন। মক্কা থেকে মদিনা প্রস্থানকে 'হিজরত' বলা হয়। আর এ হিরজতই নবীর জীবনে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে। মক্কায় তাঁর অল্প সংখ্যক অনুসারী ছিল, কিন্তু মদিনায় পেলেন অসংখ্য অনুসারী। শীঘ্রই এত বেশী প্রভাব অর্জন করেন যা তাঁকে একজন গুরুত্বপূর্ণ সুশাসনে উন্নীত করে। পরবর্তী কয়েক বৎসর তাঁর অনুসারীর সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে এবং মদিনা ও মক্কার মধ্যে কয়েকবার ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ৬৩০ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিজয়ী হিসাবে মক্কা প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে এ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। তর পরবর্তী আড়াই বছরে দেখা যায় যে, আরবের গোত্রসমূহ দ্রুতভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। ৬৩২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুকালে, তিনি সমগ্র দক্ষিণ আরবের অত্যন্ত শক্তিশালী সুশাসক ছিলেন।

আরবের বেদুইন সম্প্রদায়ের দু:সাহসী যোদ্ধা হিসাবে সুখ্যাতি ছিল। কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল কম। তাদের মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না; তারা সর্বদা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকত। উত্তরের বসতিপূর্ণ (কৃষি প্রধান এলাকা) রাজ্যগুলোর বৃহত্তর সেনাবাহিনীর মোকাবিলা তাদের সম্ভব ছিল না। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তাঁরা মুহাম্মদ-এর নেতৃত্বে এক আল্লার প্রতি অবিচল বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে, এসব আরবীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে মানব ইতিহাসে সর্বাধিক বিস্ময়কর (ধারাবাহিক অভিযানে) বিজয় লাভ করেন। আরবের উত্তর-পূর্বে ছিল সাসানীয়দের সুবিশাল নব্য পারস্য সাম্রাজ্য। উত্তর-পশ্চিমে ছিল বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য। পূর্বে রোমান সাম্রাজ্য-যার কেন্দ্র ছিল কনষ্টান্টিপাল। রণক্ষেত্রে সংখ্যার দিক দিয়ে আরবরা প্রতিপক্ষের তুলনায় অনেক কম ছিল।

(বি:দ্র: মুহাম্মদ শব্দ পড়ার সাথে (সা:) বলতে হয়।)

www.nagorikpathagar.org

তবুও বিশ্বাসে অনুপ্রাণীত আরবরা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সমগ্র মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া ও ফিলিস্তিন জয় করে। ৬৪২ খৃষ্টাব্দে মিশর বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, যখন পারস্য বাহিনী কাদেশিয়া যুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়।

মুহাম্মদ-এর ঘনিষ্ট বন্ধু এবং অন্তরঙ্গ উত্তরাধিকারী আবু বকর এবং ওমর ইবনে খাওাবের নেতৃত্বে এ ধরনের অসংখ্য বিজয়ের পরও আরবদের যাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটেনি। ৭১১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আরব বাহিনী উত্তর আফ্রিকা পেরিয়ে আটলান্টিক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সেখান থেকে তার উত্তরাদিকে ফিরে এবং জিব্রালটার প্রণালী পেরিয়ে স্পেনের ভেজিগতিক সামাজ্য অধিকার করে।

এ সময় মনে হতো মুসলমানরা সমগ্র খৃষ্টান ইউরোপ দখল করে নিবে। অবশ্য ৭৩২ খৃষ্টাব্দে একটি অগ্রসরমান মুসলিম বাহিনী ফ্রান্সের মধ্যভগে সংঘটিত বিখ্যাত তুরের যুদ্ধে ফরাসীদের হাতে পরাস্ত হয়। তা সত্ত্বেও, সামান্য এক শতাব্দীর যুদ্ধে এসব বেদুইন উপজাতি নবী (সা:) এর বানীতে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারত সীমান্ত থেকে আটলান্টিক মহাসগর পর্যন্ত বিস্তৃত সর্ববৃহৎ সামাজ্য প্রতিষ্ঠা করে- এ যাবৎ বিশ্ব এত বৃহৎ সাম্রাজ্য দেখেনি। এঁদের বিজিত প্রত্যেকটি স্থানে বিপুল সংখ্যক লোক এবং এই ধর্মের বিশ্বাসে দীক্ষিত হয়।

খৃষ্টান ধর্মের প্রধান নৈতিক ও শাস্তীয় নীতির মুল শিক্ষার উদ্ভব যীশু থেকে হলেও সেগুলো ইহুদীবাদ থেকে আলাদা সেন্টফলই ছিলেন খৃষ্ট ধর্মতন্ত্রের প্রদান বিকাশ কর্তা ও মুখ্য পরিবর্তনকারী এবং নিউটেষ্টমেন্টের বিশাল অংশের রচয়িতা।

অন্যদিকে মুহাম্মদ ইসলামের যুগপৎ ধর্মতত্ত্ব এবং এর তাত্ত্বিক ও নৈতিক মূলনীতি সমূহের প্রবর্তক। উপরন্তু ইসলামের বিকাশ এবং ইসলামের ব্যবহারিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি প্রতিষ্ঠায় তিনি এককভাবে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। অধিকন্তু মুহাম্মদ-এর নিকট আল্লা ওহী প্রেরণ করেছেন। এ সমস্ত অহীর সমষ্টি মুসলমানদের পরিবত্র ধর্মগ্রন্থ কুরআন তার মাদ্যমেই অবতীর্ণ হয়েছিল। এসব ওহী মুহাম্মদ-এর জীবদ্দশাতেই কম-বেশী যাহা হোক নির্ভরযোগ্যভাবেই কপি করা হয়েছিল। এবং তার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই প্রামাণ্য গ্রন্থবদ্ধ কারা হয়। কাজেই কুরআনে মুহাম্মদ-এর নিকট আল্লা ওহী প্রেরণ করেছেন। কাজেই কুরআনে মুহাম্মদ-এর আদর্শ ও শিক্ষার নিবিড় প্রতিনিধিত্বশীল এবং তাঁর উচ্চাতর সকল শব্দই অবিকল এখানে সংরক্ষিত আছে। অন্যদিকে যীশুর কোন শিক্ষাই এমন কোন গ্রন্থবন্ধ নাই। কুরআন যেমন মুসলমানদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ তেমনি খৃষ্টানদের নিকট বাইবেল গুরুত্বপূর্ণ; কুরআনের মাধ্যমে সম্ভবত: ইলামের উপর মুহাম্মদের প্রভাব, খৃষ্ট ধর্মের উপর যীশু খৃষ্ট ও সেন্টপলের সম্মিলিত প্রভাবের চেয়ে বেশী।

www.nagorikpathagar.org

অধিকন্তু মুহাম্মদ যুগপৎভাবে ধর্মীয় ও মানবতাবাদী নেতা (যা যীশু ছিলেন না)। বস্তুত: তিনি আরব বিজয়ের পশ্চাতে মূল চালিকা শক্তি হিসাবে সর্বযুগের সর্বকালের সর্বাধিক প্রভাবশালী যথার্থ রাজনৈতিক নেতা হিসাবে বরণ্য।

অতএব আমরা দেখছি যে, সপ্তম শতাব্দীর আরবদের বিজয় অভিযান আজ পর্যন্ত মানব সভ্যতার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এখাধারে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রভাবের এই তুলনাহীন সময় মুহাম্মদকে মানব ইতিহাসে একক সর্বাধিক প্রভাবশালী সফল ব্যক্তিত্ব হিসাবে চিহ্নিত করতে বাধ্য বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস I feel entities Muhammad to be considered the most influential single figure in human History।

আরাফায় বিদায় হজ্জের মহানবী (সাঃ) এর কালজয়ী ভাষণ

দশম হিজরীর ৮ই যুলহজ্জ তারিখে মহানবী (সা) মদীনার পথে মক্কা ত্যাগ করলেন এবং মদীনায় পৌঁছে সেখানে রাত্রি যাপন করলেন। ৯ই যিলহজ্জ সকালে ফজরের সালাতের পর আরাফায় রওয়ানার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর উট কাসওয়ার উপর আরোহণ করলেন। অন্য সকলেই তাঁকে অনুসরণ করলেন।

আরাফা ময়দানের পূর্বদিকে নামিয়া নামক স্থানে তাঁবু খাটানো হল। ঠিক দুপুরের পরেই মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা) তাঁর উটে আরোহণ করে উপত্যাকার মাঝামাঝি স্থানে এসে লক্ষাধিক লোকের সম্মুখে আবেগময়ী ভাষায় তাঁর ভাষণ দিলেন। তার প্রতিটি বাক্যই রাবিয়া বিন উমাইয়া বিন খালফ কর্তৃক পুনরাবৃত্ত হয়েছিল। আল্লাহর প্রশংসা করে এবং আল্লাহকে ধন্যবাদ দিয়ে তিনি গুরু-গম্ভীর স্বরে বলতে লাগলেন। চারদিকে সৃষ্টি হয় কেমন এক করুণ আবহ। তিনি বললেনঃ-

১। **হে মানবমণ্ডলী, তোমরা আমার কথাগুলি মন দিয়ে শ্রবণ কর, কেননা আমি এ বছরের পর এ স্থানে তোমাদের সঙ্গে পুনরায় নাও মিলতে পারি।**

২। **হে মানবমণ্ডলী, (আগত ও অনাগত কালের) যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের রবের সঙ্গে না মিলিত হও, ততদিন তোমাদের রক্ত ও তোমাদের ধন সম্পদ এই দিন ও এই মাসের মত-ই পবিত্র।**

৩। **তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের রবের সঙ্গে মিলিত হবে; তখন তোমাদের রব তোমাদের কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন এবং আমি তোমাদের তাঁর সংবাদ পৌঁছিয়ে দিয়েছি।**

৪। **যে ব্যক্তি অন্যের ধন-সম্পদের অভিভাবকরা আমানতদার তার উচিত মালিককে তার প্রাপ্য ধনসম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া।**

www.nagorikpathagar.org

৫। সুদের উপর নেওয়া দেওয়া হারাম, বাতিল; তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। কারও প্রতি অত্যাচার করো না ও অত্যাচারিত হয়ো না।

৬। আল্লাহর সিদ্ধান্তে সুদ বাতিল এবং আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের জন্য যে সুদ পাওনা আছে সবই বাতিল।

৭। অজ্ঞাত যুগের খুনের ক্ষতিপূরণ সবই বাতিল হলো।

৮। এরপর, হে মানবমণ্ডলী, শয়তান এদেশে পূজিত হওয়ার আশা ত্যাগ করেছে। সে অন্য দেশে মান্য হবে। সুতরং তোমরা তোমাদের বিশ্বাস (ঈমান) সম্পর্কে সতর্ক থাকবে, যেন তোমাদের ভাল কাজ অন্য লোকের দ্বারা নষ্ট হয়ে না যায়।

৯। হে মানবমণ্ডলী, পবিত্র মাসের রহিতকরণ অন্ধকার যুগের ধারা। যারা অবিশ্বাস্য পছন্দ করে তারা বিভ্রান্ত। তারা বলে, এক বছর পবিত্র মাস, পরের বছর অপবিত্র। তারা আল্লাহ কর্তৃক পবিত্র মাসের সংখ্যা ঠিক রাখার জন্য পবিত্র মাসকে অপবিত্র বলে। সময় ঘুরছে, যেদিন থেকে আসমান ও যমীন সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধরিত মাসের সংখ্যা ১২; তার মধ্যে ৪টি পবিত্র; ৩টি পরপর এবং জামাদি ও শাবানের মধ্যবর্তী একটি।

১০। এরপর হে মানবমণ্ডলী, তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি তোমাদের অধিকার আছে। তাদেরও তোমাদের প্রতি অধিকার আছে। ঐ ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকট শ্রেষ্ঠ। তাদের অবশ্যকর্তব্য হল তাদের সতীত্ব রক্ষা করা এবং অশ্লীলতা ত্যাগ করা। যদি তারা দোষী হয় তবে তোমরা তাদের সাথে মিলিত হয়ো না। তোমরা তাদের শোধনার্থে শাসন করবে, কিন্তু যেন ক্ষত-বিক্ষত না হয়ে যায়। যদি তারা অনুতপ্ত হয়, তবে তাদের যথাযোগ্য খেতে দাও ও পরতে দাও। তাদের সঙ্গে তখন ভাল ব্যবহার কর। তোমরা একে অন্যকে উপদেশ দিও- তোমাদের তাগিত দেওয়া হয়েছে স্ত্রী-জাতির প্রতি ভাল ব্যবহার করার জন্য। কেননা, তারা তোমাদেরই অংশ বা অন্তর্ভূক্ত। তোমরা তাদের আল্লাহর আমানত রূপে গ্রহণ করেছ। আর আল্লাহর বাক্য দ্বারাই তাদের তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে।

১১। সুতরাং হে মানবমণ্ডলী, তোমরা আমার কথাগুলো ভালভাবে অনুধাবন কর; আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর বাণী আল-কুরআন ও আমার কর্ম ও বাণী হাদীস তোমাদের নিকট রেখে গেলাম। যদি তোমরা এ দুটো দৃঢ়ভাবে গ্রহণ কর তাহলে তোমরা কোনদিনই বিপথগামী হবে না।

www.nagorikpathagar.org

১২। হে মানবমণ্ডলী, তোমরা আমার কথাগুলো অনুধাবন কর, নিশ্চিত করে বুঝতে চেষ্টা কর। তোমরা শিক্ষা পেয়েছ প্রত্যেক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। সকল মুসলমানই এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। অনুমতি ব্যতীত একে অন্যের জিনিস গ্রহণ করবে না। তা কারো জন্যই বৈধ নয়। আর তোমরা কেউ কারও প্রতি অবিচার করো না।

১৩। একজনের অপরাধে অন্যকে দণ্ড দেওয়া যায় না। অতঃপর পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে এবং পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দায়ী করা চলবে না।

১৪। যদি কোন নাককাটা কাফ্রি ক্রীতদাসকেও তার যোগ্যতার জন্য তোমাদের আমীর করে দেওয়া হয়, তোমরা সর্বতোভাবে তার অনুগত হয়ে থাকবে। তার আদেশ মান্য করবে।

১৫। সাবধান! ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করো না। এই অতিরিক্ততার ফলে তোমাদের পূর্ববর্তী বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে।

১৬। তোমরা ধর্মভ্রষ্ট হয়ে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া ও রক্তপাতে লিপ্ত হয়ো না। তোমরা ভুলে যেয়ো না যে, তোমরা পরস্পর পরস্পরের ভাই।

১৭। এক দেশের মানুষের উপর অন্য দেশের মানুষের প্রাধান্যের কোন কারণই নেই। সমস্ত মানুষ আদম থেকে এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্ট। মানুষের প্রাধান্য মানুষের যোগ্যতার জন্য।

১৮। জেনে রেখো! এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই; তাই সমগ্র বিশ্বের মুসলমান এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃ সমাজ।

১৯। হে লোকসকল! শ্রবণ কর, আমার পর কোন নবী নেই। তোমাদের পর আর কোন উম্মত (জাতি) নেই। এ বছরের পর তোমরা হয়তো আর আমার সাক্ষাৎ পাবে না। ইল্‌মে ওহী (ঐশী জ্ঞান) উঠে যাওয়ার পূর্বে আমার নিকট থেকে শিখে নাও।

২০। চারটি কথা মনে রেখো ঃ শির্‌ক (আল্লাহর সঙ্গে অংশী) করো না। অন্যায়ভাবে নরহত্যা করো না। চুরি করো না। ব্যভিচার করো না।

২১। হে মানবমণ্ডলী, কোন দুর্বল মানুষের উপর অত্যাচার করো না। সাবধান, কারও অসম্মতিতে কোনও জিনিস গ্রহণ করো না। সাবধান! মজুরের শরীরের ঘাম শুকাবার পূর্বেই তার মজুরি মিটিয়ে দিও। তোমরা যা খাবে ও পরবে, তা তোমাদের দাস-দাসীদের খেতে ও পরতে দিও। যে ব্যক্তি দাস-দাসীদের ক্ষমা করে ও ভালবাসে, আল্লাহ্‌ তাকে ক্ষমা করেন ও ভালবাসেন।

www.nagorikpathagar.org

২২। যে ব্যক্তি নিজ বংশের পরিবর্তে নিজেকে অন্য বংশের বলে প্রচার করে, তার উপর আল্লাহর, ফেরশ্তাগণের ও মানবজাতির অভিসম্পাত।

২৩। মহানবী (সা) বলেনঃ মুসলমান ঐ ব্যক্তি, যার মুখ ও হাত থেকে অন্যরা নিরাপদ থাকে। ঈমানদার বিশ্বাসী ঐ ব্যক্তি যার হাতে সকল মানুষের ধন ও প্রাণ নিরাপদ থাকে। ঐ ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন হতে পারে না– যে দু'বেলা উদর পূর্ণ করে আহার করে আর তার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে। ঐ ব্যক্তি মুসলমান হতে পারে না যখন সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তা অন্যের জন্যও পছন্দ করে না।

২৪। আমার উম্মতের মধ্যে যে ঝগড়া ও বিসংবাদ করতে বের হয়, তাকে আঘাত কর এবং পরিত্যাগ কর। তোমরা একত্রে খাওয়া–দাওয়া কর। আলাদা আলাদাভাবে আহার করো না। কেননা একত্রে খাওয়াতে বরকত আছে। যে বিভেদ সৃষ্টি করে, তার স্থান জাহান্নামে। আমি তোমাদের পাঁচটি আদেশ করছিঃ একতা রক্ষা কর, জনতার অনুগত থাক, প্রয়োজনে হিজরত কর, উপদেশ গ্রহণ কর, আল্লাহর পথে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ কর।

২৫। যাকে আমরা শাসনকার্যে নিযুক্ত করি, আমরা তার ভরণ–পোষণ করি। এরপরও যদি সে কিছু গ্রহণ করে, তা বিশ্বাস ভঙ্গ বা ঘুষ বলে গণ্য হবে। আর ঘুষ গ্রহণ মহাপাপ।

২৬। তোমরা হিংসা–বিদ্বেষ ত্যাগ কর। কেননা আগুন যেমন জ্বালানি কাঠকে ভস্মীভূত করে, হিংসা তেমন মানুষের সৎগুণকে ধ্বংস করে।

২৭। যে ব্যক্তি নিজ হাতের কাজ দ্বার খাদ্য সংগ্রহ করে, তা অপেক্ষা উত্তম খাদ্য আর নেই। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ভিক্ষা করে, সে যদি এক গাছি দড়ি দিয়ে পিঠে কাঠের বোঝা বহন করে বিক্রি করে আল্লাহ তার ইয্যত রক্ষা করেন। এ-ই তার জন্য উত্তম।

২৮। মনে রেখো, তোমাদের প্রত্যেককেই আল্লাহর সম্মুখে হাযির হতে হবে এবং আপন আপন ভালমন্দের হিসাব নিকাশ (আমলনামা) পাঠ করতে হবে। তোমরা সাবধান হও। তখন কেউ কাউকেও সাহায্য করতে পারবে না।

২৯। তোমরা জেনে রেখো, বিদ্বানের কলমের কালি শহীদের রক্ত অপেক্ষা মূল্যবার। যে জ্ঞানের পথে পরিভ্রমণ করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের সঠিক পথ দেখান। জ্ঞান অনুসন্ধান কর (যদি তা চীন দেশেও হয়)। জ্ঞানার্জন (বিদ্যার্জন) প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর জন্য ফরয অর্থাৎ অবশ্য কর্তব্য।

www.nagorikpathagar.org

৩০। **সমাজে তোমার আচরণ ঐ রূপ হবে, যেমন আচরণ তুমি অন্য থেকে কামনা কর। সমাজে তোমার ব্যবহার ঐরূপ হবে, যেরূপ ব্যবহার তুমি নিজে পেলে খুশী হও।**

৩১। **হে লোকসকল! তোমরা মনে রেখো, তোমাদের মাতা-পিতার সন্তুষ্টিই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। মাত-পিতার অসন্তুষ্টিই আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি। তোমাদের জান্নাত তোমাদের মায়ের পায়ের তলে।**

৩২। **হে মানবসন্তান! তোমাদের মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ মানুষ, যে মানুষের উপকার করে।**

৩৩। **যারা উপস্থিত আছো, তারা অনুপস্থিতদের নিকটে আমার এই পয়গাম পৌঁছিয়ে দেবে। হয়ত উপস্থিত কিছু লোক অপেক্ষা অনুপস্থিতদের কিছু লোক উপকৃত হবে।**

জগতের শ্রেষ্ঠতম মানবের, শ্রেষ্ঠতম সাধকের, শ্রেষ্ঠতম রসূলের ভাষণ সমাপ্ত হল।

মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা)-এর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাবিয়া বিশাল জনতাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনারা কি জানেন, আজ কোন দিন? তারা উত্তর দিলেন, আজ পবিত্র হজ্জের দিন। তারপর তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি জানেন, আল্লাহ্ আপনাদের জীবন ও সকল কিছু পবিত্র করেছেন, যতক্ষণ না আপনারা তাঁর সাথে মিলিত হচ্ছেন, তারা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। এইভাবে তিনি বাক্যের পর বাক্যগুলো বলতে থাকলেন। অতঃপর মহানবী হযরত (সা) আবেগভাবে সপ্তদ্বার উন্মুক্ত আকাশের দিকে মুখমণ্ডল উত্তোলন করে বলে উঠলেন ঃ হে আল্লাহ! আমি কি তোমার রিসালাতের গুরুভার ও নুবুওতের গুরুদায়িত্ব বহন করতে পেরেছি? হে আল্লাহ! আমি কি আমার কর্তব্য যথাযথ পালন করতে পেরেছি?

সঙ্গে সঙ্গে বিশাল জনতা উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলঃ হ্যাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয়। তখন হযরত (সা) করুণ সুরে বলে উঠলেনঃ ইয়া আল্লাহ! আপনি আমার সাক্ষী থাকুন।

এই বলে মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা) তাঁর বিদায় হজ্জের অবিস্মরণীয় ভাষণ শেষ করলেন। তারপর উট থেকে নেমে যুহ্‌র ও আসরের সালাত জামায়াতে আদায় করলেন। হযরতের প্রতি ওহী নাযিল হলঃ **'আল্ ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আত্‌মামতু 'আলায়কুম নিয়্'মাতী ওয়া রাদিতু লাকুমূল 'ইসলামা দীনা– আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম আর তোমাদের জন্য ইসলাম (শান্তির ধর্ম) –কে দীন মনোনীত করলাম।'**

www.nagorikpathagar.org

মহানবী আত্মতৃপ্তির সাথে তৎক্ষণাৎ সকলকে এ আয়াত আবৃত্তি করে শুনিয়ে দিলেন। সূর্যাস্তের পূর্বে গোধূলি লগ্নে হুযুর (সা) সকলকে নিয়ে আরাফা ত্যাগ করেন এবং মুজদালাফায় এসে সকলের সাথে একত্রে মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করলেন। তারপর এখানেই রাত্রি যাপন করলেন।

এ হজ্জ্কে বিদায় হজ্জ বলা হয়। কারণ এ হজ্জ্ই রাসূলুল্লাহ (সা) –এর জীবনের শেষ হজ্জ্। এখানে তিনি যে ভাষণ দেন সেটি ছিল ঐতিহাসিক বিদায় ভাষণ। ভাষণে তিনি বারবার করুণ কণ্ঠে উল্লেখ করেছেনঃ হে লোক সকল। আমার কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর, কারণ আগামী বছর হজ্জের সময় তোমাদের সঙ্গে আমার আর দেখা না–ও হতে পারে। এই হজ্জে রাসুলুল্লাহ (সা) –এর সঙ্গে এক লক্ষেরও বেশি সাহাবা যোগদান করেন। এ উপলক্ষে হযরত (সা)–এর ৬৩ বছর বয়সের জন্য ৬৩টি উট কুরবানী করেন। সকলের তরফ থেকে হযরত আলী (রা) আরো ১০০ টি উট কুরবানী করেন।

এ ভাষণেও হুযূর (সা) স্বভাবসুলভ আবেগময়ী সুললিত ভাষায় তাবুকের ভাষণের মতই লোকদের নানা বিষয়ে উপদেশ দিলেন। দুনিয়া ও আখিরাত, ইহকাল ও পরকাল, মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক, স্বামী–স্ত্রী, মাতা–পিতা, সন্তান–সন্ততি, মনিব–ভৃত্য, দাস–দাসী, ইত্যাদি সম্পর্ক, ধর্ম, মানুষ, জাতি ও দেশ, দণ্ডবিধি, আমলনামা, কার্যবিধি, কর্তব্যবোধ, দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা, একতা, হিংসা, শ্রম, ভিক্ষাবৃত্তি, জ্ঞান অর্জন, সুদ–ঘুষ ও আচরণ বিধি ইত্যাদি মানব জীবনে ঘটিত ও ঘটিতব্য বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দেন। বিশ্বমানবের প্রতি হযরত রাসূলে আকরাম (সা) এর এ কল্যাণময় ভাষণ অবিস্মরণীয় ও চিরন্তন হয়ে আছে।

(ভাষনটি ড: কাজী দীন মুহম্মদ সম্পাদিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর তিনটি অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক ভাষণ নামক প্রবন্ধ হতে সংগৃহীত–

(সূত্র: ই:ফা:বা: অগ্রপথিক/ঈদে মিলাদুন্নবী (সা:) ১৪২১/২৭ সংখ্যা)

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)ই হলেন বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত। মানবজাতীর মহান শিক্ষক তাইত নবী (সাঃ) কে আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে বললেন ; দুনিয়ার মজদুরকে মুক্তি দিতে এই সব বাণীর আলোকে।

"তোমাদের ধন বন্টন ব্যবস্থা এমন করো না, যাতে বিত্তসম্পদ এক শ্রেণীর ভিতর আবর্তিত হতে থাকে।"

সূরা হাশর, আয়াত-৪

www.nagorikpathagar.org

"তাদের (বিত্তশালীদের) ধন-সম্পদে প্রয়োজনীয় প্রার্থী (গরীব) ও বঞ্চিতদের অধিকার আছে।"

আল-জরিয়াহ, ১১ আয়াত

"তুমি আত্মীয়-স্বজন ও গরীব এবং পথের কাঙালগনকে তোমার নিকট হতে তাদের পাওনা দিয়ে দাও।

সূরা বনী ইসরাইল-২৬ আ

"যারা সম্পদ ভান্ডারে বন্ধ রাখে বা অব্যবহৃত রাখে এবং অপরকে তা করতে উৎসাহ দেয় এবং আল্লাহ্ অনু গ্রহবশত যা দান করেছেন তা গোপন রাখে সে সব কাফিরদের জন্য গ্লানিকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি

সূরা-নিসা-৪ আঃ

আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছু মালিক আল্লহ্ তোমাদের মনে যা কিছু আছে তা তোমরা যা গোপন কর বা প্রকাশ কর, সবকিছু সম্বন্ধেই আল্লাহ্ হিসাব নিবেন।"

সূরা আরহমান, ১০ আঃ

তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা আল্লাহর পথে সে সব অসহায় নর-নারী ও শিশু সন্তানদের জন্য লড়াই করো না, যারা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের প্রতি পালক আমাদের এই জালিমদের জনপদ থেকে বের করে নিয়ে যাও, অত:পর তুমি আমাদের জন্য তোমার কাছ থেকে একজন অভিবাবক পাঠাও তোমার কাজ থেকে আমাদের জন্য একজন সাহয্য কারী পাঠাও।

সূরা নিসা-৭৬ আঃ

তোমাদের মধ্যে থেকে এমন একটি দল থাকবে যারা ন্যায়ের আদেশ দেবে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর সত্যিার অর্থে তারাই সাফল্য মণ্ডিত হবে।

আলো ইমরান-১০৪ আঃ

আলকুরানের বাণী আমাদেরকে দুনিয়ার মজদুরের মুক্তির দাবী দারকে তার দিকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। যেখানে রয়েছে ইহকাল ও পরকালের দু-জাহানের পথ ও পাথেয়।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মানবজাতীর মহান শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর জীবনকে **Theory** ও **Pratice** এর মাধ্যমে সেই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

www.nagorikpathagar.org

এই প্রসঙ্গে দুনিয়ার মেহনতী মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে তিনি দিয়ে গেলেন কালজয়ী বাণী।

মজুয়ের মুজরী তার গায়ের ঘাম শুকোবার আগেই পরিশোধ কর।

ইবনে মাজাহ্

"মজুর-শ্রমিক অনুগতদের যথারীতি খাদ্য ও পোশাক দিতে হবে।"

মুসলিম

শ্রমিককে এমন কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না, যা তাদেরকে অক্ষম ও অকর্মন্য বানিয়ে দেয়।

তিরমিযি

মজরুকে তার কাজ হতে অংশ দানকর কারন আল্লাহর মজুরকে কিছুতেই বঞ্চিত করা যাবে না।

মুসনাদে আহ্মদ

"তাদের উপর অতখানি কাজেরই চাপ দেওয়া যেতে পারে। যতখানি তাদের সামর্থে কুলায়।"

মুয়াত্তা মুসলিম

"সে লোক পতিত ও অনাবাদী জমি আবদ ও চাষ যোগ্য করে নিবে সে তার মালিক হবে।"

আবু দাউদ

"তোমাদের ধন-সম্পদে (যাকাত ছাড়াও) সমাজের অধিকার আছে।

তিরমিযী

"প্রতিবেশী অভূক্ত জেনেও যে শক্তি পরিতৃপ্ত চিত্তে রাত্রি যাপন করে, আমার উপর সে ব্যক্তির ঈমান নেই।"

হযরত আনাস বর্ণিত হাদিস।

"সে মুমিন নয়, যে পুরা মাত্রার আহার করে এবং তার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে।"

বায় হাকি

"প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসের উপর আমাদের কোন অধিকার নেই।"

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম-আবু দাউদ

"থাকার জন্য একটি বাড়ি, লজ্জা নিবারনের জন্য এক টুকরো কাপড়, খুন্নি বৃত্তির জন্য এক টুকরা রুটি এবং পানি পানের জন্য একটি পেয়ালা এর বেশী-জিনিস রাখার অধিকার মানব সন্তানের নেই।"

কিতাবুল খারাজ

পরিশেষে আবার আল কুরানের কথা আসা যাক-তিনিই আল্লাহ্; তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, অদৃশ্যের সব কিছুই তাঁর জানা তিনি দয়াময় ও করুনা ময়।

তিনিই আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি রাজা ধিরাজ, পুত পবিত্র শান্তি বিধায়ক, রক্ষক পরাক্রমশালী প্রবল মহাত্ত্বের একক অধিকারী। তারা যে সব শিরক করছে আল্লাহ্ সে সব কিছু থেকে অনেক পবিত্র।

তিনি আল্লাহ্ তিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি সৃষ্টির উদ্ভাবক সব কিছুর রূপকার তার জন্যই সকল সুন্দর নাম সমূহ। আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সব কিছুই তরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে, তিনি পরাক্রম শালী ও প্রবল প্রজ্ঞাময়।

সূরা হাশর-২২-২৪

উপসংহারে বলা যায়- সূরা আননিসায়-১৭০ আয়াতে বলা হয়েছে

"হে মানবজাতি, এই রাসূল তোমাদের রবের

নিকট হতে সত্য বিধান সহ এসেছে। তোমরা ইমান আন এতেই তোমাদের কল্যাণ।

www.nagorikpathagar.org

হযরত ইসা (আঃ) এর শেষ ভাষণ

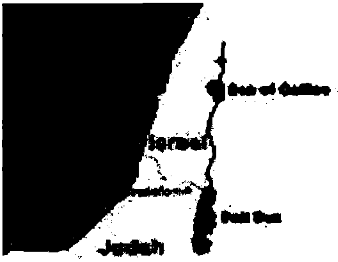

The Divided Kingdom
8th Century BC
The Time of Isaiah

যোহনই (বাংলা ইঞ্জিল শরীফের ইউহোন্না) বাইবেলের এমকাত্র সুসমাচার-লেখক, যিনি শিষ্যদের সাথে যীশুর শেষ কথোপকথনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই কথোপকথন হয়েছিলো লাস্ট-সাফারের (ঈদুল ফেসাখ) শেষ পর্যায়ে-যীশুর গ্রেফতার হওয়ার আগে। এই কথাপকথন শেষ হয়েছে যীশুর সুদীর্ঘ একটি ভাষণ দিয়েঃ যোহনের সুসমাচারের চার অধ্যায়ব্যাপী (১৪ থেকে ১৭ পর্যন্ত) এই ভাষণের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। বাইবেলের অন্য কোন সুসমাচারে (অর্থাৎ ইঞ্জিল শরীফের আনা তিন খণ্ডে) এ বিষয়ে সামান্যতম উল্লেখ পর্যন্ত নাই। অথচ যোহনের সুসমাচারের এই অধ্যায় চারিটিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে খ্রীস্টানদের দৃষ্টিভঙ্গি কি হবে, সে সম্পর্কেও এই অধ্যায়ে পেশ করা হয়েছে যীশুর একান্ত মৌলিক ও তাৎপর্যময় বক্তব্য। যীশু ও তার শিষ্যদের মধ্যে শেষ বিদায়ের লগ্নে যে ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ আবেগময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল, এই বর্ণনায় পুরাপুরিভাবেই তা প্রতিফলিত হয়েছে।

যীশুর এই শেষ ভাষণটি হচ্ছে তাঁর সব ভাষণের সেরা। এই শেষ ভাষণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মানবজাতির যে ভবিষ্যৎ যীশুর চোখে ফুটে উঠেছিল, তার বর্ণনাসহ শিষ্যবর্গের জন্যে তো বটেই, গোটা মানবজাতির জন্যেওযীশুর যে সুগভীর মমত্ববোঘ ও দরদ, তাও ফুটে উঠেছে তাঁর এই ভাষণে। এ বিষয়ে তাঁর যে নির্দেশ ও বিধান এবং তাঁর তিরোধানের পর মানবজাতিকে যে কোন দিশারী বা কোন পথ-নির্দেশককে অনুসরণ করতে হবে, সে ব্যাপারেও তাঁর এই ভাষণে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। যোহন-রচিত সুসমাচারে এই পথ-নির্দেশকের গ্রীক উপাধি হচ্ছে Parkletos : ইংরেজী বাইবেলে এসে তা হয়েছে Paraclete.

এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অনুচ্ছেদসমূহ এইঃ "যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে। আর আমি পিতার নিকট নিবেদন করিব, আর তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন।" (বাংলা বাইবেল, যোহন, ১৪, ১৫-১৬)[১]।

এই 'পারক্লীত'-পারাক্লীতস' বা 'সহায়'-এর অর্থ কি? বর্তমান (বাংলা) বাইবেলের যোহন-লিখিত সুসমাচারে (ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না, ৪র্থ খণ্ডে) এর অর্থ ও ব্যাখ্যা

www.nagorikpathagar.org

দেওয়া আছে এভাবে, "কিন্তু সেই সহায় পবিত্র আত্মা (বাংলা ইঞ্জিল শরীফে, পাকরূহ্) যাহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন এবং আমি তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছি, সেই সকল স্মরণ করাইয়া দেবেন।" (ঐ-১৪, ২৬)

"তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন।" (ঐ-১৫, ২৬)

"আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে সেই সাহায্যকারী তোমাদের নিকট আসিবেন না। কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তাহাকে তোমাদের নিকট পাঠাইয়া দিব। তিনি আসিয়া দুনিয়াকে পাপের সম্বন্ধে, নির্দোষিতার সম্বন্ধে এবং খোদার বিষয়ের সম্বন্ধে চেতনা দিবেন।" ...... (বাংলা ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না, ৪র্থ খন্ড-১৬, ৭-৮)

"পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন, কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শোনেন, তাহাই বলিবেন এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন।"--- (বাংলা বাইবেল, যোহন -১৬, ১৩-১৪) (মরিস বুকাইলি, বাইবেল, কুরান ও বিজ্ঞান)

যিশুখ্রিস্টের সময়ে সাধু যোহন (St. John) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি যখন সকলকে বাপ্তাইজ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন জেরুজালেম হইতে ইহুদীরা কতিপয় পাদ্রীকে তাঁহার পরিচয় লইবার জন্য পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা আসিয়া যোহনকে যে কয়টি প্রশ্ন করেন এবং যোহন তাহার যে-উত্তর দেন, তাহাতেই হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবের খবর পাওয়া যায়। বাইবেলে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছেঃ

"And this is the record of John, when Jews sent Priests and Laits from Jerosalem to ask him, who art thou? And he confessed and denied, not-1 am not the christ. And they asked him, what then? Art thou Elias? and he said, I am not Art thou THAT PROPHET? And he answered, No ...... And they asked him and said unto him, why baptizest thou them, it thou be not Elias the Christ, not neither that prophet? John answered then, saying I baptize with water, but there standeth one amongst you whome ye know not. He it is who coming after me is preferred before me, whose shoe's latchet I am not worthy to unloose."

www.nagorikpathagar.org

(John. Chap. I : 19-27)

অর্থাৎ ঃ "যোহন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, যখন জেরুজালেম হইতে ইহুদীদের দ্বারা প্রেরিত কতিপয় পাদ্রী আসিয়া যোহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? তখন যোহন স্বীকার করিলেন, আমি যিশুখ্রিস্ট নহি। তখন তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে আপনি কে? আপনি কি ইলিয়াস? তিনি বলিলেন, আমি ইলিয়াস নহি। আপনি তবে কি সেই নবী? যোহন উত্তর দিলেন, না।

তখন তাঁহারা আবার জিজ্ঞাসা করিলেনঃ যদি আপনি যিশুখ্রিস্ট, ইলিয়াস অথবা সেই নবী না হন, তবে কেন বাপ্তাইজ করিতেছেন? যোহন উত্তর দিলেনঃ আমি পানি দ্বারা বাপ্তাইজ করি, কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন একজন আছেন, যাঁহাকে তোমরা জানই না।

তিনি সেই জন যিনি আমার পরে আসিয়াও আমার অপেক্ষা সম্মানের অধিকারী হইবেন এবং আমি যাঁহার জুতার ফিতা খুলিবারও যোগ্য নহি।"

এখানে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যিশুখ্রিষ্ট এবং ইলিয়াস ছাড়া তৃতীয় আর একজন নবী আসিবেন, সেকথা ইহুদীরা জানিত।

এই 'সেই নবী' যে একমাত্র হযরত মুহম্মদই, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই; কারণ যিশুখ্রিস্টের পরবর্তী গয়গম্বর (এবং সর্বশেষ পয়গম্বর)-ই হইতেছেন 'হযরত মুহম্মদ'।

যিশুখ্রিস্ট নিজেও বলিয়াছেন ঃ

"If you love, keep my commandments : And I will pray the Father and he shall give you another comforter that he may abid with you forever." (John. Chap. 14 : 15-16)

অর্থাৎ ঃ "যদি তোমরা আমাকে ভালবাস, তবে আমার উপদেশমত কার্য করিও; আমি স্বর্গীয় পিতার নিকট প্রার্থনা করিব যাহাতে তিনি তোমাদিগের জন্য আর একজন শান্তিদাতা প্রেরণ করেন-যিনি চিরদিন তোমাদের সঙ্গে থাকিতে পারেন।"

অন্যত্র আছে ঃ

"Neverthless I tell you the truth. It is expendient for you that I go away; for if I go not away, the comforter will not come unto you : but if I depart, I will send him unto you."

অর্থাৎ ঃ যাহাই হোক, আমার উচিত যে তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমি চলিয়া যাইব, কারণ আমি না গেলে সেই শান্তিদাতা আসিবেন না; আমি যদি যাই তবে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব।

www.nagorikpathagar.org

"How be it when he the spirit of truth is come, he will guide you unto all truth, for he shall not speak of himself but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come."

অর্থাৎ ঃ "যাহাই হউক, যখন সেই সত্য-আত্মা আসিবেন, তখন তিনি তোমাদিগকে সর্বপ্রকার সত্যপথে চালিত করিবেন, কারণ তিনি নিজের কথা কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা তিনি (ঈশ্বরের নিকট হইতে) শুনিবেন, তাহাই বলিবেন, এবং তিনি ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা দেখাইবেন।"

এই 'শান্তিদাতা' (paraclete) কে? হযরত মুহম্মদকেই কি স্পষ্টাক্ষরে এখানে ইঙ্গিত করা হইতেছে না? যিশুখ্রিস্টের পরে একমাত্র মুহম্মদ ছাড়া অন্য কোন পয়গম্বর আবির্ভূত হন নাই। তাহা ছাড়া paraclete শব্দের অর্থও হইতেছে 'শান্তিদাতা', অথবা 'চরম প্রশংসিত'। এই দুইটি বিশেষণই হযরত মুহম্মদের জন্য নির্দিষ্ট। কাজেই এ-সম্বন্ধে আর কোনই সন্দেহের অবকাশ নাই।

কুরআন শরীফের বহু স্থানেও এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি আয়াতের উল্লেখ করা যায়ঃ

"এবং যখন আল্লাহ্ সমস্ত পয়গম্বরদিগের সমক্ষে এই চুক্তি করিলেন যে, নিশ্চয়ই আমি যে-সমস্ত বাণী তোমাদিগকে দিয়াছি তাহা সত্য, অতঃপর একজন রসূল আসিবেন এবং তিনি আসিয়া তোমাদের নিকট যাহা আছে তাহার সত্যতা প্রমাণ করিবেন; তোমরা তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং তাঁহাকে সাহায্য করিবে। তিনি বলিলেন ঃ তোমরা এই ব্যাপারে আমার কথা স্বীকার করিলে তঃ তাহারা বলিলেন ঃ আমরা স্বীকার করিলাম। তখন তিনি বলিলেন ঃ তাহার হইলে সাক্ষী থাকো। আমিও তোমাদের সহিত সাক্ষী থাকিলাম।"

(সূত্রঃ ড. মরিস বুকাইলি, বাইবেল, কুরান ও বিজ্ঞান

বিশ্ব নবী গোলাম মোস্তফা পৃ-২৭)

www.nagorikpathagar.org

অতীশ দীপংকর (৯৮০-১০৫৪)

অতীশ দীপংকার জন্ম, ৯৮০ সালে, বাংলাদেশের বিক্রমপুর জেলায়। তার আসল নাম চন্দ্রগর্ভ। উনিশ বৎসর বয়সে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নেন। তিব্বতের তিনি গৌতম বৌদ্ধের আদর্শ প্রচার করেন। তিব্বাতর রাজধানী লামার কাছে ন্যাথার নামক স্থানে এক বৃহৎ বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। ১০৫৪ সালে বিহারের তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৭৮ সালে চীন থেকে চিতাভাঘ এনে বাংলাদেশে বৌদ্ধ বিহার স্থাপন করা হয়েছে। তাঁর জীবনের মূল ভাষণ গুলোর মাত্র ছিল (ক) মানুষকে ভালবাস (খ) সদা সত্য কথা বল (গ) অহিংসা পরম ধর্ম (ঘ) পিতামাতার সেবা কর (ঙ) পাপ কাজ থেকে বিরত থাক (চ) নিজের বিবেককে জন্মাগ্রত কর (ছ) মহাপ্রভূর নামে উপসিনা কর (জ) মানুষকে হত্যা করা অর্ধম।

আড়াই হাজার বছরেরও আগের কথা। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ জগতের সমস্ত সুখসম্ভোগ ছেড়ে হয়েছিলেন গৃহত্যাগী। সংসার ত্যাগ করেছিলেন মানুষের জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুরূপ দুঃখের কারণ ও দুঃখমুক্তির পথ অনুসন্ধানের জন্যে। সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে তিনি ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন নৈরঞ্জনা নদীতীরে এক গভীর অরণ্যে। প্রকৃতির কোলে, অরণ্যের নির্জনতা-নিস্তব্ধতার মাঝে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হয়ে মুক্তির পথ খোঁজার মানসে সাধনায় রত হয়েছিলেন তিনি। দীর্ঘ ছয় বছর কঠোর সাধনায় মগ্ন থাকার পর তিনি জয় করেছেন দুঃখের মূল কারণ তৃষ্ণাকে। তিনি লাভ করেছেন বোধি বা পরম জ্ঞান। তিনিই হলেন 'বুদ্ধ'। 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ জ্ঞানী। এই জ্ঞান সাধারণ বা শুধু জাগতিক জ্ঞান নয়। এজন্যই পৃথিবরি সব জ্ঞানী ব্যীক্তই বুদ্ধ নন। বুদ্ধ দীর্ঘ সাধনাবলে যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন তা হলো 'চারি আর্য সত্য': দুঃখ সত্য, দুঃখের কারণ সত্য, দুঃখ নিরোধ সত্য, দুঃখ নিরোধের উপায় সত্য। দুঃখ নিরোধের উপায় হিসেবে, দুঃখকে জয় করার জন্যে তিনি চিহ্নিত করেছেন 'আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ'। এই আটটি পথ বা মার্গ হলো:

১। সম্যক দৃষ্টি ২। সম্যক সংকল্প ৩। সম্যক বাক্য
৪। সম্যক কর্ম ৫। সম্যক জীবিকা ৬। সম্যক উদ্যম
৭। সম্যক স্মৃতি ও ৮। সম্যক সমাধি

www.nagorikpathagar.org

বুদ্ধ নির্দেশিত এ আটটি পথ মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্যে সর্বোৎকৃষ্ট পথ। এ পথ অনুসরণ করে নিঃসন্দেহের মানুষ লাভ করতে পারে অনাবিল আনন্দ ও প্রশান্তি।

বুদ্ধ অহিংসা, সাম্য, মৈত্রী ও সর্বজীবে করুণার কথা বলেছেন। বুদ্ধ বার বার যে কথা বলেছেন সেটা হচ্ছে- বৈরিতা দ্বারা বৈরীভাব কখনও প্রশমিত করা যায় না। পরন্তু বৈরিতাহীন আচরণ দ্বারা বৈরিতা প্রশমিত হয়। এটাই সনাতন ধর্ম। বুদ্ধের দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে মানবজীবন কর্মপ্রবাহ মাত্র। মানুষ তার নিজ নিজ কর্মের স্থূল প্রতীক। সমগ্র বিশ্বচরাচর এ কর্মের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। প্রথমত মনেই তার উন্মেষ ঘটে। মানসিক চেতনা ও চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে, মানুষের প্রতিটি কর্মে। বস্তুত মানুষ তার অন্তনির্হিত চেতনা ও বাহ্যিক কর্মের মূর্ত প্রতিচ্ছবি। 'As a may thinketh in his head, so is he.'তাই বলা হয়েছে- শুদ্ধ চিত্তই সার্বিক কল্যাণের উৎস। "স্ব পাপসস অকরঙ্ক কুশলস্‌স উপসম্পদা সচিত্ত পরিষেঅদপনং এতং বুদ্ধান সাসসং।" অর্থাৎ স্বীয় চিত্তকে সর্বপ্রকার কলুষ হতে মুক্ত করে সার্বজনীন কুশল বয়ে আনে এরূপ কর্মে আত্মনিয়োগ করাই সকল দুঃখ হতে পরিত্রাণের পথ। এ-ই হচ্ছে বুদ্ধের শিক্ষা।

আরো বলা হয়েছে- "দর্শন, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, দেহ, বাক্য মন সবকিছুকে সংবরণ কর। সংবরণ, সংযমন ও সংমার্জনই সুন্দর জীবনের অভিব্যক্তি।"

ভিক্ষুসঙ্গের প্রতি বুদ্ধের নির্দেশ ছিলো এরূপ: সংগ্রামে সহস্রবার সহস্র যোদ্ধাকে জয় করা যায় কিন্তু সে-ই সর্বশ্রেষ্ঠ বিজেতা যে নিজেকে জয় করতে পেরেছে। ধ্যানের স্তরে বুদ্ধ যে পরম জ্ঞান ও দর্শন লাভ করেছিলেন তা-ই মান কল্যাণে প্রচার করেছেন। একমাত্র ধ্যানাবস্থা গূঢ় সত্যকে উপলব্ধি ও অর্জন করা সম্ভব। আত্মনিমগ্ন হয়েই মহামানবেরা নব নব উপলব্ধিতে সমৃদ্ধ হয়ে জগতে হয়েছেন স্মরণীয় ও বরণীয়।

গৌতম বুদ্ধ কেবল আস্তানাতেই থাকেন নি। ঘুরে ঘুরে, পায়ে হেটে দূর দূরান্তে চলে যেতেন। মানুষের মাঝে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেন। সে সময় পশুবলি দেয়ার রীতি চালু ছিল। তিনি বললেন, জীব হত্যার মাঝে কোন মঙ্গল লুকিয়ে থাকে না। যদি মঙ্গল কিছু থাকত তাহলে মানুষ বলি দেয়া হোত অধিকতর মঙ্গলময়। সুতরাং জীব হত্যা পরিহার কর। সমাজের অসংখ্য কুসংস্কার দেখে মানুষের মাঝে দশটি বিষয়কে তুলে ধরলেন,

> ১। কোন ব্যভিচার বা অনাচার করবে না, ২। মিথ্যা পরিহার করবে, কারো সাথে প্রতারণা করবে না। ৩। আহারে সংযমী হও। ৪। বিলাসীতা ত্যাগ কর। ৫। জীব হত্যা করবে না। ৬। অপরের জিনিস চুরি করবে না। ৭। মাদকদ্রব্য গ্রহণ করবে না। ৮। কোন অলংকার পরবে না। ৯। নৃত্য গীত দেখবে না ১০। অপরের দোষ নিয়ে সমালোচনা করবে না।

জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে দিতে চলে আসেন কুশিনগর। বিশ্রামের উদ্দেশ্যে মালবনের ভেতর ঢুকে আসন পেতে বসলেন। সাথে আছে কিছু শিষ্য। গৌতম বুদ্ধ

www.nagorikpathagar.org

ধ্যানে বসার আগে আনন্দকে ডেকে বললেন, তোমার ওপর মহান দায়িত্ব অর্পণ করতে চাই। আমি যখন থাকব না তখন তুমি আমার উপদেশ মত মানুষকে সঠিক পথ দেখাবে।

তিনি ধ্যানে মগ্ন হলেন। সেই ধ্যান আর কখনো ভাঙ্গল না। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৪৪ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তখন তার বয়স আশি বছর। তিনি তার বাণী লিপিবদ্ধ করে যাননি। তার মৃত্যুর পর তার অনুসারী বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষিত মানুষজন সংকলিত করেন, বৌদ্ধ শাস্ত্রে

....

বৌদ্ধ শাস্ত্রে ঃ বৌদ্ধদিগের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'দিঘা-নিকায়া'য় উল্লিখিত হইয়াছে "মানুষ যখন গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ভুলিয়া যাইবে, তখন আর একজন বুদ্ধ আসিবেন, তাঁহার নাম 'মৈত্তেয়' (সংস্কৃত মৈত্রেয়) অর্থাৎ শান্তি ও করুণার বুদ্ধ।"

আমরা নিম্নে সিংহল হইলে প্রাপ্ত (form Ceylonese sourssces) একটি প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি। তাহাতেও উপরোক্ত কথার সমর্থন আছেঃ

Ananda said to the Blessed One, "Who Shall teach us when thou art gone?

And the Blessed One replied :

`I am not first Buddha who came on the earth, not Shall I be the last. In one time another Buddha will arise in the world, a holy one, a supremely enlightened one, endowed with wisdom in conduct ... He will proclaim a religious life, wholly perfect and Pure such as I now proclaim...

Ananda said, `How shall we know him?

The Blessed One said, He will be known as `Maitreya'

(The Gospe of Buddha by Carus, pp. 117-10)

অর্থাৎ ঃ আনন্দ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ আপনার মৃত্যুর পর কে আমাদিগকে উপদেশ দিবেন?

বুদ্ধ বলিলেনঃ

আমিই একমাত্র বুদ্ধ বা শেষ বুদ্ধ নই। যথাসময়ে আর একজন বুদ্ধ আসিবেন আমার চেয়েও তিনি পবিত্র ও অধিকতর আলোকপ্রাপ্ত-তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মমত প্রচার করিবেন- আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাকে আমরা চিনিব কি করিয়া? বুদ্ধ বলিলেনঃ তাঁহার নাম হইবে মৈত্রেয়।

এই 'শান্তি ও করুণার বুদ্ধ' (মৈত্রেয়) যে মুহম্মদ, তাহাতে কোনই সন্দেহ না।

আল কুরনে মুহাম্মদ (সাঃ) কে বলা হয়েছে রহমতুল্লিল আল আমীন' অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের জন্য মূর্ত করুনা ও আর্শীবাদ।

(সূত্রঃ বিশ্ব নবী গোলাম মোস্তফা)

www.nagorikpathagar.org

মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি (রঃ) (১২০৪-১২৭৩)

বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্বে মাওলানা জালালউদ্দিন রুমি কবিদের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত ও পঠিত। ফারসি ভাষাভাষীদের গবেষকরা জালালউদ্দিন রুমিকে তাদের সবচেয়ে বড় কবি হিসেবে দেখেন। পশ্চিমা বিশ্বে তার জনপ্রিয়তার কারণ তিনি তার কবিতার মাধ্যমে যে বার্তা তুলে ধরেছেন তা তার ভাষার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি তার কাব্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দর্শন দিয়েছেন যা নিছক ফারসি ভাষা বা সংস্কৃতির বিষয় নয়, বরং মানবজাতির আত্মার রহস্যের বিষয়। কাব্য-সাহিত্যের পাশাপাশি তিনি গদ্যও রচনা করেছেন। তার গদ্য সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে কিছু সংলাপ, যেগুলোর মানসম্পন্ন অনুবাদ করেছেন এ জে আরবেরি। মাওলানা জালালউদ্দিন রুমি যে বিশ্বের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সুফি তা বোঝার জন্য কাউকে তার কাব্যের সমঝদার হতে হবে এমনটি নয়।

সাহিত্যের সামগ্রিক বিচারে রুমির মাহাত্ম্য নিহত এখানে, তিনি ইসলাম ধর্মের একেবারে নির্যাসটুকু হাজির করতে পেরেছিলেন। যা মানুষকে পবিত্র ও সৌন্দর্য দান করে। আর স্বভাবতই একটি সর্বজনীন ধর্ম হিসেবে ইসলামের মর্মবাণী সব দেশের সব কালের প্রতিনিধিত্ব করে। মানব সন্তান সীমাহীন স্বাধীনতা ও অফুরন্ত স্বর্গীয় মহিমা নিয়ে জন্মলাভ করেছে। এ দু'টি পাওয়া তাদের জন্মগত অীধকার। তবে এ মহামূল্যবান দু'টি জিনিস পেতে হলে তাদের অবশ্যই ভালোবাসার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কেউ হয়তো বা প্রশ্ন করতে পারেন এর মধ্যে নতুন কী আছে? দুনিয়ার তাবত মহাপুরুষই তো এ কথা বলে গেছেন। রুমির মাহাত্ম্য এখানেই নিহিত যে, তিনি অত্যন্ত সরাসরি দৈনন্দিন জীবনচরণ থেকে উদাহরণ টেনে মহাসত্যকে জীবন্তভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছেন। উন্মোচন করেছেন মানবাত্মার রহস্য।

জালালউদ্দিন রুমি ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান আফগানিস্তানের বালাখে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা বাহা ওয়ালাদ ছিলেন সর্বজনবিদিত পণ্ডিত ও সুফি। বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহর ভালোবাসা কিভাবে হাসিল করা যায় তার ওপর অনেক চিত্তাকর্ষক লেখা তিনি লিখেছেন। মোঙ্গলদের আসন্ন আক্রমণের সময় ইরানের পূর্বাঞ্চলীয় এলাকায় থাকাকে নিরাপদ মনে না করায় তিনি ১২০২ সালের দিকে তার পরিবারকে আনাতলিয়ায় সরিয়ে নেন। বর্তমান তুরস্কের কনিয়ায় তিনি স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। এবং সেখানেই তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আলেম হিসেবে পেশাজীবন শরু করেন। ১২৩১ সালে

www.nagorikpathagar.org

মৃত্যুর পর তার পুত্র জালালউদ্দিন পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। রুমি বিশ্বাস করেন, সৌন্দর্য মানব মনের চিরন্তন কাম্য। কেননা আল্লাহ নিজেই সুন্দর এবং তিনি সব সৌন্দর্যের উৎস। আর মানবাত্মার প্রকৃত চাহিদা হচ্ছে খোদ আল্লাহ পাক। নাদের এই সৌন্দর্যকে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে ভাষাগত রূপায়ণের পাশাপাশি স্থাপত্য কর্মের মাধ্যমেও তুলে ধরে মানসভ্যতাকে উপকৃত করেছেন। নাদেররে সিরামিকের বাড়ি ও মৃত স্থাপত্যের দিকে তাকালেই এই সত্য মূর্ত হয়ে ধরা দেবে।

R A Nicholson, Arther John Arbery, William C Chittick, Ancara University's History of Religions-এর Professor Annemarie Schimmel এবং আমেরিকার শৌখিন রুমি-গবেষক ইব্রাহিম গামার্দ (Ibrahim Gamard)-এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও অনুবাদকর্মের দ্বারা আজকের ইউরোপের শিক্ষার্থীরা ব্যাপকহারে রুমির সাহিত্য কর্মের রস আস্বাদন করতে পারছেন। ইত্যেমধ্যে তারা যে রুমির সাহিত্যকর্মের রস নিংড়ে পরিতৃপ্তির সাথে পান করছেন তা-ও জোরালোভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। গবেষকরা এখন বিশ্বসাহিত্যের বদ্ধমূল ধারণায় অন্তত কিছু হলেও চিড় ধরাতে সক্ষম হয়েছেন। তাদের মধ্যে সাহিত্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নতুন করে বোধোদয় ঘটতে শুরু করেছে। রুমির সাহিত্যকর্ম অধ্যয়নের পর এতকাল দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ইংরেজ সাহিত্যকদের সাহিত্যকর্মকে রীতিমতো পানসে বলে মনে হচ্ছে। তারা এখন রীতিমতো নিক্তি দিয়ে ওজন করছেন কার সাহিত্যকর্মের গভীরতা কতটা। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক রিসার্স স্কলার এবং লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রিপ্রাপ্ত সামির আসাফ The Poet of the Poets-শীর্ষক এক নিবন্ধে লিখেছেন, গভীরতার মানদণ্ডে রুমির তুলনায় শেক্সপিয়রের মান হচ্ছে মাত্র ১০ ভাগের এক ভাগ। পশ্চিমা সাহিত্যকদের মান প্রসেঙ্গ তিনি আরো লিখেছেন, 'পাশ্চাত্যের গ্যাটে, চসার ও ইমারসন পর্যন্ত রুমির প্রভাব প্রতিপত্তি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এ কথা বলতে দ্বিধা নেই, রুমির সমকক্ষ-যেমন গাজ্জালী, গালিব, জামি, সাদি, জিবরান, এমনকি কাজমি, দেহলভি বা জাউকের (Zauk) সাহিত্যকর্মের তুলনায় পশ্চিমা সাহিত্য বলতে গলে হাস্যকর পর্যায়ের অগভীর।

ভাষাবিদরা পশ্চিমা সাহিত্য, বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্যের এই অগভীরতার পেছনে অন্যতম তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন। এগুলো হচ্ছে-উর্দু বা ফারসির তুলনায় এসব ভাষার প্রকাশভঙ্গির অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা, পাশ্চাত্যে মরমিবাদের সহজাত ঘাটতি এবং সামগ্রিকভাবে পশ্চিমা সমাজ ও সংস্কৃতি তুলনামূলকভাবে অস্থিতিশীল। পক্ষান্তরে রুমি ও জগতের মানুষ হয়েও সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের বাসিন্দা তথ্য আধ্যাত্মিক চেতনার মানুষ ছিলেন। তার কবিতা তাই যেন আকাশ থেকে বারিধারায় মতো নেমে

www.nagorikpathagar.org

আসত। রুমির সাহিত্যকর্ম স্থান-কাল-পাত্রের সীমা অতিক্রম করে অমরত্ব লাভ করেছে। আজ বিশ্বখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ম্যাডোনা ও তার মতো আরো অনেকে রুমির কবিতাকে গানে রূপ দিয়ে গেয়ে বিশ্বের দরবারে তাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করার প্রয়াস পাচ্ছেন। এই মহাকবির একটি কবিতার অংশবিশেষ তুলে ধরে আজকের এই লেখার পরিসমাপ্তি টানতে চাই:

যেদিন আমি মরে যাব

যেদিন আমি মরে যাব, আমার কফিন এগিয়ে যাবে

সেদিন ভেবো না আমার অন্তর এই ধরাধামে রয়ে গেছে!

তোমরা অযথা অশ্রু বিসর্জন দিও না, হাহুতাশ করো না

'হায়রে লোকটা চলে গেল'-এই বলে বিলাপ করো না।

আমার সমাধিকে অশ্রুজলে কর্দমাক্ত করে দিও না।

আমি তো মহামিলনের মহাযাত্রার অভিযাত্রী।

আমায় কবরে শোয়ালে 'বিদায়' জানাবে না,

কবর তো ইহকাল-পরকালের মাঝে একটা পর্দা মাত্র-অনন্ত আশীর্বাদের ফোয়ারা।

তোমরা অবতরণ দেখেছ-এবার চেয়ে দেখো আমার আরোহণ।

চন্দ্র-সূর্যের অস্তাগমন কি বিপজ্জনক?

তোমাদের কাছে যেটা অস্তাগমন, আসলে সেটাই উদয়ন।

মাওলানা রুমীর মরমিদর্শন সর্বজনীন প্রেম, অনপেক্ষ সত্তার ধারণা, পূর্ণ মানবের ধারণা এবং মা' রেফত সহ বিভিন্ন বিষয় স্থান পেয়েছে। এসব বিষয় উপস্থাপনার ক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন শব্দকে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করছেন। সুফি দর্শনে প্রতীক ব্যবহার রীতি প্রথম থেকেই চালু রয়েছে। অনেক জটিল বিষয়, সৃষ্টিজগৎ, আল্লহর সাথে বান্দার সম্পর্কে, সৃষ্টি ও স্রষ্টার সাথে সম্পর্কেও ক্ষেত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের অবস্থান ও ভূমিকা, মানবত্মার স্বরূপ, খোদা প্রেম ইত্যাদি প্রতীকের মাধ্যমে সুফিরা প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন।

প্রতিক হিসাবে 'আলো' (নুর) শব্দটির ব্যবহার সুফিদর্শনে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআন মজিদে ও হাদিস শরিফে 'আলো' শব্দটির বহুবিদ ব্যবহারের কারণেই সম্ভবত সুফিরা আধ্যাত্মিকতা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়কে নির্দেশ করার জন্য এই শব্দটিকে প্রতীক হিসাবে অনুপ্রণিত হয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

মাওলানা রুমী আল্লাহকে পরম ও অনপেক্ষ আলো হিসাবে অভিহিত করেছেন। সমস্ত কিছু তিনিই অস্তিত্বে এনছেন। অতিন্দ্রীত জগৎ ও অবাভাসিক জগতের তিনিই একমাত্র স্রষ্টা। এ বিষয়টিকে প্রতীকের মাধ্যমে তিনি নানাভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। রুমী যখন আল্লাহকে আলো হিসাবে অভিহিত করেন তখন এর নির্দেশনা আভাসিক আলো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। জা'গাতিক আলোর সাথে এই নয় যে, তিনি বাস্ত বিকই আলো সদৃশ। রুমী প্রশ্ন সেখানে আভাসিক জগৎ ও দেশোর্দ্ধ সেখানে তা কিভাবে কাঁচা বা প্রদীপের মাধ্যে সিন্নিবিষ্ট থাকতে পারে। রুমী বলেন যদি কিছু কেউ একে অন্বেষণ করে তখন একে আত্মায় পাওয়া যায়; তবে এক ঠিক আলোর অবস্থানকারী পাত্র হিসাবে অভিহিত করা যায় না, কিন্তু এই স্থান থেকে আলোর বিকিরণ হচ্ছে। যেমন একজন ব্যক্তি আয়নার ভেতর তার প্রতিবিম্ব আবিষ্কার করে, কিন্তু সত্যি সত্যিই প্রতিবিম্বটি আয়নার মধ্যে সন্নিবেশিত নয়, শুধুমাত্র যখন সে আয়নার দিকে তাকায় তখন সে তাতে নিজেকে দেখতে পায়। মাওলানা রুমী তাঁর মসনবী এর প্রথম খণ্ডে (ম. ১১২১-৩৫) আল্লাহর আলোর অনুপমেয় ও গুপ্ত বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর চেষ্ট করেছেন। তিনি অবাভাসিক আলোর কথা বলে প্রসঙ্গটির অবতারনা করেন। তিনি বলেন, এই জন্যই সব ধরণের রঙ দৃষ্টিগোচর হয়। রাতে সমস্ত রঙ আমাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। অতএব এটা সুস্পষ্ট যে, আলোর কারণেই রঙসমূহ দেখা যায়। অবাভাসিক আলো হলো সূর্য নক্ষত্রে সমূহের আলো এবং গুপ্ত বা লুক্কায়িত আলো হলো পরম আলোর প্রতিফলন। দৃষ্টির আলো আসে আত্মার আলো থেকে যা(আত্মা) আল্লাহ্র আলোতে আলোকিত হয়। যেহেতু আল্লাহর কোন বিপরীত নেই জন্যই চিরদিনের জন্য নশ্বর দৃষ্টিসমূহের অন্তরালে থেকে যান। মাওলানা রুমী এই আলোচনার মাধ্যমে 'আলো' শব্দটি যে আল্লাহ্র ক্ষেত্রে সম্পপূর্ণভাবে প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ইরানের বিখ্যাত মরমি কাব জাকীও চর্মচক্ষুর অন্তরালে আল্লুহর অবস্থান সম্পর্কে মরমিভাবধারায় আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোর দীপ্তি এতই প্রগাঢ় যে, চর্মচক্ষুসমূহ তা অবলোকন করার সামর্থ্য রাখে না। তিনি বলেন, দিবাভাগে সূর্যের আলোর তেজস্বিতার কারণে আকাশের দিকে তাকানো কষ্টসাধ্য কিন্তু তা যখন মেঘের আড়ালে ঢেকে যায় তখন সে আলো হয়ে ওঠে কোমল ও সুখকর। মাহমুদ শাবিসাতারীও তাঁর মরমিগ্রন্থ গুলশান-এ রায় এ আল্লাহর আলোর অনুপমেয়তা এর প্রতীকী বৈশিষ্ট্য এবং দৃষ্টিশক্তির অন্ত রালে অবস্থানের বিষয়ে ইঙ্গিত করেছে।

প্রদীপগুলো ভিন্ন ভিন্ন আলো অভিন্নতা আসে অন্যত্র থেকে। যদি তুমি প্রদীপের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কর, তুমি বিভ্রান্ত হবে; কারণ এতে উদ্ভব হয় সংখ্যার ও বহুত্বের। তোমার দৃষ্টি স্থিরভাবে আলোর উপর নিবদ্ধ কর, তবেই তুমি সসীম দেহের দ্বৈততা ও

www.nagorikpathagar.org

বহুত্ব থেকে মুক্তি পাবে। প্রদর্শনের জন্য এক হাতিকে এনে রাতের অন্দকারে ঘরে রাখা। এই হাতি দেখার জন্য জনতার ভিড় লেগে গেল। সেই অন্ধকারেই প্রত্যেকেই হাতি দেখার জন্য নাছোড়বান্দা। একে চোখে দেখা যেহেতু সম্ভবপর ছিল না, প্রত্যেকেই হাতের স্পর্শে একে অনুভব করল। একজনের হাত গিয়ে হাতির শুঁড়ের উপর পড়ল; সে বলল "এই প্রাণীটি পানির পাইপের মতো। অপরজন এর পায়ে হাত দিল এবং হাতিটি স্তম্ভের আকৃতি বিশিষ্ট বলে বর্ণনা করল। আরেকজন এর পেছনে হাত বুলাল, হাতিটিকে সে, "বলল সিংহাসন সদৃশ।" প্রত্যেকের হাতে যদি একটি করে প্রজ্বলিত মোমবাতি খাকত, তাদের বক্তব্যসমূহে কোন বিরোধ থাকত না।

উপরোক্ত পঙক্তিসমূহে রুমী সেই সব সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির ইঙ্গিত করেছেন, যাঁরা আল্লাহর তরফ থেকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন। প্রাকৃতিক জগতে নক্ষত্রবাদির প্রভাব রয়েছে বলে বলা হয়ে থাকে, তেমনি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আল্লাহ্‌র জাতের মধ্যে নিহিত আধ্যাত্মিক নক্ষত্ররজির দ্বারা সৌভাগ্যশালী হয়ে থাকেন। এর দ্বারা রূপক অর্থ আল্লাহ্‌র গুনবাচক নামসমূহকে নির্দেশ করা হচ্ছে যা একজন সুফির প্রত্যেকটি ধাপকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এদেরও প্রভাব বহুবিধ কিন্তু উচ্চতর প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে অবলোকন করলে দেখা যাবে এরা অভিন্ন সত্তাভূক্ত এবং পরস্পর একীভূত। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, অনুকম্পা এবং পরিচয় প্রাপ্তির বদৌলতে আল্লাহ্‌র মনোনীত ব্যক্তিরা আল্লাহ ছাড়া সব কিছুর থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে সক্ষম হন। প্রত্যেক অংশই এর মূলকে চায়। একজন সুফির বা মরমির আত্মার সার্বক্ষণিক আকাঙ্ক্ষা হলো, তার মূল আবাসে ফিরে যাওয়া অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যাওয়া। আল্লাহ্‌ই তার পরম প্রেমাস্পদ (মা'শুকে হাকিকি), তাঁর আলোতে বা তাঁর অনুগ্রহে সে অস্তিত্বে এসেছে।

আগুন থেকে তুলে নিয়ে তাঁকে [মুহাম্মদ (স.)-কে] গঠন করা হয়েছে বিশুদ্ধ আলোতে; তাই তিনি সব আলোর উপরে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। ঐ ঝলকই রুহসমূহের উপরে প্রভাব ফেলেছে এবং আদম ঐ আলো থেকেই মারোফাত অর্জন করেছে।

রুমীর মতে, মুহাম্মদ (সা:) হলেন আল্লাহ্‌র আয়না। আল্লাহ্‌র চিরন্তন জ্ঞানের সরাসরি প্রতিফলন--আল্লাহ্‌র প্রথম সৃষ্টি। শুধুমাত্র অবভাসের জগত নয়, অপরিদৃশ্যমান জগতেরও তিনি ভিত্তিস্থল, অতিন্দ্রীয় জগতও মুহাম্মদ (স.) হতে জীবনীপ্রাপ্ত। তাঁর আলো সমগ্র সৃষ্টিকে শুধু অস্তিত্বেই আনে না বরং উভয় জগতের উচুঁ ও নিচু যা কিছু রয়েছে সেগুলোকে প্রতিপালন ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। নূরে মুহাম্মাদী সম্পর্কিত রুমীর এই অভিমত লগস মতবাদে পরিণতি লাভ করেছে। যা তাঁর পূর্ববর্তী সুফি দার্শনিক ইবনুল আরাবীর দর্শনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। রুমী এ বিষয়ে অন্যত্র বলেন:

www.nagorikpathagar.org

আমরা আল্লাহর প্রতিচ্ছায়া,

আমরা মুস্তাফার আলো থেকে এসেছি,

আমরা হলাম মহমূল্যবান মুক্তা

ফেলা হয়েছে আমাদের ঝিনুকের খোলসের ভেতরে।

নূরে মুহাম্মদীর আদি কালিক অস্তিত্ব সম্পর্কে রুমী মসনবীর অন্যত্র বলেন:

অতএব মুস্তাফা (মুহাম্মাদ) বলেন, "আদম ও (অন্যান্য) নবী, আমার পেছনে, আমার ঝান্ডার নিচে।"

সেই জন্যই সমস্ত জ্ঞানের আধারের এই প্রতীকী উক্তি "আমরাই সর্বশেষ, আমরাই সর্বপ্রথম।"

"বাহ্যত যদিও আমি আদম সন্তান, সত্যিকার অর্থে আমি পূর্ব পুরুষদের (প্রত্যেকের) পূর্ব পুরুষ।

আমার কারণেই ফেরেশতামতগুলী তাঁকে সেজদা করেছিল। আমার জন্যই তিনি সপ্তম আকাশে উঠতে পেরেছিলেন।

অতএব, সত্যিকার অর্থে পিতা (আদম) আমা হতেই জন্মেছেন, সত্যিকার অর্থে ফল থেকেই বৃক্ষ জন্মায়।

প্রথমে চিন্তা (ধারণা) তারপর তা বাস্তাবয়িত হয়, বিশেষ করে সেই চিন্তাটি হলো আনাদি।

রুমীর অস্তিত্বের বলয়সমূহের গতিশীলতায় নূরে মুহাম্মদীর ভূমিকা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। রুমী শুধু রাসুলুল্লাহকে সৃষ্টির কারণ হিসাবেই উল্লেখ করেননি, তাঁর মতে রাসূলুল্লাহ্‌র মাধ্যমে আল্লাহ্ নিজেকে অবলোকন করেন--তাঁর পবিত্র নামসমূহ ও গুণাবলিসহ (আল-আসমা-আল-হুসনা)। হাদিসে কুদসী "লাউ লা-কা লামা খালাকতু আল-আফলাক" অর্থাৎ তুমি ব্যতীত অন্য কোন কারণে আমি আকাশসমূহ (অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বজগত) সৃষ্টি করি নাই"-এর প্রেক্ষিতে রুমী মসনবিতে (২:৯৭০-৭৪) বলেছেন।

প্রথমে চিন্তা (ধারণা) তারপর তা বাস্তবায়িত হয়, সৃষ্টির ভিত্তিও ঠিক এইভাবে আদিতে রচিত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে চিন্তাতেই ফলসমূহ স্থিরীকৃত হয় কর্মের মাধ্যমে তা শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। যখন তুমি কর্ম সম্পাদন করলে এবং বৃক্ষ রোপন করলে, তখনই তুমি প্রথমে অভীষ্ট সেই ফল প্রাপ্ত হলে যদিও প্রথমে দৃশ্যপটে আসে গাছের মূল, শাখা প্রশাখা ও পত্র পল্লব, তথাপি ফল প্রদানই এসবের চূড়ান্ত লক্ষ্য। অতএব

www.nagorikpathagar.org

এই মহাবিশ্বে সৃষ্টির পেছনে যে মূলসত্তা (রহস্য) নিহিত ছিল তার মূলে ছিল একমাত্র খাজা-এ লাউলাকের সৃষ্টি।

উল্লেখিত হাদিসটির প্রতি ইঙ্গিত করে রুমী নূরে মুহাম্মদীকে সমগ্র সৃষ্টির সারসত্তা হিসাবে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। নিকলসন রুমী কর্তৃক রাসুলুল্লাহকে খাজা-এ-লাউলাক (লাউলাকের প্রভু) হিসাবে অভিহিত করার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, মুহাম্মদ (সা:) (পূর্ণ মানব- ইনসান-এ-কামেল) ব্যতীত, সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবয়িত হতো না। কেননা আল্লাহ পূর্ণ মানবের মাধ্যমে নিজ সম্পর্কে অবহিত হন কেননা, তাঁর মধ্যেই শুধু আল্লাহর সমগ্র গুণাবলি প্রকাশিত হয়।

রুমীর পূর্বে প্রখ্যাত মরমি কবি সানা'ঈ সমস্ত নবীর মধ্যে রাসুলুল্লাহ (স.) অগ্রগামিতা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলে: "আহমাদ থেকেই আদম পরিদৃশ্যমান হয়েছে।" সানা'ঈ-এর মতে,"সেইজন্যই সবকিছু রাসূলুল্লাহ্‌র (স.)-র অনুগত।" আমি বাতাসকে জিজ্ঞেস করলাম: "কেন তুমি সুলায়মানের প্রতি আনুগত্য পোষণ কর?" সেটি বলল: "কেননা তাঁর মোহরের মধ্যে আহ্‌মাদের নাম খোদিত রয়েছে।

নূরে মুহাম্মদীতত্ত্ব ফরিদউদ্দীন আত্তারের কাব্যেও অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি তাঁর কাব্যগ্রন্থ মানতিক আল-তায়ের এর ভূমিকায় বলেন : কিভাবে সমগ্র সৃষ্টি অস্তিত্বে আসার পূর্বে সেই নূর আল্লাহ্‌র সম্মুখে সেজদারত ছিল।

তাঁর আলো থেকেই এসেছে আরশ ও কুরসি

ফেরেশতামণ্ডলী, আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহ ও পবিত্ররা সব।

ইহজগত ও পারলৌকিক জগত তাঁর উপর নির্ভরশীল

তাঁর সত্তার আলোর কারণেই এই জগত এত মনোরম।

প্রেমিক রুমী তাঁর প্রেমাস্পদের (আল্লাহ্‌র) আলো সর্বত্র দেখতে পান। এটিকে তিনি তাঁর জন্য সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ বলে মনে করেন। রুমী বলেন, তাঁর সামনে পেছনের ধারণা থাকত না- যদি না তাঁর প্রিয়তম বন্ধুর আলো তাঁর সামনে পেছনে না থাকত। তাঁর ডানে এবং বামে, উপরে এবং নিচে বিদ্যমান রয়েছে। এটি তাঁর মাথা ও গর্দানের গলবন্ধের ন্যায়।

এখানে 'আলো'র মাধ্যমে সকল মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র সাধারণ উপঢৌকন, অনুগ্রহ ও দয়াকেই যে শুধুমাত্র প্রতীকীকরণ করা হয়েছে তা কিন্তু নয়। লক্ষণীয় বিষয় হলো এখানে ইয়ার (প্রিয়তম) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা প্রেমকে নির্দেশ করে। প্রেম প্রেমিককে পুরোপুরিভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে, সেই অবস্থায় প্রেমিক, প্রেমাস্পদ ও প্রেমই শুধু বিদ্যমান থাকে। প্রেম অথবা প্রেমাস্পদই শুধু একজন মরমির মনে বিরাজমান থাকে, কেননা এটাই তার একমাত্র কাম্য।

www.nagorikpathagar.org

হে প্রেম, যাকে বিশালতার জন্য আকাশে স্থাপন করা যায়নি
কি ভাবে তোমাকে স্থাপন করা যাবে আমার অবরুদ্ধ আত্মায়?
তুমি এক ঝাঁপে প্রবেশ করলে আমার আত্মার গৃহে এবং
বন্ধ করে দিলে দরজাটি ভেতর থেকে--
আমার প্রদীপের তাক, আমার কাঁচ (আয়না) এবং আলোর উপর আলো।

সেই আলোর অধিকারী হওয়ার পথ নির্দেশ করতে গিয়ে রুমী বলেনঃ

তিনি বলে, আয়না, অর্থাৎ আত্মা, যদি মরিচা ও নোংরামি থেকে মুক্ত হয় তবে তা আল্লাহ্‌র সূর্যের (খুরশিদে খুদা) আলোতে ঝলমল করতে থাকে। অতএব প্রথমে মুখমণ্ডল থেকে, অর্থাৎ আত্মার আয়না থেকে মরিচা অপসারণ করতে হবে, এবং তবেই শুধু ঐ আলো অর্জন সম্ভব হবে। সমস্ত সুফিই আধ্যাত্মিক উন্নতি, আল্লাহ্‌র প্রেম অর্জন এবং আল্লাহর পরিচয় প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হিসাবে আত্মার পরিশুদ্ধতার কথা বলে থাকেন। রুমী একটু ভিন্ন ভাষায় সেই আলো পাওয়ার যোগ্যতা অর্জনের বিষয়ে বলেনঃ

যেহেতু তুমি নিরাবরণ আলো ধারণ করতে অপারগ,
পান কর প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা, কেননা এর আলো আবরণে ঢাকা,
শেষ পর্যন্ত যাতে তুমি ঐ আলো অর্জনে সক্ষম হতে পার
এবং তুমি আবরণ বিহীন অবস্থায় একে দেখতে পাবে যা এখন লুক্কায়িত।

অন্যান্য সুফির ন্যায় রুমী আল্লাহ্‌র যিক্‌র-এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যিক্‌র হলো তাঁর মতে, আত্মা পাখির শক্তি, পালক এবং ডানা। যিক্‌রের মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে অন্তরাত্মা আলোকিত হয় এবং জাগতিক মোহ থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব হয়। পবিত্র হাদিসে যিক্‌রকে সাবানের সাথে তুলনা করা হয়েছে। রুমী সম্ভবত এই হাদিসের আলোকেই যিক্‌র সম্পর্কে উপরোক্ত অভিমত পোষণ করেছে। যিক্‌রের মাধ্যমে মানবাত্মা সার্বক্ষণিক আলোকেই যিক্‌র সম্পর্কে উপরোক্ত অভিমত পোষণ করেছেন। যিক্‌রের মাধ্যমে মানবাত্মা সার্বক্ষণিক আল্লাহর উপস্থিতির উপলব্ধির পর্যায়ে পৌঁছায়। 'আলোর উপর আলো' বলতে রুমী যা বলতে চেয়েছেন তা হলো সম্ভবত দুটো জিনিসের সংযোগ। প্রথমত আল্লাহর যিক্‌রের ফলশ্রুতিতে মানুষের আত্মা সকল ধরণের জাগতিক মোহ থেকে মুক্ত হয় এবং সেই অবস্থায় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠতম আলোক প্রাপ্তি হিসাবে গণ্য করেন। মসনবীর বিভিন্ন জায়গায় রুমী এই বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন। একজন মরমি যখন পরিপূর্ণতায় পৌঁছায় তখন তিনি খোদায়ী আলোর অধিকারী হয়ে যান এবং সে অবস্থায় অনেক সময় তাঁর নিজ অস্থিত্বের অনুভূতি পর্যন্ত

www.nagorikpathagar.org

লোপ পায়। ফরিদউদ্দীন আত্তার নিম্নোক্ত পঙক্তি কয়টিতে মরমিবাদের সেই স্তরটির কথা 'আলো' প্রতীকের মাধ্যমে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

আমি রহস্যেরও রহস্য, এমন কি জীবনেরও জীবন, দেহ নই আমি।
আমি অস্তিত্বশীল নই বন্ধু, নই আমি অস্তিত্বশীল।
আমি হলাম নির্মল আলো যা প্রবেশ করেছে এক মুষ্টি মাটিতে
কিন্তু আলোর আলো, আলোর আলো আমি, আমি শুধু আলো এবং আলো
নই আমি প্রদীপ, না আমি সলিতা, না আমি জ্বালানি তেল।

রুমীর মতে খোদায়ী প্রেমই মানুষের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ। এটা এমন একটি বৃক্ষ যার মূল স্থিরীকৃত রয়েছে আধ্যাত্মিক বাগানে এবং এর শাখা প্রশাখা, ডালপালা এবং ফল ফলাদি ঝুলে রয়েছে অন্যত্র। এর ফলগুলো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে। শেষ পর্যন্ত ঐ ফলগুলোকে সেই বাগানে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। কেননা এর মূল ওখানেই রয়েছে। যদি তা করা সম্ভব হয় তবে উভয়ই বাগানের মধ্যে এসে গেল, আর তাই হলো আলোর উপর আলো।

(সূত্র: দৈনিক নয়া দিগন্ত ২২/১১/০৮ জনাব একরামুল্লাহিল কাফি-এর প্রবন্ধ ও জনাব কাওসার মুস্তফা-এর প্রবন্ধ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রত্রিকা, জুন, ২০০২ সংখ্যা)

www.nagorikpathagar.org

মহাকবি জন মিল্‌টন (১৬০৮-১৬৭৪)

জন মিল্‌টন জন্ম লন্ডনে। পিতার ইচ্ছা ছিল মিলটন একজন ধর্ম যাজক হবেন। কিন্তু আজন্ম বিদ্রোহী মিলটন কোন দিনই চার্চদেরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেননি। তাঁর মুদ্রণ ও স্বাধীনতার স্বপক্ষে লেখা Areopasitica বিশ্বের বাক স্বাধীনতা মুদ্রণস্বাধীনতা সংগ্রামের এক জীবন্ত দলিল। Paradise lost, Paradise Regained তাঁর বিখ্যাত দুই কাব্য বিশ্ব নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর উদ্দেশ্য তাঁর এই বিখ্যাত মন্তব্য একটি কালজয়ী উক্তি।

Costantine এর বহু পূর্বেই খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বৃহত্তর অংশ হারিয়ে ফেলেছে তাদের ধর্মপ্রাণতা ও সত্যবাদিতা এবং এই দুইয়ের তত্ত্বগতশিক্ষা ও মননশীলতা। অতপর: যখন তাহরা চার্চ কে প্রতিষ্ঠিত করল তখনও তাহারা তাদের শ্রদ্ধাপদ ভালবাসা ও গণক্ষমতা হারিয়ে ফেলেতে লাগল এবং খৃষ্টান ধর্ম চলে গেল ক্ষয়ষ্ণুতে। ছয়শত শতাব্দীতে নবী মুহাম্মদ এর আবিভাব হলো এবং পৌওলিকতার দমিত করল এশিয়া আফ্রিকা ও মিশরের সিংহভাগ অংশে, এক সত্য প্রভূর আনুগত্যে আনল যা এখনও বিদ্যমান।

মুহাম্মদ এর ধর্মের সর্বাধিক আকর্ষনীয় দৃষ্টান্তসমূহ আলোকিত ক্ষমতা সমস্ত প্রজ্ঞাশীলদের মনকে জয় করে, যাহা দেখা যায় বিগত দিনের সময়ে। মোটের উপর ইসলাম খুবই প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ সকল খৃষ্টকে সৃষ্টি কর্তার আনগত্যের লক্ষ্যে যথাস্থান স্থাপন করতে, সমস্ত জীর্ণতারাশিকে উৎপাটন করে ইহার অনুসারীরা অবশেষে নিজের অবস্থানে টিকেছিল নানা প্রলোভনকে উপেক্ষা করে এবং তাঁদের (অবিশ্বাসীদের) উদ্দেশ্যকে দমন করেছিল এবং তাঁরা গোড়াঁমি ও অপসংস্কৃতি থেকে মুক্ত রেখেছিল এবং কখনো অসম্মান বা অবজ্ঞা করেননি কোন দেব দেবীর পুজারীদের প্রতিভা ও প্রজ্ঞা কে। আমি বিশ্বাস করি এক আল্লাহকে এবং তাঁর প্রেরিত নবী মুহাম্মদকে এবং ইসলামের সহজ ও সরল জীবন ব্যবস্থাপনাকে। বহু বিবাহ প্রচলিত অতি প্রাচীন কাল আব্রাহর সময় হতে এবং ইহা বাইবেলের নিয়মেও দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত। বাইবেলে বহু বিবাহকে পাপপূর্ণ বলা হয় নি। মুহাম্মদ বহু বিবাহু চালু করেন নি বরং ইহাকে সংরক্ষিত করছে নিরুৎসাহিত সীমার মধ্যে।

www.nagorikpathagar.org

"Long before Constantine's time the generality of Christians had lost much of the primitive sanctity and integrity, both of their doctrine and manners. Afterwards when he had enriched the church, they began to fall in love with honours and civil power and the Christian religion went to wreck. In the sixth century Muhammad appeared and extirpated idolatry out of a great part of Asia, Africa and Egypt, in all parts of which the worship of one true God remains to this day. The most convincing proof of the power of Muhammad's religion over the minds of the professors may be found in the past that although Islam is old enough to have experienced that decrepitude of all other beliefs-the putting of the creature in the place of the Creator-its followers have finally withstood the temptation of reducing the object of their faith and devotion to a level with the senses and the imagination of men, and have remained free from bigotry and superstition never disgracing the intellectual image of the Deity by any visible idol. I believe in one God and in Muhammad, the Apostle of God, is the simple and invariable profession of Islamism.

Polygamy was current in the world since the day of Patriarch Abraham and it is perfectly valid according to the Bible. There are numerous passages in the Bible to show that it was not regarded sinful. Muhammad therefore did not introduce polygamy but rather restricted it within narrow limits."

(ব্যারিষ্টর এস,এ, সিদ্দিকী বই-Touth is come let falsehood desappear)

www.nagorikpathagar.org

জর্জ ওয়াশিংটন (১৭৩২-১৭৯৯)

মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি

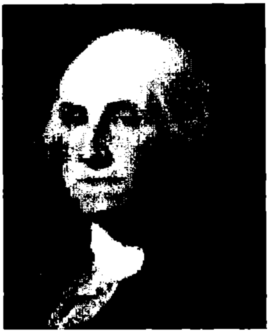

George Washington was the first president of the united States. He was first appointed to his first public office in 1749. in 1774 he was chosen to be the Commander-in-Chief of the American revolutionary forces. He became the president of the United States in 1789. Till date he is known as the greatest president of the United States. This compilation of Coerge Washington quotes as bound to give you an idea of his thinking powers and idea to set life. these George Waslrington quates well impire you for setting higher goals in life.

George Waslrington Quates:

* When a man does all he can, Thugh it succeeds not well, blame not him that did it.

* Observe good faith and justice toward all nations. Cultivate peace and harmany with all.

* Be courteaus to all, but intimate with few and let those few be well tried before you give them your confidence. True friendship is a plan at show growth, and must undergo and withstand the shocks of adversity before it is entitled to the appellation.

* Associate with men of good quality if you esteem your own reputation; for it is better to be alone than in bad company.

* It is impossible to rightly govern a nation without God and the Bible.

* Truth will ultimately prevail where these is pains taken to bring it to light.

* My mother is the most beautifule women I ever saw. All I am owe to my mother. I attribute all my success in life to the moral, intellectual and physical education I received from her.

www.nagorikpathagar.org

* It's wanderful what one can do if we're always doing.

* Happiness and moral duty are inseparably connected.

* A government is like fire, a kandy sarvant, but a dauger ous master.

* Liberty, when if begins to take root is a plant of rapid growth.

* My observation is that whenever one parson is found adequate to the discharge of a duty, it is worse executed by two Persons, and scarcely done at all if there are mare are employed therein.

By kashmina Lad

* কোন মানুষ যখন তার সর্বাত্তক চেষ্টা দিয়ে কোন কাজ করে তাতে যদি সে সম্পূর্ণ ভাবে কৃতকার্য নাও হয়, তার সমালোচনা না করাই শ্রেয়।

* প্রত্যেক জাতির প্রতি সুবিচার ও বিশ্বাস প্রদর্শন করবে এবং সবার প্রতি শান্তি ও সৌহার্দ পূর্ণ সম্পর্ক-স্থাপন করবে।

* সবার সাথে সৌজন্য মূলক ব্যবহার করবে কিন্তু সুসম্পর্ক রাখবে মুষ্টিময় লোকের সাথে এবং তাদের সাথে তোমার আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলবে।

* তুমি তোমার যোগ্যতার সাথে ভাল লোকের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলবে, আর খারাপ সঙ্গ থেকে মুক্ত থাকবে।

* ঈশ্বর এবং পবিত্র ধর্ম-গ্রন্থ ব্যতিত দেশ ও জাতি পরিচালক করা অসম্ভব।

* আমার জীবনে আমার মা-ই সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা। আমি আমার মা-এর নিকট চিরঋনী আমার জীবনের কৃতকার্যের মূলে আমার মা-এর নৈতিকতা, প্রজ্ঞা ও বাস্তব শিক্ষা।

* আমরা যাহা করতে পারি তাহাই আনন্দায়ক যদিও আমরা সর্বদা ইহা করি।

* আনন্দ ও নৈতিকতা অবিচ্ছেদ্য।

* সরকার অগ্নিতুল্য একটি আজ্ঞাবহ চাকর, কিন্তু একটি ভয়ঙ্কর প্রভু।

* স্বাধীনতা যখন শিকড়ে প্রোথিত তখন ইহা দ্রুত উত্তরনের বৃক্ষ।

* আমার অভিজ্ঞতা বলে, যখন কোন ব্যক্তি কোন দায়িত্বে অবহেলা করে তখন ইহা দুইজন, তিন জন এই ভাবে সবার মধ্যে সংক্রমিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

মহাকবি গ্যেটে (১৭৪৯-১৮৩২)

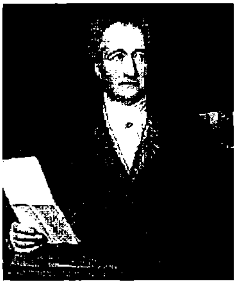

মহাকবি গ্যোটের জন্ম ১৭৪৯ সালে জার্মানে, ১৮৩২ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

রসূল-প্রশস্তি পরে লেখা হয়েছে পৃথিবীর প্রায় সব ভাষায়। পৃথিবীর মহত্তম লেখক লেও তলস্তয়ের (১৮২৮-১৯১০) মৃত্যুর পরে তার ওভারকোটের পকেটে পাওয়া গিয়েছিলো স্যার আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দি (১৮৭০-১৯৩৫) অনূদিত *THE SAYINGS OF MUHAMMAD (S.)* বইটি উলফগং ফন গ্যোটের লুপ্ত ও অসমাপ্ত মুহম্মদ (MAHOMET) নাটকটি, যার একটিমাত্র গান 'মুহম্মদের গান'-এর কাজী আবুদল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) অনূদিত প্রথম ও সর্বশেষ স্তবক উদ্ধৃত করছি:

চেয়ে দ্যাখো ঐ পার্বত্য ঝরনা
আনন্দিত ও নির্মল
তারার মতো ঝিকিমিকি:
মেঘের দেশে
তুঙ্গ শৃঙ্গে
নিকুঞ্জের কোণে
লালিত হয়েছে সে দেবতাদের হাতে।
উচ্ছল তারুণ্য তাঁর
নেচে নেচে নামছে সে
মেঘের দেশ থেকে
মর্মর সোপানের পরে
তার হর্ষধ্বনি উত্থিত হয়
আকাশের পানে।...
আটলাস-দৈত্য যেন বয়ে নিয়ে চলেছে
তার বিরাট গৃহ।
তার মাথার উপর উড়ছে
লক্ষ লক্ষ পতাকা
তার মহিমার সাক্ষী
চলেছে সে সবাইকে নিয়ে
ভাই বোন প্রেয়সী সন্তান
চলেছে পথ-চাওয়া পিতার সমীপে
বুকে তার উছলে উঠেছে আনন্দ।

www.nagorikpathagar.org

এমনি ভাবে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) নিয়ে উচ্চ মানে লিখেছেন ফরাসী লেখক আলফ্রেড দ্য লামার টাইন, ফরাসী বীর নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, ইংরেজ পাদ্রী দাত্তার বাস ওপর্থ মিথ, টমাস কার্লাইস, লর্ড বাইরন, ভারতীয় মনিষী স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী, জার্মান মহাকবি গ্যাটে প্রমুখ। রাসুল (সঃ) কে প্রবাহমান গিরি প্রস্রবনের সঙ্গে তুলনা করে একটি গীতি কবিতা রচনা করেন; যার ক'টি লাইন নিম্নোক্ত:

তোমরা সকলে দ্যাখো, দ্যাখো,
এখন শাসক তিনি, ন্যায়ের শাসক।
সমগ্র জাতিকে
রাজকীয় স্রোতের ধাক্কায়
কেমন যাচ্ছেন নিয়ে সুউচ্চ সীমায়,
তার সেই জয়যাত্রা নাম নেয় একটি স্বদেশ
নগরের জন্ম হয় তার পদতলে।
অবাধ গতিতে চলে স্রোতোধারা দূরে. বহুদূরে
জীবনের আলো জ্বলে সুউচ্চ চুড়ার পরিসরে।....

'প্রতীচ্য প্রাচ্য-দিওয়ানে' গ্যোটে সেজেছেন শান্তির অমত-পিয়াসী প্রেমবিধুর মুসলমানের বেশে, বলেছেন-

পালিয়ে চলো নির্মলতর প্রাচ্যে,
সেখানে প্রেমে মদিরায় আর গানে
খিজিরের অমৃত দান করবে তোমাকে তারুণ্য...
সেখানে অশেষ মহিমার আজো লাভ হয়
স্বর্গের বাণী মর্ত্যের ভাষায়...।

কোরআন আদি কি না
সে প্রশ্ন নয় আমার
কোরআন সৃষ্ট কি না
জানি না সে তত্ত্ব।
এ যে-মহাগ্রন্থ
মানি সে-কথা মুসলমান হিসাবে।
(কিন্তু এই মুসলমানত্ব অনুপ্রাণিত কবি চিত্তের এক মনোহর সাময়িক রূপ।)
(সূত্রঃ বাংলা সাহিত্যে মূলমাকঃ আব্দুল মান্নান সৈয়দ ইঃ ফাঃ বাঃ)

www.nagorikpathagar.org

আব্রাহাম লিংকন (১৮০৯-১৮৬৫)

বিখ্যাত গেটিস্‌বার্গ- ভাষণ

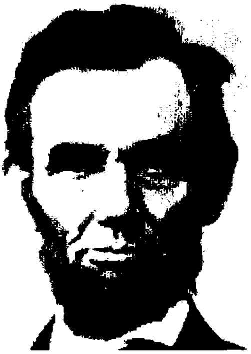

আব্রাহাম লিংকন আমেরিকার ১৬তম প্রেসিডেন্ট। গণতন্ত্রের মানসসূত্র তাঁর বিখ্যাত ১৮৬৫ সালে আতাতীয়র হাতে তিনি নিহত হন। "আজ থেকে সাতাশি বছর আগে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা প্রতিষ্ঠিত করেছিল এই ভূ-খন্ডে একটি জাতিকে, এনে দিয়েছিল স্বাধীনতা এবং জীবন উৎসর্গ করে ছিল এই মর্মে যে তখন সকল মানুষই সমান অধিকারে ভিত্তিতে সৃষ্ট।"

"বর্তমানে আমরা এক ব্যপক গৃহযুদ্ধে নিমজ্জিত যা এক অগ্নিপরীক্ষার নামান্তর, পক্ষান্তরে যে জাতি বা নিছক কোন জাতি এত সব অর্জন করেছে অমূল্য জীবন বিসর্জন দিয়ে অনন্ত কাল টিকে থাকার জন্য। আমরা তথাস্থঃ যুদ্ধের বিশাল ময়দানে সম্মিলিত ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমরা সেই ময়দানের একটি অংশকে তাঁদের চিরন্তন আবাস ভূমির নিমিত্তে উৎসর্গ করেছিলাম, যারা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিল যাতে জাতি বেঁচে থাকে। মোটের উপর ইহাই আমাদের জন্য যথাযথ ও সমোচিত যা সর্বদা আমাদরে মান্য করা উচিত।"

"কিন্তু ব্যাপক অর্থে আমরা আজ নিবেদিত নই- আমরা সত্যিকার অর্থে- সততার সহিত, পবিত্রতার সাথে এই মাটিকে পূর্নতায় পরিনত করছিনা। সূর্য- সন্তানেরা যারা আছেন এবং যারা আজ নেই যারা এখানে যুদ্ধ করেছে- তাঁরা ইহাকে পবিত্রতার উদ্দেশ্যেই করেছে। পক্ষান্তরে আমরা তাঁদের তুচ্ছ করছি অথবা তাঁদের সম্মানকে খর্ব করছি। পৃথিবী আমাদেরকে ধিক্কার দিবে, নতুবা কোন দিন মনে রাখবে না যে আমরা এখানে কি করেছি, অথচ তাঁদের আত্বত্যাগের কথা ভুলে যাওয়ার মত না।

আমরা আজ যারা আছি বা আগামী প্রজন্ম তাদের উচিত নিবেদিত হওয়া, আত্বত্যাগকারীদের অসমাপ্ত কাজগুলোর স্বার্থে, মহৎ উত্তরনের নিমিত্তে। অধিকতর ভাবে আমাদেরকে আরও নিবেদিত হতে হবে মহৎকাজগুলো সম্পন্ন করতে যা আমরা উপেক্ষা করে আসছি যা সমাধা করতে অমর দেহগুলো আমাদেরকে বার বার হাতছানি দিচ্ছে- আরও গভীরতর দায়িত্ববান হতে এবং আমাদেরকে পূর্ণমাত্রায় আত্বনিয়োগের সত্বায় নিয়ে যাবে, যাহা আমাদেরকে এমন সাফেল্যে নিয়ে যাবে- যেন মনে হবে আত্বত্যাগকারীরা প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুহীন। ইহাই আমাদের জাতি ইশ্বরের ছায়ায়, আমরা একদিন পাব এক নতুন স্বাধীনতা এবং সরকার হবে, জনগনের দ্বারা, জনগনের জন্য যা পৃথিবী হতে কোন দিন বিলিন হবে না।

www.nagorikpathagar.org

Gettysburg Address

"Fourscore and seven years ago our fathers brought forth on this continent, a new nation, conceived in Liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal.

"Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation or any nation so conceived and so dedicated, can long endure. We are met on a great battle-field of that war. We have come to dedicate a portion of that field as a final resting place for those who here gave their lives that nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this.

"But, in a larger sense, we cannot dedicate- we cannot consecrate – we cannot hallow- this ground. The brave men, living and dead, who struggled here, have consecrated it, far above our poor power to add or detract. The world will little note, nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here. It is for us the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so noble advanced. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us- that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion- that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain- that this nation, under God, shall have a new birth of freedom- and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth."

(ওবাব-সাইট থেকে সংগ্রহ)

www.nagorikpathagar.org

কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৬)

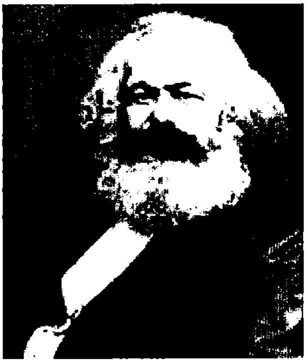

জন্ম ১৯১৮ সালে জার্মানে।

বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিদ। মার্কাস ও এঙ্গলেস যৌথ ভাবে কমিউনিস্ট মে নিফেস্টো তৈরী করেন। মার্কাস সমাজতন্ত্র কথাটির পরিবর্তে কমিউনিজম নামটি ব্যবহার করেন। দারিদ্র্য, ক্ষুদা আর অসুস্থতা ছিল মার্কসের গৃহে চিরস্থায়ী সঙ্গী। অথচ তিনি বিশ্বের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। যার কলমের শক্তিতে অর্ধেক পৃথিবী ওলপটালট হয়ে গেল। কত সম্রাট, জার, রাজা, অত্যাচারী শাসক ধ্বংস হয়ে গেল। সৃষ্টি হল নতুন পৃথিবীর ইতিহাস। অথচ সেই মানুষটির কলমের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজের সংসারের-দু-মুখো অন্ন যোগাড় করতে পারেননি। আসলে তিনি যে এক নতুন বিশ্বকে সৃষ্টি করার কাজে হাত দিয়েছেন তা উপলব্ধি করবার মত মানুষ খুব কমই ছিল। আর তাঁর কাজের জন্য অর্থ সাহায্য করবার মানুষ শুধু একজনই ছিল, তিনি ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস। সমস্ত জীবন ধরে তিনি অকৃপণ হাতে মার্কসকে সাহায্য করেছেন। বহু সময়েই দেখা গিয়াছে এঙ্গেলসের অর্থ আসবার পরেই তা নিয়ে বাজারে ছুটে গিয়েছেন মার্কস। ছেলেমেয়েদের জন্য খাবার কিনে নিয়ে এসেছেন। এঙ্গেলসের এ সাহায্য বন্ধুত্বের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লিখে রাখবার যোগ্য। মাঝে মাঝে মার্কস অস্থির হয়ে উঠতেন, বন্ধুকে লিখতেন, "তোমার কাছে আবার সাহায্য চাওয়ার আগে যেন আমার হাতের বুড়ো আঙুলটা কেটে ফেলি।"

এঙ্গেলস কোন জবাব দিতেন না। শুধু চেক পাঠিয়ে দিতেন। তিনি ভাবতেন তাঁর এ সাহায্য কোন মানুষকে নয়। মানুষের মুক্তি আন্দোলনের কাজে সাহায্য করবার জন্য এ সাহায্য।

এই নিদারুণ দারিদ্র্যকে সঙ্গী করেই মার্কস ঝাঁপিয়ে পড়লেন ইউরোপের বুকে কমিউনিজম আন্দোলনের প্রচার করতে। দেশ-বিদেশের নেতারা এসে মাঝে মাঝেই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করত। তবে এ সময় তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল আন্তর্জাতকি শ্রমিক সংঘ গড়ে তোলা। ১৮৭৩ সালে এ সমিতি ভেঙে না যাওয়া পর্যন্ত তিনিই এ সংস্থা পরিচালনা করতেন।

এরই মধ্যে তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন-যদি কিছু অর্থ পাওয়া যেত, এর সাথে নিচের চিন্তা ভাবনা মতকে প্রকাশ করা যেত।

www.nagorikpathagar.org

মার্কাসের চিন্তা, দর্শনের ভিত্তি ছিল হেগলিয় দর্শন। হেগলে ছিলেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় দর্শনের অধ্যাপক। মার্কস সেখানে ছাত্র হিসেবে যোগ দেবার পাঁচ বছর আগে হেগেল মারা গিয়েছিলেন। ফরাসি বিপ্লবের ব্যর্থতার জন্য, কিছুটা নেপোলিয়নের জার্মান আক্রমণের জন্য জার্মানির মানুষ রুশো, ভলতেয়ারের পরিবর্তে হেগেলকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। ইতিহাসকে ক্রমবিবর্তনের অভ্রান্ত গতি হিসেবে উপলব্ধি করার শিক্ষা মার্কস পেয়েছিলেন হেগেলের কাছ থেকে, কিন্তু হেগেল ছিলেন ভাববাদী দার্শনিক। মার্কস তাঁর থেকে নিজেকের উত্তরণ করলেন বস্তুবাদী দর্শনে। ক্রমশ:ই তিনি উপলব্ধি করলেন সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার চালিকা শক্তি হচ্ছে অর্থনীতি। যাদের হাতে যত উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চিত হবে, তারাই হবে সবচেয়ে ক্ষমতাবান, সমাজের প্রভু।

তাঁর এ ভাবনা চিন্তা মননশীলতা প্রকাশ করলেন তাঁর অবিস্মরণীয় গ্রন্থ ড্যাস ক্যাপিটাল-এ (Das Capital) এতে তিনি ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন। ১৮৬৭ সালে তাঁর এ ড্যাস ক্যাপিটল প্রচারিত হয়। পরবর্তী দুটি খণ্ড তাঁর মৃত্যুর পর এঙ্গেলস সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। এ বইখানি বিশ্বের সমস্ত শোষিত বঞ্চিত সংগ্রামী মানুষের বাইবেল। রুশোর "সামাজিক চুক্তি" মতবাদ বইটি যেমন ফরাসী বিপ্লবের প্রেরণা দিয়েছিল, ড্যাস ক্যাপিটালও ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের প্রেরণা দিয়েছিল।

মার্কস তাঁর জীবিতকালে (Das Capital)-এর প্রভাব দেখে যেতে না পারলেও অনুভব করেছিলেন একদিন তাঁর এ বই সমগ্র পৃথিবীর অর্থনীতিকে নাড়া দেবে। তাই জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে এ বই রচনাতে বেশি সময় কাটাতেন। ক্রমশ:ই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছিল। ডাক্তারা পরীক্ষা করে দেখলেন তাঁর লিভার অস্বাভাবিক বেড়ে গিয়েছে। কিছুদিনের মত তাঁকে বিশ্রাম নিতে বললেন। কিন্তু বিশ্রাম শব্দটি মার্কসের অভিধানে লেখা ছিল না।

তাছাড়া (Das Capital)-এর কাজ তিনি শেষ করতে পারেননি। অসুস্থ অবস্থাতে তিনি লিখে চললেন। এ সময় তাঁর জীবনে নেমে এল চরম আঘাত। ১৮১৮ সালের ২রা ডিসেম্বর বুকে ক্যানসারে মারা গেলেন মার্কসের সুখ-দু:খের চিরসাথী জেনি। যদিও কিছুদিন ধরেই অসুস্থ হয়ে ছিল জেনি, বিছানা ছেড়ে ওঠবার ক্ষমতা ছিল না তার। তবুও এই মৃত্যু মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত করে দিল মার্কসকে।

বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন মার্কস। এ বাড়ির সর্বত্র যে জেনিসর স্মৃতি ছড়ানো, কিছুতে তাকে ভুলতে পারছেন না। পুরো একটি বছর তিনি এক দেশ থেকে আরেক দেশে ঘুরে বেড়ালেন। শরীরের অবস্থা ক্রমশই খারাপ হয়ে আসছিল।

www.nagorikpathagar.org

১৮৮৩ সালের জানুয়ারিতে বড় মেয়ে মারা গেল। মেয়েকে খুব ভালবাসতের মার্কস। ফিরে এলেন বাড়িতে। সমস্ত জগৎ যেন তাঁর কাছে অন্ধকার হয়ে এসেছিল। বুকে নতুন অসুখ দেখা দিল। ডাক্তাররা সাধ্যমত চিকিৎসা করেন কিন্তু অসুখ বেড়েই চলল। অবশেষে ১৪ই মার্চ ১৮৮৩ সালে চিরঘুমের দেশে হারিয়ে গেলেন মার্কস। তখন তাঁর বয়সে ৬৬ হতে কয়েক সপ্তাহ বাকি।

তিনদিন পর তাঁর স্ত্রীর সাধির পাশে তাঁকে সমাহিত করা হল। তখন মাত্র দশ-বারোজন লোক সেখানে উপস্থিত। তাদের মধ্যে ছিলেন মার্কসের প্রিয় বন্ধু সহযোগী ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস। মার্কসের সমাধির পাশে এঙ্গেলস যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার মধ্যেই রয়েছে তাঁর জীবন ও কর্মের যথার্থ মূল্যায়ন।

"১৪ই মার্চ বেলা পৌনে তিনটায় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক চিন্তা থেকে বিরত হয়েছেন। মাত্র মিনিট দুয়েকের জন্য তাঁকে একা রেখে যাওয়া হয়েছিল। আমরা ফিরে এসে দেখলাম যে তিনি তাঁর আরামকেদারায় শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন-কিন্তু ঘুমিয়েছেন চিরকালের জন্য। এই মানুষটির মৃত্যুতে ইউরোপ ও আমেরিকার জঙ্গী প্রলেতারিয়েত এবং ইতিহাস বিজ্ঞান উভয়েরই অপূরণীয় ক্ষতি হল। এ মহান প্রাণের তিরোধামে যে শূন্যতার সৃষ্টি হল তা অচিরেই অনুভূত হবে।

ডারউইন যেমন জৈব প্রকৃতির বিকাশের নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন, তেমনি মার্কস আবিষ্কার করেছেন মানুষের ইতিহাসের বিকাশের নিয়ম। মতাদর্শের অতি নিচে এতদিন লুকিয়ে রাখা এই সত্য যে, রাজনীতি, বিজ্ঞান, কলা, ধর্ম, ইত্যাদি চর্চা করতে পারার আগে মানুষের প্রথম চাই খাদ্য, পানীয়, আশ্রয়, পরিচ্ছদ। সুতরাং প্রাণ ধারণের আশু বাস্তব উপকরণের উৎপাদন এবং সেহেতু কোন নির্দিষ্ট জাতির বা নির্দিষ্ট যুগের অর্থনৈতিক বিকাশের মাত্রাই হল সেই ভিত্তি যার ওপর গড়ে ওঠে সংশ্লিষ্ট জাতিটির রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, আইনের ধ্যান-ধারণা, শিল্পকলা এমনকি তাদের ধর্মীয় ভাবধারা পর্যন্ত এবং সেই দিক থেকেই এগুলোর ব্যাখ্যা করতে হবে, এতদিন যা করা হয়েছে সেভাবে উল্টো দিক থেকে নয়। শুধু তাই নয়। বর্তমান পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির এবং এই পদ্ধতি যে বুর্জোয়া সমাজ সৃষ্টি করেছে তার গতির বিশেষ নিয়মটিও মার্কস আবিষ্কার করেন। যে সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে এতোদিন পর্যন্ত সব বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ সমাজতন্ত্রী সমালোচক উভয়েরই অনুসন্ধান অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল, তার উপর সহসা আলোকপাত হল উদ্বৃত্ত মূল্য আবিষ্কারের ফলে।

এজনের জীবদ্দশার পক্ষে এরকম দুটি আবিষ্কারই যথেষ্ট। এমনকি এরকম একটা আবিষ্কার করতে পারার সৌভাগ্য যাঁর হয়েছে তিনিও ধন্য। কিন্তু মার্কসের চর্চার প্রতিনি ক্ষেত্রে-এমনকি গণিত শাস্ত্রেও তিনি স্বাধীন আবিষ্কার করে গেছেন।

www.nagorikpathagar.org

এই হল বিজ্ঞানী মানুষটির রূপ। ... তবে মার্কস সকলের আগে ছিলেন বিপ্লববাদী। তাঁর জীবনের আসল ব্রত ছিল পুঁজিবাদী সমাজ এবং এ সমাজ যে সব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছে তার উচ্ছেদে কোনো না কোন অংশ নেয়া, আধুনিক প্রলেতারিয়তের মুক্তি সাধনের কাজে অংশ নেয়া, একে তিনিই প্রথম তাঁর ধাচটাই ছিল সংগ্রামের এবং সে আবেগ, যে অধ্যবসায় ও যতখানি সাফল্যের সঙ্গে তিনি সংগ্রাম করতেন তার তুলনা মেলা ভার। মার্কসের জিবনে একটি গুরুত্ব পূর্ণ ভাষণের অংশ-

তাই তাঁর কালের লোকেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আক্রোশ ও কুৎসার পাত্র হয়েছেন মার্কস। স্বেচাতন্ত্রী এবং প্রজাতন্ত্রী-দু ধরনের সরকারই নিজ নিজ এলাকা থেকে ত৭াকে নির্বাসিত করেছে। রক্ষণশীল বা উগ্র গণতান্ত্রিক সব বুর্জোয়ারাই পাল্লা দিয়ে তাঁর দুর্নাম রচনা করেছে, এসব তিনি মাকড়শার ঝুলের মত ঝেঁটিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন, উপেক্ষা করেছেন এবং যখন একান্ত প্রয়োজনবশে বাধ্য হয়েছেন, একমাত্র তখনই এর জবাব দিয়েছেন।... আমি সাহস করে বলতে পারি যে মার্কসের বহু বিরোধী থাকতে পারে ক্তি ব্যক্তিগত শত্রু তাঁর মেলা ভার।

এটা বলা নিস্প্রয়োজন যে, মানুষ তাদের উৎপাদিকা শক্তিসমূহের নির্বাচনে স্বাধীন নয়। এই উৎপাদিকা শক্তি তাদের সকল ইতিহাসের ভিত্তি। কারণ প্রতিটা উৎপাদিকা শক্তিসমূহ হলো বাস্তব মানবীয় কর্মশক্তির ফলাফল; কিন্তা এই কর্মশক্তি নিজেই অবস্থার শর্তাধীন যে অবস্থার মধ্যে ইতিমধ্যে অর্জিত উৎপাদিকা শক্তির দ্বারা, আগের থেকে প্রচলিত সামাজিক রূপকাঠামোর দ্বারা, যে রূপকাঠামো তারা সৃষ্টি করে না, যা তাদের পূর্বপুরুষদের কর্মফল, তার মধ্যে মানুষ নিজেদেরকে শর্তাধীন দেখতে পায়। এই সরল ঘটনার কারণে পরবর্তী প্রতিটি বংশগতি পূর্বপুরুষদের দ্বারা অর্জিত উৎপাদিকা শক্তিসমূহকে তাদের নিজেদের দখলে দেখতে পায় যা নতুন উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল হিসেবে কাজ করে থাকে; এর ফলে মানুষের ইতিহাসে একটি সংলগ্নতার উদ্ভব ঘটে, মানব জাতির একটি ইতিহাস রূপ পরিগ্রহ করে, যা সর্বোপরি, মানুষের উৎপাদিকা শক্তি হিসেবে মানব জাতির একটি ইতিহাস এবং এর ফলে, তার সকল সামাজিক সম্পর্ক আরো বিকশিত হয়েছ। এর থেকে অনিবার্যভাবে এটা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের সামাজিক ইতিহাস তাদের ব্যক্তিগত বিকাশের ইতিহাস ছাড়া কখনও অন্যকিছু ছিল না, এ সম্পর্কে তারা সচেতন থাকুক আর না-ই থাকুক। রূপকাঠামোই হলো এই সব বস্তুগত সম্পর্ক যার মধ্যে তাদের বস্তুগত এবং ব্যক্তিগত কর্মতৎপরতা অর্জিত হয়ে থাকে।

(সূত্র: কার্লমার্কসে দর্শনের দরিদ্র সম্পর্কিত পত্রাবলী, অনুবাদ: আলাউদ্দিন আহ্‌মেদ পৃষ্ঠা:১০,১১)

www.nagorikpathagar.org

কাউন্ট লিও টলস্ট্রয় (১৮২৮-১৯১০)

শিল্পের আদর্শ

বিশ্ববিখ্যাত রাশিয়ান উপন্যাসিক তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস, **'ওয়ার এন্ড পিস'** ও **'আনাকারেনিনা'** নন্দনতত্ত্ব নিয়েও তাঁর অনেক লেখাও বক্তৃতা রয়েছে। এটি শিল্পের আদর্শ নিয়ে একটি অসাধারণ প্রবন্ধ ভাষণ।

ইতিহাসের প্রত্যেক যুগে এবং প্রত্যেক মানবসমাজে জীবনের অর্থ উপলব্ধির একটি চেতনা বিদ্যমান থাকে। সেই সমাজের মানুষ যে উচ্চতম স্তরে উপনীত সেই চেতনা তারই সূচক, এবং তা সে সমাজের অভীপ্সিত সর্বোচ্চ মঙ্গলের নিদের্শক। কোন নির্দিষ্ট সময় ও সমাজের ধর্মীয় উপলব্ধিই এই চেতনা বা বোধি। এ ধর্মীয় উপলব্ধি সর্বদাই স্পষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করে স্বল্প কয়েকজন প্রগতিশীল ব্যক্তির মধ্যে। সমাজের সাধারণ মানুষের দ্বারাও তা অল্পবিস্তর স্পষ্ট অনুভূত হয়। এই ধরনের ধর্মীয় উপলব্ধি এবং তার নিজস্ব অভিব্যক্তি সর্ব কালে প্রত্যেক সমাজে বিদ্যমান। যদি আমাদের এরূপ মনে হয়, আমাদের সমাজে কোন ধর্মীয় উপলব্ধির অস্তিত্ব নেই, তার কারণ এই নয় যে -বাস্তবে তা সত্য সত্যই অস্তিত্বহীন, বরং তার এই মাত্র কারণ যে-আমরা তার অস্তিত্ব অনুভাবে অনিচ্ছুক। আমাদের জীবন সে ধর্মীয় উপলব্ধির সঙ্গে যে অসঙ্গতিপূর্ণ সেই সত্য ধরা পড়ে যায় বলেই অধিকাংশ সময়ে আমরা তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে চাই না।

কোন সমাজের ধর্মীয় অনুভূতি প্রবহমান নদীর অভিমুখিতার মত। নদী যদি আদৌ প্রবাহিত হয় তবে নিশ্চয় তার একটা লক্ষ্য থাকবেই। সমাজ সজীব হলে তবে অবশ্যই তার একটি ধর্মীয় চেতনাও থাকবে-যা ঐ সমাজের সকল মানুষের অল্পাধিক সচেতনভাবে অনুসৃত জীবনধারার নির্দেশক।

সুতরাং প্রত্যেক সমাজে বহুকাল পূর্ব থেকে ধর্মীয় অনুভূতি যেমন প্রবহমান ছিল, তেমনি সে অনুভূতির এখনও অস্তিত্ব আছে। এই ধর্মীয় উপলব্ধির মানদণ্ডে শিল্প-সঞ্চারিত অনুভূতিগুলির সর্বদা মূল্যায়ন করা হয়েছে। স্ব-যুগের একমাত্র এই ধর্মীয় উপলব্ধিকে সক্রিয় করে তোলে। এরূপ শিল্পকেই সর্বদা সমাদর এবং উৎসাহ দান করা হয়েছে। অপরপক্ষে যে শিল্প বিগত যুগের নিস্প্রাণ ধর্মীয় উপলব্ধি-সঞ্চারক, সে শিল্প সর্বদাই ধিককৃত এবং ঘৃণ্য বিবেচিত হয়েছে।

আমি জানি, আমাদের কালে একটি প্রচলিত আছে যে, ধর্ম একটি কুসংস্কার মাত্র-যা প্রগতিশীল মানবজাতি পিছনে ফেলে এসেছে। কাজেই এটাও ধরে নেওয়া হয় যে, আমাদের সকলের পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য এমন কোন ধর্মীয় উপলব্ধির অস্তিত্ব নেই-যার সাহায্যে আমাদের যুগের শিল্পের মূল্যায়ন করা যেতে পারে। আমি জানি, বর্তমান

www.nagorikpathagar.org

কালের ছদ্ম সংস্কৃতিবান গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে প্রচলিত মত এই। নিজেদের বিশেষ সামাজিক সুবিধা ক্ষুণ্ন করে বলে যে সমস্ত ব্যক্তি খ্রীস্ট ধর্মকে যথার্থ স্ব-রূপে স্বীকার করেন না এবং নিজেদের অর্থহীন এবং অবৈধ জীবনধারা আত্মগোপন করবার উদ্দেশ্য সব ধরনের দার্শনিক এবং নান্দনিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেন-তাদের বিকল্প কিছু ভাবা সম্ভব নয়। এ সমস্ত ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এবং কোন সময় অনিচ্ছায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান-পদ্ধতির সঙ্গে ধর্মীয় উপলব্ধিকে গুলিয়ে ফেলেন এবং মনে করেন, সে অনুষ্ঠানকে অস্বীকার করে তাঁরা ধর্মীয় অনুভূতিকেই অস্বীকার করলেন। ধর্মের ওপর এই আক্রমণই ফলত: আমাদের যুগের ধর্মীয় উপলব্ধির। জীবনধারণা প্রতিষ্ঠার সমস্ত প্রয়াসই খুব স্পষ্টভাবে ধর্মীয় উপলব্ধির অস্তিত্বই সপ্রমাণ করে এবং সে উপলব্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন সমস্ত জীবনকে ধিকৃত করে।

মানবতার যদি প্রগতি হয় অর্থাৎ মানব সমাজ যদি সামনের দিকে এগিয়ে চলে-তবে সে গতিপথ নির্ধারক কোন চালক অবশ্যই থাকবে। এবং ধর্মসমূহ সর্বদাই সে পথ-নির্দেশকের ভূমিকা গ্রহন করেছে। সকল ইতিহাসই এ সাক্ষ্য দেয় যে, মানব-প্রগতি ধর্মের নির্দেশ ছাড়া আর কিছুতেই সম্ভব হয় না। কিন্তু মানবজাতি যদি ধর্মের নির্দেশ ব্যতীত প্রগতিপথে অগ্রসর হতে না পারে, যে প্রগতির স্রোত সদা প্রবহমান বলে কাজে কাজেই আমাদের যুগেও প্রবাহিত, তবে আমাদের যুগেরও অবশ্যই একটি ধর্ম আছে। ফলে আজকের যুগের সংস্কৃতিবান মানুষদের নিকট তা তৃপ্তি বা অতৃপ্তিদায়ক যাই হোক না কেন-তারা ধর্মের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করবেন। সে ধর্ম ক্যাথলিক, প্রোটেষ্টান্ট বা অন্য কোন ধর্মীয় তন্ত্র নয়, বরং একটি ধর্মীয় উপলব্ধি-যা এমনকি আমাদের যুগেও যেখানে কোন প্রগতি দেখা যায় তার পথ-প্রদশকরূপে সর্বদাই বিদ্যমান। এবং আমাদের মধ্যে যদি কোন ধর্মীয় উপলব্ধির অস্তিত্ব থাকে, তবে আমাদের শিল্পে যে সমস্ত অনুভূতি উপাদান-রূপে ব্যবহৃত হয়েছে তার মূল্যায়ন হওয়া উচিত এই ধর্মীয় উপলব্ধির ভিত্তিতেই। এবং সর্বত্র সব সময় যেমন ঘটে আসছে তেমনি যে শিল্প আমাদের স্ব-কালের ধর্মীয় উপলব্ধি-জাত অনুভূতি-সঞ্চারক-তাকেই সকল পর্যায়ের নিকৃষ্ট শিল্প থেকে পৃথক করে স্বীকৃতি ও উচ্চ সমাদর এবং উৎসাহ দান করতে হবে। অপরপক্ষে সে উপলব্ধির বিপরীত স্রোতে প্রবাহিত শিল্পকে নিন্দা এবং ধিক্কারের বিষয় করে তুলতে হবে। এবং উদ্দেশ্যহীন বাকী সব শিল্পকেও কোন মর্যাদা বা উৎসাহের যোগ্য বিবেচনা না করাই উচিত।

আমাদের যুগের ধর্মীয় উপলব্ধি তার ব্যাপকতম ও সর্বাদিক বাস্তব-প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই বোধসঞ্চারী চেতনার জন্ম দিয়েছে যে, আমাদের বৈষয়িক, আধ্যাত্মিক, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত, ঐহিক এবং চিরকালীন মঙ্গল মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশে এবং পারস্পরিক প্রেমময় সামঞ্জস্যের মধ্যে নিহিত।

তথাকথিত রেনেসাঁসের যুগে উচ্চবর্গীয় লোকেরা একটি বড় ভুল করে ছিলেন-সে ভূলের আমরা এখনও পুনরাবৃত্তি করে চলেছি। সেই ভুল কেবল এই নয় যে, তারা

www.nagorikpathagar.org

ধর্মীয় শিল্পের প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করেননি-তাদের ভুল হল এই যে, অনুপস্থিত ধর্মীয় শিল্পের স্থলে তারা একটি নগণ্য, শুধুমাত্র তৃপ্তিদায়ক শিল্পকে স্থাপন করেছিলেন। অর্থাৎ ধর্মীয় শিল্পের বদলে তারা এমন শিল্পের নির্বাচন, সমাদর করতে ও উৎসাহ দিতে শুরু করলেন-যা কোন মতেই সেরূপ সম্মান ও উৎসাহের যোগ্য নয়। সে যুগের লোকেরা যে ধর্মীয় শিল্পের প্রতি কোন গুরুত্ব দেননি তার কারণ হলো, এ যুগের অভিজাতবর্গের মতই তাঁরাও অধিকাংশ নগণ-গৃহীত ধর্মমতে কোন আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি।

জনৈতিক ধর্মযাজকের বক্তব্য হল, সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা ততটা মারাত্মক নয় যতটা মারাত্মক তারা সৃষ্টিকর্তা স্থলে অনিশ্বরকে স্থাপন করেছে। শিল্পের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। তার ব্যতিক্রমী স্বভাবের জন্যেও সে নীতির পরিপন্থী। ধর্মীয় উপলব্ধিময় শিল্পের পরিবর্তে শূন্যগর্ভ এবং দূষিত শিল্পকে অনেক সময় তুলে ধরা হচ্ছে, এবং মানুষকে উন্নত করবার জন্য যে যথার্থ ধর্মীয় শিল্পের প্রয়োজন, এই অসৎ শিল্প সেই প্রয়োজনটাকেই গোচরে আসতে দেয় না।

যে শিল্প আমাদের যুগের ধর্মীয় উপলব্ধির দাবীকে পূরণ করে তা পূর্ব যুগের শিল্প থেকে সম্পূর্ণ পৃথক-এটা স্বীকার্য। কিন্তু এই বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজের নিকট থেকে সত্য গোপন করেন না, তাঁর নিকট আমাদের যুগের ধর্মীয় উপলব্ধিময় শিল্পের স্বরূপ অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং সুনির্দিষ্ট।

প্রত্যেক মানুষই ঈশ্বরের সন্তান-এ কারণে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষে এবং মানুষের পারস্পরিক মিলনের স্বীকৃতির মধ্যেই খ্রীস্টীয় উপলব্ধির সারমর্ম নিহিত। খ্রীস্টের উপদেশবাণীতেও এ কথা বলা হয়েছে (জন, xviiz) সুতরাং খ্রীষ্ট্রীয় শিল্পের বিষয়বস্তু এই প্রকৃতির: অনুভূতির মাধ্যমেই মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে এবং পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে পারে।

মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে এবং পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত কর-এমন ধরনের কথা সে পর্যায়ের মানুষের কাছে অস্পষ্ট মনে হতে পারে, যারা প্রথাসিদ্ধ এ সমস্ত কথার অসদ্ব্যবহারে অভ্যস্ত। এতদসত্ত্বেও এ সমস্ত কথার সম্পূর্ণ পরিষ্কার একটি অর্থ আছে। তা এ নির্দেশই দেয় যে,-খ্রীষ্টীয় অনুভূতিজাত মানব মিলন সেই ধরনের বস্তু যা ব্যতিক্রমহীনভাবে সকল মানুষকে একত্রিত করে। (সংকোচিত)

(লেখাটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ থেকে প্রকাশিত লিও টলস্টয় এর **'শিল্পের স্বরূপ'** বই থেকে নেয়া)

www.nagorikpathagar.org

আল্লামা জামালউদ্দীন আফগানী (১৮৩৬-১৮৯৭)

প্যাণ ইসলামী আন্দোলনের প্রবক্তা

আফগানিস্তানে ইসলাম আসে ইসলামের আবির্ভাবের অল্প কিছুদিন পরেই। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে আফগানিস্তান নামে কোনো দেশ না থাকলেও আফগানিস্থান বললে, বোঝা যেতো আফগান জাতির বাসভূমিকে। এখানকার জনসমষ্টির সকলেই মুসলমান। ইসলামের জেহাদী চেতানায় তারা চিরকাল বলীয়ান। একানে বহু মনীষীর জন্ম হয়েছে। সুলতানুল হিন্দ খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী, সুলতান মাহ্‌মুদ, শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ ঘোরী এঁরা সবাই এই দেশেরই মানুষ। সম্রাট বাবরের স্মৃতিও বিজড়িত এই জনপদের সাথে।

ঊনিশ শতকে মুসলিম জাহান যখন এক অস্থিরতার আবর্তে দিশাহারা, খিলাফতের স্বর্ণযুগের ঐতিহ্য বুকে এঁটে তুরস্কে ওসমানীয় খিলাফত নিবু নিবু প্রদীপটি নিয়ে কুঁজো বৃদ্ধের মতো দণ্ডায়মান, ইসলাম বিরোধী শক্তির লাল চক্ষুর রোষানল যখন মুসলিম জাহানের সর্বত্র নিপতিত। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন মজবুত হয়ে উঠেছে, গোটা ইউরোপ যখন মুসলিম মিল্লাতকে ধ্বংস করার নিত্য নতুন কৌশল প্রয়োগে ব্যস্ত, তখনই আফগানিস্তনে ফুটলো এক উম্মাহ্‌কে রক্ষা করার লক্ষ্যে সন্ধ্যাকাশে শূকতারার মত ফুটে উঠলো। এই আলোর উপমা যেন এক মানুষের–যিনি মুসলিম উম্মাহ্‌কে ঐক্যবদ্ধ মক্তিতে পরিণত করতে প্যান ইসলামিজমের আহবান দিলেন। তিনি হচ্ছেন আফগানিস্তানের সিংহপুরুষ অন্য কথায় আফগানিস্তানের আত্মা সৈয়দ মুহম্মদ জামালুদ্দীন হুসায়নী আল–আফগানী।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে হামাদানের কাছে আসাদাবাদে তাঁর জন্ম। বংশীয় সূত্রে তিনি মহান শহীদ হযরত ইমাম হুসাইন ইবনে হযরত আলী (রাঃ)–এর উত্তর–পুরুষ। তাঁর পিতা সৈয়দ সফদর ছিলেন একজন সৈনিক। ৮ বৎসর বয়সে জামালুদ্দীন এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষকের কাছে লেখাপড়া শুরু করেন। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তিনি আরবী–ফরাসী ভাষা, বিজ্ঞান, গণিত, চিকিৎসা ও ধর্ম–শাস্ত্রের বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জন করেন। আঠারো বছর বয়সে, তিনি ভারত এসে পাশ্চাত্য শিক্ষাও অর্জন করেন বলে জানা যায়।

যে বছর ভারতের সিপাহীরা ব্রিটিশ শক্তিকে ভারতের মাটি থেকে নির্মূল করে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আজাদী সংগ্রামে লিপ্ত, ঠিক সেই বছর অর্থাৎ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারত থেকে মক্কা শরীফে হজ্ব করতে যান। এখানে উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে অন্যান্য বিদ্যার পাশাপাশি তিনি যুদ্ধ বিদ্যাতেও বেশ দক্ষতা অর্জন করেন। হজ্ব থেকে ফিরে এসে তিনি আফগানিস্তানের তাদানীন্তন আমীর দোস্ত মুহম্মদ খানের

www.nagorikpathagar.org

সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। তাঁর যুদ্ধ-কৌশল ও বুদ্ধিমত্তায় আকৃষ্ট হয়ে আমীর দোস্ত মুহম্মদ তাঁকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন।

আমীর দোস্ত মুহম্মদের পর আমীর হন মুহম্মদ আযম খান। আযম খানের সেনাবাহিনীতেও তিনি কর্মরত থাকেন। এই সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী চক্র আযম খানের চোট ভাই শের আলী খানকে তাদের তাবেদার রূপে কাবুলের সিংহাসনে বসায়। কনিষ্ঠ ভাইয়ের বিরুদ্ধে আযম খান যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এ সময় তিনি পরামর্শদাতা বন্ধু জামালুদ্দীনকে সন্দেহ করে বসেন। জামালুদ্দীনের পরামর্শকে তিনি বিপদজনক বলে ধরে নেন। আযম খানের এই মিথ্যা সেন্দেহে জামালুদ্দীনের সৈনিক-হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগে। তিনি মনের দুঃখে ভারতে চলে আসেন। কিন্তু ভারতের তদানিন্তন ব্রিটিশ সরকার ভারত প্রবেশে তাঁকে বাধা দিলে তিনি আফগানিস্তানে ফিরে যান। আফগানিস্তানে তাঁর উপস্থিতি আমীর শের আলী সুনজরে দেখলেন না। স্বদেশে অবস্থান নিরাপদ নয় বিবেচনা করে তিনি হজ্বের উদ্দেশ্যে আফগানিস্তান থেকে একমাত্র ভৃত্যসহ নৌ পথে মিসর চলে যান । প্রাচ্যের তোরণ হিসেবে পরিচিত মিসর তখন রাজনৈতিক অস্থিরতায় কম্পমান। এই সময় মিসরের খেদিব মুহম্মদ আলী পাশার পুত্র সৈয়দ পাশা ইন্তিকাল করেন। এ সময়ে প্রকৃতপক্ষে মিসরের আকাশে খঞ্জর-হেলালের বদলে ইউনিয়ন জ্যাক উড়তে থাকে। বৃটিশ ও ফরাসী শক্তি বিভিন্নভাবে প্রচার করতে থাকে, মিসর পাশ্চাত্যেরই অংশ-এমনি সময়ে মিসরে এসে তিনি ঘোষণা করলেন; 'আল মিসরুন লিল মিস্‌রীনা' মিসর মিসরবাসীদের জন্যই। তিনি বললেন ঃ মিসরের উপর পাশ্চাত্যের কোনোই অধিকার নেই, হিস্যাও নেই। মিসরে অবস্থানকালে তিনি আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দান করেন। ইতিমধ্যে তিনি হজ্বের নিয়ত প্রত্যাহার করে তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলে চলে আসেন। এখানে তিনি তরুণ তুর্কীদের নিয়ে একটি আদর্শ সমিতি পত্তন করেন।

এই সমিতির নাম ছিল মজলিসুল মা'রীফ অর্থাৎ জ্ঞানালোচনা পরিষদ। জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার-এই ছিলো সমিতির উদ্দেশ্য। জামালুদ্দীন বিভিন্ন স্থানে যেয়ে বক্তৃতা দিতেন। তাঁর বক্তৃতাসমূহ ছিল প্রজ্ঞা ও আবেদনে পূর্ণ। তাঁর এই বক্তৃতামালার ফলে জনসাধারণের ভেতর সমকালকে জানার ইচ্ছা স্ফীত হয়ে ওঠে। একদল কট্টরপ্রন্থী আলেম জামালুদ্দীনকে সহ্য করতে না পারায় আলেমদের আক্রোশের মুখে তুরস্কের সুলতান জামালুদ্দীনকে তুরস্ক হতে বহিস্কার করে দিলেন। বাধ্য হয়ে ১৮৭১-এ তিনি পুনরায় মিসরে চলে এলেন। মিসরের খেদিব ইসমাঈল পাশা তাঁকে বেশ সাদরেই গ্রহণ করলেন। এমনকি রাজকোষ থেকে তাঁকে বিশেষ অনুদান ও বার্ষিক ভাতারও ব্যবস্থা করা হল। জামালুদ্দীন তরুণদের মধ্যে দেশপ্রেম, ও স্বাধীনতা-লিপ্সা জাগিয়ে তোলার জন্য এখানে একটি স্কুল খুলে বসলেন। মিসরের জনগণ জামালুদ্দীনের একান্ত সান্নিধ্যে এলেন। অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। মিসরের জনগণ জামালুদ্দীনের একান্ত সান্নিধ্যে এলেন। অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ

www.nagorikpathagar.org

করলেন। মিসরের শক্তিশালী পুরুষ পন্ডিত-প্রবর মুফতী আব্দুহু, আহমদ আরাবী পাশা প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁর বাণী গ্রহণ করলেন। সৈয়দ জামালুদ্দীনের পরশে সারা মিসর ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠলো যেন। ১৮৭৯ সালে খেদিব ইসমাঈল পাশা গদীচ্যুত হলেন। তাঁর পুত্র তওফীক খেদিবের শূণ্য স্থান পূরণ করলেন।

খেদিব হওয়ার পূর্বে তওফীক জামালুদ্দীনের শিস্যত্ব গ্রহণ করে ওয়াদা করেছিলেন, তিনি গদী লাভ করলে মিসরকে পাশ্চাত্যের প্রভাব থেকে মুক্ত করবেন। মিসরকে আত্ম-নির্ভর করে তুলবেন। কিন্তু খেদিব হয়ে তিনি সে ওয়াদা ভংগ করলেন, বরং অধিকতর পাশ্চাত্য ঘেঁষা হয়ে গেলেন। তাঁর এই ওয়াদা ভংগের ফলস্বরূপ মিসরে তুর্কী-ব্রিটিশ দ্বৈত শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো। জামালুদ্দীনের উপর বিহস্কারাদেশ জারী হলো। তিনি মিসর থেকে ভারতে চলে এলেন। কিন্তু মিসরে তিনি বিপ্লবের যে বীজ অংকুরিত অবস্থায় রেখে এসেছিলেন তা মহাবৃক্ষে পরিণত হয়ে গেল। সারা মিসর বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে যোগ্য শিষ্য মুফ্তী আবদুহু ও আহমদ আরাবী পাশার নেতৃত্বে মিসরের মানুষ স্বাধিকার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং মিসরের জাতীয় আন্দোলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো। জন্ম নিলো হিজবুল ওত্নী অর্থাৎ স্বদেশ সংঘ নামক সংগঠনের। এদিকে মিসর থেকে বহিস্কৃত হয়ে সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানী প্রথমে হায়দারাবাদে পরে কলকাতায় এলেন। ভারতবর্ষে অবস্থানকালে তিনি ফার্সী ভাষায় 'রদ্দে দাহ্রীইন' নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। এই বইতে তিনি বলেন, ধর্মই কেবল মানব সমাজকে মংগল, নিরাপত্তা ও জাতীয় শক্তির নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে। তিনি আরো বললেন, ইহজাগতিকতা বা ধর্মহীনতা ও বস্তুবাদ জাতীয় অবনতি ও ধ্বংসের জন্য দায়ী।

কলকাতায় অবস্থানকালে কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানকে জনসমাবেশে বক্তৃতা দেবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি এতে রাজী হন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর বুধবার কলকাতা মাদ্রাসা মিলনায়তনে সভার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ডক্টর রডলফ হন্লি প্রথমে সভা করার অনুমতি দিলেও পরে অজ্ঞাত কারণে সভা করতে দেননি। পরে আলবার্ট হলে তিনি বক্তৃতা দিলেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় মুসলমানদের অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্য, ভারতে মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ; বিশ্ব মুসলিম ঐক্য ইত্যাদি বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে অল্প কিছু দিন লন্ডনে অবস্থান করে তিনি প্যারিসে চলে আসেন। এখানে তাঁর সাথে এসে মিলিত হলেন মুফ্তী আবদুহু।

এখানে আরবী ভাষায় তিনি বের করলেন উরওয়াতুল উস্কা নামে একটি সাময়িকী। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ মার্চ এর প্রথম সংখ্যা বের হয়। সহকারী সম্পাদক ছিলেন মুফ্তী আব্দুহু। এর প্রধান প্রচারকেন্দ্র ছিলো মিসর। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিলো মুসলিম মিল্লাতকে এক কাতারে শামিল করা, তাঁদের সংহতি নিশ্চিত করা ও

www.nagorikpathagar.org

তাদের মধ্যে স্বাধীনতাবোধ জাগিয়ে তোলা। পত্রিকাটির পাতায় আগুন ঝরা লেখা বের হতে থাকে। মিসরে তখন ইংরেজের যে দমন ও তোষণনীতি বিরাজিত ছিলো তার বিরুদ্ধে কঠোর ভাষার তীব্র সমালোচনা বরে হয়। মিসরের ইংরেজ তাঁবেদার খেদীব ভীত হয়ে মিসরে পত্রিকাটির প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। ঐ একই সময় ভারতের ইংরেজ সরকারও পত্রিকাটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। মিসরে হুকুম জারী হয় যে, 'উরওয়াতুল উস্‌কা' যার কাছে পাওয়া যাবে তাঁকে মোটা অংকের অর্থ জরিমানা করা হবে। এতো কড়াকড়ি সত্বেও মিসর ও ভারতের মানুষ এ পত্রিকা সংগ্রহ ও অধ্যয়ন থেকে বিরত হয়নি। গোপনে গোপনে তাঁদের কাছে যথা সময়ে এ পত্রিকা এসে পৌঁছাতো। কিন্তু প্রতিকুল অবস্থার মধ্যে চলতে চলতে মাত্র ১৮টি সংখ্যা বের হবার পর পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। এখন তিনি ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা, ঘরোয়া বৈঠক ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁর চিন্তাধারা জনমনে উপস্থাপিত করতে থাকেন। সাম্রজ্যবাদ বিরোধী বহু প্রবন্ধ তিনি লিখেন। তাঁর বেশ কিছু প্রবন্ধ তদানীন্তন বিশ্বের প্রধান পত্রিকাগুলিতে ছাপা হয়। সুদানের স্বাধীনতা আন্দোলনেও তিনি প্রবেশকরূপে তৎপর ছিলেন। ইংলন্ডের রাজনীতিকদের সাথে সুদানের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে তিনি কয়েক দফা আলোচনায় মিলিত হন।

ইতিমধ্যে তিনি মুসলিম জাহানের ঐক্য ও সংহতির পুরোধারূপে বিশ্ব-জনমত কর্তৃক স্বীকৃতি পেয়েছেন। জামালুদ্দীন আফগানী এই নামটিই যেনো পরিগণিত হয়েছে মুসলিম ঐক্য ও সংহতির প্রতীকরূপে। ফলে তিনি ইরানের শাহ নাসিরুদ্দীনের কাছ থেকে ইরান সফরের আমন্ত্রণ পেলেন। তিনি ইরানে এলেন। শাহ্ তাঁকে দিলেন উষ্ণ অভ্যর্থনা। তাঁকে দেয়া হলো ইরানের উচ্চতর সম্মান। শাহের মেহমান হিসাবে তিনি ইরানে অবস্থান করতে লাগলেন। তাঁর কাছে দৈনিক শত শত মানুষ ভীড় করতে লাগলো। তাঁর এই জনপ্রিয়তা শাহের মনে সন্দেহের উদ্রেক করলো। রাশিয়ায় তখন জারের শাসন। জার তাঁকে বেশ সদারে গ্রহণ করলেন। তিনি তাঁকে রাশিয়ার মুসলমানদের জন্য কুরআন শরীফ ও অন্যান্য ইসলামী পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশের অনুমতিও দিলেন।

১৮৮৯ সালে প্যারিসের বিশ্বমেলায় যাবার পথে জার্মানীর মিউনিখে ইরানের শাহের সাথে তাঁর পুনরায় সাক্ষাত হয়। শাহ্ তাঁকে আবার ইরানে যাবার জন্য দাওয়াত দিলেন। তিনি আবার ইরানে এলেন। তাঁর কাছে আবার জনতার ঢল নামতে লাগলো। তাঁর স্বাধীন চিন্তাধারায় ইরানের যুব শ্রেণী উদ্বুদ্ধ হতে লাগলো। শাহ্ আবার প্রমাদ গুণলেন। তিনি জামালুদ্দীনকে বিতাড়নের পায়তারা শুরু করে দিলেন। জামালুদ্দীন আত্মরক্ষার জন্য শাহ্ আব্দুল আযীম খানকা শরীফে আশ্রয় নিলেন। এখানেও যুব জনতার ভীড় হতে লাগলো। একদিন শাহের সেনাদল এসে এই গোপন আস্তানা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে শৃঙ্খলিত অবস্থায় ইরানের সীমান্তের বাইরে রেখে এলো। এ সময় তিনি ভীষণ অসুস্থ ছিলেন। অতি কষ্টে তিনি বসরায় পৌঁছেন। বসরায় অল্পট কিছু দিন অবস্থান করে চলে আসেন ইংলন্ডে। ইংলন্ডে এসে তিনি ইরানের স্বৈরতন্ত্রের

www.nagorikpathagar.org

বিরুদ্ধে লেখালেখি শুরু করেন। বক্তৃতা ও প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি ইরানের জালিম শাহানশাহীর চেহারাখানি উম্মোচন করে দেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে ইরানেও গড়ে ওঠে সংস্কার আন্দোলন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে শাহ ইরানের ব্যবসায়ীদের অধিকার বঞ্চিত করে ইংরেজ কোম্পানীকে ইরানের তামাক বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার প্রদান করলে ইরানে বিদ্রোহের সূচনা হয়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে লন্ডনে এসে তিনি নব প্রকাশিত 'যিয়াউল কাপেকীন' পত্রিকায় শাহের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে বেশ কিছু লেখা প্রকাশ করেন। জামালুদ্দিন আফগানীর অন্যতম প্রধান শিষ্য মীর্যা মুহম্মদ রেজা ইরানের সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। জামালুদ্দীনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ সংস্কার আন্দোলন ইরানে জোরদার হয়ে ওঠে। ফলে শাহ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১১ মার্চ উৎখাত হন ও নিহত হন।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে লন্ডল অবস্থান কালে তিনি তুরস্কের সুলতান আব্দুল হামিদের আমন্ত্রণে ইস্তাম্বুল সফরে যান। তাঁকে রাজকীয় মেহমান হিসাবে সম্বর্ধনা জানানো হয়। তাঁকে তুর্কী সরকার মাসিক ভাতা ও বসবাসের জন্য একটি সুরম্য প্রাসাদ দান করেন। তিনি ইস্তাম্বুলে পাঁচ বৎসর কাটান। এখানে ১৮৯৭ সালের ৯ মার্চ তিনি ইন্তেকাল করেন। অনেকেই মনে করেন যে, তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছিলো।

জামালুদ্দীন স্বাধীনতার যে মন্ত্র রেখে যান তারই প্রভাবে কামাল আততুর্কের নেতৃত্বে জেগে ওঠে তুরস্ক। সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, মিসর, সুদান, তিউনিসিয়া, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি প্রাচ্যদেশ। মহান কবি ও দার্শনিক আল্লামা ইকবাল জামালুদ্দীনের কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিয়ে গেয়ে ওঠেন–

চীন ও আরব হামারা হিন্দুস্তা হামারা,
মুসলিম হ্যায় হাম ওয়াতন হ্যায় সারাঁ জাহী হামারা।

কঠোর সংযমী এই সিংহ–পুরুষকে নিশানতাশের কবরগাহে দাফন করা হয়। তিনি কর্মবহুল জীবনে আরাম করার অবকাশ খুব কমই পেয়েছেন। বক্তৃতা প্রদান লেখনী চালনা ও সংগঠন এই তনিটি শখ ছাড়া তাঁর আর কোন শখ ছিলো না। বস্তুতান্ত্রিক দর্শনের বিরুদ্ধে তিনি দ্বীন ইসলামের তত্ত্ব রচনা করে আধুনিক আন্তর্জাতিক মুসলিম জাহানের পত্তন করেছেন। সত্যিকার অর্থেই জামালুদ্দীন আফগানী এক কালাতিক্রমী মহান ব্যক্তিত্ব। ফরাসী দার্শনিক ও পন্ডিত রেনাঁ তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে বলেছেনঃ

"প্রাচীন কালের মহান্ডিতদের চেহারাতে যে আলোকচ্ছটা উৎসারিত হতো, জামালুদ্দীনের চেহারায় অবিকল আমি সেই আলোকচ্ছটাই উৎসারিত হতে দেখেছি।" আজকে যখন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত মুসলিম জাহানের ঐক্যে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে, ইসরাইল ইয়াহুদীবাদের খপ্পরে, নিমজ্জিত, তাঁর স্বদেশ আফগানিস্তান রুশ সৈন্যদের দখলে, ইরান ইরাক যুদ্ধ চলছে, তখনই সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানি অভাব অনুভূত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। আফগানিস্তানের আত্মা তথা মুসলিম মিল্লাতের ঐক্য সাধনের মহান

www.nagorikpathagar.org

অগ্রদূত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ও সংগঠক সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানীর প্রতি কাজী নজরুল ইসলামের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তাঁর পবিত্র রূহের উদ্দেশ্যে নীচের স্তবকটি নিবেদন করিঃ

সালাম, সালাম জামালউদ্দীন আফগানী তস্‌লীম,
এশিয়ার নব–প্রভাত–সূর্য, পুরুষ মহা মহিমা।
সউদ, কামাল জগ্‌লুল্‌–পাশা, ইব্‌নে করিম বীর
তোমার মানস–পুত্রের রূপে এল উন্নত শির,
দ্বীনের জামাল, তরুণ শাহানশাহীর আলমগীর,
প্রাচীর গর্ব সাম্য মৈত্রী মানবতার খাদিম।

জামাল উদ্দিন আফগানী ভাষণ নিয়ে কিছু কথা–

জামালের অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব হচ্ছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার দিকে দৃষ্টি রেখে ইসলামের প্রগতিমূলক ব্যাখ্যা দান করা এবং মুসলিম ধর্মীয় জীবনে নতুন প্রগতিমূলক ধারা প্রবর্তন করা। একথা অনস্বীকার্য যে, তাঁর উগ্র প্রগতিমূলক ধর্মীয় মতবাদ প্রায় ক্ষেত্রেই গোঁড়া আলিম সমাজ বরদাশত করতে পারেন নাই, কিন্তু এ কথাও নিঃসন্দেহে সত্য যে, ধর্মীয় মতবাদে তাঁর বিজ্ঞাসম্মত ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারা আধুনিক মুসলিম জীবনে বহুল পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করেছে এবং মুফতী আবদুহুর মতো প্রগতিবাদী, নির্ভীক ও মুক্তবুদ্ধি ধর্মতাত্ত্বিকের আবির্ভাব হয়েছে। জামালের আশ্চর্য প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে বিখ্যাত ফরাসী মনীষী আর্নেষ্ট রেনান বলেছিলেনঃ তাঁর চিন্তাশক্তির বিশালতা ও স্বচ্ছতায়, তাঁর মহিমান্বিত ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে যখনই তাঁর সঙ্গে আলাপ করতাম তখনই আমার চোখের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করতাম ইবনে-সিনা, আবূ-রুশদ প্রমুখ মানবতার অনন্ত ট্রাডিশানবাহীকে। ফারসী সাহিত্যের প্রথিতযশা ঐতিহাসিক সমালোচক অধ্যাপক ব্রাউন সাহেব (E.G. Browne) বলেনঃ জামালউদ্দীন ছিলেন অসামান্য চরিত্রবল, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, আশ্চর্য মনীষা, অক্লান্ত কর্মদক্ষতা, অদম্য সাহস, অপূর্ব বাগ্মিতা এবং বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি একাধারে দার্শনিক, চিন্তানায়ক, সুবক্তা ও সাংবাদিক ছিলেন, কিন্তু সবার উপরে তিনি ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর রাজনীতিক-যাঁকে সর্বসাধারণ আশ্চর্য দেশ-প্রেমিক হিসাবে শ্রদ্ধা জানাতো, কিন্তু শাসকশ্রেণী ভয়ংকর আন্দোলনকারী হিসাবে ভয় করতো।

শিক্ষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে জামালের মতামত কিরূপ ছিলো, নিম্নের উদ্বৃতি থেকেই তার পরিচয় মেলেঃ

যাঁরা কোনও জাতিকে বিদ্যা ও নীতি শিক্ষা দেয়ার ভার গ্রহণ করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই মনের ও আত্মার চিকিৎসক। অতএব চিকিৎসক যেমন শরীরতত্ত্বে সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিফহাল থাকেন, সেই রকম শিক্ষকদেরও উচিত নৈতিক স্বাস্থ্যের প্রত্যেকটি বিধি সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া। তাঁরা নিজের জাতীয় পুরাতত্ত্ব ও অন্য জাতিসমূহের ইতিহাস ভালোভাবে জ্ঞাত হবেন, তাদের উন্নতি ও অবনতির কারণসমূহ নির্ণয় করবেন এবং

www.nagorikpathagar.org

কোন নৈতিক দুর্বলতার কারণে অবনতি ঘটেছে ও কি উপায়ে তার প্রতিকার সম্ভব, সে বিষয়ে চিন্তা করবেন। রূহানী চিকিসকদিগকে দুই ভাগে ভাগ করা চলে-বক্তা ও প্রচারকগণ এবং লেখক, কবি, চিন্তানায়ক ও সাংবাদিকগণ।

জামালউদ্দীনের শ্রেষ্ঠ অবদান 'জড়বাদীদের মত খণ্ডন' ফারসীতে লেখা, কিন্তু তার প্রিয়তম শিষ্য মুফতী মোহাম্মদ আবদুহু 'আল-রদ্দ আল আল-দাহরিহীন' নামে আরবীতে তার তর্জমান প্রকাশ করেন। গ্রন্থখানির শেষ অধ্যায়ের নাম 'জাতিসমূহের সুখ অর্জনের উপায়'। জামালের মতানুযায়ী প্রধানত নিম্নলিখিত উপায়েই জাতিসমূহের সুখ-শান্তি অর্জন সম্ভবঃ

১। প্রত্যেক জাতির অন্তর থেকে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের কলুষ নাশ করতে হবে।

২। প্রত্যেক জাতির এই বিশ্বাস থাকা চাই যে, মানুষ মাত্রেরই অত্যুচ্চ ও অকলংক চরিত্র অর্জনের মৌলিক অধিকার আছে এবং তা অর্জনের স্পৃহাও থাকা চাই। মানুষ কেবলমাত্র নবুয়ত (প্রেরিত পুরুষত্ব) অর্জনে অক্ষম, কারণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছাকরেন, তাঁকেই মাত্র এই মর্যাদা দান করেন। যদি সকল মানুষকে চারিত্রিক পূর্ণতা লাভ করতে প্রলুব্ধ করা হয়, তাহলে তারাই এ পথে অগ্রসর হত পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করবে।

৩। প্রত্যেক জাতিকে প্রথমে স্বধর্মে বিশ্বাসী হতে শিক্ষা দিতে হবে এবং যুক্তিতর্কের দ্বারাই এই বিশ্বাস আনয়ন করতে হবে-মানুষের ধর্মবিশ্বাস কেবলমাত্র পূর্ববর্তী ব্যবস্থা বা নজীরের (তকলিদ) উপর নির্ভরশীল হবে না।

৪। প্রত্যেক জাতির মধ্যে এক শ্রেণীর লোক থাকবেন, যাঁদের একমাত্র কাজ হবে সকলকে জ্ঞানদান করা এবং আর এক শ্রেণীর লোক থাবনে যাঁদের কর্তব্য হবে মানুষের নৈতিক চরিত্র নিয়মিত করা। একশ্রেণীর মানুষের স্বাভাবিক অজ্ঞতা দূর করবেন ও শিক্ষাদান করবেন, আর অন্য শ্রেণী তাদের ষড়রিপুকে দমন করবেন ও জীবন নিয়ন্ত্রিত করবেন।

জামালউদ্দীন নিজের স্বপ্নকে, স্থির বিশ্বাসকে রূপায়িত করবার আকুল আগ্রহে প্রকৃত শহীদের আদর্শ নিয়ে নিজেকে কুরবান করেছিলেন-তিনি বিবাহ করবার অবসর পান নাই, কিংবা ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশ, লাভ-লোকসানের হিসাবের দিকে লক্ষ্য রাখেন নাই। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি নিষ্কামভাবে নিজের আদর্শ অনুসরণকরে গেছেন। তিনি সারা মুসলিম জাহানকে যে সকল কর্মচঞ্চল গতিশীল জীবনের দিকে চালনা করে গেছেন, তারা জন্য যুগযুগ ধরে মুসলিম জগতে তঁর প্রভাব অক্ষুন্ন থাকবে।

(সূত্র: আলমাহমুদ ও আফজাল চৌধুরী সম্পাদিত বই আফগানিস্তান আমার ভালবাসা, ই:ফা:বা:)

www.nagorikpathagar.org

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

বিশ্বসাহিত্য

আমাদের অন্ত:করণে যত-কিছু বৃত্তি আছে সে কেবল সকলের সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য। এই যোগের দ্বারাই আমরা সত্য হই, সত্যকে পাই। নহিলে আমি আছি বা কিছু আছে, ইহার অর্থই থাকে না।

জগতে সত্যের সঙ্গে আমাদের এই-যে যোগ ইহা তিন প্রকারের। বুদ্ধির যোগ, প্রয়োজনের যোগ, আর আনন্দের যোগ।

ইহার মধ্যে বুদ্ধির যোগকে একপ্রকার প্রতিযোগিতা বলা যাইতে পারে। সে যেন ব্যাধের সঙ্গে শিকারের যোগ। সত্যকে বুদ্ধি যেন প্রতিপক্ষের মতো নিজের রচিত একটা কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া জেরা করিয়া করিয়া তাহার পেটের কথা টুকরা-টুকরা ছিনিয়া বাহির করে। এই জন্য সত্য সম্বন্ধ বুদ্ধির একটা অহংকার থাকিয়া যায়। সে যে পরিমাণে সত্যকে জানে সেই পরিমাণে আপনার শক্তিকে অনুভব করে।

তার পরে প্রয়োজনের যোগ। এই প্রয়োজনের অর্থাৎ কাজের যোগে সত্যের সঙ্গে আমাদের শক্তির একটা সহযোগিতা জন্মে। এই গরজের সম্বন্ধে সত্য আরো বেশি করিয়া আমদের কাছে আসে। কিন্তু. তবু তাহার সঙ্গে আমদের পার্থক্য ঘোচে না। ইংরেজ সওদাগর যেমন একদিন নবাবের কাছে মাথা নিচু করিয়া ভেট দিয়া কাজ আদায় করিয়া লইয়াছিল এবং কৃতকার্য হইয়া শেষকালে নিজেই সিংহাসনে চড়িয়া বসিয়াছে, তেমনি সত্যকে ব্যবহারে লাগাইয়া কাজ উদ্ধার করিয়া শেষকালে মনে করি, আমরাই যেন জগতের বাদশাগিরি পাইয়াছি। তখন আমরা বলি, প্রকৃতি আমাদের দাসী, জল বায়ু অগ্নি আমাদের বিনা বেতনের চাকর।

তার পরে আনন্দের যোগ। এই সৌন্দর্যের বা আনন্দের যোগে সমস্ত পার্থক্য ঘুচিয়া যায়; সেখানে আর অহংকার থাকে না; সেখানে নিতান্ত ছোটোর কাছে, দুর্বলের কাছে, আপনাকে একেবারে সঁপিয়া দিতে আমাদের কিছুই বাধে না। সেখানে মথুরার রাজা বৃন্দাবনের গোয়ালিনীর কাছে আপনার রাজমর্যাদা লুকাইয়ার আর পথ পায় না। যেখানে আমাদের আনন্দের যোগ সেখানে আমাদের বুদ্ধির শক্তিকেও অনুভব করি না, কর্মের শক্তিকেও অনুভব করি না, সেখানে শুধু আপনাকেই অনুভব করি; মাঝখানে কোনো আড়াল বা হিসাব থাকে না।

এক কথায়, সত্যের সঙ্গে বুদ্ধির যোগ আমাদের ইস্কুল, প্রয়োজনের যোগ আমাদের আপিস, আনন্দের যোগ আমাদের ঘর। ইস্কুলেও আমরা সম্পূর্ণভাবে থাকি না, আপিসেও আমরা সম্পূর্ণরূপে ধরা দিই না, ঘরেই আমরা বিনা আধায় নিজের সমস্ত

www.nagorikpathagar.org

টাকে ছাড়িয়া দিয়া বাঁচি। ইস্কুলে নিরলংকার, আপিস নিরাভরণ, আর ঘরকে কত সাজ সজ্জায় সাজাইয়া থাকি।

এই আনন্দের যোগ ব্যাপারখানা কী? না, পরকে আপনার করিয়া জানা, আপনাকে পরের করিয়া জানা। যখন তেমন করিয়া জানি তখন কোনো প্রশ্ন থাকে না। এ কথা আমরা কখনো জিজ্ঞাসা করি না যে, আমি আমাকে কেন ভালোবাসি। আমরা আপনার অনুভূতিতেই যে আনন্দ। সেই আমার অনুভূতিকে অন্যের মধ্যেও যখন পাই তখন এ কথা আর জিজ্ঞাসা করিবার কোন প্রয়োজনই হয় না যে, তাহাকে আমার কেন ভালো লাগিতেছে।

যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বলিয়াছিলেন-

নবা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি।
আত্মস্ত কামানায় বিত্তং প্রিয়ো ভবতি ॥
নাবা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি।
আত্মনস্ত কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবিত ॥

পুত্রকে চাহি বলিয়াই যে পুত্র প্রিয় হয় তাহা নহে, আত্মাকে চাহি বলিয়াই পুত্র প্রিয় হয়। বিত্তকে চাহি বলিয়াই যে বিত্ত প্রিয় হয় তাহা নহে, আত্মাকে চাহি বলিয়াই বিত্ত প্রিয় হয়। ইত্যাদি। এ কথার অর্থ এই যাহার মধ্যে আমি নিজেকেই পূর্ণতর বলিয়া বুঝিতে পারি আমি তাহাকেই চাই। পুত্র আমার অভাব দূর করে, তাহার মনে, আমি পুত্রের মধ্যে আমাকে আরো পাই। তাহার মধ্যে আমি যেন আমিতর হইয়া উঠি। এইজন্য সে আমার আত্মীয়; আমার আত্মাকে আমার বাহিরেও সেসত্য করিয়া তুলিযাছে। নিজের মধ্যে যে সত্যকে অত্যন্ত নিশ্চিতরূপে অনুভব করিয়া প্রেম অনুভব করি পুত্রের মধ্যে সেই সত্যকে সেইমতই অত্যন্ত অনুভব করাতে আমার সেই প্রেম বাড়িয়া উঠে। সেইজন্য একজন মানুষ যে কী তাহা জানিতে গেলে সে কী ভালোবাসে তাহা জানিতে হয়। ইহাতেই বুঝা যায়, এই বিশ্বজগতে কিসের মধ্যে সে আপনাকে লাভ করিয়াছে, কতদূর পর্যন্ত সে আপনাকে ছড়াইয়া দিয়াছে। যেখানে আমার প্রীতি নাই সেখানেই আমার আত্মা তাহার গণ্ডির সীমারেখায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

শিশু বাহিরে আলো দেখিলে বা কিছু-একটা চলাফেরা করিতেছে দেখিলে আনন্দে হাসিয়া উঠে কলবর করে। সে এই আলোকে এই চাঞ্চল্যে আপনারই চেতনাকে অধিকতর করিয়া পায়, এইজন্যই তাহার আনন্দ।

কিন্তু ইন্দ্রিয়বোধ ছাড়াও ক্রমে যখন তাহার চেতনা হৃদয়মনের নানা স্তরে ব্যাপ্ত হইতে থাকে তখন শুধু এতটুকু আন্দোলনে তাহার আনন্দ হয় না। একেবারে হয় না তাহা নহে, অল্প হয়।

www.nagorikpathagar.org

এমনি করিয়া মানুষের বিকাশ যতই বড়ো হয় সে ততই বড়োরকম করিয়া আপনার সত্যকে অনুভব করিতে চায়।

এই যে নিজের অন্তরাত্মাকে বাহিরে অনুভব করা, এটা প্রথমে মানুষের মধ্যেই মানুষ অতি সহজে এবং সম্পূর্ণরূপে করিতে পারে। চোখের দেখায়, কানের শোনায়, মনের ভাবায়, কল্পনার খেলায়, হৃদয়ের নানান টানে মানুষের মধ্যে সে স্বভাবতই নিজেকে পুরোপুরি আদায় করে। এইজন্য মানুষকে জানিয়া, মানুষকে টানিয়া, মানুষের কাজ করিয়া, সে এমন কানায় কানায় ভরিয়া উঠে। এইজন্যই দেশে এবং কালে যে মানুষ যত বেশি মানুষের মধ্যে আপনার আত্মাকে মিলাইয়া নিজেকে উপলব্ধি ও প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন তিনি ততই মহৎ মানুষ। তিনি যথার্থই মহাত্মা। সমস্ত মানুষেরই মধ্যে আমার আত্মার সার্থকতা, এ যে ব্যক্তি কোনো-না-কোনো সুযোগে কিছু-না-কিছু বুঝিতে না পারিয়াছে তাহার ভগ্যে মনুষ্যত্বের ভাগ কম পড়িয়া গেছে। সে আত্মাকে আপনার মধ্যে জানাতেই আত্মাকে ছোটো করিয়া জানে।

সকলের মধ্যেই নিজেকে জানা-আমাদের মানবাত্মার এই যে একটা স্বাভাবিক ধর্ম, স্বার্থ তাহার একটা বাধা, অহংকার তাহার একটা বাধা; সংসারে এই সকল নানা বাধায় আমাদের আত্মার সেই স্বাভাবিক গতিস্রোতে খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ সৌন্দর্যকে আমরা অবাধে দেখিতে পাই না।

কিন্তু জানি, কেহ কেহ তর্ক করিবেন, মানবাত্মার যেটা স্বাভাবিক ধর্ম সংসারে তাহার এত লাঞ্ছনা কেন? যেটাকে তুমি বাধা বলিয়া উড়াইয়া দিতেছ, যাহা স্বার্থ, যাহা অহংকার, তাহাকেই বা স্বাভাবিক ধর্ম না বলিবে কেন?

বস্তুত অনেকে তাহা বলিয়াও থাকে। কেননা, স্বাভাবের চেয়ে স্বভাবের বাধাটাই বেশি করিয়া চোখে পড়ে। দুই-চাকার গাড়িতে মানুষ যখন প্রথম চড়া অভ্যাস করে তখন চলার চেয়ে পড়াটাই তাহার ভাগ্যে বেশি ঘটে। সেই সময়ে কেহ যদি বলে, লোকটা চড়া অভ্যাস করিতেছে না, পড়াই অভ্যাস করিতেছে, তবে তাহা লইয়া তর্ক করা মিথ্যা। সংসারে স্বার্থ এবং অহংকারের ধাক্কা তো পদে পদেই দেখিতে পাই, কিন্তু তাহার ভিতর দিয়াও মানুষের নিগূঢ় স্বধর্মরক্ষার চেষ্টা অর্থাৎ সকলের সঙ্গে মিলিবার চেষ্টা যদি না দেখিতে পাই, যদি পড়াটাকেই স্বাভাবিক বলিয়া তক্‌রার করি, তবে সে নিতান্তই কলহ করা হয়।

বস্তুত যে ধর্ম আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক তাহাকে স্বাভাবিক বলিয়া জানিবার জন্যই তাহাকে তাহার পুরা দমে কাজ জোগাইবার জন্যই, তাহাকে বাধা দিতে হয়। সেই উপায়েই সে নিজেকে সচেতনভাবে জানে, এবং তাহার চৈতন্য যতই পূর্ণ হয় তাহার আনন্দও ততই নিবিড় হইতে থাকে। সকল বিষয়েই এই রূপ।

www.nagorikpathagar.org

এই যেমন বুদ্ধি। কার্যকরণের সম্বন্ধ ঠিক করা বুদ্ধির একটা ধর্ম। সহজ প্রত্যক্ষ জিনিসের মধ্যে সে যতক্ষণ তাহা সহজেই করে ততক্ষণ সে নিজেকে যেন পুরাপুরি দেখিতেই পায় না। কিন্তু বিশ্বজগতে কার্যকারণের সম্বন্ধগুলি এতই গোপনে তলাইয়া আছে যে, তাহা উদ্ধার করিতে বুদ্ধিকে নিয়তই প্রাণপণে খাটিতে হইতেছে। এই বাধা কাটাইবার খাটুনিতেই বুদ্ধি বিজ্ঞানদর্শনের মধ্যে নিজেকে খুব নিবিড় করিয়া অনুভব করে; তাহাতেই তাহার গৌরব বাড়ে। বস্তুত ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিলে বিজ্ঞান দর্শন আর কিছুই নহে, বিষয়ের মধ্যে বুদ্ধির নিজেকেই উপলব্ধি। সে নিজের নিয়ম যেখানে দেখে সেখানে সেই পদার্থকে এবং নিজেকে একত্র করিয়া দেখে। ইহাকেই বলে বুঝিতে পারা। এই দেখাতেই বুদ্ধির আনন্দ। নহিলে আপেলফল যে কারণে মাটিতে পড়ে সূর্য সেই কারণেই পৃথিবীকে টানে এ কথা বাহির করিয়া মানুষের এত খুশি হইবার কোনো কারণ ছিল না। টানে তো টানে, আমার তাহাতে কী? আমার তাহাতে এই, জগৎচরাচরের এই ব্যাপক ব্যাপারকে আমার বুদ্ধির মধ্যে পাইলাম, সর্বত্রই আমার বুদ্ধিকে অনুভব করিলাম। আমার বুদ্ধির সঙ্গে ধুলি হইতে সূর্যচন্দ্রতারা সবটা মিলিল। এমনি করিয়া অন্তহীন জগৎরহস্য মানুষের বুদ্ধিকে বাহিরে টানিয়া আনিয়া মানুষের কাছে তাহাকে বেশি করিয়া প্রকাশ করিতেছে, নিখিলচরাচরের সঙ্গে মিলাইয়া আবার তাহা মানুষকে ফিরাইয়া দিতেছে। সমস্তের সঙ্গে এই বুদ্ধির মিলনই জ্ঞান। এই মিলনই আমাদের বোধশক্তির আনন্দ।

তেমনি সমস্ত মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আপনার মনুষ্যত্বের মিলনকে পাওয়াই মানবাত্মার স্বাভাবিক ধর্ম এবং তাহাতেই তাহার যথার্থ আনন্দ। এই ধর্মকে পূর্ণচেতনরূপে পাইবার জন্যই অন্তরে বাহিরে কেবলই বিরোধ ও বাধার ভিতর দিয়াই তাহাকে চলিতে হয়। এইজন্যই স্বার্থ এত প্রবল, আত্মভিমান এত অটল, সংসারের পথ এত দুর্গম। এই সমস্ত বাধার ভিতর দিয়া যেখানে মানবের ধর্ম সমুজ্জ্বল হইয়া পূর্ণসুন্দররূপে সবলে নিজেকে প্রকাশ করে সেখানে বড়ো আনন্দ। সেখানে আমরা আপনাকেই বড়ো করিয়া পাই।

মহাপুরুষের জীবনী এইজন্যই আমরা পড়িতে চাই। তাঁহাদের চরিত্রে আমাদের নিজের বাধাযুক্ত আচ্ছন্ন প্রকৃতিকেই মুক্ত ও প্রসারিত দেখিতে পাই। ইতিহাসে আমরা আমাদেরই স্বভাবকে নানা লোকের মধ্যে নানা দেশে নানা কালে নানা ঘটনায় নানা পরিমাণে ও নানা আকারে দেখিয়া রস পাইতে থাকি। তখন আমি স্পষ্ট করিয়া বুঝি বা না বুঝি, মনের মধ্যে স্বীকার করিতে থাকি সকল মানুষকে লইয়াই আমি এক সেই ঐক্য যতটা মাত্রায় আমি ঠিকমত অনুভব করিব ততটা মাত্রায় আমার মঙ্গল, আমার আনন্দ।

www.nagorikpathagar.org

সংসারে মানুষ যে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে সেই প্রকাশের দুইটি মোটা ধারা আছে। একটা ধারা মানুষের কর্ম, আর– একটা ধারা মনুষ্যের সাহিত্য। এই দুই ধারা একেবারে পাশাপাশি চলিয়াছে। মানুষ আপনার কর্মরচনায় এবং ভাবরচনায় আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছে। ইহারা উভয়ে উভয়কে পূরণ করিতে করিতে চলিয়াছে। এই দুয়ের মধ্য দিয়াই ইতিহাসে ও সাহিত্যে মানুষকে পুরাপুরি জানিতে হইবে।

মা তাঁহার কোলের শিশুর সেবা না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু শুধু তাই নয়, কেবল কাজ করিয়া নয়, মায়ের স্নেহ আপনা-আপনি বিনা কারণে আপনাকে বাহিরে ব্যক্ত করিতে চায়। তখন সে কত লেখায় কত আদরে কত ভাষায় ভিতর হইতে ছাপাইয়া উঠিতে থাকে। তখন সে শিশুকে নানা রঙের সাজে সাজাইয়া, নানা গহনা পরাইয়া, নিতান্তই বিনা প্রয়োজনে নিজের প্রাচুর্যকে প্রাচুর্যদ্বারা, মাধুর্যকে সৌন্দর্যদ্বারা বাহিরে বিস্তার না করিয়া থাকিতে পারে না।

ইহা হইতে এই বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের হৃদয়ের ধর্মই এই। সে আপনার আবেগকে বাহিরের জগতের সঙ্গে মিলাইয়া দিতে চায়। সে নিজের মধ্যে নিজে পুরা নহে। অন্তরের সত্যকে কোনোপ্রকারে বাহিরের সত্য করিয়া তুলিলে তবে সে বাঁচে। যে বাড়িতে সে থাকে সে বাড়িটি তাহার কাছে কেবল ইঁট–কাঠের ব্যাপার হইয়া থাকে না, সে বাড়িটিকে সে বাস্তু করিয়া তুলিয়া তাহাতে হৃদয়ের রঙ মাখাইয়া দেয়। যে দেশে হৃদয় বাস করে সে দেশ তাহার কাছে মাটি–জল–আকাশ হইয়া থাকে না; সেই দেশ তাহার কাছে ইশ্বরের জীবধাত্রীরূপকে জননীভাবে প্রকাশ করিলে তবে সে আনন্দ পায়, নহিলে হৃদয় আপনাকে বাহিরে দেখিতে পায় না। এমন না ঘটিলে হৃদয় উদাসীন হয় এবং ঔদাসীন্য হৃদয়ের পক্ষে মৃত্যু।

হৃদয় বলে, আমি অন্তরে যতখানি বাহিরেও ততখানি সত্য হইব কী করিয়া? তেমন সামগ্রী, তেমন সুযোগ বাহিরে কোথায় আছে? সে কেবলই কাঁদিতে থাকে যে, আমি আপনাকে দেখাইতে অর্থাৎ আপনাকে বাহিরে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছি না। ধনী হৃদয়ের মধ্যে যখন আপনার ধনিত্ব অনুভব করে তখন সেই ধনিত্ব বাহিরে প্রকাশ করিতে গিয়া কুবেরের ধনকেও সে ফুঁকিয়া দিতে পারে। প্রেমিক হৃদয়ের মধ্যে যখন যথার্থ প্রেম অনুভব করে তখন সেই প্রেমকে প্রকাশ অর্থাৎ বাহিরে সত্য করিয়া তুলিবার জন্য সে ধন প্রাণ মান সমস্তই এক নিমেষে বিসর্জন করিতে পারে। এমনি করিয়া বাহিরকে অন্তরের ও অন্তরকে বাহিরের সামগ্রী করিবার একান্ত ব্যাকুলতা হৃদয়ের কিছুতেই ঘুচে না। বলরামদাসের একটি পদ আছে: তোমায় হিয়ার ভিতর হৈতে কে হৈল বাহির। অর্থাৎ প্রিয়বস্তু যেন হৃদয়ের ভিতরকারই বস্তু; তাহাকে কে যেন বাহিরে আনিয়াছে, সেইজন্য তাহাকে আবার ভিতরে ফিরাইয়া লইবার জন্য এতই আকাঙ্খা।

www.nagorikpathagar.org

আবার ইহার উলটাও আছে। হৃদয় আপনার ভিতরের আকাঙ্খা ও আবেগকে যখন বাহিরের কিছুতে প্রত্যক্ষ করিতে না পারে তখন অন্তত সে নানা উপকরণ লইয়া নিজের হাতে তাহার একটা প্রতিরূপ গড়িবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। এমনি করিয়া জগৎকে আপনার ও আপনাকে জগতের করিয়া তুলিবার জন্য হৃদয়ের ব্যাকুলতা কেবলই কাজ করিতেছে। নিজেকে বাহিরে প্রকাশ করা এই কাজেরই একটি অঙ্গ। সেইজন্য এই প্রকাশব্যাপারে হৃদয় মানুষকে সর্বস্ব খোয়াইতেও রাজি করিয়া আনে।

আমরা যে পূজা করিয়া থাকি তাহা বুদ্ধিমানেরা এক ভাবে করে, ভক্তিমানেরা আর-এক ভাবে করে। বুদ্ধিমান মনে করে, পূজা করিয়া ভগবানের কাছ হইতে সদ্‌গতি আদায় করিয়া লইব; আর ভক্তিমান বলে, পূজা না করিলে আমার ভক্তির পূর্ণতা হয় না, ইহার আর কোনো ফল নই থাকুক, হৃদয়ের ভক্তিকে বাহিরে স্থান দিয়া তাহাকেই পুরা আশ্রয় দেওয়া হইল। এইরূপে ভক্তি পূজার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করিয়া নিজেকেই সার্থক করে। বুদ্ধিমানের পূজা সুদে টাকা খাটানো; ভক্তিমানের পূজা একেবারেই বাজে খরচ। হৃদয় আপনাকে প্রকাশ করিতে গিয়া লোকসানকে একেবারে গণ্যই করে না।

বিশ্বজগতের মধ্যেও যেখানে আমরা আমাদের হৃদয়ের এই ধর্মটি দেখি সেখানেই আমাদের হৃদয় আপনিই আপনাকে ধরা দিয়া বসে, কোনো কথাটি জিজ্ঞাসা করে না। জগতের মধ্যে এই বেহিসাবি বাজে খরচের দিকটা সৌন্দর্য। যখন দেখি, ফুল কেবলমাত্র বীজ হইয়া উঠিবার জন্যই লাগাইতেছে না, নিজের সমস্ত প্রয়োজনকে ছাপাইয়া সুন্দর হইয়া ফুটিতেছে- মেঘ কেবল জল ঝরাইয়া কাজ সারিয়া তাড়াতাড়ি ছুটি লইতেছে না, রহিয়া বসিয়া বিনা প্রয়োজনে রঙের ছটায় আমাদের চোখ কাড়িয়া লইতেছে- গাছগুলা কেবল কাঠি হইয়া শীর্ণ কাঙালের মতো বৃষ্টি ও আলোকের জন্য হাত বাড়াইয়া নাই, সবুজ সোনার পুঞ্জ পুঞ্জ ঐশ্বর্য দিকবধূদের ডালি ভরিয়া দিতেছে- যখন দেখি, সমুদ্র যে কেবল জলকে মেঘরূপে পৃথিবীর চারি দিকে প্রচার করিয়া দিবার একটা মস্ত আপিস তাহা নহে, সে আনাপর তরল নীলিমার অতল স্পর্শ ভয়ের দ্বারা ভীষণ- এবং পর্বত কেবল ধরাতলে নদীর জল জোগাইয়াই ক্ষান্ত নহে, সে যোগনিমগ্ন রুদ্রের মতো ভয়ংকরকে আকাশ জুড়িয়া নিস্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছে-তখন জগতের মধ্যে আমরা হৃদয়ধর্মের পরিচয় পাই। তখন চিরপ্রবীণ বুদ্ধি মাথা মাড়িয়া প্রশ্ন করে, জগৎ জুড়িয়া এত অনাবশ্যক চেষ্টার বাজে খরচ কেন? চিরনবীন হৃদয় বলে, কেবলমাত্র আমাকে ভুলাইবার জন্যই, আর তো কোনো কারণ দেখি না। হৃদয়ই জানে, জগতের মধ্যে একটি হৃদয় কেবলই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। নহিলে সৃষ্টির মধ্যে এত রূপ, এত গান, এত হাবভাব, এত আভাস-ইঙ্গিত, এত সাজসজ্জা কেন? হৃদয় যে

www.nagorikpathagar.org

ব্যাবসাদারির কৃপণতায় ভোলে না, সেইজন্যই তাহাকে ভুলাইতে জলে স্থলে আকাশে পদে পদে প্রয়োজনকে গোপন করিয়া এত অনাবশ্যক আয়োজন। জগৎ যদি রসময় না হইত তবে আমরা নিতান্তই ছোটো হইয়া অপমানিত হইয়া থাকিতাম; আমাদের হৃদয় কেবলই বলিত, জগতের যজ্ঞে আমারই নিমন্ত্রণ নাই। কিন্তু সমস্ত জগৎ তাহার অসংখ্য কাজের মধ্যেও রসে ভরিয়া উঠিয়া হৃদয়কে এই মধুর কথাটি বলিতেছে যে, আমি তোমাকে চাই: নানারকম করিয়া চাই; হাসিতে চাই, কান্নাতে চাই; ভয়ে চাই, ভরসায় চাই: ক্ষোভে চাই, শান্তিতে চাই।

এমনি জগতের মধ্যেও আমরা দুটো ব্যাপার দেখিতেছি, একটা কাজের প্রকাশ, একটা ভাবের প্রকাশ। কিন্তু, কাজের ভিতর দিয়া যাহা প্রকাশ হইতেছে তাহাকে সমগ্ররূপে দেখা ও বোঝা আমাদের কর্ম নয়। ইহার মধ্যে যে অমেয় জ্ঞানশক্তি আছে আমাদের জ্ঞান দিয়া তাহার কিনারা পাওয়া যায় না।

কিন্তু ভাবের প্রকাশ একেবারে প্রত্যক্ষ প্রকাশ। সুন্দর যাহা তাহা সুন্দর। বিরাট যাহা তাহা মহান। রুদ্র যাহা তাহা ভয়ংকর। জগতের যাহা রস তাহা একেবারে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, এবং আমাদের হৃদয়ের রসকে বাহিরে টানিয়া আনিতেছে। এই মিলনের মধ্যে লুকোচুরি যতই থাক, বাধাবিঘ্ন যতই ঘটুক, তবু প্রকাশ ছাড়া এবং মিলন ছাড়া ইহার মধ্যে আর-কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

তবেই দেখিতেছি, জগৎসংসারে ও মানবসংসারে একটা সাদৃশ্য আছে। ঈশ্বরে নিত্যরূপ জ্ঞানরূপ জগতের নানা কাজে প্রকাশ পাইতেছে, আর তাঁহার আনন্দরূপ জগতের নানা রসে প্রত্যক্ষ হইতেছে। কাজের মধ্যে তাঁহার জ্ঞানকে আয়ত্ত করা শক্ত, রসের মধ্যে তাঁহার আনন্দকে অনুভব করারয় জটিলতা নাই। কারণ, রসের মধ্যে তিনি যে নিজেকে প্রকাশই করিতেছেন।

মানুষের সংসারেও আমাদের জ্ঞানশক্তি কাজ করিতেছে। আমাদের আনন্দশক্তি রসের সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। কাজের মধ্যে আমাদের আত্মরক্ষার শক্তি, আর রসের মধ্যে আমাদের আত্মপ্রকাশের শক্তি। আত্মরক্ষা আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, আর আত্মপ্রকাশ আমাদের প্রয়োজনের বেশি।

প্রয়োজনে প্রকাশকে এবং প্রকাশে প্রয়োজনকে বাধা দেয়, যুদ্ধের উদাহরণে তাহা দেখাইয়াছি। স্বার্থ বাজে খরচ করিতে চায় না, অথচ বাজে খরচেই আনন্দ আত্মপরিচয় দেয়। এইজন্যই স্বার্থের ক্ষেত্রে আপিসে আমাদের আত্মপ্রকাশ যতই অল্প হয় ততই তাহা শ্রদ্ধেয় হইয়া থাকে, এবং এইজন্যই আনন্দের উৎসবে স্বার্থকে যতই বিস্মৃত হইতে দেখি উৎসব ততই উজ্জ্বল হইতে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

তাই সাহিত্যে মানুষের আত্মপ্রকাশে কোনো বাধা নাই। স্বার্থ সেখান হইতে দূরে। দুঃখ সেখানে আমাদের হৃদয়ের উপর চোখের জলের বাষ্প সৃজন করে, কিন্তু আমাদের সংসারের উপর হস্তক্ষেপ করে না; ভয় আমাদের হৃদয়কে দোলা দিতে থাকে, কিন্তু আমাদের শরীরকে আঘাত করে না; সুখ আমাদের হৃদয়ে পুলকস্পর্শ সঞ্চার করে, কিন্তু আমাদের লোভকে নাড়া দিয়া অত্যন্ত জাগাইয়া তোলে না। এইরূপে মানুষে আপনার প্রয়োজনের সংসারের ঠিক পাশে- পাশেই একটা প্রয়োজন-ছাড়া সাহিত্যের সংসার রচনা করিয়া চলিয়াছে। সেখানে সে নিজের বাস্তব কোনো ক্ষতি না করিয়া নানা রসের দ্বারা আপনার প্রকৃতিকে নানারূপে অনুভব কারবার আনন্দ পায়, আপনার প্রকাশকে বাধাহীন করিয়া দেখে। সেখানে দায় নাই, সেখানে খুশি। সেখানে পেয়াদা-বরকন্দাজ নাই, সেখানে স্বয়ং মহারাজা।

এইজন্য, সাহিত্যে আমরা কিসের পরিচয় পাই? না, মানুষের যাহা প্রাচুর্য, যাহা ঐশ্বর্য, যাহা তাহার সমস্ত প্রয়োজনকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। যাহা তাহার সংসারের মধ্যেই ফুরাইয়া যাইতে পারে নাই।

এইজন্য, ইতিমধ্যে আমার একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছি, ভোজনরস যদিচ পৃথিবীতে ছোটো ছেলে হইতে বুড়া পর্যন্ত সকলেরই কাছে সুপরিচিত তবু সাহিত্যে তাহা প্রহসন ছাড়া অন্যত্র তেমন করিয়া স্থান পায় নাই। কারণ, সে রস আহারের তৃপ্তিকে ছাপাইয়া উছলিয়া উঠে না। পেটটি পুরাইয়া একটি জলদগম্ভীর 'আঃ' বলিয়াই তাহাকে হাতে-হাতেই নগদ-বিদায় করিয়া দিই। সাহিত্যের রাজদ্বারে তাহাকে দক্ষিণার জন্য নিয়ন্ত্রণপত্র দিই না। কিন্তু যাহা আমাদের ভাঁড়ার-ঘরের ভাঁড়ার মধ্যে কিছুতেই কুলায় না সেই সকল রসের বন্যাই সাহিত্যের মধ্যে ঢেউ তুলিয়া কলধ্বনি করিতে বহিয়া যায়। মানুষ তাহাকে কাজের মধ্যেই নিঃশেষ করিয়া দিতে পারে না বলিয়াই ভরা হৃদয়ের বেগে সাহিত্যের মধ্যে তাহাকে প্রকাশ করিয়া তবে বাঁচে।

এইরূপ প্রাচুর্যেই মানুষের যথার্থ প্রকাশ। মানুষ যে ভোজনপ্রিয় তাহা সত্য বটে, কিন্তু মানুষ যে বীর ইহাই সত্যতম। মানুষের এই সত্যের জোর সামলাইবে কে? তাহা ভাগীরথীর মতো পাথর গুঁড়াইয়া, ঐরাবতকে ভাসাইয়া, গ্রাম নগর শস্যক্ষেত্রের তৃষ্ণা মিটাইয়া, একেবারে সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে। মানুষের বীরত্ব মানুষের সংসারের সমস্ত কাজ সারিয়া দিয়া সংসারকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

এমনি করিয়া স্বভাবতই মানুষের যাহা-কিছু বড়ো যাহা-কিছু নিত্য,যাহা সে কাজে কর্মে ফুরাইয়া ফেলিতে পারে না, তাহাই মানুষের সাহিত্যে ধরা পড়িয়া আপনা-আপনি মানুষের বিরাট রূপকেই গড়িয়া তুলে।

www.nagorikpathagar.org

আরো একটি কারণ আছে। সংসারে যাহাকে আমরা দেখি তাহাকে ছড়াইয়া দেখি; তাহাকে এখন একটু তখন একটু, এখানে একটু সেখানে একটু দেখি; তাহাকে আরো দশটার সঙ্গে মিশাইয়া দেখি। কিন্তু সাহিত্যে সেই-সকল ফাঁক, সেই সকল মিশাল থাকে না। সেখানে যাহাকে প্রকাশ করা হয় তাহার উপরেই সমস্ত আলো ফেলা হয়। তখনকার মতো আর-কিছুকেই দেখিতে দেওয়া হয় না। তাহার জন্য নানা কৌশলে এমন একটি স্থান তৈরি করিয়া দেওয়া হয় সেখানে সেই কেবল দীপ্যমান।

এমন অবস্থায়, এমন জমাট স্বাতন্ত্র্যে, এমন প্রখর আলোকে যাহাকে মানাইবে না তাহাকে আমরা স্বভাবতই এ জায়গায় দাঁড় করাই না। কারণ, এমন স্থানে অযোগ্যকে দাঁড় করাইলে তাহাকে লজ্জিত করা হয়। সংসারের নানা আচ্ছাদনের মধ্যে পেটুক তেমন করিয়া চোখে পড়ে না, কিন্তু সাহিত্যমঞ্চের উপর তাহাকে একাগ্র আলোকে ধরিয়া দেখাইলে সে হাস্যকর হইয়া উঠে। এইজন্য মনুষ্যের যে-প্রকাশটি তুচ্ছ নয়, মানবহৃদয় যাহাকে করুণায় বা বীর্যে, রুদ্রতায় বা শান্তিতে আপনার উপযুক্ত প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত না হয়, যাহা কলা নৈপুণ্যের বেষ্টনীর মধ্যে দাঁড়াইয়া নিত্যকালের অনিমেষ দৃষ্টিপাত মাথা তুলিয়া সহ্য করিতে পারে, স্বভাবতই মানুষ তাহাকেই সাহিত্যে স্থান দেয়; নহিলে তাহার অসংগতি আমাদের কাছে পীড়াজনক হইয়া উঠে। রাজা ছাড়া আর কাহাকেও সিংহাসনের উপর দেখিলে আমাদের মনে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়।

কিন্তু সকল মানুষের বিচারবুদ্ধি বড়ো নয়, সকল সমাজও বড়ো নয়, এবং এক-একটা সময় আসে যখন ক্ষণিক ও ক্ষুদ্র মোহে মানুষকে ছোটো করিয়া দেয়। তখন সেই দুঃসময়ের বিকৃত দর্পণে ছোটো জিনিস বড়ো হইয়া দেখা দেয় এবং তখনকার সাহিত্যে মানুষ আপনার ছোটোকেই বড়ো করিয়া তোলে, আপনার কলঙ্কের উপরেই স্পর্ধার সঙ্গে আলো ফেলে। তখন কলার বদলে কৌশল, গৌরবের জায়গায় গর্ব এবং টেনিসনের আসনে কিপলিঙের আবির্ভাব হয়।

কিন্তু মাহকাল বসিয়া আছেন। তিনি তো সমস্তই ছাঁকিয়া লইবেন। তাঁহার চালুনির মধ্য দিয়া যাহা ছোটো, যাহা জীর্ণ তাহা গলিয়া ধুলায় পড়িয়া ধুলা হইয়া যায়। নানা কাল ও নানা লোকের হাতে সেই সকল জিনিসই টেকে যাহার মধ্যে সকল মানুষই আপনাকে দেখিতে পায়। এমনি করিয়া বাছাই হইয়া যাহা থাকিয়া যায় তাহা মানুষের সর্বদেশের সর্বকালের ধন।

এমনি করিয়া ভাঙিয়া গড়িয়া সাহিত্যের মধ্যে মানুষের প্রকৃতির, মানুষের প্রকাশের একটি নিত্যকালীন আদর্শ আপনি সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই আদর্শই

www.nagorikpathagar.org

নূতন যুগের সাহিত্যেরও হাল ধরিয়া থাকে। সেই আদর্শমতই যদি আমরা সাহিত্যের যদি আমরা সাহিত্যের বিচার করি তবে সমগ্র মানবের বিচারবুদ্ধির সাহায্য লওয়া হয়।

এইবার আমার আসল কথাটি বলিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; সেটি এই, সাহিত্যকে দেশকাল ছোটো করিয়া দেখিলে ঠিকমত দেখাই হয় না। আমরা যদি বুঝি যে, সাহিত্যে বিশ্বমানবই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে তবে সাহিত্যের মধ্যে আমাদের যাহা দেখিবার তাহা দেখিতে পাইব। যেখানে সাহিত্যরচনায় লেখক উপলক্ষমাত্র না হইয়াছে সেখানে তাহার লেখা নষ্ট হইয়া গেছে। যেখানে লেখক নিজের ভাবনায় সমগ্র মানুষের ভাব অনুভাব করিয়াছে, নিজের লেখায় সমগ্র মানুষের বেদনা প্রকাশ করিয়াছে, সেইখারেই তাহার লেখা সাহিত্যে জায়গা পাইয়াছে। তবেই সাহিত্যকে এইভাবে দেখিতে হইবে যে, বিশ্বমানব রাজমিস্ত্রি হইয়া এই মন্দিরটি গড়িয়া তুলিতেছেন; লেখকেরা নানা দেশ ও নানা কাল হইতে আসিয়া তাহার মজুরের কাজ করিতেছে। সমস্ত ইমারতের প্ল্যানটা কী তাহা আমাদের কারও সামনে নাই বটে, কিন্তু যেটুকু ভুল হয় সেটুকু বার বার ভাঙা পড়ে; প্রত্যেকে মজুরকে তাহার নিজের স্বভাবিক ক্ষমতা খাটাইয়া, নিজের রচনাটুকুকে সমগ্রের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া, সেই অদৃশ্য প্লানের সঙ্গে মিলাইয়া যাইতে হয়, ইহাতেই তাহার ক্ষমতা প্রকাশ পায় এবং এইজন্যই তাহাকে সাধারণ মজুরের মতো কেহ সামান্য বেতন দেয় না, তাহাকে ওস্তাদের মতো সম্মান করিয়া থাকে।

আমার উপরে যে আলোচনার ভার দেওয়া হইয়াছে ইংরেজিতে আপনারা তাহাকে Comparative Literature নাম দিয়াছেন। বাংলায় আমি তাহাকে বিশ্বসাহিত্য বলিব।

এই বিশ্বসাহিত্যের আমি আপনাদের পথপ্রদর্শক হইব এমন কথা মনেও করিবেন না। নিজের নিজের সাধ্য-অনুসারে এ পথ আমাদের সকলকে কাটিয়া চলিতে হইবে। আমি কেবল এইটুকু বলিতে চাহিয়াছিলাম যে, পৃথিবী যেমন আমার খেত এবং তোমার খেত এবং তাঁহার খেত নহে, পৃথিবীকে তেমন করিয়া জানা অত্যন্ত গ্রাম্যভাবে জানা, তেমনি সাহিত্য আমার রচনা, তোমার রচনা এবং তাঁহার রচনা নহে। আমরা সাধারণত সাহিত্যকে এমনি করিয়াই গ্রাম্যভাবেই দেখিয়া থাকি। সেই গ্রাম্য সংকীর্ণতা হইতে নিজেকে মুক্তি দিয়া বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে বিশ্বমানবকে দেখিবার লক্ষ্য আমরা স্থির করিব, প্রত্যেক লেখকের রচনার মধ্যে একটি সমগ্রতাকে গ্রহণ করিব এবং সেই সমগ্রতার মধ্যে সমস্ত মানষের প্রকাশচেষ্টার সম্বন্ধ দেখিব, এই সংকল্প স্থির করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

www.nagorikpathagar.org

(সংক্ষেপিত)

(কলকাতা, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ-এ প্রদত্ত ভাষণ)

(৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৭ (২৬ মাঘ ১৩১৩), মাঘ, বঙ্গদর্শন, ১৩১৩)

রবীন্দ্রণাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) রসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে তিনটি বাণী পাঠিয়েছিলেন- ২৬শে নভেম্বর, ১৯৩৩-এ (বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত পয়গম্বর দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রেরিত। এই সভার সভাপতি ছিলেন বিচারপতি মির্জা আলী আকবর খা। রবীন্দ্রনাথের বাণী পাঠ করে শুনিয়েছিলেন সরোজিনী নাইডু); ২৫শে জুন, ১৯৩৪ (কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত স্যার আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দির অনুরোধে ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম উপলক্ষ প্রেরিত); ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬ (নয়াদিল্লি জামে মসজিদ থেকে প্রকাশিত পয়গম্বর-সংখ্যার জন্যে প্রেরিত শুভেচ্ছাবার্তা)। আমরা তিনটি বাণীই পর-পর উদ্ধৃত করছি:

১। জগতে যে সামান্য কয়েকটি মহান ধর্ম আছে, ইসলাম ধর্ম তাদেরই অন্যতম। মহান এই ধর্মমতের অনুগামীদের দায়িত্বও তাই বিপুল। ইসলাম-পন্থীদের মনে রাখা দরকার, ধর্মবিশ্বাসের মহত্ত্ব আর গভীরতা যেন তাদের প্রতিদিনের জীবন-যাত্রার উপরেও ছাপ রেখে যায়। ... সত্য ও শাশ্বতকে যারা জেনেছেন ও জানিয়েছেন তাঁরা ঈশ্বরের ভালোবাসার পাত্র এবং মানুষকেও তাঁরা চিরকাল ভালোবেসে এসেছেন।

২। ইসলাম পৃথিবীর মহত্তম ধর্মের মধ্যে একটি। এই কারণে তার অনুবর্তীগণের দায়িত্ব অসীম। যেহেতু আপন জীবনে এই ধর্মের মহত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁদের সাক্ষ্য দিতে হবে। ভারতে যে-সকল বিভিন্ন ধর্ম-সমাজ আছে, তাদের পরস্পরের প্রতি সভ্যজাতিযোগ্য মনোভাব যদি উদ্ভাসিত করতে হয়, তাহলে কেবলমাত্র রাষ্ট্রিক স্বার্থ-বুদ্ধি দ্বারা তা সম্ভব হবে না। আমাদের নির্ভর করতে হবে সেই অনুপ্রেরণার প্রতি-যা ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র ও মানবের বন্ধু সত্যদূতদের অমর জীবন থেকে চিরউৎসারিত। আজকের এই পুণ্য অনুষ্ঠান উপলক্ষে মুসলিম ভাইদের সাথে একযোগে ইসলামের মহাঋষির উদ্দেশে আমার ভক্তিউপহার অর্পণ করে উৎপীড়িত ভারতবর্ষের জন্য তাঁর আশীর্বাদ ও সান্ত্বনা কামরি করি।

৩। যিনি বিশ্বের মহত্তমদের অন্যতম সেই পবিত্র পয়গম্বর হযরত মুহম্মদ (সা)-এর উদ্দেশে আমি আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। মানুষের ইতিহাসে এক নতুন সম্ভাবনাময় জীবনীশক্তির সঞ্চার করেছিলেন পয়গম্বর হযরত। এনেছিলেন নিখাদ, শুদ্ধ ধর্মাচরণের আদর্শ। সর্বান্তকরণে প্রার্থনা করি, পবিত্র পয়গম্বরের পথ যাঁরা অনুসরণ করছেন, আধুনিক ভারতবর্ষের সুসভ্য ইতিহাস রচনা করে তাঁরা যেন জীবন সম্পর্কে তাঁদের গভীর আস্থা এবং পয়গম্বরের প্রদত্ত শিক্ষাকে যথাযথ মর্যাদা দেন। তারা যেন এমনভাবে ইতিহাসকে গড়ে তোলেন-যাতে আমাদের জাতীয় জীবনে শান্তি ও পারস্পরিক শুভেচ্ছার বাতাবরণটি অটুট থেকে যায়।

www.nagorikpathagar.org

ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহমে কখনো-কখনো শান্তিনিকেতনে গীতাঞ্জলি-র (১৯১০) ৫১-সংখ্যক গানটি গীত ও হয়েছে:

কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আসো
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো,
পাগল ওগো, ধরায় আসো।।
এই অকূল সংসারে
দুঃখ-আঘাত তোমার প্রাণে বীণা ঝংকারে।
ঘোর বিপদ-মাঝে
কোন জননীর মুখের হাসি দেখিয়া হাসো।।
তুমি কাহার সন্ধানে
সকল সুখে আগুনে জ্বেলে বেড়াও কে জানে।
এমন ব্যাকুল করে
কে তোমারে কাঁদায় যারে ভালোবাসো।।
তোমার ভাবনা কিছু নাই-
কে যে তোমার সাথের সাথি ভাবি মনে তাই।
তুমি ভাবনা ভুলে
কোন অনন্ত প্রাণসাগরে আনন্দে ভাসো।।

(সূত্র: আব্দুল মান্নান সৈয়দ: বাংলাসাহিত্যে মুসলমান)

Do they seek other than the religion of Allah, while to him submitted all creatures in the heavens and the earth willingly or unvrilliensly. And to him shall they all be returned (Al-imran-83)

অর্থাৎ

এখন কি এরা আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পথ (আল্লাহর দীন) ত্যাগ করে অন্য কোন পথের সন্ধান করেছে? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছুই স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আল্লাহর হুকুমের অনুগত এবং তারই দিকে সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

(আলকুরান-৩-৮৩)

আল কুরানের সূরে সুর মিলিয়ে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথও বলেছেন- জগতের উপর দিয়া জগন্নাথের রথ চলিতেছে। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছাক হোক সে রথের রশি আমাকে ধরিতে হইবেই তাই বের্জার হয়ে টানার চেয়ে খুশি মনে টানাই শ্রেয় মনে করি।

(বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কুরানের প্রভাব আবুতালিব পৃ-৪৪)

www.nagorikpathagar.org

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)

ভগবৎপ্রেম

[২৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩, 'Chicago Herald' পত্রিকায় প্রকাশিত স্বামীজীর একটি বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণী]

লাফলিন ও মনরো স্ট্রীটে তৃতীয় ইউনিটেরিয়ান চার্চের বক্তৃতা-গৃহে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী গতকল্য প্রাতে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শ্রবণ করেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় চিল ভগবৎপ্রেম'; আলোচনা বাগ্মিতাপূর্ণ ও অপূর্ব হইয়াছিল। তিনি বলেনঃ

ঈশ্বর পৃথিবীর সর্বত্র পূজিত হন, কিন্তু বিভিন্ন নামে এবং বিভিন্ন উপায়ে। মহান ও সুন্দর ঈশ্বরকে উপাসনা করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, এবং ধর্ম মানুষের প্রকৃতিগত। সকলেই ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং ঈশ্বরের প্রতি প্রেমই মানুষকে দান, দয়া, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি সৎকার্যে প্রণোদিত করে। সকলেই ঈশ্বরকে ভালবাসে, কারণ তিনি প্রেমস্বরূপ।

বক্তা চিকাগোতে আসা অবধি মানুষের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনিয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করেন-আরও দৃঢ়তর বন্ধন মানুষকে যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, কারণ সকলেই ঈশ্বরপ্রেম ইহাতে সঞ্জাত। মানুষের ভাতৃত্ব ঈশ্বরের পিতৃত্বেরই যুক্তিগত সিদ্ধান্ত। বক্তা বলেনঃ

তিনি ভারতের বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছেন, পর্বতগুহায় রাত্রি কাটাইয়াছেন, সমগ্র প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিয়া তিনি এই বিশ্বাসে উপনীত হইয়াছেন যে, স্বাভাবিক নিয়মের ঊর্ধ্বে এমন কিছু আছে, যাা মানুষকে অসত্য বা অন্যায় হইতে রক্ষা করে। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উহা ঈশ্বরপ্রেম। ঈশ্বর যদি যীশু, মহম্মদ এবং বৈদিক ঋষিগণের সহিত কথা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঈশ্বরেরই অন্যতম সন্তান-তাঁহার সহিতও তিনি কেন কথা বলেন না?

স্বামী আরও বলিলেন-সত্যই তিনি আমার সহিত এবং তহার সকল সন্তানের সহিত কথা বলেন। আমরা তাঁহাকে আমাদের চতুর্দিকে দেখি এবং তাঁহার প্রেমের সীমাহীনতা দ্বারা নিরন্তর প্রভাবিত হই এবং সেই প্রেম হইতে আমাদের মঙ্গল ও শুভকর্মের প্রেরণা লাভ করি। স্বামীজী, বেদান্তসূত্র থেকে চিকাগো আরও অনান্য ভাষণে আরও উক্তি করেছেন, যেমন

(সূত্র-ঠিকানা বক্তৃতা. উদ্বোধন কার্য্যালয়, কলকাতা)

www.nagorikpathagar.org

"আমাদের জাতি ও ধর্মমতের সীমানার বাহিরেও আমরা সিদ্ধপুরুষ দেখিতে পাই।

বেদান্ত সূত্র ৩/৪/৩৬

এ পসঙ্গে বেদ-পুরান উপনিষদে এর স্বপক্ষে আত্তি প্রমাণ পাওয়া যায়।

'অথর্ববেদনীয় উপনিষদ'-এ আছে ঃ

অস্য ইল্ললে মিত্রাবরুণো রাজা

তস্মাৎ তানি দিব্যানি পুনস্তং দুধ্যু

হবয়ামি মিলং কবর ইল্ললাং

অল্লোরসূলমহমদকং

বরস্য অল্লো অল্লাম ইল্লল্লেতি ইল্লাল্লাল।। ৯।।

'ভবিষ্য পুরাণ'-এ আছে ঃ

এতস্মিন্নন্তরে ম্লেচ্ছ আচার্যেন সবন্বিতঃ।

মহামদ ইতি খ্যাতঃ শিস্যশাখাসমন্বিতঃ।। ৫।।

নৃপশ্চৈব মহাদেবং মরুস্থলনিবাসিনম্

গঙ্গজলৈশ্চ সংস্নাপ্য পঞ্চগব্যসমন্বিতৈঃ

চন্দনাদিভিরভ্যর্চ তুষ্টাব মনসা হরম্।। ৬ ।।

নমস্তে গিরিজানাথ মরুস্থলনিবাসিনে

ত্রিপুরাসুরনাশায় বহুমায়াপ্রবর্তিনে।। ৭।।

ভোজরাজ উবাচ-

ম্লেচ্ছৈর্গুপ্তায় শুদ্ধায় সচ্চিদানন্দরূপিণে।

ত্বং মাং হি কিঙ্করং বিদ্ধি শরণার্থ মুপাগতম্।। ৮।।

ভাবার্থ ঃ ঠিক সেই সময় 'মহামদ' নামক এক ব্যক্তি-যাঁহার বাস 'মরুস্থলে' (আরব দেশে)-আপন সাঙ্গোপাঙ্গসহ আবির্ভূত হইবেন। হে আরবের প্রভূ, হে জগদগুরু, তোমার প্রতি আমার স্তুতিবাদ। তুমি জগতের সমুদয় কলুষ নাশ করিবার বহু উপায় জান, তোমাকে নমস্কার। হে পবিত্র পুরুষ! আমি তোমার দাস। আমাকে তোমার চরণতলে স্থান দাও।

'অল্লোপনিষদ'-এর একটি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়ঃ

www.nagorikpathagar.org

হোতারমিন্দ্রো হোতারমিন্দ্রো মহাসুরিন্দ্রাঃ।

অল্লো জ্যেষ্ঠং পরমং পূর্ণং ব্রহ্মাণ অল্লাম।।

অল্লোরসুলমহমদকং বরস্য অল্লো অল্লাম্।

আদল্লাহ্‌বুকমে ককম অল্লাবুক নিখাতকম।। ৩।।

ভাবার্থ ঃ আল্লাহ্ সকল গুণের অধিকারী। তিনি পূর্ণ ও সর্বজ্ঞানী। মুহম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল। আল্লাহ আলোকময়, অক্ষয়, এক, চির পরিপূর্ণ এবং স্বয়ম্ভূ।

ইদং জনা উপশ্রুত নরাশংসস্তবিষ্যতে।।

ষষ্টিং সহস্রা নবতিং চ কৌরম আরুশমেষু দবহে।। ১।।

ভাবার্থ ঃ হে লোকসকল, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। 'প্রশংসিত জন' লোকদিগের মধ্য হইতে উত্থিত হইবেন। আমার পলাতককে ৬০,০০০ জন শত্রুর মধ্যে পাইলাম।

বলা বাহুল্য, এখানে যে হযরত মুহম্মদের কথাই বলা হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কারণ মুহম্মদের অর্থই 'প্রশংসিত জন', আর মক্কার অধিবাসীদিগের তৎকালীন সংখ্যাও ছিল প্রায় ৬০,০০০।

উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ হইতে পাঠক নিশ্চয়ই অনুমান করিতে পারিতেছেন যে, আর্য ঋষিগণ দ্যানবলে হাজার হাজার বৎসর পূর্বেই মুহম্মদের স্বরূপ ও আবির্ভাব সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত ছিলেন।

(গোলাম মোস্তফা-বিশ্বনবী)

www.nagorikpathagar.org

জর্জ বার্নাড শ' (১৮৬৫-১৯৫০)

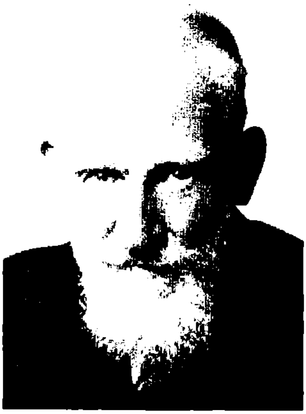

বিশ্বখ্যাত আইরিশ নাট্যকার। সাহিত্যে মৌলিক অবদানের জন্যে তিনি ১৯২৫ সালে নোবেল পুরস্কার পান। তিনি একজন বিশ্ববিখ্যাত বক্তাও ছিলেন।

শ' ছিলেন কথার পাগল সে কথাত কথা নয়, বুদ্ধির বারুদ ভরা তুবড়ি। শ' বাক্যে-বিদ্রুপে নাট্য দর্শকদের করেছেন চমৎকৃত তাঁদের বুদ্ধিকে করেছেন, জাগ্রত, প্রবুদ্ধও উজ্জল। (গোপাল হালদার, ইংরেজী সাহিত্যের রূপরেখা, পৃষ্ঠ ২৮১)

বার্নাড শ' ১৯২৯ সালে সংস্করনে "Gettuing married" বই এ বলেছেন, আমি বিশ্বাস করি গোটা বৃটিশ সাম্রাজ্য এই শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই মুহাম্মদ (সা:) এর আদর্শ দ্বারা সংস্কার করবে। যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় ইহাতে নিশ্চয়তা কি তখন তিনি বলেন, আমি সর্বদা এই মুহাম্মদের ধর্ম অধ্যয়ন করে আসছি উচ্চ ধারনার সহিত কারন ইহাতে আছে আশ্চর্যজনক মৌলিকত্ব, ইহাই একমাত্র ধর্ম যা আমার নিকট ধরা দিয়েছে একটি সুশংখল দক্ষতা সম্পন্ন যা চিরচরিত প্রথাকে পরিবর্তন করে সর্বযুগের জন্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে। বিশ্ব অবশ্যই নি:সন্দেহে এই ধর্মের মহান ব্যক্তির আদর্শকে নির্ণয় করবে আমরার মত, আমি ভবিষ্যৎবানী করতে পারি মুহাম্মদের বিশ্বাসের নিয়ে এই ধর্ম যে অদুর ভবিষৎ নিয়ে এ ইহা যেমন গুরুত্বের সাথে পূর্বে গ্রহণ যোগ্য ছিল তেমনি আজকের ইউরোপেও তেমনি গ্রহণ যোগ্য হবে। মধ্যযোগীয় খৃষ্টান পুরোহিতরা হয় তাদের অজ্ঞতা অথবা তাদের সংকীর্নবাদীতা দ্বারা মুহাম্মদের আদর্শকে অন্ধাকারের কালিতে কলংকিত করছে। তাহারা বস্তুত: দীক্ষা নিয়েছে মুহাম্মদ ও তাঁর ধর্মকে ঘৃণা করার। তাদের নিকট মুহাম্মদ ছিল খৃষ্টান বৈরী। আমি তাঁকে অধ্যয়ন করেছি, তিনি একজন আশ্চার্যজনক মানুষ এবং আমার মতে তিনি খৃষ্টান বৈরীতা থেকে অনেক দুরে, তাঁকে অবশ্যই একজন মানবতার মহানরক্ষক বর্ণনা যায়, আমি বিশ্বাস করি যদি তাঁর মত একজন মানুষ বর্তমান বিশ্বের একছত্রভাবে শাসন করত তবে সে সর্বসমস্যার সমাধান করতে পারত, যাতে আসত আকাংকিত শান্তি ও সুখ। ইউরোপে মুহাম্মদের দর্শন আকর্ষন করতে শুরু করেছে, পরবর্তী শতাব্দীতে ইহার মূলমন্ত্র আরও স্বীকৃতি লাভ করবে এবং ইহার প্রয়োজনীয়তা সকল সমস্যা সমাধানে সক্রিয় হবে এবং আমার এই উপলব্ধি তাদের নিকট প্রজ্জায়িত হবে।

ইতিমধ্যে বর্তমানে আমাদের অনেক মানুষ ও ইউরোপী বাসীরা এই ধর্ম বিশ্বাসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এবং বলা যায় ইউরোপে ইসলামীকরন শুরু হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

GEORGE BERNARD SHAW

Bernard Shaw in his 'Getting married,' 1929 edition, said, "I believe the whole of the British Empire will adopt a reformed Muhammadanism before the end of the century." When asked to confirm it, he said, "I have always held the religion of Muhammadin high estimation because of its wonderful vitality. It is the only religion which appears to me to possess that assimilating capability to the changing phases of existence which can make itself appeal to every age. The world must doubtless attach high value to the predictions of great men like me. I have prophesied about the faith of Muhammad that it would be acceptable to-morrow as it is beginning to be acceptable to the Europe of to-day. The Medieval ecclesistics, either through ignorance or bigotry, painted Muhammadanism in the darkest colours. They were, in fact, trained to hate both the man Muhammad was anti-Christ. I have studied him, the wonderful man and in my opinion far from being an anti-Christ he must be called the saviour of Humanity. I believe that if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world he would succeed in solving its problems in a way that would bring it the much-needed peace and happiness. Europe is beginnig to be enamoured of the creed of Muhammad. In the next century it may go still further in recognizing the utility of that creed in solving its problems and it is in this sense that you must understand my prediction.

Already even at the present time many of my own people and of Europe as well have gone over to the faith of Muhammad. And the Islamization of Europe may be said to have begun."

(সূত্র: ব্যারিষ্টার এস,এ, সিদ্দিকী Truth is Come Let Falsehood Disappear)

ট্রেগ্রাম

www.nagorikpathagar.org

মহাত্মা করম চাঁদ গান্ধী (১৮৫৯-১৯৪৮)

একমাত্র বিশুদ্ধ অহিংসাই ভারতের স্বাধীনতা আনবে

Quit India ভাষণ, ৮ই আগস্ট, ১৯৪২

আপনাদের সামনে রেজুলেশন বর্ণনার আগে আমাকে দু-একটি কথা বলতে দিন। আমি আপনাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলতে চাই এবং একই দৃষ্টিভঙ্গীতে তাদের (বৃটিশ) কেও বিবেচনা করতে বলি যা ইতি পূর্বে তাদেরকে অবহিত করেছিলাম। আমি আপনাদেরকে আমার দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিবেচনা করতে আহ্বান জানাই, কারণ আপনারা যদি সম্মত হন তবে আমার সমস্ত কথাই সহজে উপভোগ করতে পারবেন, তখন ইহা প্রধান দায়িত্বে পর্যবসিত হবে। জনগণ আমাকে প্রশ্ন করে, আমি কি এখন সেই ব্যক্তি যা ছিলাম ১৯২০ সালে অথবা আমার মতে কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা? আপনাদের সে প্রশ্ন করার অধিকার আছে।

যা হোক, আজ আমি বলছি, আমি ১৯২০ সালের মতই গান্ধী আছি। আমার কোন মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয় নাই। আমি আমার অহিংসা নীতিতে অটল যা আগেও ছিলাম। প্রকৃতপক্ষে ইহার প্রতি গুরুত্ব আরও দৃঢ় হয়েছে আমার বর্তমান সিদ্ধান্তের সহিত বিগত দিনের লেখা ও বলাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব সবার জন্যেই আসেনা কিন্তু কারো জীবনে হয়ত কদাচিৎ আসে। আমি আপনাদেরকে জানাতে ও অনুধারণ করাতে চাই যে পবিত্র অহিংসা ছাড়া আর কোন পথ নেই যা আজ বলছি এবং করছি। কার্যকরী পরিষদের খসড়া প্রস্তাবটি অহিংসার উপর ভিত্তি করে দাঁড় করানো এবং এই বুদ্ধিভিত্তিক আন্দোলন একইভাবে এই অহিংসার শিকাড়ে প্রোথিত। যদি এমন কেও থাকেন যারা অহিংসার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন বা ইহার প্রতি ভীত হয়েছেন, তাহারা এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিবেন না।

আজ আমাকে আমার অবস্থান পরিষ্কার করতে দিন। ঈশ্বর আমাকে সাদরে অহিংসার অমূল্য অস্ত্র উপহার দিয়েছেন। আমি এবং আমার অহিংসা আমাদের একই তিলকে গ্রন্থিত। চলমান এই দূর অবস্থায় যখন বিশ্ব অহিংসার আগুনে জ্বলছে এবং

www.nagorikpathagar.org

স্বাধীনতার জন্য চিৎকার করছে তখন আমরা ঈশ্বরের দেয়া প্রজ্ঞাকে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হচ্ছি। কিন্তু ঈশ্বর আমাদেরকে ক্ষমা করবে না যদি এই মহা–দানকে বিজ্ঞতার সাথে বিবেচনায় না নেই। আমাকে এখন এই কার্য্য–অবশ্যই করতে হবে।

আমাদের শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই, একমাত্র বিশুদ্ধ অহিংসাই ভারতের স্বাধীনতা আনবে। একটি সহিংস সংগ্রামের একজন কৃতকার্য সেনা নায়ক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা নিতে পারে কিন্তু ফলত: সে একজন একনায়কে পর্যবসিত হন। কিন্তু কংগ্রেসের উৎস ধারণা অহিংসার মধ্যেই কার্যকর এখানে এক নায়কের কোন স্থান নেই। একজন অহিংস স্বাধীনতার সৈনিকের নিজের জীবনের জন্য কোন চাওয়া পাওয়া থাকে না। সে শুধু দেশ ও স্বাধীনতার জন্যই সে নিবেদিত থাকে। কংগ্রেস নিশ্চিত করে নাই কে দেশ শাসন করবে বা কখন স্বাধীনতা আসবে। ক্ষমতা যখন আসবে সেটা ভারতবাসীর জন্যই আসবে, জনগণই নির্ধারণ করবে কে দেশের জন্য বিশ্বাসভাজন হবেন।

আমার বিশ্ব-ইতিহাসের উপর দখল আছে, সেখানে প্রকৃতপক্ষে সঠিক কোন স্বাধীনতার জন্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নজির নেই যা এখন আমরা করছি। আমি জেলের ভিতরে কারলাইলের ফরাসী রেজুলেশন পড়েছি, পন্ডিত নেহেরু আমাকে রাশিয়ার বিপ্লবের কথাও বলেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মোটের উপর এই সমস্ত বিপ্লব সমূহ সহিংস অস্ত্রের মাধ্যমে ঘটেছে এবং তাহারা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে। গণতন্ত্রের ভিতরের যে চিত্র আমি দেখি একটি গণতন্ত্র যা অহিংসার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে সবারই সমান স্বাধীনতা থাকে। সেখানে প্রত্যেকেই হবে তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রা, এটাই সেই গণতন্ত্র যাহাতে আপনাদের আজ অংশ গ্রহণ করতে আহ্বান জানাচ্ছি। একদিন আপনারা বুঝতে পারবেন, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য ভূলে যাওয়া এবং আপনারা আপনাদেরকে শুধুমাত্র ভারতীয় মনে করবেন। এবং সবাই একাত্রিত হয়ে স্বাধীনতার আন্দোলনে ব্রতী হবেন।

আজ আমাদের বৈরীতা বৃটিশ জনগণের সাথে নয় আমরা লড়াই করছি বৃটিশ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে। বৃটিশের পক্ষ হতে ক্ষমতা প্রত্যাহারের প্রস্তাব বৈরীতার মাধ্যমে আসবে না। আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মত্যাগের ও তার মূল্যবোধের পবিত্র প্রেরণাকে আহ্বান করতে পারি না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা স্বাধীনতা অর্জন না করতে পারছি।

আমাদেরকে অবশ্যই ঘৃনা করার মনোভাবকে শুদ্ধিকরণ করতে হবে। আমি নিজের কথা বলতে পারি যে, আমার কোন ঘৃনাবোধ নেই। সত্য কথা বলতে আমি আমাকে আগের যে কোন সময় থেকে বেশী বৃটিশ বন্ধু বলে মনে করি। ইহার একটি কারণ, যে তাহারা এখন খুবই বিধ্বস্ত। আমার ব্যাপক সৈহার্দ্যতা দাবী করে যে

www.nagorikpathagar.org

আমাদেরকে তাদের ভুল পদক্ষেপ থেকে রক্ষা করতে হবে। দৃশ্যমান পরিস্থিতিতে তারা এখন নরকের কিনারায়। ইহা ফলত: আমাকে এমন এক দায়িত্বের কথা বলে, যা তাদেরকে এক অনাহুত বিপদ থেকে সাবধান করবে। এ সময় বৈরীতা বন্ধুত্বকে ছিন্ন করবে এবং তাদের সহযোগীতা মূলক কর্মকান্ড প্রলম্বিত হবে। একথায় জনগণ হয়ত হাসবে তথাপি এটাই আমার দাবী। যথা সময়ে যখন আমি আমার জীবনের আন্দোলনের তরী ভাসাবে। তখন আমি যেন সেই তরী কোন ঘৃনার বন্দরে নোঙ্গর না করি। (সংক্ষেপিত)

গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ (১১ সেপ্টেম্বর, ১৯০৬) একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। ঐতিহাসিক পদক্ষেপ এই অর্থে যে সাম্রাজ্যবাদী য়ুরোপ সেদিন অহিংস সত্যাগ্রহ সে আবার কি জিনিস-এমন একটা হাসিঠাট্টায় এত বড় বিষয়কে পাতলা করে এনেছিল। কিন্তু মাত্র একটা বছর ফুরিয়ে আসতে না আসতেই য়ুরোপ-আমেরিকার ধনতন্ত্রবাদী মানুষ উপলব্ধি করতে আরম্ভ করল যে নেহাতই আগুন বোমা নিয়ে শান্তিপ্রিয় অহিংস মানুষকে বেশিদিন দাবিয়ে রাখা যায় না। ওদের অস্ত্রাগারে যখন মারণাস্ত্র পাইলআপ করে তখন আমাদের দরিদ্র জীবনে, কর্ষণভূমিতে, প্রতিদিনের জীবনসংগ্রামে শিশু-যুবক-বৃদ্ধা কণ্ঠে গান্ধীনাম তুলে নিয়েছিল। চারিদিকে এক বিশাল মানব ঐক্য। ওরা বলছে: অহিংস অসহযোগ আমাদের মন্ত্র। এ মন্ত্র উচ্চারণ করতে কোন মানুষের আপত্তি হতে পারে না। একেই বলতে হয় উদ্বোধন থেকে উত্তরণ। আফ্রিকায় মানবজাতির উদ্বোধনের সূচনা। আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষ এবং সমগ্র পৃথিবীতে মানুষ বলছে হিংসার প্রভূত অস্ত্র দিয়ে সে নিজেকে রক্ষা করতে পারল না। এবার যন্ত্রের সঙ্গে মন্ত্র চাই। সেই মন্ত্র হল সত্যাগ্রহের। শান্তির, অহিংসার, দুঃসাহসের সম্মিলিত প্রকাশ হল সত্যাগ্রহ। ভয় থেকে অভয়ে যাত্রা। গান্ধী বহু বহু বছর আগে স্পষ্ট করে বলেছিলেন Civilization and Conscience। ওই সঙ্গে বলতে ভুলে যাননি যে অর্থনীতির সঙ্গে নৈতিক উন্নতি হওয়া চাই।

এখানে বলে নেয়া দরকার, এমন একটি জীবনদর্শন তো একদিনে গড়ে ওঠেনি। আমি গড়ে ওঠার দু-একটা নমুনা দিচ্ছি। তারপর চলে যাব আমাদের আসল বিষয়ে। জগৎজুড়ে দেখা যাচ্ছে রাজনীতি এবং ধর্ম-এ যেন কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করা যাচ্ছে না। চূড়ান্ত দারিদ্র্য-তার সহায় তো অবশ্যই ধর্ম, ধর্মযাজক, ধর্মব্যবসায়ী সবাই। গান্ধী জানতেন ধর্ম পরিহার করে কেবল রাজনীতি? ভয়ানক তার পরিণতি। কিন্তু গান্ধী বিশ্বা করতেন তাঁর ভাষায় Spiritualising political life হল এই সমস্যার সমাধান অর্থাৎ আপনার নৈতিক মূল্যবোধ আপার রাজনৈতিক ধারণাকে গড়ে তুলবে। এটাই আসলে শেষ পর্যন্ত আধ্যাত্মিকায় পৌঁছে যায়। ধর্মের ও মনুষ্যজীবনের সম্পর্ক আরম্ভ হোক এখান থেকে-গান্ধী সারাজীবন তাই চেয়েছেন। যেমন অহিংসা বলতে গান্ধী বুঝেছেন একটি মানুষ তার প্রেম ও সম্প্রীতি সকলের প্রতি সম্প্রসারিত করে দেবে। এই পথেই অহিসংসা সার্বজনীন হয়ে উঠবে। ব্যাখ্যা করে বলতে হয় গান্ধী 'a larger common good'-এর প্রতি আমাদের সৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। তাহলে অহিংসার অর্থ হল `a will-ingness to treat all beings as oneself। সেই জন্যই গান্ধী বার বার অহিংসাকে creed বলেছেন।

www.nagorikpathagar.org

অন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি করছেন স্বামী বিবেকানন্দ। শিকাগোর পথে যাত্রা করেছেন-সঙ্গে সন্ন্যাসী বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা ভাই তোমরা ধর্ম বলতে কি বোঝ? আমি তো কিছুই বুঝি না। আমি দেখছি প্রতিদিন আমার হৃদয় বড় হয়ে উঠছে।' অর্থাৎ কবির ভাষায় সবারে আমি করি আহ্বান। একই বাণী শুনতে পাওয়া যাবে ইবনে আল আরাবির কবিতায়:

My heart has become capable of
every form,
It is a pasture for gazelles and
convents for Christian monks.
And a temple for idols and the
pilgrim's Kaba
And the tables for Torah and the
book of the Quran
I follow the religion of love:
whatever way
Love's camels take, that is my
religion and my faith.
I follow the religion of love-

এই হল অহিংস সত্যাগ্রহীর ধর্ম। হ্যাঁ, সত্যাগ্রহ একজন করে না, একটি সুসংবদ্ধ গোষ্ঠী সত্যাগ্রহ আন্দোলন করে। বহু মানুষের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠা করা সত্যাগ্রহের কাজ।

(সূত্র: ভারত বিচিত্রা, হোসেনুর রহমান)

মহমা গান্ধীর একটি বাণী

"আমি কুরানের শিক্ষা সমূহের উপরে গবেষণা করে এ সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে, কোরুন নাজিলকৃত আসমানি কিতাব এবং এর শিক্ষা সমূহ মানব সমাজর সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল।

www.nagorikpathagar.org

ভ.ই. লেনিন (১৮৭০-১৯২৪)

রাষ্ট্র

সভের্দলভ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা, ১১ই জুলাই, ১৯১৯

রাষ্ট্রের প্রশ্নকে, অন্য যেকোন প্রশ্নের মতোই- উদাহরণস্বরূপ, পুঁজিবাদের উৎস, মানুষ কর্তৃক মানুষের উপর শোষণ, সমাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র কিভাবে উদ্ভূত হলো, কি অবস্থায় সমাজতন্ত্রর উদ্ভব ঘটলো, ইত্যকার প্রশ্নকে গভীরভাবে ও নির্ভরযোগ্যভাবে দেখা যেতে পারে একমাত্র যদি আমরা সমগ্রভাবে রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক বিকাশ ধারার ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। এই সমস্যা সূত্রে প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, রাষ্ট্র সব সময় বিদ্যমান ছিল না। এমন একটা সময় ছিল যখন কোন রাষ্ট্র ছিল না। যখন ও যেখানেই বিভিন্ন শ্রেণীতে সমাজের বিভক্তি দেখা দেয়, যখন শোষক ও শোষিতের আবির্ভাব ঘটে, তখন ও সেখানেই রাষ্ট্রেরও আবির্ভাব ঘটে।

মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণের প্রথম রূপ দেখা দেয়ার পূর্বে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভক্তির প্রথম রূপ- দাস-মালিক ও দাস- দেখা দেয়ার পূর্বে বিদ্যমান ছিল পিতৃতান্ত্রিক পরিবার, কিংবা, কোন কোন সময় বলা হয় ক্ল্যান পরিবার (ক্ল্যান-গোত্র বা পারিবারিক গোষ্ঠী, যখন মানুষ আত্মীয়তা বা কুল অনুসারে একত্রে বসবাস করতো)। বহু আদিম জাতির জীবনে এসব আদিম যুগের বেশ পরিমাণ নির্দিষ্ট ছাপ এখনও টিকে আছে; এবং আদিম সভ্যতা সম্পর্কে কোন রচনার যেকোনটিই আপনারা দেখুন না কেন, সব সময়ই আপনারা এই বাস্তব তথ্যের কমবেশী সুনির্দিষ্ট বর্ণনা, উল্লেখ ও স্মৃতি-বিবরণ পাবেন যে, এমন এক সময় ছিল যখন দাস ও দাস-মালিকে সমাজের বিভক্তি বিদ্যমান ছিল না, যা ছিল কমবেশী আদিম সাম্যবাদের অনুরূপ। আর সে যুগে কোন রাষ্ট্র ছিল না, নিয়মানুগ বলপ্রয়োগের ও বলপ্রয়োগের মারফৎ জনগণকে অধীন করে রাখার কোন বিশেষ যন্ত্র ছিল না। এরূপ এক যন্ত্রকেই বলা হয় রাষ্ট্র।

আদিম সমজে, মানুষ যখন ছোট ছোট পারিবারিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে বসবাস করত এবং তখনও ছিল ক্রমবিকাশের নিম্নতম পর্যায়ে, এমন এক অবস্থায় যা বর্বরতার সমতুল্য- এমন এক কাল যার সাথে আধুনিক সভ্য মানব সমাজের রয়েছে কয়েক হাজার বছরের ব্যবধান- তখন রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কোন চিহ্নই ছিল না। সেখানে

www.nagorikpathagar.org

আমরা দেখতে পাই রীতি-প্রথা, গোত্রের প্রবীণদের দ্বারা ভোগকৃত কর্তৃত্ব, শ্রদ্ধা ও ক্ষমতার প্রধান্য; দেখাতে পাই মাঝে মাঝে মেয়েদের কাছে সে ক্ষমতা প্রদত্ত হয়েছে-সে সময়ে মেয়েদের অবস্থান আজকের মেয়েদের পদানত ও উৎপীড়িত অবস্থার মত ছিল না। কিন্তু কোথাও আমরা দেখতে পাই না এমন বিশেষ বর্গের লোক যাদেরকে অন্যদের উপর শাসন চালাবার জন্যে পৃথক করে রাখা হয়েছে এবং শাসনের খাতিরে ও উদ্দেশ্যে যাদের হাতে রয়েছে নিয়মানুগ ও স্থায়ীভাবে বলপ্রয়োগের নির্দিষ্ট যন্ত্র, হিংসা প্রয়োগের যন্ত্র, যা বর্তমান কালে, আপনারা সবাই বুঝতে পারেন, প্রতিনিধিত্বশীল হয়ে ওঠে সশস্ত্র সেনাবাহিনী, জেল ও বলপ্রয়োগের দ্বারা অন্যের ইচ্ছাকে দাবিয়ে রাখার অন্যান্য পন্থা দ্বারা- এদের সবগুলোই গঠন করছে রাষ্ট্রের অন্ত বস্তু।

তথাকথিত ধর্মীয় জ্ঞান-শিক্ষা, বুর্জোয়া পন্ডিতদের দ্বারা তুলে ধরা সূক্ষ্ম বাক-চাতুরী, দার্শনিক যুকিতর্ক ও বিভিন্ন মতামত থেকে যদি আমরা নিজেদেরকে দূরে রাখি, যদি এগুলো থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রেখে বিষয়টির প্রকৃত অন্তর্বস্তুতে প্রবেশ করার প্রচেষ্টা নিই, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষেই হচ্ছে এমন এক শাসন-যন্ত্রের সমতুল্য যা সমগ্রভাবে মানব সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। যখন এমন এক বিশেষ ধরণের লোক দেখা দেয় যাদের একমাত্র কাজ হলো শাসন-কর্মে নিয়োজিত থাকা, অন্য কোন কিছু নয়, আর শাসন করার জন্যে যাদের দরকার দমন-পীড়নের এবং বলপ্রয়োগের দ্বারা অন্যদের ইচ্ছাকে আয়ত্তে রাখার বিশেষ যন্ত্র- কারাগার, বিশেষ বাহিনী, সৈন্য দল ইত্যাদি। তখনই দেখা দেয় রাষ্ট্র।

কিন্তু এমন একটা সময় ছিল যখন কোন রাষ্ট্র ছিল না, যখন সাধারণ বন্ধন, সমাজ নিজে, তার শৃংখলা ও কর্মবিন্যাস বজায় থাকতো রীতিনীতি ও ঐতিহ্য-প্রথার শক্তি দ্বারা; কিংবা সেই কর্তৃত্ব ও মর্যাদা দ্বারা যা গোষ্ঠীর প্রবীণরা কিংবা মেয়েরা ভোগ করতো- সেসব যুগে মেয়েরা যে প্রায়শই পুরুষের সমান মর্যাদা লাভ করতো তাই নয়, বরং অনেক সময় তারা এমনকি অধিকতর মর্যাদাও ভোগ করতো- এবং যখন ছিল না শাসন কার্যে বিশেষজ্ঞ কোন বিশেষ ধরনের লোক। ইতিহাস দেখিয়ে দেয় যে, যখন ও যেখানেই সমাজে শ্রেণী বিভাগ দেখা দিয়েছে, অর্থাৎ মানুষের মধ্যে এমন একটা বিভক্তি দেখা দিয়েছে যেখানে তাদের কেউ কেউ অন্যের শ্রম আত্মসাৎ করার মতো অবস্থান স্থায়ীভাবে লাভ করেছে, যেখানে কিছু লোক অন্যদের শোষণ করছে, সেখানেই মানুষের উপর দমন-পীড়নের এক বিশেষ যন্ত্র হিসেবে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে।

আর বিভিন্ন শ্রেণীতে সমাজের এই শ্রেণী-বিভক্তিকে সব সময় অবশ্যই পরিস্কারভাবে মনে রাখতে হবে ইতিহাসের এক মৌলিক বাস্তব ঘটনা হিসেবে। হাজার

www.nagorikpathagar.org

হাজার বছর ধরে, ব্যতিক্রমহীনভাবে সকল দেশেই, সকল মানব সমাজের ক্রমবিকাশ একটি সাধারণ সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়ম, এই ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে একটি ধারাবাহিকতা ও সুসঙ্গতিকে তুলে ধরে; যাতে দেখা যায় প্রথমে ছিল শ্রেণীহীন সমাজ- আদি পিতৃতান্ত্রিক সমাজ, আদিম সমাজ, যেখানে ছিল না কোন অভিজত; তারপর আমরা পাই দাস প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত এক সমাজ-দাস মালিকানার সমাজ। গোটা আধুনিক সভ্য ইউরোপই এই স্খরের মধ্য দিয়ে পার হয়েছে-দু' হাজার বছর আগে দাস-প্রথাই ছিল একক আধিপত্য। পৃথিবীর অন্যান্য অংশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিও এই স্তরের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। কম উন্নত জাতিসমূহের মধ্যে আজও দাস-প্রথার চিহ্ন টিকে আছে; উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান সময়েও আপনারা আফ্রিকায় দাস-প্রথার বিধান দেখতে পারবে। দাস-মালিক ও দাস- এটাই হলো প্রথম গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী-বিভক্তি। প্রথমোক্তরা কেবল যে সমস্ত ধরনের উৎপাদন-যন্ত্রের-জমি আর হাতিয়ারের, তখনকার দিনে যতই আদিম সেগুলো হোক না কেন- মালিক ছিল তা নয়, বরং তারা ছিল মানুষেরও মালিক। এই দলকে বলা হত দাস-মালিক, অন্যদিকে যারা মেহনত করত এবং অন্যদের জন্যে শ্রম যোগান দিত তাদেরকে বলা হত দাস।

এই রূপের পর ইতিহাসে দেখা যায় শ্রেণী-বিভক্তির আরেক রূপ- সামন্ততন্ত্র। বেশীর ভাগ দেশেই দাস-প্রথা তার বিকাশের গতিপথে ভূমিদাস-প্রথায় বিবর্তিত হয়। এখন সমাজের মৌলিক বিভক্তি হয়ে দাঁড়ায় সামন্ত জমিদার ও কৃষক ভূমিদাস। মানুষে মানুষে সম্পর্কের ধরন বদলে যায়। দাসদের মনে করতো তাদের সম্পত্তি; আইনও এই মতকে পুরোপুরি নিশ্চয়তা প্রদান করতো এবং দাসদের বিবেচনা করতো দাস-মালিকদের পুরোপুরি মালিকানাভূক্ত এক অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে। কৃষক ভূমিদাসদের সম্পর্কে বলতে গেলে, শ্রেণী-নিপীড়ন ও অধীনতা বহাল থেকে গেল বটে, কিন্তু এ কথা মনে করা হতো না যে, কৃষকরা অস্থাবর সম্পত্তির মতো সমস্ত-জমিদারদের মালিকানাধীন, বরং জমিদার কেবলমাত্র তাদের শ্রমের মালিক এবং নির্দিষ্ট কিছু কাজ করতে জমিদার তাদের বাধ্য করতে পারে। বাস্তবতঃ আপনারা যেমন জানেন, বিশেষ করে রাশিয়ায় ভূমিদাসত্ব কোনক্রমেই দাসত্ব থেকে ভিন্ন ছিল না, যেখানে ভূমিদাসত্ব সবচেয়ে বেশী দিন স্থায়ী ছিল এবং সবচেয়ে স্থূল রূপ ধারণ করে।

তারও পরেও, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি বিশ্ব বাজারের অভ্যুদয় এবং মুদ্রা-সঞ্চলনের বিকাশ ঘটার সাথে সাথে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অভ্যন্তরে এক নোতুন শ্রেণীর-পুঁজিপতি শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। পণ্য, পণ্যের বিনিময় এবং টাকার ক্ষমতার উত্থান থেকে উত্থিত হলো পুঁজির ক্ষমতা। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বরং বলা উচিৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দী ধরে- সমস্ত বিশ্ব জুড়ে ঘটলো

www.nagorikpathagar.org

বিপ্লব। পশ্চিম ইউরোপের সকল দেশেই সামন্ততন্ত্রের ঘটলো উচ্ছেদ। রাশিয়ায় তা সবচেয়ে দেরিতে ঘটলো। ১৯৬১ সালে রাশিয়াতেও এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটলো, যার ফলশ্রুতিতে এক রূপের সমাজের বদলে আরেক রূপের সমাজ আসলো– সামন্ত তন্ত্রের স্থলাভিষিক্ত হলো পুঁজিবাদ, যে ব্যবস্থাধীনে শ্রেণী বিভক্তি বজায়ই থাকলো, সাথে সাথে থেকে গেল ভূমিদাসত্বের নানা চিহ্ন ও ধ্বংসাবেশেষ, কিন্তু যেখানে শ্রেণী–বিভক্তি মৌলিকভাবেই নোতুন রূপ পরিগ্রহণ করলো।

রাষ্ট্র হলো এক শ্রেণীর উপর অন্য শ্রেণীর শাসন বজায় রাখার যন্ত্র। যখান সমাজে কোনও শ্রেণী ছিল না, যখন দাসতান্ত্রিক যুগের আগে অধিকতর সমতার আদিম অবস্থায় মানুষ শ্রম করতো, এমন এক অবস্থায় যখন শ্রমের উৎপাদনী ক্ষমতা ছিল তখনও তার নিম্নতম স্তরে, যখন আদিম মানুষ সবচেয়ে আদিম অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিছক কোনক্রমেই ব্যবস্থা করতো তখন গোটা সমাজের উপর শসন ও প্রভুত্ব করার জন্য বিশেষভাবে বিচ্ছিন্ন এক বিশেষ ধরনের লোকেরও উদ্ভব ঘটেনি, আর তার উদ্ভব ও ঘটতে পারতো না। শুধুমাত্র যখন সমাজে শ্রেণী-বিভক্তির প্রথম রূপ দেখা দিল, যখন দাসতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটলো, যখন সবচেয়ে আদি ধরনের কৃষি-শ্রমের উপর সমস্ত প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করে, একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর লোক এক নির্দিষ্ট পরিমাণ উদ্বৃত্ত উৎপাদন করতে পারলো, যখন দাসদের অত্যন্ত হীন জীবন যাপনের জন্যে এই উদ্বৃত্ত আর একান্তই অপরিহার্য ছিল না এবং তা দাস–মালিকদের হাতেই গেল, যখন এভাবে ই দাস–মালিক শ্রেণীর অস্তিত্ব শক্ত শেকড় গাড়লো– কেবলমাত্র তখনই তাদের পাকাপোক্ত অস্তিত্ব কায়েমের জন্য রাষ্ট্রের উদ্ভব নিতান্তই অপরিহার্য হয়ে পড়লো।

প্রাচীন কালের ইতিহাসের উপর প্রতিটি পাঠ্যসূচীর ক্ষেত্রে, এই বিষয়ের উপর যেকোন বক্তৃতায়, আপনারা রাজতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক রষ্ট্রের মধ্যে পরিচালিত সংগ্রামের কথাই শুনবেন। কিন্তু মৌলিক ঘটনা হলো এই যে, দাসদের মানুষ বলেই গণ্য করা হতো না– তাদেরকে কেবল যে নাগরিক হিসেবেই বিবেচনা করা হতো না তাই নয়, তাদেরকে মানুষের মধ্যেই ধরা হতো না। রোমান আইন তাদের অস্থাবর সম্পত্তি বলেই মনে করতো। ব্যক্তির নিরাপত্তা রক্ষার অন্য সমস্ত আইন– কানুনের কথা না হয় বাদই দিলাম, নরহত্যার আইনও দাসদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হত না। আইন কেবলমাত্র দাস–মালিকদেরই রক্ষা করতো, তারাই কেবল পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করতো। কিন্তু রাজতন্ত্রই প্রতিষ্ঠা লাভ করুক কিংবা প্রজাতন্ত্রই প্রতিষ্ঠা লাভ করুক কিংবা প্রজাতন্ত্রই প্রতিষ্ঠা লাভ করুক– তা ছিল দাস–মালিকদের রাজতন্ত্র কিংবা দাস–মালিকদের প্রজাতন্ত্র। যেসব রাষ্ট্রে অধিকারই ভোগ করতো দাস–মালিকরা, অন্যদিকে আইনের চোখে দাস ছিল অস্থাবর সম্পত্তি, তাদের উপর

www.nagorikpathagar.org

যেকোন ধরনের হিংস্রতাই কেবল যে প্রয়োগ করা যেতো তাই নয়, এমনকি দাসকে খুন করাটাও অপরাধ বলে গণ্য করা হতো না। দাস-মালিক প্রজাতন্ত্রগুলো তাদের অভ্যন্তরীণ সংগঠনের দিক দিয়ে বিভিন্ন রকম হতোঃ অভিজাততান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রও ছিল, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রও ছিল। অভিজাততান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে স্বল্প-সংখ্যক বিশেষ সুবিধাভোগী লোক নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতো; গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে প্রত্যেকেই নির্বাচনে অংশ নিত- কিন্তু সবাই মানে কেবল দাস-মালিকরা, অর্থাৎ দাস ছাড়া সবাই। এই মৌলিক তথ্যটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে, কারণ এই তথ্যটিই অন্য যেকোন প্রশ্নের চেয়ে রাষ্ট্র সম্পর্কিত প্রশ্নে অধিক আলোকপাত করে এবং সুস্পষ্টভাবে রাষ্ট্রের প্রকৃতিটি প্রদর্শন করে।

রাষ্ট্র হলো এক শ্রেণী কর্তৃক অন্য শ্রেণীর উপর নিপীড়নের যন্ত্র, অন্য শ্রেণীগুলোকে অর্থাৎ পদানত শ্রেণীগুলোকে একটি শ্রেণীর আনুগত্যাধীন রাখার যন্ত্র। এই যন্ত্রের রয়েছে বিভিন্ন রূপ। দাস-মালিক রাষ্ট্রে আমরা দেখেছি রাজতন্ত্র বা অভিজাততান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, কিংবা এমনকি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রও। প্রকৃতপক্ষে, সরকারের ধারণ চূড়ান্তভাবেই বহু রূপের ছিল, কিন্তু তাদের অন্তর্বস্তু সব সময় ছিল একইঃ দাসরা কোনরূপ অধিকার ভোগ করতে না, তারা ছিল নিপীড়িত শ্রেণী; তাদের মানুষ বলে গণ্য করা হতো না। সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রেও আমরা একই জিনিস দেখতে পাই।

শোষণের রূপের ক্ষেত্রে পরিবর্তন দাস-মালিক রাষ্ট্রকে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করে। এটা ছিল সুবিপুল গুরুত্বের বিষয়। দাস-মালিক সমাজে দাসরা কোন অধিকারই ভোগ করতো না এবং মানুষ হিসেবে গণ্য হতো না; সামন্ততান্ত্রিক সমাজে কৃষক জমির সাথে বাঁধা। ভূমিদাসত্বের মূল বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন ছিল এই যে, কৃষকদের (আর সে যুগে কৃষকরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ; শহরের লোক-সংখ্যা ছিল সবচেয়ে কম বিকশিত) জমির সাথে বাঁধা বলে মনে করা হতো- এ থেকেই ভূমিদাসত্ব ধারণাটি এসেছে। জমিদারদের দ্বারা বরাদ্দকৃত নির্দিষ্ট জমিতে নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন কৃষকরা নিজেদের জন্যে কাজ করতে পারতো; বাকি দিনগুলোতে কৃষক-ভূমিদাসকে তার প্রভুর জন্য খাটতে হতো। শ্রেণী-সমাজের সারবস্তুটি থেকে গেল; শ্রেণী শোষণের উপরই সমাজ প্রতিষ্ঠিত থাকলো। কেবলমাত্র জমিদাররাই সকল অধিকার ভোগ করতো; কৃষকদের কোন অধিকারই ছিল না। বাস্তবে দাস-মালিক রাষ্ট্রে দাসদের অবস্থা থেকে তাদের অবস্থার খুব কমই পার্থক্য ছিল। তথাপি তাদের মুক্তির জন্য, কৃষকদের মুক্তি অর্জনের জন্য আরো প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত হলো, কৃষক-ভূমিদাসকে জমিদারদের সরাসরি সম্পত্তি বলে মনে করা হতো না। সে তার কিছুটা সময় তার

নিজের জমিতে কাজ করতে পারতো, বলা যায়, নির্দিষ্ট পরিমাণে তার নিজের কিছুটা সত্তা ছিল; বিনিময় ও বাণিজ্য সম্পর্কের বিকাশের বৃহত্তর সুযোগ সৃষ্টির সাথে সাথে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্রমান্বায়ে ভেঙে পড়তে থাকলো এবং কৃষকদের মুক্তির পরিধি ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকলো। সামন্ত্মতান্ত্রিক সমাজ সব সময়ই দাসতান্ত্রিক সমাজের চেয়ে অধিকতর জটিল। ব্যবসা ও শিল্পের বেশ পরিমাণ। বিকাশ হয়েছিল, যা এমনকি সে যুগেই ঘটিয়েছিল পুঁজিবাদের সূচনা। মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রেরই ছিল প্রাধান্য। আর এখানেও আমরা পাই রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র, যদিও শেষেরটির প্রকাশ ছিল খুবই দুর্বল। কিন্তু সব সময়ই সামন্ত জমিদারকে একমাত্র শাসক বলে মনে করা হতো। কৃষক–ভূমিদাসরা চূড়ান্তভাবেই সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার থেকে ছিল বঞ্চিত।

ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ, পণ্য-বিনিময়ের বিকাশ সাধন এক নতুন শ্রেণী-পুঁজিপতি শ্রেণীর আবির্ভাবের দিকে চালিত করলো। মধ্যযুগের সমাপ্তির দিকে পুঁজির উদ্ভব ঘটলো, যখন আমেরিকা আবিস্কারের পডর বিশ্ব বাণিজ্য বিপুলভাবে বেড়ে গেল, যখন মহামূল্যবান ধাতুর পরিমাণ বেড়ে গেল, যখন রূপা ও সোনা হয়ে দাঁড়াল বিনিময়ের মাধ্যম, যখন মুদ্রা-সঞ্চালন বিশেষ ব্যক্তিদের পক্ষে বিপুল সম্পদ ধারণ করাটা সম্ভব করে তুললো। সমগ্র বিশ্ব জুড়েই রূপা ও সোনাকে সম্পদ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হলো। জমিদার শ্রেণীর অর্থনৈতিক ক্ষমতা কমে যাচ্ছিল আর নোতুন শ্রেণী-পুঁজির প্রতিনিধিদের- ক্ষমতা বাড়তে থাকলো। সমাজের পুনর্গঠন এরূপ হয়ে দাঁড়ালো যেন সকল নাগরিক সমান বলে মনে হলো, দাস-মালিক ও দাসের পুরানো শ্রেণী-বিভাগ তিরোহিত হয়ে গেল, প্রত্যেকের পুঁজির মালিকানা নির্বিশেষে সকলেই আইনের চোখে সমান বলে বিবেচিত হলো; ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে একজন জমির মালিকই হোক, কিংবা নিজের শ্রম করার ক্ষমতা ছাড়া নিঃস্ব ভিখারীই হোক - আইনের চোখে সবাই সমান হয়ে দাঁড়ালো। আইন প্রত্যেককে সমানভাবেই রক্ষা করে: যে জনগণের কোন সম্পত্তি নেই, শ্রম শক্তি ছাড়া যারা আর কিছুর অধিকারী নয়, যারা ক্রমান্বয়েই দরিদ্র ও ধবংশ হয়ে পড়ে এবং সর্বহারায় রূপান্ত্মরিত হয়ে পড়ে তাদের আক্রমণের হাত থেকে সম্পত্তিবানদের সম্পত্তিকে আইন রক্ষা করে। এই হলো পুঁজিবাদী সমাজ।

রাষ্ট্রের প্রভুত্বের রূপ বিভিন্ন রকম হতে পারে ঃ এক বিশেষ ধরনের রূপ যেখানে বিরাজমান সেখানে পুঁজির ক্ষমতার প্রকাশ একভাবে, অন্য বিশেষ ধরনের যেখানে বিদ্যমান সেখানে তার প্রকাশ অন্যভাবে -কিন্তু অপরিহার্যরূপে ক্ষমতা পুঁজির হাতে থাকে, তা সে নিয়ন্ত্রিত ভোটাধিকারই থাকুক আর না থাকুক, কিংবা প্রজাতন্ত্রটি গণতান্ত্রিক হোক আর না হোক – প্রকৃতপক্ষে প্রজাতন্ত্র যত বেশী গণতান্ত্রিক হয় পুঁজিবাদের শাসন তন্ত্র বেশী স্থুল ও নিন্দার্হ। দুনিয়াতে সবচেয়ে গণতান্ত্রিক

www.nagorikpathagar.org

প্রজাতন্ত্রগুলোর একটি মর্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথাপি পুঁজি ক্ষমতা, সমগ্র সমাজের ওপর মুষ্টিমেয় কয়েকজন কোটিপতির ক্ষমতা আমেরিকার মতো আর কোথাও এত স্থূল এবং এত খোলাখুলিভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে ওঠে (১৯০৫ সালের পর যারা সেখানে থেকেছেন তাঁরা সম্ভবত এ কথা জানেন)। পুঁজি এক অস্তিত্বশীল হয়ে উঠলে সমগ্র সমাজের ওপর তা প্রভূত্ব কায়েম করে, আর কোন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বা কোন রূপের ভোটাধিকারই বিষয়টির সারবস্তুকে বদলাতে পারে না।

সমাজতন্ত্রের তুলনায় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও সর্বজনীন ভোটাধিকার ছিল এক বিপুল প্রগতিশীল অগ্রগতি ঃ সেগুলো সর্বহারাশ্রেণীকে সক্ষত করে তুলেছে তার বর্তমান ঐক্য সংহতি অর্জন করায়, পুঁজির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সংগ্রাম পরিচালনাকারী দৃঢ়বদ্ধ ও সুশৃংখল সারি গড়ে তোলায়। দাসদের কথা ছেড়ে দিলেও, কৃষক–ভূমিদাসদের মধ্যে এমনকি এর প্রথম সদৃশ কিছু ছিল না। দাসরা বিদ্রোহ করেছে, দাঙ্গা করেছে, গৃহযুদ্ধ শুরু করেছে, তা আমরা জানি, কিন্তু কখনও এক শ্রেণী-সচেতন সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংগ্রাম পরিচালনা করার মতো গড়ে তোলা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কি তাদের লক্ষ্য তা তারা উপলব্ধি করতে পারেনি আর এমন কি ইতিহাসের সবচেয়ে বিপ্লবী মুহূর্তেও তারা সব শাসক শ্রেণীর হাতে বোড়ে হয়েই থেকেছে। বিশ্ব সমাজ বিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র, পার্লামেন্ট সর্বজনীন হলো, আর একমাত্র পুঁজিবাদই কেবল, শহুরে সংস্কৃতির কারণে, সক্ষম করে তুলতে নিপীড়িত সর্বহারা শ্রেণীকে নিজেকে চিনতি শিখতে ও বিশ্বব্যাপী শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে, সমস্ত পৃথিবী জুড়েই লক্ষকোটি শ্রমিক সংগঠিত হলো পার্টিতে –সমাজতান্ত্রিক পার্টিতে, যে পার্টিগুলো সচেতনভাবে জনগণের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিচ্ছে। পার্লামেন্টবাদ ছাড়া, নির্বাচনী ব্যবস্থা ছাড়া, শ্রমিক শ্রেণীর এই অগ্রগতি হয়ে দাঁড়াতো অসম্ভব। সে কারণেই এসব সকল জিনিস ব্যাপক জনগণের দৃষ্টিতে এত বিপুল গুরুত্ব অর্জন করেছে। সে কারণেই মৌলিক পরিবর্তন এত কঠিন বলে মনে হয়। রাষ্ট্রে আছে স্বাধীনতা এবং সকলের স্বার্থকে রক্ষ করাই তার পবিত্র উদ্দেশ্য– এই বুর্জোয়া মিথ্যাচারটি কেবল যে জ্ঞানপাপী, বিজ্ঞানী ও পুরোহিতরাই তুলে ধরে ও সমর্থন করে তা নয়, বরং যারা পুরানো কুসংস্কারকে মনে প্রাণে আঁকড়ে থাকে ও যারা পুঁজিবাদী সমাজ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণকে বুঝতে পারে না, সেই সব বহু লোকও তা করে থাকে। বুর্জোয়া শ্রেণীর উপর সরাসরিভাবে নির্ভরশীল লোকেরাই কেবল নয়, পুঁজির জোয়ালে নিপীড়িত কিংবা পুঁজির কাছ থেকে উৎকোচ লাভকারীরাই কেবল নয় (নানা ধরনের বিজ্ঞানী, শিল্পী, পুরোহিত ইত্যাদি বহু সংখ্যক লোকই পুঁজির সেবায় রয়েছে), [redacted]

www.nagorikpathagar.org

যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই সে এসব বুর্জোয়া মিথ্যাচারকে প্রত্যাখান করে এবং প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে ঃ তোমরা বলছ তোমাদের রাষ্ট্রে স্বাধীনতা আছে, কিন্তু বাস্তবে, যে পর্যন্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে সে পর্যন্ত, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হলেও, তোমাদের রাষ্ট্র শ্রমিকদের দমন করার জন্য পুঁজিবাদীদের হাতের যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়, আর সে রাষ্ট্র যত বেশী স্বাধীন, ততই তা সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হবে।

প্রজাতন্ত্র যে আবরণই ধারণ করুক না কেন, এমন কি তা সবচেয়ে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হলেও, যদি তা হয় এক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র, যদি তা জমি, মিল ও ফ্যাক্টরীর উপর ব্যক্তিমালিকানা বজায় রাখে, আর ব্যক্তিগত পুঁজি যদি গোটা সমাজকে মজুরী–দাসত্বে আবদ্ধ রাখে, অর্থাৎ, যদি আমাদের পার্টির কর্মসূচী ও সংবিধানে যা ঘোষণা করা হয়েছে তা যদি পালন না করে, তাহলে এই রাষ্ট্র হলো এক দল লোককে দমন করার জন্য অন্য দলের হাতের যন্ত্র। পুঁজির ক্ষমতা উচ্ছেদ করবে যে শ্রেণী আমরা তারই হাতে এই যন্ত্র তুলে দেব। রাষ্ট্র সম্পর্কে সর্বজনীন সমতা বিষয়ক সকল পুরানো কুসংস্কারকে আমরা ছুড়ে ফেলে দেব– কারণ তা হলো এক ভাঁওতাঃ যতদিন শোষণ বজায় থাকবে ততদিন কোন সমতা আসতে পারে না। জমিদার আর শ্রমিক সমান হতে পারে না, ভুখা মানুষ আর পেট ভরা মানুষ সমান হতে পারে না। রাষ্ট্র নামক যে যন্ত্রটির সামনে মানুষ কুসংস্কারমূলক সশ্রদ্ধ ভয়ে মাথা নীচু করে, সেই আষাঢ়ে গল্প বিশ্বাস করে যে, এ যন্ত্রের অর্থ হলো গণতান্ত্রিক শাসন– সেই যন্ত্রটিকে সর্বহারাশ্রেণী খারিজ করে দিয়ে ঘোষণা করে যে, এ হলো এক বুর্জোয়া মিথ্যাচার, সর্বহারাশ্রেণী এ যন্ত্রকে ধবংশ করে দেবে। আমরা পুঁজিপতিদের এ যন্ত্র থেকে অধিকারহারা করেছি এবং নিজেদের হাতে তা তুলে নিয়েছি। এই যন্ত্র বা মুগুর দিয়ে আমরা সকল শোষণকে খতম করে দেব। এবং দুনিয়ার কোথাও শোষণের কোন সম্ভাবনা যখন আর থাকবে না, যখন জমির মালিক ও কারখানার মালিক আর থাকবে না, কেউ আকণ্ঠ খাবে আর কেউ উপোস করবে– এই পরিস্থিতি যখন আর থাকবে না, যখন এসবের সম্ভাবনা আর থাকবে না, একমাত্র তখনই আমরা এই যন্ত্রটিকে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করবো। তখন কোন রাষ্ট্র থাকবে না, থাকবে না কোন শোষণ। এই হলো আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী। আমি আশা করি পরবর্তী বক্তৃতাগুলোতে আমরা এই বিষয়বস্তুতে ফিরে আসবো, ফিরে আসবো বারে বারে।

(সংক্ষেপিত)

(প্রথম প্রকাশ, ১৮ই জানুয়ারী, ১৯২৯, "প্রাভদা", ১৫শ সংখ্যা)

www.nagorikpathagar.org

নওয়াব স্যার সলীমুল্লাহ্ (১৮৭১-১৯১৫)

[১৯০৬ সালের ২৭শে ডিসেম্বর দিবা এগারটার সময় ঢাকার শাহবাগে 'অল-ইন্ডিয়া মোহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্স'-এর যে ২০তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতিরূপে প্রদত্ত নওয়াব সলীমুল্লাহর ভাষণঃ]

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

"আল-হামদু লিল্লাহি রব্বিল্ আলামীন্ ওয়াস-সালাতু ওয়াস্-সালামু আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ ওয়া-আলা আলিহিওয়া ওয়া-আস্হাবিহি আজ্মাঈন্ ওয়াল্-আকিবাতু লিল্ মুত্তাকীন্"

জনাব,

স্বাগত জানাবার পূর্বে আপনাদের শুভ ভবিষ্যত কামনা করেই এ দোয়াটি পাঠ করলাম। এর উদ্দেশ্য হলো- স্বজাতির উন্নতির জন্য আমরা যে সব চেষ্টা করে চলেছি, তাতে যেন আল্লাহ ও তাঁর পাক রসুল আমাদের সহায় হন। আমি নিজেকে এজন্য ভাগ্যমান মনে করছি যে, আপনাদের ন্যায় 'অল-ইন্ডিয়া এডুকেশন্যাল কনফারেন্স'-এর সম্মানিত ও উজ্জ্বল ধ্যান-ধারণাসম্পন্ন সদস্য পর্যবেক্ষক ও কর্মকর্তাদের স্বাগত জানাবার গুরুদায়িত্ব অভ্যর্থনা কমিটি আমার উপর অর্পণ করেছেন। আপনারা কষ্টস্বীকার পূর্বক সুদূর পথ সফর করে তাকায় পদার্পণ করেছেন; জাতীয় সহানুভূতিই আপনাদেরকে এখানে উপনীত করেছে; আপনাদের শুভাগমন আমাদেরকে উচ্চ সম্মানে ভূষিত করেছে। পূর্ব বাঙলার মুসলমানদের তরফ থেকে এজন্য আপনাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আমার পবিত্র দায়িত্ব। আমার বক্তব্য পেশ করার পূর্বেই মুর্শিদাবাদের মহামান্য নওয়াব বাহাদুর জি.সি.এস. আই-এর মর্মান্তিক মৃত্যু সম্পর্কে আপনাদের অবহিত করা আমি জরুরী বলে মনে করি। তাঁর মৃত্যুতে আমাদের জাতি শাহী খান্দানের একজন খ্যাতিমান সদস্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাঁর পুত্র অনারেবল ওয়াসিফ কদর ইউসুফ মির্জার উপর আমাদের ও ভরসা রয়েছে যে, তাঁর পিতার মৃত্যুতে আমাদের জাতীয় যে ক্ষতি হয়েছে, তা অপূর্ণ থাকবে না; মরহুম নওয়াবের বংশধরগণের সম্মান ও খ্যাতি ভবিষ্যতেও এখনকার মত অটুট ও উজ্জ্বল থাকবে।

বিগত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে কোন সময় আমরা তথা ঢাকার অধিবাসীরা স্বপ্নেও এটা ভাবতে পারি নি যে, আমাদের জাতীয় খ্যাতনামা শিক্ষিত ও সুধীবর্গের এত বড় একটি দল আমাদের অবস্থা দেখার জন্য ঢাকায় পদার্পণ করবেন। এটা আমাদের সৌভাগ্য। আপনাদেরকে এখানে পেয়ে আজ আমরা আনন্দিত। য়াকা শহর ভারতের সুদূর পূর্ব দিগন্তে অবস্থিত; দিল্লীর বাদশাগণ ও শহরকে তাঁদের রাজধানী করেছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

অর্ধ শতাব্দীরও পূর্বে এ শহরটি তার সকল অতীত গৌরব হারিয়ে ফেলে। সেই অতীত গৌরব ফিরে পাওয়া বা ভারতের অন্যতম বড় ও বিখ্যাত শহররূপে পুনরায় পরিগণিত হওয়ার কোন আশাও এর ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা অতীব মহান; তাঁর রহমত সার্বজনীন; তাঁর কাছে বাদশা-ফকীর সবাই সমান; যাকে চান, তাকে বাড়ান; যাকে চান, তাকে খর্ব করেন; আলো দানের পর রাতের অন্ধকার বিছিরেয় দেন; রাতের আঁধারের পর আবার দিনের ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করেন। ঢাকা শহরের উত্থান পতনের ইতিহাস এই মর্ম কথারই প্রতিধ্বনি করে। আমি আপনাদের এ মর্মে নিশ্চিত ধারণা দিতে চাই যে, গত দুবছরের স্বপ্ন পরিসরে ঢাকা শহর অপ্রত্যাশিতভাবে অতি দ্রত গতিতে ও বিস্ময়করভাবে অধ:পতনের গহ্বর থেকে উন্নতির শিখরে আরোহন করেছে।

জনাব,

গত দু'বছরের স্বল্প পরিসর সময়ে ঢাকা ও পুর্ব বাঙলার ইতিবৃত্তে আশাপ্রদ অনেক বিপ্লব সাধিত হয়েছে। আমরা আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে এর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে। ঢাকার শাসন-ক্ষমতা ও গৌরব অবলুপ্ত হওয়ার পর থেকেই মান-সম্মান, জ্ঞান-গরিমা ও অর্থ-সামর্থ্যের দিক থেকে এখনকার মুসলমান নাগরিকদের অবস্থা অবনতির অতল গহ্বরে তলিয়ে যেতে শুরু করে। আমি মনে করি, মুসলমানদের জন্য এটা খুবই আনন্দের বিষয় যে, সেই সর্বশক্তিমান জগতস্রষ্টা আমাদের মেহেরমান গভর্ণমেন্টকে তাঁর দরিদ্র প্রজাকুল, বিশেষত এই প্রান্তিক প্রদেশের মুসলিম নাগরিকদের শোছনীয় অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করার তওফিক দিয়েছেন এবং এর প্রতিকারে তাঁকে প্রবুদ্ধ করেছেন। আমি ঐক্যান্তিকভাবে কামনা করছি, বিশ্বপলক যেন তাঁর রহমতের দ্বার সব সময় আমাদের জন্য উন্মুক্ত রাখেন। আমরা সেই শিক্ষিত ও সুধী মুসলমান ভাইদের, বিশেষত আলীগড়ের মহোদয়গণের ঋণ কোনভাবেই শোধ করতে পারবো না, যাঁরা পূর্ববাঙলার ভাইদের পশ্চাৎপদতা ও শোচনীয় অবস্থ লক্ষ্য করে তাদের সাহায্যার্থে এবং সুপরামর্শ দিয়ে উপকার সাধনের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ স্বীকার করে সুদূর জলপথ ও স্থলপথ অতিক্রম করে নিজ ব্যয়ে ঢাকায় পদার্পণ করেছেন। আপনাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। এর সাথে সাথে যদি এ নতুন প্রদেশের উপকরণ ও এ প্রদেশের স্রষ্টা তথা বড়লাট কার্জন এবং পূর্ব বাঙলার প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা না হয়, তবে তা হবে কৃতজ্ঞতার শামিল। যে ফলপ্রসু নীতির উপর ভিত্তি করে আমাদের মহীয়ান ও দূরদর্শী শাসনকর্তা গণ নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করেছেন, সে সম্পর্কে বেশি কিছু বলতে চাই না। কারণ বিষয়টি আমার বর্তমান আলোচনার গন্ডিবহির্ভূত। তা ছাড়া রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কিছু আলোচনার করার জায়গাও এটা নয়।

জনাব,

আমাকে এতটুকু আরজ করার অনুমতি দেবেন যে, আমরা -তথা পূর্ব বাঙলার অধিবাসীরা অত্যন্ত আনন্দ সহকারে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা

www.nagorikpathagar.org

এমন এক উদ্দেশ্যে নিয়ে এখানে সমবেত হয়েছেন, এ প্রদেশবাসীর যার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। আমি এ মহৎ ও ভাবগম্ভীর সভায় সংকোচ নিয়ে এটা স্বীকার করছি যে, আমাদের শিক্ষার অবস্থা খুবই শোচনীয়। কলকাতায় ৩ জন অশিক্ষিতের অনুপাতে ১ জন শিক্ষিত, অথচ ঢাকায় ৮ জন অশিক্ষিতের অনুপাতে মাত্র ১ জন শিক্ষিত লোক রয়েছে। গোটা বঙ্গে ১২ জন অশিক্ষিতের অনুপাতে ১ জন শিক্ষিত এবং দু-এক জায়গায় ১৬ জন অশিক্ষিতের অনুপাতে মাত্র ১ জন শিক্ষিত লোক রয়েছে। মুসলমান শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের অনুপাত হলো ১ ঃ ১৫। অন্য কথায়, সমগ্র বঙ্গে প্রতি ১৬ জন মুসলমানের মধ্যে ১৫ জনই অশিক্ষিত। এতে আপনারা অনুধাবন করতে পারবেন যে, আমরা তথ্য মুসলমানরা শিক্ষায় কত পশ্চাৎপদ। দেশের যেসব অঞ্চলে যাতায়াত-ব্যবস্থা ভাল ছিল, সেখানে তাহযীব-তমদ্দুন প্রসার লাভ করেছে, কিন্তু পূর্ববাঙলা শাসনকর্তৃপক্ষের দৃষ্টি থেকে দূরে থাকায় তা দিন দিন লয়প্রাপ্ত হতে থাকে। লর্ড কার্জন ও স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের প্রজ্ঞাই আমাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে মুক্তির পথে টেনে এনেছে এবং আমাদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেছে। এ পথ ধরেই আপনাদের মনে আমাদের প্রয়োজন ও সাহায্যের কথা উদিত হয়ছে। আমি এটা স্বীকার না করে পারছি না যে, ওয়ারেন হেস্টিংসকে ১ম গভর্ণর জেনারেল নিয়োগের সময় তথা বর্তমান ইংরেজ শাসনের সুচনালগ্ন থেকে আমাদের জাতির অনেক নেতাই এই প্রান্তিক প্রদেশের শোচনীয় অবস্থার প্রতি শাসনকর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার যাথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আমি আল্লাহর শুকুর এজন্যই আদায় করছি যে, স্বজাতির উন্নতির উষাপর্ব দেখা আমার ভাগ্যেই নিহিত ছিল। আমি আল্লাহর কাছে মুনাজাত করছি আমাদের শাসকদের কৃপাদৃষ্টি এ প্রদেশের প্রতি চির-অটুট থাকুক, তা হলে যেন আমরা নৈরাশ্যের সেই গহ্বরে না পড়ি যেখানে বিগত এক শতাব্দী কালব্যাপী আমরা পড়ে রয়েছিলাম।

জনাব,

এতক্ষণ আমি আপনাদের সামনে দেশের কোন শুভ দিক তুলে ধরিনি। এখন এমন দুএকটি ঘটনার অবতারণা করার প্রয়োজন মনে করি, যা বিগত ১২ মাসে আমাদের জাতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে। ঐ ব্যাপারগুলো হলো এমন কতক আসন্ন ঘটনার ইঙ্গিতবাহক, যার লক্ষণ ইতিমধ্যেই প্রতিভাত হয়েছে। এ সবের মধ্যে একটি ছিল প্রতিশ্রুত ভাবী মহামান্য সম্রাট ও তাঁর বেগম সাহেবার ভারত আগমন এবং আমাদের শিক্ষার প্রতি তাঁদের বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ। আলীগড় কলেজ পরিদর্শন ছিল তাঁদের এ আগ্রহেরই পরিচালক। আমাদের সম্মান বৃদ্ধির জন্য আমরা তাঁদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আমি যতটুকু জানি তাঁরা আর কোন জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এতটুকু সম্মান দেন নি, যা আলীগড় কলেজকে দিয়েছেন। আমাদের

www.nagorikpathagar.org

জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁদের এই আগমন খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। আমাদের ভারতীয় মুসলমানদের বর্তমান ইতিহাসে দ্বিতীয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ছিল বড় লাটের সাথে নিখিল ভারত মুসলমান প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎকার এবং তাঁদের প্রতি তাঁর সহানুভূতিমূলক ও আশাপ্রদ উত্তরদান। এটাও আমাদের জন্য একটি সুখকর বিষয়। তৃতীয়ত সবচাইতে ফলদায়ক ব্যাপার হলো, ভারতের প্রায় সকল অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে অনুভূতি ও জাগরণ সৃষ্টি। তারা এখন নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়েছে। আমার বিশ্বাস, এই উক্তিতে আমি সকল মুসলমানের অভিমতেরই প্রতিধ্বনি করছি। আমাদের মধ্যে যে অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে, তা আমাদের ভবিষ্যৎ কল্যাণ ও সুখময় জীবন লাভের সবচাইতে বড় ও নিশ্চিত লক্ষণ। আমি যদিও আরো একটি কথা সর্বশেষে বলছি, কিন্তু তা হলো খুবই আনন্দের বিষয় সে কথাটি হলো– ১৯০৬ সালে ক্রান্তিলগ্নে আমরা স্বজাতির দুজন সম্মানিত লোককে হাইকোর্টের বিচারপতিপদে পেতে যাচ্ছি। সবচাইতে আনন্দের বিষয় হলো–তন্মধ্যে একজন এখানে উপস্থিত হয়ে আমাদের শির উ'চা করেছেন এবং এ সম্মিলনে সভাপতিত্ব করার অনুমতি প্রদান করেছেন। 'কনফারেন্স' এর বিশ বছরের জীবনে কি কি সুফল ফলেছে, তা এই নিয়োগেই প্রতিপন্ন হয়। 'অল–ইন্ডিয়া এডুকেশন্যাল কনফারেন্স'–এর চেষ্টায় আমাদের মধ্যে অত্যল্প উপযুক্ত, প্রজ্ঞাবান ও শিক্ষিত মুসলমান সৃষ্টি হয়েছে। এর খুবই যোগ্যতা সহকারে সে সব বড় বড় পদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন, যেগুলোকে বর্তমানে সরকারী চাকরিতে ভারতের সর্বোচ্চ পদ বলে মনে করা হয়। এ সব লক্ষণ স্বাজাতির উন্নতি অব্যাহত রাখার পথে আমাদের জন্য খুবই সাহসপ্রদ ও উৎসাহব্যঞ্জক।

জনাব,

আমি আশা করি, অভিবাদন পত্র পাঠ শেষ করার পূর্বেই আপনারা আমাকে ব্যক্তিগত একটি বিষয়ে কিছু বলার অনুমতি দেবেন। আমি আপনাদের কাছে এই আবেদন করেছিলাম যে, ঢাকায় অবস্থানকালে আপনারা আমার অতিথি হবেন। আপনারা আমার অনুরোধ রক্ষা করেছেন। আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আপনাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এর সঙ্গে আমি এই নিবেদনও করবো যে, আপনাদের আরাম–আয়েশের ব্যবস্থাপনায় যদি কোন ত্রুটি হয়ে তাকে এবং তার ফলে আপনারা কষ্ট অনুভব করে থাকেন, তবে আশা করি, আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনাদেরকে আমি এ মর্মে বিশ্বাস করাতে চাই যে, কোন ত্রুটি হয়ে থাকলে তা আমাদের উদাসীনতায় ও জ্ঞাতসারে হয় নি। আপনারা বিশ্বাস করুন, আপনাদের আরাম–আয়েশের ব্যবস্থাপনায় এবং আপনাদের অবস্থাপনাগারে সুখ–শান্তি বজায় রাখতে অভ্যর্থনা কমিটির সদস্যগণ কোন প্রকার ত্রুটি করেন নি।

সম্মেলনে উপস্থিত নামের তালিকা

www.nagorikpathagar.org

১৯০৬ সালের ২৭শে ডিসেম্বর নওয়াব সলীমূল্লাহ্‌, বাহাদুরের উদ্যোগে ঢাকার শাহবাগে অনুষ্ঠিত 'অল-ইন্ডিয়া মোহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্স'-এর বিশতম অধিবেশনে যাঁরা সভামঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেনঃ

(১) অনারেবল জিস্টিস সৈয়দ শরফুদ্দীন (২) নওয়াব মুহসিনুল মুল্‌ক বাহাদুর (৩) নওয়াব ওকারুল মূল্‌ক বাহাদুর (৪) মুমতাযুল মুল্‌ক খলীফা সৈয়দ মুহম্মদ হুসাইন (পাতিয়ালা) (৫) হাকীম মুহম্মদ আজমল খাঁ (দিল্লী) (৬) এইচ,এম, মালেক (নাগপুর) (৭) খানবাহাদুর আহমদ মুহ্‌ইউদ্দীন (মাদ্রাজ) (৮) খানবাহাদুর শায়খ গুলাম সাদিক (অমৃতসর) (৯) রাজা নওশাদ আলী খাঁ তালুকদার (অযোধ্যা) (১০) নবী উল্লাহ্‌ বার-এট্‌ল (লখনৌ) (১১) সৈয়দ মুহম্মদ আলী জজ (মির্জাপুর) (১২) সৈয়দ হাসান ইমাম বার-এট্‌ল (বাঁকিপুর) (১৩) অনারেবল খানবাহাদুর সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, জমিদার (ময়মনসিংহ) (১৪) খানবাহাদুর আলী নওয়াব চৌধুরী (কুমিল্লা) (১৫) আবদুল মজীদ, ডিস্ট্রিক্ট সেশন জজ (আসাম) (১৬) আবদুল করীম, স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর জেনাবেল অব রেজিস্ট্রেশন (বেঙ্গল) (১৮) শার্প, জনশিক্ষা-পরিচালক (পূর্ব বাঙলা) (১৯) এইচ, পি, মসুরিয়ার সি. আই. ই. কমিশনার (ঢাকা) (২০) বি.সি. এ্যালেন, ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর (ঢাকা) (২১) স্টিপিল্‌টন (২২) কেম্প, সম্পাদক, বেঙ্গল টাইম্‌স্‌ (২৩) কর্ণেল জে. হোডিঞ্জ সি. আই. ই. (২৪) ক্যাম্বেল (২৫) রফীউদ্দীন, বার-এট্‌ল (বোম্বে) (২৬) নিযামুদ্দীন আহমদ. বি.এ., বি.এল. ডেপুটি কমিশনার (বেরার) (২৭) শামসুল উলামা মওলানা শিবলী নুমানী (২৮) শাহ সুলায়মান (ফুলওয়ারী) (২৯) সৈয়দ আলী হাসান বাহাদুর, কাউন্সিল-সদস্য (ইন্দোর এস্টেট) (৩০) খাজা গুলাম সাকালাইন বি.এ., এল.এল.বি. (৩১) শায়খ আবদুল্লাহ বি.এ., এল.বি. (৩২) মুহম্মদ আলী, বি.এ. এক্সন (বড়োদা) (৩৩) শওকত আলী, আফিম- এজেন্ট (৩৪) আবদুল হামীদ, সম্পাদক, মোসলেম ক্রনিকল (৩৫) আবদুল হামীদ হাসান, সম্পাদক, মোসলেম পেট্রিয়ট (মাদ্রাজ) (৩৬) ডক্টর যিয়াউদ্দীন আহমদ (৩৭) আর্চ বোল্ড, অধ্যক্ষ, এম.এ.ও. কলেজ।[১]

---

[১] রিপোর্ট, অল-ইন্ডিয়া, মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল এডুকেশন্যাল কনফারেন্স, ১৯.৩, পৃঃ ৮

www.nagorikpathagar.org

আল্লামা ড. মুহাম্মদ ইকবাল (১৮৭২-১৯৩৭)

ওঠো দুনিয়ার সব গরীব কে জাগিয়ে দাও
ধনীর প্রসাদের দ্বার, প্রাচীর ভেঙ্গে দাও।
যে ক্ষেত থেকে কৃষকের জীবিকা মিলেনা
সেই ক্ষেতের সকল ফসল খোসাসহ জ্বালিয়ে দাও। ইকবাল

স্থুল দৃষ্টিতে ধর্মীয় জীবনকে তিন পর্যায়ে ভাগ করে দেখা যায়, যেমন-বিশ্বাস, মনন ও আবিষ্কৃত। প্রথম ব্যক্তির তথা সমগ্র জাতির পক্ষে নিয়মের বাঁধাবাঁধিতে মেনে নেওয়া অপরিহার্য। এ বাঁধাবাঁধি স্বেচ্ছাকৃত হলেও এর কোন অর্থ উদ্ধার বা এর শেষ তাৎপর্য আবিষ্কারের চেষ্টা অবান্তর। জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে এ- পর্যায়ের গুরুত্ব প্রচুর; কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের মনোবিকাশ বা মনোস্ফূর্তির দিক থেকে বিচার করতে গেলে, একে বেশী মূল্য দেওয়া চলে না। এরপর আসবে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা এবং আলোকের দিশা। পরিপূর্ণ নিয়ামানুবর্তিতার অর্থ এখন থেকে হৃদয়ঙ্গম হতে থাকবে এবং নিয়মের পেছনে বিরাজমান মূল তত্ত্বের সাথে অন্তরের যোগ সাধিত হবে। এ পর্যায়ে ধর্মজীবন চায় একটি পরম তত্ত্বমূলক ভিত্তি। এ জীবন নিখুঁত যুক্তির কাঠামোর মধ্যে আল্লাহ্‌কেসহ সমস্ত বিশ্বকে ফেলে দেখতে চায়। তৃতীয় পর্যায়ে পরম তত্ত্বের অন্বেষণের স্থানে হয় মনস্তত্ত্বের উদয়। ধর্মীয় জীবন আর নিরেট তত্ত্বজ্ঞানের খোলসে আচ্ছন্ন থাকবে না। এখন তার লক্ষ্য পরম সত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়। এ-পর্যায়ে ধর্ম হয়ে পড়ে ব্যক্তিগতভাবে জীবন ও শক্তিকে আত্মস্থ করার ব্যাপার। ব্যক্তি এখন মুক্ত সত্তার অধিকারী হয়। অবশ্য এ মুক্তি নীতির বাঁধন থেকে তার মুক্তি নয়; বরং সে তার গভীর চেতনার অন্তঃস্থল ঐ নীতির মূল সূত্র আবিষ্কার করে। এ তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে জনৈক মুসলিম সুফী ঘোষণা করেছেন যে, 'পবিত্র কুরআনকে সে-ই সত্যিকার রূপে বুঝতে পারবে, যার কাছে তা রাসূলুল্লাহর কাছে যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছিল ঠিক সেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে; নচেৎ অসম্ভব।' ধর্মীয় জ্ঞান ও অনুভূতির এই যে তৃতীয় পর্যায়, ধর্মের এই অর্থেই আমি ধর্মকে আজ বিচার করতে চেষ্টা করব। দুর্ভাগ্যবশত ধর্মের এ-রূপকে বলা হয়েছে দুর্জ্ঞেয় 'মরমীবাদ'-যা জীবনের প্রতি বিমুখ, তথ্যের প্রতি উদাসীন এবং আমাদের আজকের অভিজ্ঞতার-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিকূল। তবুও একথা আশ্চর্য ঠেকলেও সত্য যে, ধর্মের উন্নততর স্তরে প্রশস্ততর জীবনেরই অভিজ্ঞতার অনুসন্ধান করা হয়। বিজ্ঞান অভিজ্ঞতার গুরুত্ব বুঝতে বারবার

www.nagorikpathagar.org

অনেক আগে থেকেই ধর্ম-জীবনের ভিত্তি স্বরূপ এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। ধর্মের যে পর্যায়ের কথা আমি বলছি, তাকে বলা যায় মানুষের মনোচেতনাকে পরিচ্ছন্ন ও সুসমঞ্জস্য রূপ দেবার আন্তরিক প্রচেষ্টা, যাতে প্রকৃতিবাদের মতোই অভিজ্ঞতাকে যথেষ্ট বিচার-বিচেনা করে গ্রহণ বা বর্জন করা হয়। অধিবিদ্যা (Metaphysics) কি সম্ভব? এ প্রশ্ন উত্থাপন করে তার নেতিবাচক উত্তর দিতে গিয়ে কান্ট যে সব যুক্তির অবতারণা করেছিলেন, ধর্মীয় তথ্যবিচারেও সে সব যুক্তি সমানভাবেই খাটানো যায়। তাঁর মতে, অনুভূতিকে সরাসরি জ্ঞানের পর্যায়ে ফেলা চলে না। অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি-সমষ্টিকে জ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হতে হলে,তাকে কতকগুলো শর্ত পূরণ করতে হয়। বস্তু একটি সীমাবদ্ধকারী আইডিয়া মাত্র। এর কাজ কেবল নিয়ন্ত্রণ। কোন বস্তু সম্বন্ধে আমাদের যা ধারণা তার মূলে খাঁটি কিছু যদি থেকে থাকে তবে তা আছে অনুভূতির সীমানার বাইরে; কাজেই তাকে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ কর সম্ভব নয়। কান্টের এ নির্দেশ অবশ্য বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করা চলে না। বিজ্ঞান ইতোমধ্যে আমাদের অনেক নতুন কথা শুনিয়েছে। 'বস্তুকে' আজ আমরা ভাবতে শিখেছি 'বোতলেপোরা আলোক তরঙ্গ' বলে, বিশ্বজগতকে জানতে পারছি একটি চিন্তার রূপায়ণ হিসেবে, স্থান-কাল এ আজ সীমাবদ্ধতা আরোপিত হয়েছে, প্রকৃতির রীতিনীতি জ্যামিতির ফাঁদে আর ধরা দিচ্ছে না। এমতাবস্থায় অনুভূতিমূলক ধর্ম তত্ত্বকে একটি জ্ঞানগ্রাহ্য সূত্র ও ব্যবস্থার আওতায় এনে দাঁড় করানো কান্ট এর কাছে যতটা বিসদৃশ মনে হয়েছে ততটা না হতেও পারে। আপাতত আমাদের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাবার প্রয়োজন নেই; এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে তাঁর মত বস্তুর প্রকৃত রূপ অনুভূতি সীমানার বর্হিভূত, সুতরাং তা নিরেট যুক্তিরও অতীত-এ মেনে নিতে হলে পূবাহ্নেই স্বীকার করতে হবে যে, মানুষের সাধারণ স্তরের অনুভূতির অতীত আর কোন প্রকারের অনুভূতি অসম্ভব। অতএব প্রশ্নটি এইভাবে দাঁড়ায়: আমাদের সাধারণ স্তরের অনুভূতিই কি একমাত্র জ্ঞানপ্রসূ অনুভূতি? প্রজ্ঞানে তত্ত্বের সম্ভাবনা বিচারে কান্টের প্রশ্নটি বিশেষ রূপ লাভ করেছে তাঁর বস্তুর প্রকৃত রূপ এবং বাহ্যিক রূপ সংক্রান্ত ধারণা থেকে। কিন্তু তিনি ব্যাপারটিকে যে দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করেছেন, তার উল্টো দিক থেকে আরম্ভ করলে কেমন হয়? যশস্বী মুসলিম সূফী দার্শনিক স্পেনের মুহিয়ুদ্দীন ইবনুল আরাবী মন্তব্য করেছেন যে, আল্লাহই অনুভূতি স্বরূপ এবং দৃশ্যমান জগৎ একটি প্রত্যয়মাত্র। আর একজন মুসলিম সূফী ও সাধক কবি ইরাকীল মতে, স্থান-কাল যোগও বহু এবং এবং বিচিত্র। 'ঐশীকাল' এরও অস্তিত্ব আছে। এমনো হতে পারে যে আমরা যে বাহ্যিক জগৎ বলি, তা আমাদের বৃদ্ধির সৃষ্টিমাত্র। মানবীয় অনুভূতির এমন আরও অনেক স্তর আছে যা সম্পূর্ণ আলাদা স্থান-কাল যোগের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলেছে। এসবের বিচার-বিশ্লেষণের কাজ সাধারণ মানবীয় অনুভূতির কাজের মত নয়। এখানে অবশ্য বলতেহ

www.nagorikpathagar.org

পারেন, মানবানভূতির যে স্তর সাধারণ প্রত্যয়ের অতীত, তা থেকে সার্বজনীন জ্ঞান আহরণ সম্ভব হবে কি করে? একমাত্র প্রত্যয়-বোধ থেকেই সামাজিক সমঝোতা আসতে পারে। এখানে স্পষ্ট ভাষায় বলা আবশ্যক যে, ধর্মীয় অনুভূতির ওপরই নির্ভর করতে হবে এবং তা অন্যকে জানানো সম্ভব হবে না। উপরোক্ত আপত্তিটিকে বেশ কিছুখানি শক্তিশালী বলে মানতে হবে যদি ধরে নেওয়া হয় যে, মরমীবাদী কেবল তার নিজস্ব সাধন-পথ, চিন্তা-ধারা এবং আশা-আকাঙ্খার দ্বারা চালিত হয়ে থাকে। রক্ষণশীলতা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে এমন বাঞ্ছনীয়, ধর্মের ক্ষেত্রে ঠিক তেমনি।

এতে মানবত্তার সৃষ্টিধর্মী স্বাধীনতার লোপ পায় এবং নবতর আধ্যাত্মিক স্ফূরণের পথ রুদ্ধ হয়। এই কারণেই মধ্যযুগীয় আধ্যাত্মিক সাধন-পদ্ধতি সেই পুরাতন মহাসত্যের আবিষ্কার পথে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায়। যা হোক ধর্মীয় অনুভূতি পরস্পর আদান-প্রদান যোগ্য নয়-এ কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে তার সন্ধান নিরর্থক নয়। বস্তুত এর থেকেই আমরা মানব-সত্তার আসল প্রকৃতির পরিচয় পেতে পারি। দৈনন্দিন সামাজিক মেলামেশার ব্যাপারে আমরা যেন এক প্রকার অবরোধের মধ্যেই কাল যাপন করি। এ ব্যাপারে মানুষের ভিতরকার ব্যক্তিত্বের সাথে পরিচয়ের চেষ্টা আমরা করি না। সামাজিক মানুষকে আমরা বুঝি বাইরে তার সাথে আমাদের যা সম্পর্ক বা আমাদের অন্তরে তার ব্যক্তিসত্তাকে তার স্বকীয় রুপে আবিষ্কার করা। এর জন্যে বাহ্যিক ও নৈমিত্তিক রুপের খোলসকে ভেদ করে অনেক দূরে গভীরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয়। একে সম্ভব করবার জন্যে চাই পরম সত্যের সংস্পর্শ। ব্যক্তিসত্তা পরম সত্তার সান্নিধ্যে এসেই আবিষ্কার করতে পারে নিজের অনন্যসাধরণতা, নিজের প্রজ্ঞানি মর্যাদা এবং সেই মর্যাদার উন্নয়ন সম্ভাবনা। প্রকৃতপক্ষে যে অনুভূতি থেকে এই আত্মদর্শন আসে, তাকে বুদ্ধির জোরে অনুধাবন করা যায় না। যুক্তিবাদরে সূক্ষ্ম জাল বিস্তারে এর নাগাল পাওয়া যায় না। এ সত্যানুভূতি জীবন্ত; অন্তরের জৈবিক রূপায়ণ থেকে এর অভ্যুদয়। এই কালাতীত অনুভূতি বিশ্বজগৎকে গড়তে পারে, ভাঙতে পারে এবং কেবল এই আকারেই এর মর্মার্থ কালগতির সাথে নিজেকে পরিব্যপ্ত করে সাময়িক ইতিহাসের চোখে কার্যকরীভাবে প্রতিভাত হয়। বাহ্যিক প্রত্যয়ের কষ্টিপাথরে সত্যকে যাচাই করার প্রয়াস অনেকখানি ছেলেখেলারই মতো। ইলেকট্রন কেবল একটি প্রতীক বা একটি প্রথাসিদ্ধ ধারণা মাত্রও হতে পারে। পক্ষান্তরে জীবনধারার সাথে সত্যিকারভাবে জড়িত ধর্মই একমাত্র যোগ্য হাতিয়ার যাকে নিয়ে পরম-সত্যের রূপ উদঘাটনের কার্যকরী প্রচেষ্টা চলতে পারে। তা ছাড়া ধর্মাশ্রয়ী উন্নততর অনুভূতির সাহায্যে আমাদের দর্শনসম্মত ধর্মতত্ত্বের সূত্রাদি এবং ধারণাবলীর সংস্কারও সম্ভব। অন্ততঃপক্ষে নিছক যুক্তিসিদ্ধ ধারণাবলীর দুর্বলতা সম্পর্কে আমাদের অন্তরকে সজাগ রাখবার কাজে একে অনায়াসে নিয়োজিত করা চলে। ল্যাঞ্জ প্রজ্ঞানকে 'কবিতার

www.nagorikpathagar.org

যুক্তিযুক্ত ধরন' বলে অভিহিত করেছেন। নীটশে আরও তীব্র ভাষায় একে বলেছেন 'বয়ঃপ্রাপ্তদের একটি বিধিসম্মত খেলা।' বস্তুত বিজ্ঞানীরা আধিবিদ্যাকে পুরোপুরি অবজ্ঞা করে চলতে পারেন। কিন্তু বিজ্ঞান যতই কেন বলুক না যে 'এ একটি মারাত্মক মিথ্যার বেসাতি' বা 'মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও চাল-চলনকে আয়ত্তে রাখবার একটি যেন-তেন কৌশল', তবুও ধর্মবিশেষজ্ঞরা বিজ্ঞানীর এ কথায় তুষ্ট থাকতে পারে না। ধর্ম বিশেষজ্ঞরা জানতে চায়, এ বিশ্বব্যবস্থায় তাদের যথাযথ স্থান কোথায়। সত্যের চরম প্রকৃতি বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় নয়; কাজেই বিজ্ঞানের অনুসন্ধান অভিযানে সত্যের চরম প্রকৃতির বিকৃত অর্থ হওয়ার আশংকা নেই। কিন্তু ধর্মের কথা আলাদা। সত্যের চরম প্রকৃতিই তার অনুসন্ধানের বিষয়। সুতরাং ধর্মের অনুসন্ধান ভুল পথে চালিত হলে মানুষের ব্যক্তিসত্তার বিপদ হতে পারে, কারণ ব্যক্তিসত্তাই তার জীবনের মূল কেন্দ্র স্বরূপ। কর্মকর্তার ভাগ্য নির্ভর করে তার কর্মের উপর। প্রান্তির ভিত্তির উপর এ কর্ম প্রতিষ্ঠিত হলে চলে না। ভ্রান্ত প্রত্যয় বিচারবুদ্ধিকে ভ্রান্ত পথে পরিচালনা করে। মন্দ কাজ সমগ্র মানুষটির অবনতি ঘটায় এবং তার ব্যক্তি-সত্তার ধ্বংসের কারণ হতে পারে। শুধু প্রত্যয় জীবনকে সামান্য প্রভাবিত করে, কিন্তু পরম-সত্যের সঙ্গে কর্মের সম্বন্ধ সক্রিয়। পরম সত্তার প্রতি সমগ্র মানুষের যে মনোভাব, তা-ই হলো কর্মের উৎস। এই মনোভাব মোটামুটি একই রকম থাকে। ভিতরে ও বাইরে কর্মের একটা ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র রূপ আছে। তবু কর্মের একটা সামাজিক রূপও গড়ে উঠতে পারে, যখন অন্যেরাও এরূপ কর্মের মারফত পরম-সত্তার সান্নিধ্য কামনা করে। সর্বদেশের এবং সর্বযুগের ধর্ম-বিশেষজ্ঞরা এই সাক্ষ্যই দিয়ে এসেছেন যে, আমাদের সাধারণ চেতনাস্তরের সন্নিকটে আরও একটি চেতনাস্তরের উৎস প্রচ্ছন্ন আছে। এইসব প্রচ্ছন্ন চেতনার উন্মেষে আমরা যদি নবতর জীবনপ্রসূ এবং জ্ঞানপ্রসূ অনুভূতির সম্ভাবনা দেখতে পাই, তবে উন্নততর অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির রূপায়ণ হিসেবে ধর্মের অস্তিত্বকে যথার্থ বলে মেনে নিতে আমরা ন্যায়ত বাধ্য এবং তার বিচারে আমাদের গভীর মনোনিবেশ করা দরকার।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, 'ধর্মের ভবিষৎত কি' প্রশ্নটি অবান্তর নয়। তা ছাড়া আধুনিকত সংস্কৃতির ইতিহাসে, বিশেষ করে আজকের পরিপেক্ষিতে এ প্রশ্ন উত্থাপনের আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। প্রথমেই আসে এর বৈজ্ঞানিক বিচারের প্রসঙ্গ। পদার্থ বিজ্ঞান তার উন্নতি পথে চলতে আগের অনেক প্রিয় মতবাদকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। যে বিজ্ঞান আজ প্রশ্ন করেছে: কার্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ রূপই কি প্রকৃতির একমাত্র এবং সমগ্র রূপ? পরম সত্য কি আমাদের চেতনার অন্যান্য দিক থেকেও সাড়া জাগাচ্ছে না? প্রকৃতিকে হৃদয়ঙ্গম করবার জন্যে আমাদের বুদ্ধি পথই কি একমাত্র পথ? অধ্যাপক এডিংটনের ন্যায় জগৎমান্য বিজ্ঞানীও স্বীকার করেছেন যে,

www.nagorikpathagar.org

'পদার্থবিদ্যার সূত্রাদি স্বভাইতই সত্যের মাত্র অংশবিশেষের উপর আলোকপাত করতে পারে। বাকী অংশ নিয়ে কি করা যাবে? অন্য অংশ সম্পর্কে অবশ্য একথা বলা চলে না যে, যা পদার্থবিদ্যার আয়ত্তের বাইরে তা আমাদের জীবনে নিস্প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি আমাদের চেতনার যতখানি মনোবৃত্তি, আদর্শ ও মূল্যবোধ, এ সবও তার চেয়ে কম নয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতির অনুসরণ করে আমরা বিজ্ঞানীর বাহ্যিক জগতে উপনীত হই; আমাদের প্রকৃতির অন্য উপকরণ অনুসরণ করেও আমরা স্থান-কালের অতীত এক জগতে গিয়ে হাজির হই।

দ্বিতীয়টি, প্রশ্নটির অপরিসীম ব্যবহারিক গুরুত্বের দিকেও আমাদের নজর দিতে হয়। এ যুগের মানুষ একদিকে সমালোচনা দর্শনের শাণিত অস্ত্রে এবং অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যবাদের লৌহ-বর্মে নিজেকে যতই সজ্জিত করছে,ততই জীবন সমস্যা তার কাছে উত্তরোত্তর জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রকৃতিবাদ তাকে এক হাতে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের অভূতপূর্ব ক্ষমতার অধিকারী করেছে, অন্য হাতে ভবিষ্যতের প্রতি তার আস্থা ও প্রত্যাশাকে ধূলি লুণ্ঠিত করে দিয়েছে। একই ধারণা দুইটি বিভিন্ন সংস্কৃতিতে কতখানি ভিন্নমখী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে, তার একটি উদাহরণ প্রণিধানযোগ্য। মুসলিম জগতে যখন বিবর্তনবাদের অভ্যুদয় ঘটলো; তখন মানব গোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ বিকাশের উজ্জ্বল স্বপ্নে রুমী উল্লাসিত হয়ে উঠেছিলেন। নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি লাইন পড়লে যে কোন কৃষ্টিবান মুসলিমের অন্তরে আনন্দ শিহরণ জাগতে বাধ্য:

ভূ-গর্ভের প্রদেশে
খনি এবং পাথরের রাজ্যে কতকাল বিরাজ করেছি.
তারপর. হেসেছি আমি ফুলের বিচিত্র রঙে ;
কালে দুরন্ত-উদ্দাম প্রবাহের সাথে
অন্তরীক্ষে, মৃত্তিকায় এবং সমুদ্রে বিচরণ করে
নবতীরে জীবনে
গভীর জলে আমি সন্তরণ করেছি,
অসীম আকাশে আমি ডানা মেলেছি,
কঠিন মৃত্তিকায় আমি হামা টেনেছি, ছুটেছি;
আমার মর্মের সর্ব রহস্য কেন্দ্রীভূত হয়ে
দেখা দিল মানুষ রুপে।
তারপর, আমার গন্তব্য-

www.nagorikpathagar.org

মেঘমালার উর্ধ্বে, তারকারাজির সীমা পেরিয়ে,
যেখানে নেই পরিবর্তন, নেই মৃত্যু-
ফেরেশ্‌তার রুপে-তারপর আরও অসীমে
রাত্রি-দিবার সীমা পেরিয়ে
জীবন-মৃত্যুর সীমা পেরিয়ে
দৃশ্য-অদৃশ্যের সীমা পেরিয়ে
যেখানে যা আছে, অনন্ত কাল ধরে আছে
-একক-সম্পূর্ণ!... (জালালুদ্দীন রুমী)

অন্যদিকে এই একই বিবর্তবাদ ইউরোপে আরও সুসংবদ্ধভাবে ব্যাখাত হয়ে এই বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে যে, মানুষের যে এত সমৃদ্ধ জীবন, মৃত্যুর সঙ্গেই এর শেষ। আধুনিক মানুষের নৈরাশ্য এমনিভাবে বৈজ্ঞানিক কথার মারপ্যাঁচের ভিতর লুকিয়ে আছে। নীট্‌শে অবশ্য বলেছেন যে, বিবর্তনবাদে মানুষের পরজীবনকে অসম্ভব মনে করে না, কিন্তু তাঁর একথাও নৈরাশ্যবাদেরই নামান্তর। কারণ, তিনি মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাবাদিতার অতিআগ্রহেও এর বেশী বলতে পারেন নি যে, মানুষ অনন্তকাল পর্যন্ত পুনর্জন্ম গ্রহণ করবে। এ চিরন্তন পৌনঃপুনিকতাবাদ হতাশার বাণী, সৃষ্টিধর্মী অমরত্বের বাণী নয়।

আধুনিক মানুষ তার বুদ্ধির আবিষ্কার ও উপলব্ধি দ্বারা এতদূর সমাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে যে, আধ্যাত্মিকতার আবেদন তার জীবনে আর নেই বললেই চলে। নিজ অন্ত রের সাথেই তার যোগ নেই। চিন্তা-জগতে যেমন তার নিজের সাথে দ্বন্দ্ব অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জীবনেও তেমনি অপরের সাথে তার দ্বন্দ্ব। বিকট আত্মসর্বস্বতা, অফুরন্ত ঐশ্বর্য-পিপাসা তাকে ক্রীতদাসে পরিণত করেছে; অপরপক্ষে তার লাভ হয়েছে জীবনব্যাপী অবসাদ। বাহ্যত যা সত্য, তা-ই তার কাছে চরম সত্য, তা-ই আজ তার প্রেরণার একমাত্র উৎস। জীবনের অনাবিষ্কৃত গভীরে লালিত সত্যের আমন্ত্রণ তার কাছে একান্ত ব্যর্থ। বস্তুবাদের পরিণতি যে জীবনে অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতা ও অবসাদ ডেকে আনবে, হাক্সলি পরম বেদনার্ত চিত্তে এই আশংকাই করেছিলেন। আধ্যাত্মধর্মী প্রাচ্যের অবস্থাও আজ পাশ্চাত্যেরই মতো। এককালে যে মধ্যযুগীয় মরমী সাধনার ধারা প্রাচ্য ও প্রতীয়চ্যের ধর্ম-জীবনে একই ভাবে সহায়তা করেছিল, আজ তার অবনতি উভয় ক্ষেত্রেই প্রকট। অধিকন্তু এই মধ্যযুগীয় আধ্যাত্মবাদের অপকারিতা মুসলিম অধ্যুষিত প্রচ্যেই বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। সাধারণ মানুষের আত্মিক জীবনকে কালের গতিধর্মের সাথে সুসামঞ্জস্য করে না তুলে এ বরং আমাদের জীবনে এনেছে এক অসার বৈরাগ্যভাব। এ আমাদের শিক্ষা দিয়েছে অজ্ঞতা ও আধ্যাত্মিক দাসত্বের

www.nagorikpathagar.org

নিগড়ে তৃপ্তিলাভের মনোবৃত্তি। এই অব্যবস্থিত চিত্ততা থেকে মুক্তি খুঁজতে গিয়ে মুসলিম তুর্ক, মিসর ও ইরান দেশপ্রেম ও জাতীয়তার আপাতঃমনোরম ও কৃষ্টির শত্রু বলে বর্ণনা করেছেন। একমাত্র ধর্মীয় পন্থাতেই সত্যিকারের আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবন সম্ভব হতে পারে এবং এই ধর্মীয় পন্থাই মানুষকে অনন্ত জীবন ও অপরিসীম ক্ষমতার সান্নিধ্যে আনতে পারে । আজকের মুসলমান আমরা বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি হারিয়েছি বলেই চিন্তা ও মনোভাবের বিস্মৃতির পরিবর্তে আমরা মনোবৃত্তি সংকোচ সাধন করে শক্তিমান হবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছি। আধুনিক নাস্তিক্যপুষ্ট সমাজবাদে একটি নর্বধর্মের উদ্যম আছে এবং এ-ব্যাপারে তা উদারতর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু উগ্র হেগেলবাদের আদর্শে যেভাবে এর দার্শনিক ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, তাতে যে মানসিকতা শক্তি ও উদ্দেশ্য-মাহাত্ম্য একে সমুন্নত করে তুলতে পারত তারই বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সকলেই স্বীকার করবেন যে ঘৃণা, সন্দিগ্ধতা, ক্রোধ ইত্যাদি মানবাত্মাকে কলুষিত করে এবং তাঁর অন্ত র্নিহিত শক্তির বিকাশপথ রুদ্ধ করে। কিন্তু জাতীয়তাবাদ ও নাস্তিক্যপুষ্ট সমাজবাদের যতই প্রশংসা করুন না কেন, একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, এ সব 'গুণাগুণ'ই ঐ শ্রেণীর মতবাদের মূল উপজীব্য। মানুষ আজ সর্বতোভাবে হতাশার সম্মুখীন। মধ্যযুগীয় আধ্যাত্ম রীতি যেমন আজ তাকে কোন আশায় বাণী শোনাতে পারছে না, তেমনি আধুনিক জাতীয়তাবাদ বা নাস্তিক্যপুষ্ট সমাজবাদও তার অন্তরে নবতর প্রেরণা যোগাতে অক্ষম হয়েছে। আধুনিক সংস্কৃতির ইতিহাসে আজকের দিন বাস্তবিকই একটি সংকটের দিন। জীব-জগৎ এখন এমন এক অচলাবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, নবতর বিকাশ ছাড়া তার আর এগিয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই। বিজ্ঞানের অগ্রগতি আনুষ্ঠানিক ধর্মের ভিত্তি ভেঙ্গে দিয়েছে। তার সাথে ভেঙ্গে পড়েছে সমাজ বাঁধনের নৈতিক ভিত্তি। এখন নতুন ভিত্তি প্রতিষ্ঠার কঠিন দায়িত্ব বর্তমানে মানুষের উপর পড়ছে। এর জন্যে যে বলীয়ান নৈতিক চরিত্র চাই, তা সে পারে একমাত্র ধর্মেরই কাছে; কারণ ধর্ম তার সুবিকশিত স্তরে অন্ধবিশ্বাসের বন্ধন, পুরোহিতানুগত্য বা গতানুগতিক ক্রিয়া-কলাপে নিবদ্ধ নয়। মানব চিত্তের এরূপ একটি বিশ্বাসপুষ্ট প্রকাশই তার ব্যক্তিত্বকে বর্তমান জীবনে অগ্রগতির সহায়ক ও ভবিষ্যৎ জীবনে প্রতিষ্ঠার বাহন রুপে গড়ে তুলতে পারে। মানুষ আজ নিজেরা আদিকারণ এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিচারে যদি উন্নততর দৃষ্টি অর্জন না করতে না পারে তবে আজকের অমানুষিক প্রতিযোগিতাপ্রবণ সমাজব্যবস্থা এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব জর্জরিত আধ্যাত্মিক জীবনাদর্শ ও সভ্যতার নিম্নগতি রোধ করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

আগেই বলা হয়েছে যে, জগত-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধের নীতি সন্ধানে এবং তার সহায়তার ব্যক্তি-জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তিপুঞ্জের বিকাশ সাধনে

www.nagorikpathagar.org

মানব সভ্যতায় ধর্ম পরম আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে এসেছে। অবশ্য আজকের মনস্তত্তাত্ত্বিকের কাছে সেকালের ধর্ম বিশেষজ্ঞের পরিভাষা অনেকখানি অপাংক্তেয়। তা সত্ত্বেও দুনিয়ার সমস্ত ধর্ম সাহিত্য ও ধর্ম সাধকদের ব্যক্তিগত অনুভূতিলব্ধ তথ্যাবলী এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ। ধর্মীয় অনুভূতিও আমাদের সাধারণ অনুভূতির মতোই স্বাভাবিক ব্যাপার। এসব অনুভূতিলব্ধ তথ্য সাক্ষ্য দেয় যে, ধর্মসাধক তাঁর সাধনা থেকে একটি অতীন্দ্রিয় জ্ঞানাত্মক দৃষ্টি লাভ করেন এবং এই দৃষ্টির ফলে সত্তার প্রচ্ছন্ন শক্তিপুঞ্জের উন্মেষ ও কেন্দ্রায়ন সম্ভব হয়। এই প্রক্রিয়া সাধককে একটি নবতর ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে তোলে। মানব-ব্যক্তিত্বের এই সচেতন রূপান্তরকে স্নায়ুবিকরোগসম্ভূত বা বান্ত বজ্ঞান-বর্হিভূত বললেই এর প্রকৃত ও চরম মূল্য সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হল না। পদার্থ বিজ্ঞানের সীমার বাইরে কোন জ্ঞানমার্গের যদি সম্ভাবনা থাকে, তবে সাহসের সাথে সে সম্ভাবনার সম্মুখীন হতে হবে। এর ফলে আমাদের সাধারণ জীবন ও চিন্তাধারাকে কিছুটা ব্যতিক্রম বা সংশোধনেরও যদি প্রয়োজন হয়, তাতে পরোয়া করলে চলবে না। সত্যের খাতিরে আমাদের বর্তমান মনোভাব ত্যাগ করতেই হবে। মানুষের ধর্মীয় মনোভাব যদি মূলত কোন শরীরগত বিপর্যয় থেকেও উদ্ধৃত হয়ে থাকে তাতে কিছু আসে যায় না। জর্জ ফক্স স্নায়ুবিক রোগগ্রস্ত হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু সমসাময়িক ইংল্যান্ডের ধর্মজীবনের তাঁর শুদ্ধিমূলক প্রভাব অনস্বীকার্য। মোহাম্মদকেও একজন মনোবিকারগ্রস্ত ব্যক্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই বিরাট ব্যক্তিত্ববান পুরুষ মানবসভ্যতার গতি পরিবর্তন করে দিয়েছেন; একটি দাস সম্প্রদায়কে মানুষের নেতৃত্বে সমাসীন করেছেন; এমন কি সমগ্র মানব জাতির জীবনধারা ও সমাজ-পদ্ধতিতেত আমূল পরিবর্তনের প্রেরণা যুগিয়েছেন। মনোবিকারের কোন বিশিষ্ট প্রকাশ থেকে যদি পৃথিবীর ইতিহাস এতখানি বিপর্যয় সম্ভব হয়, তবে মনস্তাত্ত্বিকের বিচারেও এহেন মনোবিকারের মূল প্রেরণা সম্পর্কে গবেষণার প্রয়োজন অত্যধিক। তাছাড়া হযরত মুহাম্মদের কর্মপ্রচেষ্টা মানব জীবনে যেভাবে কার্যকরী হয়েছে তাতে তাঁকে মস্তিষ্কের ভ্রান্তি আশ্রিত আধ্যত্মিকতার রূপায়ন বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তাঁর জীবন সাধনাকে বুঝতে হলে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, তাঁর সাধানা কোন আকস্মিক বিচ্ছিন্ন ব্যাপার ছিল না; এ ছিল কোন ছিল সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির প্রয়োজনে উদ্ভূত প্রেরণার উৎস, নবসৃষ্টির যাত্রা পথের উদ্বোধন। নৃতত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হবে যে, মানবজাতির সংবিধানের সৌকর্যের জন্যে অমন মনোবিকারগ্রস্তের প্রয়োজন আছে। তথ্য বিশ্লেষণ ও তার কারণ খুঁজে বের কার তাঁর কাজ নয়; তাঁর কারবার জীবন দিয়ে, জীবনের গতি নিয়ে এবং তারই মারফত মানব জাতির কর্মজীবনের জন্যে নতুন পথনির্দেশ নিয়ে। অবশ্য পদস্খলন বা ভ্রান্তি তাঁরও হতে পারে, যেমন হতে পারে বাহ্যেন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার উপর

www.nagorikpathagar.org

নির্ভরশীল বিজ্ঞানীর। কিন্তু তাঁর কার্যক্রম অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, নিজ অভিজ্ঞতাকে ভ্রান্তি মুক্ত করে দাঁড় করাতে তাঁর সাধনা বিজ্ঞানীর চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

আমাদের মত বাইরের লোকের কর্তব্য হচ্ছে এই অতিপ্রাকৃকি ব্যাপারটির প্রকৃতি ও তাৎপর্য অনুধাবন করার কোন কার্যকরী প্রণালী খুঁজে বের করা। আধুনিক বৈজ্ঞানিক ইতিহাস পদ্ধতির প্রবর্তক ইবন খালদুনই প্রথম মানব মনস্তত্ত্বের এই বিশেষ অধ্যয়ে বিস্তারিত গবেষণা করেন গেছেন। মনস্তত্ত্বের পরিভাষায় আজ-কাল আমরা 'অব্যক্ত অহংকার বলতে যা বুঝি, তার সূত্র তিনিই প্রথম দিয়ে গেছেন। তারপরে ইংল্যান্ডের স্যার উইলিয়াম হ্যামিল্টন এবং জার্মানী লাইবনিজ মনোরাজ্যের আরও অজ্ঞাততর অনুভুতিসমুহের কিছু কিছু নিয়ে অনুসন্ধান চালনা করেছেন। জাঙ্গ বোধ হয় সত্য সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন যে, ধর্মের মৌলিক প্রকৃতি বিশ্লেষণমূলক মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিসীমার বাইরে। বিশ্লেষণমূলক মনস্থত্ত্বের সাথে কাব্যকলার সম্পর্ক বিচার তিনি বলেছেন যে, মাত্র আর্টের রূপ বিকাশের ক্ষেত্রেই মনস্তত্ত্বের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতে বাধ্য তাঁর মতে:

"মনস্তত্ত্বের মাধ্যমে আর্ট-এর মৌলিক রূপ উদঘাটন সম্ভব নয়। ধর্মের ব্যাপারেও এই সিদ্ধান্ত পুরাপুরি খাটে। সে ক্ষেত্রে ও হৃদয়াবেগ এবং প্রতীক বিচারে মাত্র মনস্ত স্তাত্ত্বিক বিবেচনা চলতে পারে; তার সাথে ধর্মের নিগূঢ় অভিব্যক্তির কোন সম্বন্ধ নেই, আর থাকতে পারে না। যদি থাকত, তা হলে শুধু ধর্ম নয়, আর্টও মনস্তত্ত্বের মাত্র একটি অংশসিশেষের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যেত।"

জাঙ্গ অবশ্য তাঁর লেখায় নিজের নীতি নিজেই একাধিকবার ভঙ্গ করেছেন। ফলে আধুনিককালের মনস্তত্ত্বিকদের কাছ থেকে ধর্মের নিজস্ব রূপে এবং মানবব্যক্তিত্বের উপর তাঁর প্রভাব সম্পর্কে আমরা কোন হদিস পাই না। বরঞ্চ ধর্মের উন্নততর অভিব্যক্তির বিচারে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক দৃষ্টি নিয়ে তাঁরা শত-সহস্র অবান্তর থিয়োরীর জন্মদান করে গেছেন এবং তার ফলে সত্য সন্ধানীকে একান্ত নৈরাশ্যজনকভাবে বিপদগামী করেছেন। এ সব তত্ত্বালোচনা থেকে পাঠকের মোটের উপর যে ধারণা জন্মাবে তার মর্ম হল এই:

মানবসত্তাকে তার নিজ পরিধির বাইরে কোন বাস্তব সত্যের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন সহায়তাকল্পে ধর্মকে নিয়োজনে কোন ফায়দা নেই। ধর্ম মানব মনের সীমাহীন উদ্দামতার আঘাত থেকে সমাজের নীতি-শৃঙ্খলাকে রক্ষা করবার একটি সুবেচিত জৈবিক কৌশলমাত্র। এর কারণেই অধুনাতন কালের মনস্তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে খৃষ্টধর্ম

www.nagorikpathagar.org

ইতোমধ্যেই তার জৈবিক প্রয়োজন মিটিয়ে ফেলেছে। আজকের মানুষের কাছে খৃস্ট ধর্মের আদি কারণপরম্পরা বুঝতে পারা অসম্ভব। জাঙ্গের কথায়:

খৃস্টধর্মের আদি মর্ম আমরা আজও কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারতাম, যদি আমাদের রীতি-নীতিতে প্রাচীন সিজারীয় রোমের বল্গাহীন ইন্দ্রিয়াসক্তি ও ক্রুর পাশবিকতার একটি স্ফুলিঙ্গও অবশিষ্ট থাকত। আজকের সভ্য মানুষ সমাজের সে স্তর ছাড়িয়ে বহুদূর এগিয়ে এসেছে। যে যুগ প্রয়োজনে খৃস্টধর্মের অভ্যুদয় ঘটেছিল তার অস্তিত্ব আর নেই, তাই আজকে আমরা তার মর্ম বুঝতে অক্ষম। আমরা বুঝতে পারি না, কিসের বিরুদ্ধে খৃস্টধর্ম আমাদের রক্ষা করতে চায়। আজকের আলোকপ্রাপ্ত মানুষের কাছে তথাকথিত 'ধার্মিকতা' স্নায়ুবিক বিকারের অত্যন্ত কাছাকাছি ব্যাপার। খৃস্টধর্ম বিগত দু' হাজার বছর ধরে আমাদের সামাজিক ক্ষেত্রে যেসব নিরোধ-প্রাচীর গড়ে তুলেছে, তার আড়ালে আমাদের পাপপ্রবণতার চেহারা ঢাকা পড়েছে।'

এ বিশ্লেষণে ধর্মের উন্নততর অভিব্যক্তির কথা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে গেছে। ব্যক্তিসত্তার বিকাশে যৌনবোধ নিয়ন্ত্রণ একটি প্রারম্ভিক পর্যায় মাত্র। সমাজজীবনে প্রত্যক্ষ পারিপার্শ্বিকতায় নৈতিক স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজন অবশ্য স্বীকার্য; কিন্তু সত্তার ধর্মীয় বিকাশের সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার কাছে এ প্রয়োজন নগণ্য। ব্যক্তিসত্তার ঐক্য দুর্বল, ভঙ্গপ্রবণ বা পুনর্গঠনক্ষম, ব্যক্তিসত্তা অধিকতর স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে এবং জানা ও অজানা পরিবেশে নব নব পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে সক্ষম-এই উপলব্ধিতেই ধর্ম তার পথে এগিয়ে যায়। এই মৌলিক সত্য উপলব্ধি করার জন্যে উন্নতর ধর্মজীবন সেই সব অভিজ্ঞতার অনুসন্ধান করে, যে অভিজ্ঞতা পরম সত্যের গতিবিধির প্রতীক এবং যে গতিবিধি ব্যক্তিসত্তার ভাগ্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এই ব্যক্তিসত্তা পরমসত্তার সংগঠনের একটি স্থায়ী উপাদান কি-না কে জানে? এদিক থেকে বিচার করলে বুঝতে পারা যাবে যে, আধুনিক মনোবিজ্ঞান ধর্মীয় জীবনের ধারেই পৌঁছাতে পারেনি, ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য হতে মনোবিজ্ঞান আজো অনেক দূরে। প্রসঙ্গত সপ্তদশ শতাব্দীর ভারতীয় সাধক শায়খ আহ্মদ সারহিন্দীর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যায়। তৎকালীন সুফীবাদ তাঁর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণমূলক সমালোচনার পরশে নবতর দীপ্তিতে প্রতিভাত হয় এবং তা থেকে একটি নবতর সাধনারীতি জন্মলাভ করে। সূফী সাধনারদ অন্য সব পদ্ধতি মধ্য এশিয়া ও আরব ভূমি থেকে ভারতে এসেছে। একমাত্র এর পদ্ধতিই ভারত থেকে বর্হির্মুখীন হয়ে এখনও পাঞ্জাব, আফগানিস্থান ও এশীয় রাশিয়ার জীবন্ত রয়েছে। এ মন্তব্যের পূর্ণ মর্মোদ্ধার আধুনিক মনস্তত্ত্বের ভাষায় সম্ভব বলে আমি মনে করি না, কেননা তেমন ভাষা এখনও সৃষ্ট হয়নি। যা হোক, উপস্থিতি আমার উদ্দেশ্য হল, পরমসত্তার সন্ধানরত ব্যক্তিসত্তার

www.nagorikpathagar.org

অনুভূতিপুঞ্জের বিশালতার আংশিক পরিচয় দেবার চেষ্টা করা। ভাষার কিছুটা বিসদৃশ্যতা লক্ষণীয়; কিন্তু এ ভাষা উদ্ভূত হয়েছে ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশে লালিত ধর্মীয় প্রেরণা থেকে। আবদুল মুমিন নামক এক ব্যক্তি শায়খ আহ্‌মদের নিকট নিজ অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছেন:

> আকাশ, পৃথিবী, আল্লাহ্‌র আর্‌শ্‌, দোযখ, বেহেশ্‌ত্‌, এদের অস্তিত্ব আমাদের দৃষ্টিতে লোপ পেয়ে গেছে। আমার চতুস্পার্শ্বে কোথাও এদের আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কারুর সামনাসামনি দাঁড়িয়েও আমি তাকে আর দেখতে পাই না। এমন কি আমার নিজ অস্তিত্বও আমার কাছে লুপ্ত। আল্লাহ্‌ অসীম, অনন্ত। কেউ তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার এই-ই শেষতম সীমারেখা। কোন সাধক এ সীমা অতিক্রম করতে পারেননি।

শায়খ আহ্‌মদ-এর মন্তব্যঃ

যে অভিজ্ঞতার বর্ণনা করা হল, তার মূলে রয়েছে 'কুলব্‌'র চিরপরিবর্তনশীল জীবনরূপ। দেখা যাচ্ছে যে, সাধক এখনও 'ক্বল্‌ব্‌-এর গণনাতীত' 'মোক্বাম'-সমূহের এক-চতুর্থাংশও অতিক্রম করেননি। আধ্যাত্মিক জীবনের এই প্রথম 'মোক্বাম'-এর অভিজ্ঞতাবলী পরিসমাপ্ত করতে তাঁকে বাকী তিন-চতুর্থাংশ অতিক্রম করতে হবে। এই 'মোক্বাম'-এর পরে যে সেব মোক্বাম রয়েছে-সেগুলো হচ্ছে 'রূহ', 'সির্‌রি-খাফী', 'সির্‌রি-আখ্‌ফা'। সূফী পরিভাষায় এদের সমষ্টিগত নাম 'আলম-ই আমর।'এ-সব 'মোক্বাম'-এর প্রত্যেকটিরই নিজ বিশিষ্ট অবস্থা ও অভিজ্ঞতাসমূহ রয়েছে। সত্যসন্ধান প্রয়াসী সাধক এসব 'মোক্বাম' অতিক্রম করবার পড়ে লাভ করতে থাকবেন 'ঐশী নামাবলী' ও 'ঐশী গুণাবলী'র আলোক-দীপ্ত; এবং অবশেষে লাভ করবেন পরম সত্তার আলোক-দীপ্তি। সূফী সাধনার যেসব স্তরের কথা উল্লেখ করা হল, মনস্তত্ত্বের ভাষায় এসবের যে অর্থ বা তাৎপর্যই হোক না কেন, এসব বর্ণনা থেকে মুসলিম সূফীবাদের একজন যুগ-প্রবর্তনকারী সংস্কারকের দৃষ্টিতে গূঢ়তম অভিজ্ঞতাবলীর এক সমগ্র বিশ্বের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মতে, বাস্তব সত্যের অনুপম অভিজ্ঞতায় পৌছবার আগেই 'আলম্‌-ই আমর্‌' বা অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্দীপন ও গতিনির্দেশকারী জগতের সীমা অতিক্রম করে আসতে হবে। এই কারণেই আমি বলেছি যে, আধুনিক মনোবিজ্ঞান এখনও এ অভিজ্ঞতার বহিরাঙ্গনেরও বহু দূর। ব্যক্তিগতভাবে জীব-বিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থাকে আমি মোটেই আশাপ্রদ মনে করি না। ধর্মীয় জীবনের অভিব্যক্তি কখনও কখনও যে ধারার রূপকে আত্মপ্রকাশ করে, আংশিক জ্ঞান নিয়ে যে তার বিশ্লেষণমূলক সমালোচনার দ্বারা মানব ব্যক্তিত্বের জীবন্ত উৎসে পৌছানোর সম্ভাবনা খুবই কম। ধর্মের ইতিহাসে যৌন-প্রতীক একটি বিশিষ্ট স্থান

www.nagorikpathagar.org

অধিকার করে থাকতে পারে; অথবা জীবনের কোন কোন গ্লানিময় বাস্তবতা থেকে পলায়নে বা তার সাথে সম্মানজনক আপোষ-সাধনে ধর্মের কাছে আমরা কোন কল্পনাশ্রয়ী সমাধান পেয়ে থাকতে পারি; কিন্তু ধর্মীয় জীবনের মূল উদ্দেশ্য এতে প্রতিভাত নয়। আজকের সমাজ জীবনের শ্বাসরোধকর পরিবেশে এর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে আমরা সক্ষম না হতে পারলেও ধর্মের মূল উদ্দেশ্য অবিচলভাবে একই রয়ে গেছে; এবং সে হল সীমাহীন জীবনপ্রবাহের সঙ্গে সীমাবদ্ধ ব্যক্তিসত্তার যোগসাধন এবং এইভাবে তাঁকে প্রজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা দান। কাজেই মনোবিজ্ঞান যদি মানব-জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে চায় তবে তার কাজ হবে বর্তমান কালের প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে জীবনাভিব্যক্তির পরিমাপে নতুন দৃষ্টি-সঞ্জাত কোন স্বাধীন পদ্ধতির উদ্ভাবন। সম্ভবত একজন অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত 'মনোবিকারগ্রস্ত' ব্যক্তির দ্বারাই এ-কাজ সাধিত হতে পারে। এহেন চারিত্রিক সংযোগ আমি অসম্ভব বলে মনে করি না। তাঁর মতে, মানসিক গঠনের ব্যক্তি থেকে এ কাজ সম্পন্ন হবার সম্ভাবনা ছিল; এবং প্রাচ্যের সূফীবাদের অতীত ইতিহাসেও এ-ধরনের মনোবিকাশসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষের পরিচয় যে মেলে না, তা নয়। মানুষের মধ্যে আদেশাত্মক স্বর্গীয় ভাবের অস্তিত্ব যে তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এ অন্ত দৃষ্টিকে আমি আদেশাত্মক বলছি, কেননা, আমার মনে হয়, এর থেকে তিনি এমন একটি প্রেরণাধর্মী মনোভাব লাভ করেছিলেন যা অনুভূতিকে চিরস্থায়ী জীবনশক্তিতে রূপান্তরিত করবার ক্ষমতা রাখে। তবুও নীট্শের জীবন-সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এর কারণ, শোপেনহাওয়ার, ডারউইন, ল্যাঞ্জ প্রমুখ পূর্বসূরীর প্রভাব তাঁকে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির মর্ম সম্বন্ধে অন্ধ করে তুলেছিল। দুনিয়ার এমন আধ্যাত্মিক বিধান প্রবর্তিত হোক যার ফলে গণজীবনেও স্বর্গীয় সত্তার স্ফূরণ হয়ে তার সামনে অনন্ত ভবিষ্যতের দুয়ার খুলে দেবে-এর জন্যে প্রত্যাশা না করে নীট্শে চেয়েছেন যে, অভিজাত সমাজের পরিপূর্ণ সংস্কারের ভিতর দিয়ে তাঁর আশার উপলব্ধি ঘটবে। অন্যত্র আমি তাঁর সম্বন্ধে বলেছি;

দর্শনের তা' অতীত, জ্ঞানের সে অতীত।
মানব-হৃদয়ের একান্ত অগোচর ভূমি হতে
বেড়ে ওঠে যে বৃক্ষ শিশু,
শুধু একতাল কাদায় তারা অঙ্কুরণ অসম্ভব।

একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তির সাধনা এমনভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল এই জন্যে যে, তাঁর অন্ত দৃষ্টি কেবল তাঁর অন্তরের শক্তি দিয়েই পুষ্ট ছিল, তাঁর আধ্যাত্ম জীবন বাইরের কোন নির্দেশ পায়নি। অদৃষ্টের পরিহাস এমনই যে, যে-ব্যক্তি তাঁর বন্ধুদের বিবেচনায় 'এমন

www.nagorikpathagar.org

এক দেশ থেকে এসেছেন যেখানে কোন মানুষ বাস করেনি', তিনি নিজে নিজ আধ্যাত্মিম অভাববোধের প্রতি ছিলেন সম্পূর্ণ সজাগ। তিন বলেছেন ঃ

> একটি বিশাল সমস্যার সম্মুখে আমি একক দাঁড়িয়ে; মনে হচ্ছে যেন একটি দিগন্ত বিস্তৃত আদিম অরণ্যে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। আমি চাই সহায়তা, আমি চাই শিষ্য, আমি চাই উস্তাদ। আদেশ যে কি প্রশান্তিই পেতে পারতাম!

আবার তিনি বলেছেনঃ

> আমার চেয়ে বেশী দেখতে পেয়েছেন, এবং নিচের দিকে চেয়ে তবে আমাকে দেখতে হয়,-এমন কাউকে কেন জীবিত মানব-সমাজে দেখতে পাচ্ছিনে? আমার কি আজও ভাল করে খুঁজে দেখা হয়নি বলে? অথচ কত অসীম আগ্রহে আমি অমন একজনকে খুঁজে ফিরছি।

প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিবক কার্যক্রমের পন্থা আলাদা হলেও শেষ উদ্দেশ্য অভিন্ন। দূয়েরই প্রচেষ্টা পরমতম সত্যের আবিষ্কারে বিজ্ঞানের চেয়ে ধর্ম অনেক বেশি আগ্রহশীল হতে বাধ্য। দুয়েরই অভীষ্টাসিদ্ধির পথ অভিজ্ঞতার পবিত্রতা সাধনের ভিতর দিয়ে। কিন্তু এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার দু'টি বিশিষ্ট রূপ আমাদের অনুধাবন করতে হবে। সত্য সাধারণ মানুষের কাছে যেভাবে প্রকাশ পায় তাকে অভিজ্ঞতার প্রাকৃতিক রূপ বলা চলে। সত্যের অন্তর্নিহিত রূপ প্রতিভাত হয় অভিজ্ঞতার গভীরতম প্রদেশে। প্রাকৃতিক রুপের ব্যাখ্যা করতে হবে মনস্তাত্ত্বিক বা শরীরতাত্ত্বিক পূর্ব ইতিহাসরে আলোকে; কিন্তু অন্তর্নিহিত রুপের ব্যাখ্যায় চাই সম্পূর্ণ আলাদা মাপকাঠি। বিজ্ঞান-জগতে সত্যের বাহ্যিক আচরণই প্রধান; ধর্ম-জগতে ঘটনাকে দেখতে হবে কোন সত্যের প্রতিভূ রূপে এবং এর অর্থ আবিষ্কার করতে হবে সেই সত্যের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করা। এ আলোচনা থেকে বোঝা যাবে যে, বৈজ্ঞানিক এবং ধর্মীয় কার্যক্রম পরস্পর সমান্তরাল। আসলে এ-দুই একই জগৎ বর্ণনার দু'টি আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ। পার্থক্য এইমাত্র যে, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সত্তাকে নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলতে হয়; কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টিতে সত্তা নিজ প্রতিযোগী বৃত্তিদের সমতা সাধন করে এমন একটি সাধারণ ক্ষেত্র রচনা করে যাতে তার অভিজ্ঞতাবলী একটি সামগ্রিকরূপে প্রতিভাত হয়। এই দু'টি সম্পূরক ধারার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য বিষয়ে একটু অনুধাবন করলেই বুঝতে পারা যাবে যে এরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ভ্রান্তি মোচনে আন্তরিকভাবে নিয়োজিত। একটি উদাহরণ দিলে বক্তব্যটি পরিষ্কার হবে। নিমিত্ত সম্বন্ধে আমাদের ধারণার সমালোচনায় হিউম যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তা দর্শন শাস্ত্রের চেয়ে বিজ্ঞান ইতিহাসেরই একটি অধ্যায়রূপে স্বীকৃতি লাভে বাধ্য। তাঁর বিচার-পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের প্রাধান্য এত বেশী যে, বস্তুর বিষয়গত প্রকৃতির ধারণা তাতে সম্পূর্ণরূপে বিবর্জিত। তাঁর মতে, যেহেতু 'শক্তিবাদের' কোন ইন্দ্রিয়াভূত ভিত্তি নেই, সেহেতু পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানকে তার আওতা মুক্ত করতে হবে। স্পষ্টত, বৈজ্ঞানিক কার্যক্রমকে ভ্রান্তিমুক্ত করে দাঁড় করাবার এ একটি আধুনিক মনোসুলভ প্রচেষ্টা-এবং এই-ই প্রথম প্রচেষ্টা।

www.nagorikpathagar.org

আইনস্টাইন প্রবর্তিত বিশ্ব প্রকৃতির গাণিতিক রূপায়ণে হিউমের ভ্রান্তমোচন প্রচেষ্টা শেষ পরিণতি লাভ করেছে, এবং তাতে হিউমীয় সিদ্ধান্তের পূর্ণ সমর্থন প্রকট হয়েছে-শক্তিবাদকে একেবারে বাদ দিয়ে। সারহিন্দীর যে মন্তব্য উপরে উদ্ধৃত হয়েছে, তা থেকে দেখা যাবে যে, ধর্মীয় মনস্তত্ত্বের বাস্তব গবেষণার ক্ষেত্রেও অনুভূতিকে বাহ্যিক প্রভাব থেকে মুক্ত করবার প্রচেষ্টা একইভাবে করা হয়ে থাকে। বিজ্ঞানী আপন ক্ষেত্রে যেমন, ধর্মপন্থীও ঠিক তেমনই তাঁর নিজের ক্ষেত্রে বাস্তবদৃষ্টির প্রতি সমভাবে সজাগ। অভিজ্ঞতা-পরম্পরায় এগিয়ে যাবার বেলায় তাঁর ভূমিকা শুধুমাত্র দর্শকের নয়, অবস্থিতির বিশিষ্ট ক্ষেত্রোপযোগী রীতি অনুসারে অভিজ্ঞতাকে যাচাই করে চলাও তাঁর প্রধানতম কাজ। এর পূর্ণ পরিণতির লাভ হয় একটি চিরন্তন, মৌলিক এবং স্বতঃস্ফূত জীবনী শক্তির সাথে নিকট পরিচয়। সত্তার চিরকালীন রহস্য এই যে, এই চরমতর সত্যদৃষ্টি লাভের সাথে সাথেই সে পরম সত্তাকে তার নিজ অস্তিত্বের মূলে বিরাজমান দেখতে পায়। অবশ্য এ অনুভূতি কোনরকম রহস্যাবৃত নয়। এমন কি, এর মধ্যে ভাবাবেগেরও কিছু নেই। অন্ত তপক্ষে মুসলিম সূফীবাদরে রীতি-নীতি সম্বন্ধে একথা বিশেষ করে বলা যায় যে, এ অভিজ্ঞতাকে পূর্ণভাবে ভাবাবেগ মুক্ত রাখবার জন্যে আরাধনা-অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্রের সহায়তা গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং নির্জন ধ্যান-ধারণার কোনরূপ সামাজিক প্রতিক্রিয়া যাতে না আসতে পারে সেই উদ্দেশ্যে দৈনিক সমষ্টিগত উপাসনার প্রয়োজনীয় উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এভাবে লব্ধ অভিজ্ঞতায় অপ্রাকৃতিক কিছু থাকতে পারে না। মানব সত্তা এভাবে তার পতিফলিত রূপের বন্ধন ছড়িয়ে এবং তার ক্ষণস্থায়িত্বকে অতিক্রম করে চিরন্তনে উপনীত হয়। এ পথের একমাত্র আশংকা এই যে, শেষ লক্ষ্যে পৌছবার আগে লব্ধ অভিজ্ঞতাবলীর দ্বারা মোহিত হয়ে কেউ কেউ সাধনায় শৈথিল্য অবলম্বন করতে পারেন। প্রাচ্যের সূফীতত্ত্বের ইতিহাসে এ রকম বিপাকে নজীর অনেক রয়েছে। সারহিন্দীর সংস্কার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল এই আশংকার অপসারণ। তার আভাস পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। এর কারণ সুস্পষ্ট। ব্যক্তিসত্তার মূল উদ্দেশ্য কিছু 'দেখা' নয়, কিছু 'হওয়া'। সত্তা নিজ 'সম্ভাবনার' পথেই বাস্তবদৃষ্টিকে প্রখর করে তুলবার সুযোগ আবিষ্কার করে এবং এতেই তার মৌলিকতর 'অহং'-এর সাথে মিলন ঘটে। যার প্রমাণ কাটেজীয় 'আমি ভাবি'-তে নয় কান্টীয় 'আমি পারি' তে পাওয়া যাবে। ব্যক্তিসত্তার চারমতর উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্ব বন্ধন থেকে মুক্তি অর্জন নয়; ব্যক্তিত্ব বন্ধনের মূল প্রকৃতির স্বচ্ছতর সংজ্ঞা উদ্ভাবন। এর শেষ কথা একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য জগৎ বা জীবনের ব্যবস্থাপনা মাত্র নয়, এ একটি জীবন্ত ও প্রেরণাধর্মী অনুভূতি-যা সত্তাকে আত্মদৃষ্টিতে গভীরতর প্রত্যয় দান করে এবং তার ইচ্চাশক্তিকে প্রবল করে তোলে। তার কাছে জগৎ শুধুমাত্র ধারণার মাধ্যমে দেখবার বা জনার বস্তু নয়, অবিরাম প্রচেষ্টায় গড়া, ভাঙা এবং পূনর্বার গড়ে তুলবার বিশাল ক্ষেত্র। অসীম প্রশান্তিত্ব আছে এতে এবং তার সাথে এর মধ্যে লুকিয়ে আছে ব্যক্তিসত্তার শ্রেষ্ঠতম পরীক্ষা মুহূর্ত-

তুমি কোন্ স্তরে আছ? জীবিত, মৃত, না জীবন্মৃত?

www.nagorikpathagar.org

তিনজন সাক্ষীকে ডাকো তোমার স্থান-নির্দেশে।
প্রথম সাক্ষী তোমার নিজের চেতনা-
নিজেরাই আলোকে নিজেকে নিরীক্ষণ করো।
দ্বিতীয় সাক্ষী অপর সত্তার চেতনা-
প্রথমে নিজ সত্তার তোমাকে দেখ,তারপর
যে সত্তা তোমা হতে ভিন্ন
তার আলোকে বিচার করো নিজেকে।
তৃতীয় সাক্ষী আল্লাহর চেতনা-
আগে নিজ সত্তায় নিজেকে দেখ, তারপর
আল্লাহর আলোকে নিজেকে বিচার করো।
এই আলোকের সম্মুখে যদি পারো
অকম্পিত দাঁড়িয়ে থাকতে,
মনে করো নিজেকে জীবন্ত
এবং চিরন্তন তাঁরই মতো।
একমাত্র সেই ব্যক্তিই খাঁটি, সে সাহসী হয়-
সাহসী হয় আল্লাহকে সামনাসামনি দেখতে।
মি'রাজ কি? আসলে তা একজন সাক্ষীর সন্ধান মাত্র,
যে সাক্ষী জানাবে তোমার সত্তাকে অলংঘ্য সমর্থন-
কেবল যে সাক্ষীর সমর্থনই তোমাকে চিরন্তন স্থান দেবে।
আল্লাহর সম্মুখে অকম্প থাকতে পারে না কেউ;
-কিন্তু যে পারে সে খাঁটি সোনা।
তুমি কি একটি ধুলিকণা মাত্র?
তোমর সত্তার গ্রন্থি শক্ত করে কষো;
তোমার ক্ষুদ্র অস্তিত্বকে দৃঢ় হস্তে ধরো।
কী গৌরবে-সত্তার আবর্জনা দূর করে
সূর্যরশ্মিতের দীপ্ত পরীক্ষা করা।
তোমার পুরোনো কাঠামোকে নতুন করে রং দাও,
নতুন অস্তিত্ব গড়ে তোলো-
সেই-ই খাঁটি অস্তিত্ব,
নয় তো তোমার সত্তা একটি ধূম্রজাল মাত্র!

(ভাষনটি আল্লামা ইকবালের ভাষণ সম্বলিত ইসলামী ফাউন্ডেশন হতে প্রকাশিত
ইসলাম ধর্মীয় চিন্তার পূর্নগঠন হতে সংকলিত)

www.nagorikpathagar.org

বারট্রান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০)

বিজ্ঞান ও যুদ্ধ

১৯৫০ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার গণিত শাস্ত্র দর্শন সাহিত্য, রাজনীতি। সমাজসেবা ইদ্যাদি বিষয়ে একজন আগধ মেধা শক্তির বিরল ব্যক্তিত্ব।

যুদ্ধের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক দিনকে দিন ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে। এটা শুরু হয় আর্কিমিডিসের সময় থেকে, যিনি তাঁর সম্পর্কীয় তাই সাইরাকিউজের শাসককে ২১২ খৃষ্ট পূর্বাব্দে রোমানদের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য সাহায্য করেছিলেন। প্লুটার্ক লিখিত 'মারসেল্লাস এর জবিনী'তে, আর্কিমিডিস যুদ্ধের কলগুলো যা যা উদ্ভাবন করেছিলেন তার একটা খুবই বিচিত্র এবং স্পস্টতাঃ অধিকতর কাল্পনিক বর্ণনা দেওয়া আছে। আমি নর্থের উদ্ধৃত দিচ্ছিঃ

যুদ্ধ শুরু হবার পূর্বে

"রাজা তাঁর কাছে সবধরণের অবরোধ এবং হামলার মুখে কিছু কল আক্রমণ এবং রক্ষণ উভয়ের জন্যই, তৈরী করতে অনুনয় করলেন। সেজন্য আর্কিমিডিস তাঁর তরে, বহু যন্ত্র তৈরী করলেন। কিন্তু রাজা হাইরন কোন সময় সেসব ব্যবহার করেননি, যেহেতু তিনি তাঁর রাজত্বকালের প্রায় অধিকাংশ সময়ই কোন যুদ্ধ ছাড়া শান্তিতে কাটান। কিন্তু এই ব্যবস্থা এবং যুদ্ধ উপকরণ সাইরাকিউজদের খুবই চমৎকারভাবে কাজে লেগেছিল ঐ সময় (যখন সাইরাকিউজ অবরুদ্ধ হয়েছিল)। তখন আর্কিমিডিস তাঁর যন্ত্রগুলোকে ব্যবহার করতে মনোনিবেশ করেছিলেন এবং স্বাধীনভাবে সেগুলোকে প্রয়োগ করেছিলেন। উর্দ্ধভাগে অজস্র ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হলো এবং বিস্ময়কর বৃহৎ পাথরগুলো অবিশ্বাস্য বিকট শব্দ এবং শক্তি নিয়ে হঠাৎ করে পদাতিক মানুষদের যারা স্থলপথে শহরটি আক্রমণ করতে এসেছিল, তাঁদের উপর পড়ে সবলে বিপর্যস্ত এবং ছিন্নভিন্ন করল। সবাই যারা এগুলোর অভিমুখে এসেছিল অথবা সেস্থানে অবতরণ করেছিল, কোন পার্থিব জনই এতভারী ওজনের প্রচণ্ডতা প্রতিহত করতে অক্ষম হলোঃ যার দরুণ তাদের সকল শ্রেণীই অদ্ভুতভাবে লন্ডভন্ড হয়ে গেল। সমুদ্রপথে যে ক্ষুদ্র জাহাজগুলো হামলা চালিয়েছিল তাদের মধ্যে কিছু, দীর্ঘ কাষ্ঠখন্ড দ্বারা ডুবে গেল, যেগুলো আকস্মিকভাবে দেয়াল সমূহের উপর থেকে কলের শক্তি দ্বারা ছোঁড়া হয়েছিল তাদের জাহাজগুলোর উপর এবং ফলে তাদের অতিরিক্ত ওজনের দরুন ডুবিয়ে

www.nagorikpathagar.org

দিয়েছিল। অন্য জাহাজগুলোর সম্মুখভাগ লোহার হাতসমূহ দ্বারা উত্তোলিত হলো, এবং সারস পাখীদের ঠোঁটগুলোর মত আক্‌শীগুলো তাদের পচাঁদভাগগুলো সাগরে নিমজ্জিত করল। একটা অপরটার বিপরীত এরকম কিছুকাল ভিতরে আবদ্ধ অবস্থায় অন্য কতগুলো জাহাজকে উপরে উঠিয়ে নাগরদোলার মত বাতাসে ঘোরাল আর তাদেরকে গোল দেয়ালগুলির পাশ দিয়ে পাহাড়ে নিক্ষেপ করল এবং সবকটাকে বিদীর্ণ করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিল, যাতে যেসব মানুষেরা ভিতরে ছিল তাদের ব্যাপক ক্ষতি অথবা মৃত্যু হলো। কখনও কখনও জাহাজগুলো এবং বড় নৌকারা পরিস্কার পানি থেকে উর্দ্ধে তোলা হয়েছিল, এটা ছিল ভীতিপ্রদ ব্যাপার তাদেরকে সেভাবে ঝুলতে এবং বাতাসে ঘুরতে দেখাটাঃ যে পর্যন্ত অর্দ্ধদ্বার দিয়ে তাদের ভিতরের মানুষগুলোকে কিছু এখানে, কিছু সেখানে, ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এভাবে ভীতিজনক ঘূর্ণনের ফলে তারা শেষ পর্যন্ত শূন্য হয়ে গিয়েছিল, এবং দেয়ালগুলোর বিপরীতে ভেঙ্গে পড়ল, অথবা সমুদ্রে আবার পতিত হলো, যখন, তাদেরকে কলগুলো ছেড়ে গিয়েছিল।"

বিভিন্ন রকমের বৈজ্ঞানিক বলা-কৌশল সত্ত্বেও রোমানরা যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিল এবং মহাবিজ্ঞানী আর্কিমিডিস একজন সাধারণ পদাতিক সৈন্যের দ্বারা নিহত হয়েছিলেন।

একজন ভাবতে পারেন প্রাচীন পরিক্ষিত ঐতিহ্যের অধিকারী সৈন্যরা, যাদের উপর ভিত্তি করে রোমানদের বিশাল সাম্রাজ্য দাঁড়িয়েছিল তাদের হাতে লম্বা চুলওয়ালা বিজ্ঞানীদের নব নব কৌশল আরেকবার পরাভূত হল দেখে রোমান প্রতিক্রিয়াশীলরা নিশ্চয়ই খুশীতে উল্লসিত হয়েছিল।

এতদসত্ত্বেও বিজ্ঞান যুদ্ধের ক্ষেত্রে একটা নিয়ামক শক্তি হিসাবে তার প্রাধান্য বজায় রাখল। কয়েক শতাব্দীব্যাপী গ্রীক অস্ত্র বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যটা টিকিয়ে রাখল। বন্দুক ও গোলাগুলি সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থাকে পংগু করল, জোয়ান অব আর্কের পৌরাণিক কাহিনীর জন্ম দিল ইংরাজ তীরন্দাজদের বাতিল করে দিয়ে। রেনেসাঁর সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ মানবেরাই বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ বিদ্যায় তাঁদের পারদর্শিতা দেখিয়ে ক্ষমতাশীলদের সুপারিশ যোগাড় করতেন। যখন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি মিলানে ডিউকের কাছে চাকরীপ্রার্থী হলেন, তখন একটা লম্বা চিঠিতে তিনি এ দূর্গাদির নির্মাণ কৌশলে নতুন উন্নত পদ্ধতি রপ্ত করেছেন তা লিখলেন এবং শেষবাক্যে, সংক্ষেপে জানালেন যে কিছু ছবিও তিনি আঁকতে পারেন। তিনি চাকরীটা পেলেন, যদিও আমি সন্দেহ করি ডিউক শেষবাক্য অবধি চিঠিটা পড়েন নি। যখন গ্যালিলিও তুসকানির গ্রান্ড ডিউকের অধীনে কর্মপ্রাথী হলেন, তখন গ্রান্ড ডিউক, নিক্ষেপ করা কামানের গোলার নির্দিষ্ট গমন- পথ সম্বন্ধে তাঁর গণনাতেই আস্থা স্থাপন করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের সময়

www.nagorikpathagar.org

বিজ্ঞানীরা তাঁদের জান বাঁচাতে পেরেছিলেন যুদ্ধ প্রচেষ্টায় যথেষ্ট অবদান রেখে। এর পাল্টা উদাহরণ হিসাবে মাত্র একটা ঘটনার কথাই আমি জানি। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় বিষাক্ত গ্যাস সম্বন্ধে ফ্যারাডের পরামর্শ চাওয়া হয়েছিল। তিনি জবাব দিয়েছিলেন যে এটা খুবই সম্ভব কিন্তু মানবতার খাতিরে অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যাপার। ঐ অদক্ষতার যুগে তাঁর মতই বজায় ছিল। কিন্তু সেও বহুদিনপূর্বের ব্যাপার।

বীরপূজার যুগের রোমান্টিক ভাষায় 'কিং লেইক' ক্রিমিয়ার যুদ্ধের বন্দনা করতে পারেন, তবে আধুনিক যুদ্ধ হল সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। সন্দেহ নেই যে এখনও বহু সাহসী সামরিক অফিসার এবং সৈনিক আছেন যাঁরা প্রাচীন পন্থায় মহৎভাবে জীবন বিসর্জন দিতে পারেন, কিন্তু তাঁরা এখন মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নন। একজন আণবিক পদার্থবিদ বহু ডিভিশন পদাতিকের চেয়েও মূল্যবান এবং সর্বাধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ ছাড়াও যুদ্ধে যা সাফল্য আনে তা বীর সৈনিকবর্গ নয় বরং ভারী শিল্প। পার্ল হারবারের পতনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য চিন্তা করুন। জাপানীদের মত কোন জাতিই এত বীরত্ব প্রদর্শন করেনি, কিন্তু তাঁরা পরাজিত হয়েছিল আমেরিকার শিল্পোৎপাদনের কাছে। আধুনিক জাতিসমূহ যুদ্ধ জয়ের জন্য নিশ্চয় লক্ষ্য রাখবেন ইস্পাত, তেল এবং ইউরেনিয়ামের দিকে, সামরিক উদ্দীপনার দিকে নয়।

এ পর্যন্ত দেখা যায়, আধুনিক কালের যুদ্ধবিগ্রহ আগেকার কম বৈজ্ঞানিক যুগের চেয়ে অধিক জীবননাশী নয়; কারণ একদিকে যেমন অস্ত্রের মারণক্ষমতার বৃদ্ধি হয়েছে অপরদিকে সমভাবে ওষুধপত্র ও স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থারও উন্নতি হয়েছে।

কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত মড়ক শত্রুর প্রচেষ্টার চেয়ে বেশী জীবনাশী হিসাবে প্রতীয়মান হয়েছে। যখন সেনাচারীব জেরুজালেম অবরোধ করেছিলেন, তাঁর সেনাবাহিনীর ১৮৫,০০০ লোক একরাত্রেই মড়কে মারা গিয়েছিল। এথেন্সের প্লেগ রোগ পেলোপোনেসিয়ান যুদ্ধের ফল নির্ধারণের জন্য বেশী দায়ী ছিল। সাইরাকিউজ এবং কার্থেজের মধ্যে যুদ্ধগুলো বেশীর ভাগই সমাপ্ত হতো মড়কের মাঝ দিয়ে। বারবারোস্যা, লমবার্ড লীগকে পুরোপুরি যুদ্ধে পরাস্ত করার পর তাঁর প্রায় সমুদয় বাহিনীই হারালেন রোগের প্রাদুর্ভাব এবং আল্পস পর্বত পেরিয়ে গোপনে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন।

এই সকল যুদ্ধকালে মহামারীতে যে লোক ক্ষয় হতো তা আমাদের নিজেদের শতাব্দীর দুটো মহাযুদ্ধের চেয়েও বহু বেশী। আমি বলছিনা যে ভবিষ্যতের যুদ্ধগুলোতে মানব-মৃত্যুর হার শেষ দুটো মহাযুদ্ধের মতো কম হবে, কারণ সেই বিষয়ে আমি একটু পরেই আলোচনায় আসছি। তবে আমি শুধু বলছি, যা বহুলোক অনুধাবন করতে পারে না যে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিজ্ঞান যুদ্ধকে অধিক ধবংশাত্মক হিসাবে পরিগণিত করেনি।

www.nagorikpathagar.org

অবশ্য অন্যান্য কতগুলো দিক দিয়ে যুদ্ধের মন্দ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণে। ধরতে গেলে ফ্রান্স ক্রমাগত যুদ্ধ জড়িয়েছিল ১৭৯২ সাল থেকে ১৮১৫ সাল পর্যন্ত এবং শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয়েছিল, কিন্তু ফ্রান্সের জনগণ ১৮১৫ সালের পরে এমনকিছু কষ্ট স্বীকার করেনি, যা সমস্ত মধ্য ইউরোপকে ১৯৪৫ সালের পর করতে হয়েছিল। যুদ্ধে নিয়োজিত একটা আধুনিক জাতি বেশী গঠনমূলক, বেশী সুশৃঙ্খল এবং যুদ্ধ জয়ের জন অধিক একাগ্রচিত্ত হতে সচেষ্ট হয় যেটা শিল্পোন্নয়নের পূর্বকালে সম্ভব ছিল না। এবং এর পরিণতিতে দেখা যায় পরাজয় এখন আরো গুরুতর রূপ ধারণ করে, ভাঙ্গন আরো ব্যাপক হয়, এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে হতাশা বৃদ্ধি পায় যা নেপোলিয়নের যুগে সম্ভব ছিল না।

তবে এ ব্যাপারেও কিন্তু সম্ভব না কোন সাধারণ বিধি প্রণয়ন করা। প্রাচীনকালেও কতগুলো যুদ্ধ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মত ভাঙ্গন সৃষ্টিকারী ও ধবংসাত্মক হয়েছিল পরাভূত দেশসমূহ সভ্যতার জন্যে। উত্তর আফ্রিকা রোমানদের আমলে যে সচ্ছলতার অধিকারী ছিল তা আর কখনও ফিরে পায়নি। পারস্য মংগোলদের আঘাত থেকে কখনও সেরে উঠতে পারেনি যেমন সিরিয়া তুর্কীদের কারণে। সবসময়ে দু ধরণের যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে এসেছে, যার একটাতে পরাজিতদের সর্বনাশ ঘটেছে আর অন্যটিতে পরাজিতরা শুধু কষ্টের সম্মুখীন হয়েছে। আমরা, দুঃখজনক হলেও মনে হয়, এমন এক সময়ের সম্মুখীন হচ্ছি, যখন যুদ্ধ প্রথমোক্ত পর্যায়ের মত ফলদায়ক হবে।

আণবিক বোমা এবং আরো বেশী করে হাইড্রোজেন বোমা, নতুন ভয়ের কারণ হয়েছে। তারা মানব জীবনের উপর বিজ্ঞানের প্রভাব সম্পর্কে নতুন সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। আইনষ্টাইনের মতো কয়েকজন খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ উল্লেখ করেছেন এই গ্রহের জীবজগতের সম্পূর্ণ বিনাশের বিপদ সম্পর্কে। আমি নিজে মনে করি না যে এটা পরবর্তী যুদ্ধেই ঘটবে, তবে মনে করি এটা তার পরের যুদ্ধে ঘটবে, যদি যে যুদ্ধ ঘটতে দেওয়া হয়। যদি এই ধারণা সঠিক হয়, তবে আমাদের সম্মুখে আগামী পঞ্চাশ বছরে দুটো বিকল্প পথ খোলা আছে।

হয় আমরা মানবজাতিকে স্ব-ইচ্ছায় আত্মঘাতী হতে মত দিব, অথবা আমার আমাদের প্রিয় কতকগুলো অধিকার বর্জন করবো, বিশেষ করে যখন খুশী তখনই বিদেশীদের হত্যা করার অধিকারটুকু। সম্ভবতঃ আমি মনে করি মানবজাতি নিজের চরম বিলুপ্তির পথটিকেই গ্রহণযোগ্য বলে বেছে নেবে। এই বাছাই অবশ্য করা হবে, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, সার্বজনীন ধ্বংসের ঝুঁকি ছাড়াই যারা সত্যপথে আছে তাদের জয় অবশ্যম্ভাবী (উভয়পক্ষের সামরিক জান্তারা অন্ততঃ এইভাবে বোঝাবো)। আমরা সম্ভবতঃ মানবজাতির শেষপর্বে বাস করছি এবং যদি তা হয়, এটা বিজ্ঞানের কারণে যে সে বিলুপ্ত হবে।

Throught the Middle Ages, the mohammedans were more civilized and more humane than the christians perceuted Jeus, spelially at the time of religions excitement, the crusaders were associated with appalins programrnes. In the mohamedan countries on the contar, Jews at most times were not ill treated- B. Russel- history of western philosophy. P. 343

www.nagorikpathagar.org

তবে যদি মানবজাতি টিকে থাকার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে, তাকে তার চিন্তায়, অনুভূতিতে, ব্যবহারে অনেক বিরাট পরিবর্তন সূচীত করতে হবে। আমাদের নিশ্চয়ই এমন কথা না বলতে শিখতে হবে যে, "অসম্মানের চেয়ে মৃত্যু ভাল।"

আমরা নিশ্চয় আইন মেনে চলতে শিখব, এমনকি যদিও তা বিদেশীদের দ্বারা নির্ধারণ করা হয়, যাদেরকে কিনা আমরা ঘৃণা ও অবজ্ঞা করি এবং যাদেরকে ন্যায়ের ব্যাপারে একেবারে অন্ধ বলে বিশ্বাস করি। কতগুলো স্থুল দৃষ্টান্ত বিবেচনা করা যাক। ইহুদী এবং আরবরা মধ্যস্থতা স্বীকার করতে বাধ্য থাকবে। যদি রায় ইহুদীদের বিরুদ্ধে যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পরবর্তী নির্বাচনে তাঁর বিপক্ষ দলের বিজয় নিশ্চিত করবেন, কারণ তিনি যেহেতু আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বকে সমর্থন করবেন, সেহেতু নিউইয়র্ক রাজ্যের ইহুদী ভোটগুলো হারাবেন। অপরদিকে, যদি রায় ইহুদীদের পক্ষে যায়, মুসলিম জগত তাহলে বিগড়ে যাবে এবং অন্যান্য অসন্তুষ্ট পক্ষরা এতে যোগ দেবে। অথবা আরেকটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক, আলষ্টারের প্রোটেষ্টান্টদের নির্যাতন করার জন্য আয়ার হয়তো তার অধিকার দাবি করবে এবং এই প্রসেঙ্গ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়তো আয়ারকে সমর্থন দেব ওদিকে বৃটেন আরষ্টরকে। এ ধরনের মতভেদ কি একটা আন্ত র্জাতিক কর্তৃপক্ষ সামলাতে পারবে? আবারঃ ভারত ও পাকিস্থান কাশ্মীরের ব্যাপারে একমত নয়, কাজেই একপক্ষ নিশ্চয় রাশিয়াকে সমর্থন করবে এবং অপরপক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে। এটা পরিস্কার যে এই সব বিবাদের মধ্যে যে পক্ষই জড়িত থকবে, তার কাছেই আমাদের এ গ্রহে প্রাণের টিকে থাকার চেয়ে ঐ বিষয়টি বেশী গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে প্রতীয়মান হবে। মানবজাতি শেষ পর্যন্ত নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখবে এইটুকু আশার সম্ভাবনাও তাই খুব দুর্বল।

কিন্তু যদি মানবজীবন বিজ্ঞানকে নিয়েই টিকে থাকতে চায়, মানবজাতিকে নিজেদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে শিখতে হবে, পূর্বে যার তেমন প্রয়োজন ছিল না। মানুষদের আইন মেনে চলতে হবে, যদিও তারা মনে করে আইনটা অনুচিত এবং অন্যায্য। জাতিসমূহ যখন নিম্নতম বিচারের দাবীতে প্রলুব্ধ হবে, তখন যদি তাদের দাবী নিরপেক্ষ কর্তৃত্ব দ্বারা অস্বীকৃত হয়, তাহলে ও তাদেরকে মেনে নিতে হবে। আমি বলছি না এটা খুব সহজ হবে; আমি ভবিষ্যৎবাণী করছি না এটাই ঘটবে; আমি শুধু বলছি এসব যদি না হয়, মানবজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বিজ্ঞানের কারণে।

পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে একটা ধ্রুব সিদ্ধান্ত নিতে হবে- যুক্তি এবং মৃত্যুর মাঝখানে। এবং 'যুক্তি' বলতে আমি বোঝাচ্ছি আন্তর্জাতিক কর্তৃত্ব দ্বারা জারীকৃত আইনের প্রতি সমর্থন জানানোকে। আমি ভয় পাচ্ছি মানব জাতি না মৃত্যুকেই পছন্দ করে। আশা করি আমার এই ভয় ভুল প্রমাণিত হবে।

(জুন ৯, ১৯৮৯ইং তারিখে দৈনিক বাংলায় শুক্রবারের সাহিত্য সাময়িকীতে প্রকাশিত। 'সমাজের উপর বিজ্ঞানের প্রভাব' গ্রন্থ থেকে আহমেদ আশারাফ অনুদিত।)

www.nagorikpathagar.org

শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২)

১৯৫৮ সনের ১৮ মার্চ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসেবে সমাবর্তনে ছাত্রদের উদ্দেশে দেয়া ভাষণ।

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৭ সনে জননায়ক এ.কে. ফজলুল হককে অনারারি ডক্টরেট এনএলডি উপাধি প্রদান করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে এই সম্মানে সম্মানিত করা হয়।)

"মিঃ ভাইস চ্যান্সেলর, ভদ্র মহোদর ও ভদ্র মহিলাগণ

আমার জীবন সায়েহ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে চ্যান্সেলর হিসেবে সভাপতিত্ব করা আমার জীবনে সবচেয়ে গৌরবময় মুহূর্ত বলে আমি মনে করি। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার আহবান জানাবার জন্য আমি ভাইস চ্যান্সেলরের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধনকৃত গ্রাজুয়েট মোহাম্মদ হোসেন খানের দুঃখজনক, বিয়োগাত্মক এবং অকাল মৃত্যু স্মরণ না করে শুরু করতে পারছি না। নির্বাহী পরিষদে কোর্ট কর্তৃক তিনি সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পরপরই মৃত্যুবরণ করেন। তার মূল্যবান সেবা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এমন সময় বঞ্চিত হলো যখন তার উদ্ভুত প্রতিভা এবং তীক্ষ্ণ জ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যন্ত মূল্যবান অবদান রাখার কথা ছিল।

আমি ভাইস চ্যান্সেলরের পণ্ডিতপূর্ণ ভাষণ নিবিষ্ট মনে ও গভীর আগ্রহে শুনেছি। সম্প্রতি নিসন্দেহে পাকিস্তানের সর্বত্র শিক্ষা সম্পর্কে ব্যাপক আলোড়ন হয়েছে। ভাইস চ্যাঞ্চলর সঠিক গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে শিক্ষা চিন্তায় এ আলোড়ন স্বাভাবিক। আপনাদের স্মরণ করে দেয়ার প্রয়োজন নেই যে প্রত্যেক দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে জনগণকে যে শিক্ষা প্রদান করে তার গুনগত মানের ওপর। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ব্যতীত শিক্ষা প্রসার সম্ভব নয়। বস্তুত পৃথিবীতে বিশ্ববিদ্যালয় এত প্রয়োজন যে যদি বিশ্ববিদ্যালয় অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। তাহলে আমাদের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে যাবে। বিজ্ঞানের কৌশল চর্চার ভিত্তিতে ব্যাপক বিশ্ববিদ্যায় শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিক জাতি সভ্যতায় অগ্রগতি অর্জন করছে। ভাইসচ্যান্সেলর বলেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পাদপীঠ এবং সকল জাতির ঐক্যের পথ সূচনা করে। তার এ

www.nagorikpathagar.org

সঠিক বক্তব্যের সাথে আমি একমত। আমাদের দেশের মুক্তি নির্ভর করছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভিত্তিতে শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কারের ওপর। বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণ সর্বদা জ্ঞান ও সত্যের সন্ধানে নিজেদের উৎসর্গ করছেন। তারা দেশের ইতিহাসে দেখা যায় সেদেশের পণ্ডিত ও প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীগণ জাতীয় জীবনে শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে। জ্ঞান অর্জনের জন্য আমাদের সামনে ইসলামের নির্দেশ আছে 'জ্ঞান অর্জনের জন্য। এমনকি পৃথিবীর সর্বদূরে (চীন) অবস্থিত স্থানে যেতে হলেও যাবে'। কোরানের পূর্ণ নির্দেশ ও অনেক স্বীকৃত হাদিস অনুসারে খোদার বিশ্বকে জানার মাধ্যমে আমাদের সকল বিষয় ব্যবহার ও শক্তি অর্জন করতে হবে।

আমি বলেছি যে ইসলাম ধর্ম সবসময় মুক্ত বিদ্যার প্রসার উৎসাহিত করে। মানুষের সৃষ্টিশীল অনুভূতি প্রগতিশীল প্রসারকে গুরুত্ব প্রদান করে। পবিত্র কোরান মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে বর্ণনা করছে। আল্লাহ যখন মানুষকে এরূপ সম্মানিত অবস্থান প্রদান করছে তখন মানুষের দায়িত্ব নয় যে তার সৃষ্টিকর্তার প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারি না তাহ হলে নিশ্চয় আমরা বিশ্ব শান্তি এবং মানব জাতির ঐক্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রগতি লাভ করতে পারবো এবং আমরা আমাদের মর্যাদা প্রমাণ করতে পারবো যে ইসলামের বাণী 'ঐক্য ও শান্তি।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্ষেত্রে যেসকল সমস্যা আছে সে সর্ম্পকে আমি সম্পূর্ণ অবহিত। আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে প্রদেশের শিক্ষা চাহিদা বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে সরকার সম্পূর্ণ সজাগ। শিক্ষাখাতে সরকারের বরাদ্দবৃদ্ধি থেকে একথা প্রমাণিত হয়। ১৯৫৬-৫৭ সনের ৬.৭৫ লক্ষ বরাদ্দ হতে ১৯৫৭-৫৮ সনে ১২.০২ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইন্টারমেডিয়েট পর্যায়ে ইডেন গালর্স কলেজে গার্হস্থ্ বিজ্ঞান খোলা হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা কালে একটি পুর্ণাঙ্গ গার্হস্থ্ বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে। ঢাকা কলেজে ৩০০ ছাত্রের জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। আজিমপুরের নিকট নতুন স্থানে ইডেন কলেজ ও হোষ্টেল নির্মাণ আগামী একবছরে সমাপ্ত হবে। আলিয়া মাদ্রাসার জন্য নতুন ভবন নির্মাণের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

সমাজ উন্নয়নের অর্ন্তভূক্ত সকল প্রতিষ্ঠান ১৯৫২ সন হতে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছো। বর্তমানে অর্থ বছরে ৬৬.৫ লক্ষ বরাদ্দ করা হয়েছে।

কারিগরী শিক্ষা ক্ষেত্রে কিছু বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে। আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ডিগ্রি পর্যায়ে ভর্তির সংখ্যা দ্বিগুন করা হয়েছে। দুটি প্রকৌশল উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উচ্চ বিদ্যালয়গুলোর বহুবিধ পাঠ্যক্রম

www.nagorikpathagar.org

চালু করা হবে এবং একটি আর্কিটেকচার ও টাউন প্লানিং কলেজ শুরু করা হবে। এসকল কর্মসূচী আমাদের শিক্ষা ব্যাবস্থায় নতুনত্ব আনবে।

আনন্দের কথা ঢাকা ও রাজশাহী উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্ত সম্পদের ভিত্তিতে উন্নয়ণের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি বিষয় খোলা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে সুস্থ পরিবেশ গড়ার লক্ষ্যে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণের জন্য জমি সংগ্রহ করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষদের জন্য অধিগ্রহণকৃত কয়েকটি বাসভবনের পরিবর্তে সরকারী বাসভবন বরাদ্দ করা হয়েছে।

আমি আশাকরি যে আপনাদের সব সম্যাসার দূর করার জন্য সরকার দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আমি পুনরায় আপনাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে আপনাদের প্রয়োজনে সুযোগ প্রদানের জন্য আমার সে ক্ষমতা আছে তা দিয়ে কাজ করবো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটগণ, ছাত্র-জীবনের দেয়াল অতিক্রমের জন্য আমি তোমাদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এটা তোমাদের জন্য খুলে দেবে আকাঙ্ক্ষা, পুরস্কার, সাফল্য এবং নিরাশার বিরাট দরজা, যা আজকের এই বস্তুবাদী পৃথিবী তোমাদের প্রদান করবে। তোমরা মাত্র জীবনযুদ্ধ শুরু করতে যাচ্ছ, আমি তোমাদের আশীবার্দ করছি এবং তোমাদের সকলের জন্য প্রার্থনা করছি। কিন্তু তোমাদের মহান শিক্ষা নিকেতন ত্যাগ করার পূর্বে আমি মাতা-পিতার ন্যায় উপদেশ দিচ্ছি-প্রথমত তোমরা জীবনক্ষেত্রে যেখানেই থাক না কেন, যে বিশ্ববিদ্যালয় তোমাদের মানুষ করেছে তার মান-মর্যাদা তুলে ধরবে। এর ঐতিহ্য এবং এটা তোমাদের জ্ঞানদান করছে সে সম্পর্কে গর্বিত থাকবে। এ কথা মনে রেখ, তোমরা সকল সমস্যাসহ পৃথিবীকে গ্রহণ করছে। ভাইস চ্যান্সেলর তাঁর বক্তৃতায়, তোমাদের উপদেশ দিয়েছেন যা তোমাদের সর্বাদ মনে রাখতে হবে। আমি আমার উপদেশ, যা আমি এই মাত্রা পড়লাম, তা সংযোজন করলাম। খোদা তাঁর সবচেয়ে পছন্দমত আশীবার্দ তোমাদের ওপর বর্ষণ করুন এবং জীবনে কৃতিত্বের সাথে সফলকাম হও এবং মাতা-পিতা, বিদ্যানিকেতন ও দেশের কাছে গৌরব ও আনন্দের কারণ হও।

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমি শংকিত ও এখনই আমার বক্তব্য শেষ করবো। আমার বক্তব্য শোনার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ বক্তব্যটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রয়োজনে যে দার্শনিক ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতার ওপর গুরুত্ব প্রদানের চেয়ে তথ্য বিবরণী পূর্ণ। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলো প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক তাদের আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আমি আশা করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাকিস্তানের সকল পণ্ডিতদের জন্য জলন্ত প্রদীপ হবে। আমীন।”

(সূত্র: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা)

www.nagorikpathagar.org

উইলস্ট্রন চার্চিল (১৮৭৪-১৯৬৫)

উইলসন্টন চার্চিল নোবেল বিজয়ী বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী, ১৯৪০ সালে ১৮ই জুন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, যখন বৃটিশ জার্মান বাহিনীর আক্রমনের দ্বার প্রান্তে তখন তিনি বৃটিশ জনগনকে চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ ভাষন দেন। যা যুদ্ধের গতি পরিবর্তন করে বিজয় এনে দেয়।

This Was The Finest Hour

আমরা এখনো জানি না সামনে ফ্রান্সে কি ঘটবে বা অন্যথায় ফ্রান্সের প্রতিরোধ দীর্ঘায়িত হতে কিনা। এই উভই নির্ভর করছে ফ্রান্স ও ফ্রান্স উপনিবেশে স্থান সমূহের উপর। ফরাসী সরকার এই সুযোগগুলো ভ্রুক্ষেপ করছে। এবং তাদের ভবিষৎকে অনিয়ন্ত্রণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যদি তাহারা যুদ্ধ চুক্তি মোতাবেক যুদ্ধ চালিয়ে না যায় তাতে তাদের মুক্তির আশা দেখছিনা। আজ সংসদকে সেই ঐতিহাসিক ঘোষণা পড়ে দেখতে হবে যেখানে ফরাসীদের প্রত্যাশা নিহিত আছে এবং যাহা আমাদের হৃদয় থেকে উৎসারিত এবং যেখানে আমাদের প্রতিজ্ঞা উৎকীর্ণ আছে। অন্ধকারাছন্ন সময়ে যেখানে ফরাসী ইতিহাসের আপামর জনসাধারণের সংগ্রামের ঐকোমতের সিদ্ধান্ত নিহিত। ফরাসী বাসী ফ্রান্স সরকার অথবা অন্যান্য ফ্রান্স শাসিত এলাকায় বস্তুত যাহাই হোকনা কেন আমরা এই জমিনে, এই বৃটিশ সম্রাজ্যের মধ্যে ফরাসীদের বন্ধুত্বের কোন ক্ষতি হতে দেব না। তাঁহরা যে দু:খ কষ্ট সহ্য করছে তাহা থেকে পরিত্রান করতে তাঁদের দৃঢ়তা বাড়িয়ে দিতে হবে এবং যখন চূড়ান্ত বিজয় আমাদের কবজায় এসে যাবে তখন তাঁহারও সেই ফলাফলের অংশীদার হবে, হবে বিজয়ের সাথে পাবে স্বাধীনতা যা সর্বসাধারনের জন্য সংরক্ষিত। আমরা আমাদের তৎক্ষনিক ভাবে কোন কিছুই প্রশামত করছিনা, এক বিন্দু এক তিল পরিমান ও সরে যাচ্ছিনা। আজ চেক, পোলিশ নরওয়েজিয়ান ডাচ, বেলজিয়ান বাসীরা একত্রিত-হয়েছে, আমাদের সাথে তাঁদের প্রয়োজনে। তাহাদের সবারই স্বাধীনতা সংরক্ষিত থাকবে।

কি বলছে ওয়েগ্যান্ড, ফরাসী জেনারেল? যে ফরাসীদের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে? আমি মান করছি বৃটিশদের যুদ্ধত সবে মাত্র শুরু। আজ এই যুদ্ধের উপরই খৃষ্ট সভ্যতা

www.nagorikpathagar.org

অস্তিত্ব নির্ভর করছে। বৃটিশের নিজস্ব জীবনধারা দীর্ঘসভ্যতার ধারাবাহিকতা এবং সম্রাজ্যের অস্তিত্ব এই যুদ্ধের উপরই নির্ভর করছে। শত্রুদের সমস্ত ক্রোশ ও প্রচন্ডতা অতি দ্রুত আমাদের করতলে আসতে বাধ্য। হিটলার জানে যে তাকে অবশ্যই আমাদেরকে পরাভূত করতে হবে অন্যাথায় তাকে ধ্বংস হতে হবে। যদি আমরা রুখে দাড়াই তবেই তামাম ইউরোপমুক্ত হবে এবং পৃথিবী জীবন ফিরে পাবে এবং সূর্যালোক দেখা দিবে। আমরা যদি ব্যার্থ হই তাহলে তামাম বিশ্ব মার্কিন, বাকী দুনিয়া যা আমাদের আওতায় তা অসীম অন্ধকারে পতিতহবে এবং বিশ্ব, নিক্ষিপ্ত হবো সম্ভাব্য অধিক অরক্ষিত বিকৃত বিজ্ঞানের শিকারে। সুতরাং আমাদেরকে দক্ষতা আরও সূদৃঢ় করতে হবে এবং নিজের উপর নির্ভরশীলতা এমন ভাবে বাড়াতে হবে, যাতে বৃটিশ সম্রাজ্য ও কমনওয়েনাথ হাজার বছর টিকে থাকে। মানুষ চিরদিন যেন বলে "এটাইছিল তাদের চমৎকার সময় " This Was Their Finest Hour`s.

(ওয়েভসাইট থেকে সংগ্রহ)

www.nagorikpathagar.org

কায়দে আযম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্ (১৮৭৬-১৯৪৮)

১৯৪৩ সালের এপ্রিলে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলীগ লীগের বার্ষিক সম্মেলনে কায়েদে আযমের ভাষণঃ

সমাগত ডেলিগেট ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

পুনরায় আপনারা যে আমাকে সভাপতি নির্বাচিত করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এই সম্মান ও মর্যাদা যে কোনও লোকেরই কাম্য। আশা করি, আগামী বৎসর আমি আপনাদের সহযোগিতা ও সমর্থনে নিখিল ভারত মোছলেম লীগের নীতি ও কার্যক্রম পরিচালনে সক্ষম হইব।

আমি মনে করি এই কয়মাসে বাংলার মুছলমানগণ এমনভাবে নিজেদেরকে সংঘবদ্ধ করিয়াছে যাহার নজীর বাংলার ইতিহাসে নাই। তাহারা যথেষ্ট নির্যাতন ভোগ করিয়াছি। আমি বাংলার মুছলমানদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি। এই ব্যাপার বাংলার মোছলেম যুবকদের এই কৃতিত্ব অনেকখানি। তাহারই অত্যাচারীর দফা-রফা করিয়া দিয়াছেন। কয়েক মাস পূর্বে নাটোর নির্বাচনে ইহার প্রমাণ পাওয় গিয়াছে। আমি আনন্দের সহিত বলিতেছি যে, আমাদের প্রার্থীর বিরুদ্ধে আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা যে প্রার্থী দাঁড় করাইয়াছিলেন তাঁহারা জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। প্রত্যেক উপনির্বাচনেই আমরা জয়লাভ করিয়াছি। উচ্চ পরিষদের গত নির্বাচনে আমরা সবগুলি আসনই দখল করিয়াছি।

বাংলা এই রুপে প্রমাণ করিয়াছে যে, সেখানে ছল চাতুরী করার আর উপায় নাই। বাংলা এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। উহা হইতে অন্যেরা শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। লীগ এক্ষণে জনমতের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মিল্লাতের কতৃত্ব এক্ষণে লীগের উপরই অর্পিত হইয়াছে।

মোছলেম জাতির লক্ষ্য ও আদর্শ

আমাদিগকে অনেক কিছু করিতে হইবে। আমরা কি জন্য সংগ্রাম করিতেছি তাহা অবশ্য এক্ষণে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। যে ব্যক্তি ইহা বুঝে না বলিয়া ভান করে, তাহাকে কি নামে অভিহিত করিব? হয় সে আহমক, না হয় কপট। আমাদের আদর্শ ও

www.nagorikpathagar.org

দাবী পরিষ্কার। আমরা কি চাই? আমাদের নিজস্ব আবাস ভূমিতে এবং যেখানে আমাদের সংখ্যাধিক্য রহিয়াছে সেখানে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাই।

১৮৮৪ সন হইতে ১৯০৭ সন পর্যন্ত মুছলমানেরা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তাহারই ফঠলে ঐ সময়ে তাহারা পৃথক নির্বাচনের দাবী উত্থাপন করে। তখন আমার বয়স খুব অল্প। মহান হিন্দু নেতা গোখলে ও 'দাদাভাই নৌরজী কতকগুলি নীতি Imbibe করেন। তন্মাধ্যে একটি হইতেছে এই যে, সমানাধিকারের ভিত্তিতে দেশের এই দুইটি প্রধান জাতির মধ্যে যাহাতে বুঝাপড়া হয় তজ্জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিৎ। ঐসব মিঃ গোখলে মুছলমানদের পক্ষালম্বন করেন। তিনি ছিলেন উদার ও উন্নতমনা রাজনীতিক এবং তাঁহার প্রতিভাও ছিল বিরাট। ১৯০৭ সনে গোখলে ঘোষণা করেনঃ "হিন্দুরা সংখ্যায় অত্যধিক বলিয়া মুছলমানদের ন্যায় হইতে পারে। তাহাদের এই আশঙ্কা উপহাসের বস্তু নহে। সংখ্যার দিক দিয়া হিন্দুদের অবস্থা যদি মুছলমানদের ন্যায় হইত তবে তাহারাও কি এইরূপ সংশয়ে পতিত হইত না? নিঃসন্দেহে আমাদের মনেও এইরূপ আশঙ্কার উদ্রেক হইত এবং মুছলমানেরা আজ যে নীতি অবলম্বন করিতেছে আমরাও সেই নীতিই অবলম্বন করিতাম।

মিঃ গান্ধীর স্বরূপ

১৯১৬-১৭ সালের কথা। যখন এই সমস্ত্ম ঘটনা ঘটিতেছিল তখন ভারতাকাশে উদিত হইলেন মিঃ গান্ধী। ১৯২০ সালেল ১২ই মে তারিখে "ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রে মিঃ গান্ধী ঘোষণা করেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে, ৭ বৎসর পূর্বে এই মাসেই মিঃ বি, পি, পাল তাঁহার ঘোষণা প্রচার করেন। মিঃ গান্ধী কি বলিয়াছিলেন? তিনি বলিয়াছিলেন-"এইগুলিকে আমি রাজনীতি বলিয়া মনে করি না-ধর্ম বলিয়া মনে করি। এইগুলি ধর্মকার্যে সহায়তা করিয়া থাকে।" আপনারা পরে দেখিতে পাইবেন, তিনি তাঁহার ঘোষণা মোতাবেক কি করিয়াছেন। তিনি আরো বলেন, "আমরা রাজনৈতিক সত্তা আমার কোন সিদ্ধান্তের উপরই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। আজকাল রাজনীতি আমাদিগকে সাপের ন্যায় কুন্ডলী পাকাইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে বলিয়া আমি রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করি। যে যত চেষ্টাই করুন না কেন ইহা হইতে বাহির হইয়া আসা কাহারো পক্ষে সম্ভব নহে। এই সর্পের সহিত লড়িবারদ জন্য আমি এবং আমার সহকর্মীগণ; রাজনীনিতিতে ধর্মের আমদানী করিয়া রাজনীতি ক্ষেত্রে পরীক্ষা কার্য চালাইতেছি।"

পরে বুঝিতে পারিবেন; মিঃ গান্ধী এই পরীক্ষা কার্য চালাইয়েছেন প্রতিহিংসনাবৃত্তি চরিতার্থতার মধ্য দিয়া। ১৯২১ সনে নাগরপুর অধিবেশনে কংগ্রেসের উপর মাতব্বরী প্রতিষ্ঠার পর ঐ সনের ১২ই অক্টোবর তারিখে "ইয়ং ইন্ডিয়া" পত্রে মিঃ গান্ধী লিখিয়াছিলেন "আমি নিজেকে একজন সনাতনী (গোঁড়া) হিন্দু বলিয়া মনে করি,

www.nagorikpathagar.org

কারণ প্রথমতঃ আমি বেদ, পুরাণ এবং হিন্দুরা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাসী, আর সঙ্গে সঙ্গে অবতারবাদ এবং পুনর্জ্জন্মেও বিশ্বাসী।" অবশেষে 'তিনি নিজেই একজন অবতার হইয়া পড়েন।

"দ্বিতীয়তঃ আমি বর্ণাশ্রম ধর্ম (জাতিভেদ প্রথা) ও ইহার বৈদিক নীতিতে বিশ্বাসী। তৃতীয়তঃ আমি গো-রক্ষা কার্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। ইহাকে আমি বিশ্বাসের বস্তু বলিয়াই মানি। চতুর্থতঃ মূর্ত্তি পূজায়াও আমি অবিশ্বাসী নই।"

কেমন মোলায়েম করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "আমি মূর্ত্তি পূজায়ও অবিশ্বাসী নই!"

মিঃ গান্ধীর এই সমস্ত পরিষ্কার ও অদ্ব্যর্থক ঘোষনা সত্ত্বেও হিন্দু জাতীয়তাবদীগণ কিছুটা বিচলিত হইয়া পড়েন। তাঁহারা জানিতেন না এই লোকটাও কত চালাক ও চতুর। কাজেই তাঁহাদের মধ্যে কিছুটা আশঙ্কার সৃষ্টি হয়। তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করার জন্য তিনি পুনরায় ১৯২৪ সনে ঘোষণা করেন" "এইরূপ কানাঘুষা হইতেছে যে, মুছলমান বন্ধুদের সহিত এত মেলামেশা করিয়া আমি হিন্দু মনোবৃত্তির উপলব্ধি করার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু আমি হিন্দু-মনোবৃত্তির প্রতীক এবং আমার দেহের প্রত্যেক অণুপরমাণুই হিন্দু। প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে যদি আমি আমার হিন্দুত্বের উৎকণ্ঠা সাধন করিতে না পারি তবে হিন্দু ধর্মের প্রতি আমার আস্থা যে শিথিল তাহাই প্রমাণিত হইবে।" তথাপি আমি যখন তাঁহাকে একজন হিন্দু হিসাবে সহিত মোলাকাত করিতে বলি তখন তিনি তাহাতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তবুও তিনি বলেন, তাঁহার দেহের প্রত্যেক অণুপমাণুই হিন্দু'। ইহার অর্থ এই যে, তাঁহার হিন্দু মনোবৃত্তি অভেদ্য। এই তো গেল ১৯২৪ সনের কথা।

নেহরু রিপোর্ট

মিঃ গান্ধীর নেহরু পরিকল্পনায় যে শাসনতন্ত্রের প্রস্তাব হইয়াছেন তাহার অধীনে সরকারি ফেরিওয়ালারা হাঁক ডাক করিয়া ভারতে নূতন দ্বৈত-শাসনের বার্ত্তা ঘোষণা করিবে। তাহাদের ফরমূরা হইবে-খাল্‌ক খোদা কী; মূল্‌ক ব্রিটিশ কা; হুকুম মহাসভা বাহাদুরকা; (মানুষের মালিক খোদা, দেশের মালিক ব্রিটিশ এবং শাসন কর্তৃত্ব হিন্দু মহাসভা বাহাদুরের)।

মাওলানা মোহাম্মদ আলীর উক্তি

কংগ্রেসের জন্য মওলানা মোহাম্মদ আলী যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করেন, দুঃখকষ্ট ভোগ করেন এবং স্বার্থ ত্যাগ স্বীকার করেন। ১৯৩০ সনে বোম্বাইয়ে এক সভার সভাপতি রূপে তিনি বলেনঃ

www.nagorikpathagar.org

"মিঃ গান্ধী সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিন্দু মহাসভার প্রভাবাধীনে কাজ করিতেছেন। তিনি হিন্দু ধর্মের প্রাধান্যের জন্য এবং মোছলেম জাতির স্বাতন্ত্র্য মুছিয়া ফেলার নিমিত্ত সংগ্রাম করিতেছেন। আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যাপারে তিনি কখনও মোছলেম জাতির সহিত পরামর্শ করেন নাই। তিনি চান, ভারতীয় মোছলেম জাতির মাথার উপর দিয়া বিজয় রথ চালনা করিতে। আমরা কোন প্রতিশ্রুতি, চুক্তি বা সন্ধি ভঙ্গ করি নাই। আমরা ভারতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই। গত ১০ বৎসর মুছলমানগণ সংখ্যাগুরু হিন্দুদের দ্বারা নির্যাতিত ও নিপীড়িত হইয়াছে। মিঃ গান্ধী অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা বা মুছলমানদের প্রতি হিন্দুদের স্বৈরাচারের প্রতিবাদে টু শব্দটি পর্যন্ত করেন নাই। তিনি শুদ্ধি এবং সংগঠন আন্দোলনের প্রতিবাদ করেন নাই। এ সমস্ত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হইতেছে ভারতের বুক হইতে এছলাম ও মুছলমানের অস্তিত্ব মুছিয়া ফেলা। তিনি মাদ্রাজ হিন্দু মোছলেম চুক্তি অস্বীকার এবং ভঙ্গ করেন। 'কোন সম্প্রদায় বিশ্বাসঘাতকতা করিবে বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবে বলিয়া যদি আশঙ্কা কর, তবে সেই সন্ধিপত্র তাহার মুখের উপর ছুড়িয়া দাও। আল্লাহ বিশ্বাসঘাতক ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীদের কার্য অনুমোদন করে না।' এক্ষণে কোরআনের এই নীতি অনুসরণ করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই "।

হিন্দু কংগ্রেসের চালবাজী

ভারতের এই প্রতিষ্ঠানটি আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ শুনাইয়া আসিতেছে যে মোছলেম লীগ একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। সুপরিকল্পিত পন্থায়–সঙ্ঘবদ্ধভাবে হিন্দু স্বেচ্ছায় সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যলইয়া দুইটি জাতির মধ্যে মীমাংসার সমস্ত আশা ভরসা নির্মূল দিয়াছেন। আর এক্ষণে তাঁহারা নিজদিগকে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রবাদী বলিয়া জাহির করিতেছেন। আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই। ইহাকেই কি জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র বলা হয়? (না না ধ্বনি)। গত ২৫ বৎসরে আমরা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি তাহার ফলে এবং সুদৃঢ় প্রমাণকে ভিত্তি করিয়া আজ আমরা এই "না" ধ্বনি উচ্চারণ করিতে পারিতেছি। তাঁহারা জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের বড়াই করেন। হয় তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারেন না, না হয়, তাঁহারা কপট। পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র এদেশ মানাইবে না-ইহার অর্থ কি তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না? আমরা তাঁহাদের বলিঃ গণতন্ত্রের বুলি কপচাইয়া আপনারা শুধু কপটতাই প্রদর্শন করিতেছেন আপনাদের গণতন্ত্রের অর্থ হিন্দুরাজ। আপনারা চান সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য সকল দিক দিয়া অন্য একটা জাতির উপর আধিপত্য করিতে। আপনারা হিন্দু জাতীয়তা ও হিন্দুরাজ কায়েম করার জন্য অপচেষ্টা করিতেছেন।

www.nagorikpathagar.org

গণতান্ত্রিক মুছলমান

আমরা ১৩ শত বৎসর পূর্বে গণতন্ত্রের ছবক গ্রহণ করিয়াছি (হর্ষধ্বনি)। ইহা আমাদের রক্তের সহিত বিজড়িত হইয়া আছে। ইহা মরু প্রদেশের ন্যায় হিন্দু সমাজ হইতে বহু দূরে রহিয়াছে। হিন্দুরা বলেন আমরা গণতান্ত্রিক নই। কিন্তু আমরাই সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব শিক্ষা করিয়াছি। এক শ্রেণীর হিন্দু অন্য শ্রেণীর স্পর্শ করা পানি পান করে না। ইহারই নাম কি গণতন্ত্র? ইহাই কি সাধুতা? আমরা গণতন্ত্র চাই। কিন্তু যে গণতন্ত্রের ফলে সমগ্র ভারত গান্ধী আশ্রমে পরিণত হইবে সেই রূপ গণতন্ত্র আমরা চাই না। এইরূপ গণতন্ত্রে একটি সমাজ বা জাতি স্থায়ী সংখ্যাগুরুত্বের জোরে অন্য একটি স্থায়ী সংখ্যালুঘ সমাজ বা জাতিকে এবং উহার নিকট যাহা প্রিয় তাহা ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। আমি হিন্দুদিগকে বলি এইরূপ ভাবগতি পরিহার করুন। আপনারা আপনাদের শয্যা রচনা করিয়াছেন। আপনারা ইহাতে শয়ন করিতে পারেন। আপনারা আপনাদের হিন্দু জাতীয়বাদ লইয়া থাকুন। আপনাদের গণতন্ত্র আপনারা প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করুন। যদি পারেন, আপনারা আপনাদের হিন্দুস্তান গঠন করুন। আমি আপনাদের সাফল্য কামনা করি। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত একজন মুছলমানের দেহেও প্রাণ থাকিবে ততদিন পর্যন্ত আমরা কিছুতেই এই হিন্দুরাজ কায়েম হইতে দিব না।

স্বাধীনতা লাভের প্রকৃষ্টতম পন্থা

প্রায় একশত বৎসর যাবৎ ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট এই নীতিই অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা আমাদিগকে কেবল প্রগতি হইতেই দূরে রাখেন নাই পরন্তু বিপথেও চালিত করিয়াছেন। আর বিভ্রান্ত হইবেন না। আমি হিন্দুদিগকে বলি-ব্রিটিশ অন্যের চেয়ে ভাল করিয়াই জানেন-পাকিস্তান আমার জীবদ্দশাতেই আসুক বা উহার পরেই আসুক (আসিবেই–ধ্বনি), ইহাই ভারতের হিন্দু ও মুছলমানদের স্বাধীনতা লাভের প্রকৃষ্টতম পন্থা।

কোন কোন জাতি পরস্পরের লক্ষ লক্ষ লোক হত্যা করিয়াছে। কিন্তু ইহা স্থায়ী নহে। আজ যে দুশমন, কাল সে বন্ধু হইতে পারে। ইহাই তো জীবন, ইহাই তো ইতিহাস।

আপোষের জন্য আবেদন

পাকিস্তানের ভিত্তিতে মিঃ গান্ধী যতি প্রকৃতই এখনও লীগের সহিত আপোষ মীমাংসার জন্য অগ্রণী হন তাহা হইলে আমার অপেক্ষা আর কেহই উহাকে বেশী অভিনন্দিত করিবে না। আমি বলিতেছি সেই দিনটা হিন্দু ও মুছলমান উভয়ের পক্ষেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ হইবে। আমার নিকট সরাসরি পত্র লিখিতে বাধা কিসের? (হর্ষ)। তিনি বড়লাটের সহিত পত্রালাপ করিতেছেন, কিন্তু আমার নিকট সরাসরি পত্র লেখেন না

www.nagorikpathagar.org

কেন? এই কাজে কে বাধা দিতে পারে? বড় লাটের নিকট গিয়া বা ডেপুটেশন পাঠাইয়া কিম্বা তাঁহার সহিত পত্রালাপ করিয়া লাভ কি? আমি এ কথা বলার সাহস রাখি যে এ দেশের গর্ভণমেন্ট যত শক্তিশালীই হউন না কেন তাঁহার চিঠি আমার নিকট পৌছানোয় তাঁহারা বাধা দিতে পারিবেন না।

গর্ভণমেন্ট যদি এইরূপে কিছু করেন তবে ব্যাপার গুরুতর হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু মিঃ গান্ধী অথবা কংগ্রেস নীতিতে আমি কোন পরিবর্তনের লক্ষণ দেখিতেছি না।

আমাদিগকে বলা হয় যে, একটা কিছু করা উচিৎ। কিন্তু আমরা কি করিব ? অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই। তথাকথিত অদলীয় সম্মেলনে যোগদান করিতে আমাকে অনুরোধ করা হইল আমি মিঃ রাজগোপালচারীকে বলিয়াছিলাম যে, আমি উহাতে যোগ দিতে চাই না। তাহার কারণও আমি প্রদর্শন করিয়াছিলাম। আমি তাঁহাদের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে চাই না। আমি অযথা তিক্ততার সৃষ্টি করিতে চাই না। আমরা অবশ্য জানি যে তাঁহাদের কোন সমর্থন নাই। কিন্তু জীবনে তাঁহাদের কিছুটা প্রতিষ্ঠা আছে, কিছুটা অভিজ্ঞতাও আছে। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহারা আমাদের বিরুদ্ধবাদী হইতে পারেন, কিন্তু একবার তাঁহারা এ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। এই ভদ্রলোকগণ যে প্রস্তাব ও পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন এই সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁহারা তাহা অপেক্ষা অধিক কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু মহান ব্যক্তিরাও ভুল করিয়া থাকেন। মিঃ গান্ধী সব খবরই রাখেন, সংবাদপত্র পাঠ এবং দেশে কি ঘটিতেছে তাহাও জানেন ও বুঝেন। তাঁহার হৃদয়ের যদি পরিবর্তন হইয়া থাকে, তবে তিনি আমার নিকট মাত্র কয়েক ছত্র লিখুন। আমি আপনাদিগকে আশ্বাস দিতেছি, অতীতে আমাদের মধ্যে যত রকম বাদানুবাদই হইয়া থাকুক না কেন মোছলেম লীগএ ব্যাপারে সাড়া দিতে কসুর করিবে না (তুমুল উল্লাস ধ্বনি)।

হিন্দু পরিকল্পিত স্বাধীনতা

হিন্দু নেতৃবৃন্দের ইহা বুঝা উচিতৎ তাঁহারা আমাদিগকে যে স্বাধীনতা দিতে চান তাহা তাঁহাদেরই পরিকল্পিত। ইহার কাঠামো ঠিক করিবেন তাঁহারাই, আর শাসন কর্তৃত্ব থাকিবে তাঁহাদেরই হাতে। এইরূপ স্বাধীনতা একটা প্রহসন মাত্র (হর্ষ)। প্রথমতঃ আমাদিগকে ভিত্তি ঠিক করিতে হইবে। আমার মনে মোটেই সন্দেহ নাই যে, পাকিস্তানে জনগণের গর্ভনমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়াই অনেকে মনে করিতেছেন। শক্তি প্রয়োগ প্রয়োগ করিয়াই হউক, বা আপোষ-মীমাংসার সাহায্যই হউক, বৈদেশিক জাতির নিকট হইতেই হউক; বা আমাদের নিজেদের গর্ভনমেন্টের নিকট হইতেই হউক; আপানারা যতক্ষণ পর্যন্ত ইহা লাভ করিতে না পারিয়াছেন ততক্ষণ পর্যন্ত শাসনতন্ত্র এবং গর্ভনমেন্টের গঠন প্রণালী সম্বন্ধে কোনই প্রশ্ন উঠে না। ফরাসী বিপ্লবের দৃষ্টান্তই উল্লেখ করা যাক। যে পার্টি তদানীন্তন গর্ভনমেন্টকে ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিয়াছিল, প্রথম সে পার্টীকে দেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া পরে গণপরিষদ গঠন করতে হইয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়ার কথা ধরা যাক। সেখানে আপোষ মীমাংসার দ্বারাই কার্যসিদ্ধি

www.nagorikpathagar.org

করা হয়। ভারতকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে-প্রথমত এই ব্যাপারে আমাদিগকে একমত হইতে হইবে। ইহার পর শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে। জনগণই শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানে তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করিবে। সুতরাং আমি মনে করি, অতি সাধারণ ভোটাধিকারের ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে। পাকিস্থানে দুই আনা যাঁহারা ট্যাক্স দিবেন তাঁহাদের কিম্বা প্রাপ্ত বয়স্ক সকলেরই ভোটাধিকার থাকিবে। শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানে আপনারই আপনাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করিবেন। আপনারা আপানাদের ক্ষমতা সম্পর্কে সজাগ না থাকিতে পারেন; এই ক্ষমতার ব্যবহার কি করিয়া করিতে হয় তাহাও আপনারা জ্ঞাত না থাকিতে পারেন। ইহার জন্য দায়ী হইবেন আপনারাই। তবে আমি নিশ্চিত যে, গণতন্ত্র আমাদের দেহে শোণিতে সহিত মিশিয়া রহিয়াছে। ইহা আমাদের অস্থিমজ্জায় বিজড়িত রহিয়াছে। কয়েক শতাব্দীর প্রতিকূল অবস্থার ফলে আমাদের সেই রক্ত চলাচলের গতি মন্থর হইয়া পড়িয়াছে। ইহা জমিয়া গিয়াছে এবং আমাদের ধমনীও স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আল্লাহকে ধন্যবাদ, মোছলেম লীগের প্রচেষ্টায় পুনরায় সেই রক্ত আমাদের ধমনীতে বহিতেছে। পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হইবে জনগণের গর্ভনমেন্ট।

ধনতন্ত্রবাদের নিন্দা

একটা অতি জঘন্য ও কুৎসিৎ প্রথা অবলম্বনে আমাদের সর্বনাশ করিয়া যেসব জমিদার ও পুঁজিবাদী লোক ফাঁপিয়া উঠিয়াছেন আমি তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি। তাঁহারা এত স্বার্থপর হইয়া উঠিয়াছেন যে, তাঁহাদের নিকট যুক্তি তর্ক উত্থাপন করাও কঠিন। জনগণকে শোষণ করার প্রবৃত্তি তাঁহাদের রক্তে সহিত মিশিয়া রহিয়াছে। তাঁহারা এছলামের শিক্ষা ভূলিয়া গিয়াছেন।

পরের ধনে নিজেদের ভূঁড়িকে ফাঁপাইয়া তোলার উদ্দেশ্য, লোভ ও স্বার্থপরতার বশতঃ এই সমস্থ লোক অন্যের স্বার্থকে গৌণ বলিয়া মনে করেন। ইহা সত্য যে, আমাদের হাতে আজ ক্ষমতা নাই। আপনারা পল্লী অঞ্চলে যাইয়া দেখুন। আমি কতকগুলি গ্রাম পরিদর্শন করিয়াছি। আমাদের লক্ষ লক্ষ লোক দৈনিক একবেলাও আহার করিতে পায় না। এই কি সভ্যতা? ইহাই কি পাকিস্তানের লক্ষ্য? (না, না ধ্বনি)। আপানারা কি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, আমাদের লক্ষ লক্ষ লোককে শোষণ করা হইয়াছে? তাহারা দৈনিক একবেলাও খাইতে পায় না।

পাকিস্তানের পরিণতি যদি তাহাই হয় তবে সে পাকিস্তান নিশ্চয়ই আমার কাম্য নয় (হর্ষধ্বনি)। এই সব জমিদার ও পুঁজিবাদী লোক যদি বুদ্ধিমান হন, তবে আধুনিক জীবন ধারার সাথে তাঁহাদিগকে নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে। যদি তাঁহারা তাহা না করেন, তবে খোদা তাঁহাদের সহায় হন আমরা কিছুতেই তাঁহাদিগকে আমাদের নিজেদের উপর আস্থা স্থাপন করিতে হইবে। আমাদিগকে ইতস্ততঃ ও দ্বিধাবোধ করিলে চলিবে না। পাকিস্তানই আমাদের আদর্শ ইহা লাভ করিতে যাইতেছি (হর্ষ ধ্বনি)। মিল্লাত ও জনসাধারনই ইহার শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবে।

www.nagorikpathagar.org

আপনারা নিজেদেরকে প্রস্তুত করিয়া তুলুন এবং মনের মন করিয়া একটি শাসনতন্ত্র রচনা করুন। বহু ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। পাকিস্খানে কি এছমালিক গর্ভনমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে? জনগণের সিদ্ধান্ত অনুসারেই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হইবে। একমাত্র সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিতে পারে।

সংখ্যালঘুগণ সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি পাওয়ার অধিকারী। অন্যথায় তাহারা প্রশ্ন করিতে পারেঃ "আপনাদের পরিকল্পিত পাকিস্তানে আমাদের অবস্থা কি হইবে? কাজেই তাহাদিগকে সুস্পষ্টভাবে একটা সুনির্দিষ্ট আশ্বাস দিতে হইবে। আমরা তাহা দিয়াছিও। আমরা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছি। উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, সংখ্যালঘুদিগকে রক্ষা করিতে হইবে, তাহাদের জন্য পুরাপুরিভাবে রক্ষা কবচের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমি পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও বলি যে, যে কোন সভ্য গর্ভনমেন্ট তাহা করিবে এবং করাও উচিৎ। ইছলামের ইতিহাসে সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে যে, অমুছলমানদের সহিত কেবলমাত্র ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ ব্যবহারই করা হয় নাই তদুপরি তাহারা উদার ব্যবহারও লাভ করিয়াছে।

উদাত্ত আহবান

পরিশেষে আমি আর একটি বষিয় বলিতে চাই। আমি মুছলমানদিগকে বলিঃ গত ৭ বৎসর আমরা বহু বিপর্য্যয়ের মধ্যে দিয়া চলিয়াছি। বর্তমান আমরা এমন এক স্তরে আসিয়া পৌছিয়াছি যেখানে আমাদের মনে সন্দেহের লেশ মাত্র ও নাই, যে ভারতের দশ কোটি মুসলমান এক্ষণে আমাদের পিছনে রহিয়াছে। দশ কোটি মুসলমান অর্থে আমি এই বুঝাইতে চাই যে কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক, দুর্বলচিত্ত, অতিমানব কিংবা উম্মাদ ব্যক্তি ছাড়া তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জনই আমাদের সমর্থক। প্রত্যেক জাতি বা সমাজেই কিছু সংখ্যক কলঙ্কিত লোক রহিয়াছে। কোন জাতি বা সমাজই এই পাপ হইতে একেবারে মুক্ত নহে। অষ্টদশ ও ঊনিবিংশ শতাব্দীর ধ্বংসস্তপের মধ্য হইতে অধুনিক ভারতে মোছলেম জাতির অভ্যূদ্বয় একটি অলৌকিক ব্যাপার। যে জাতি সবই হারাইয়াছিল এবং অদৃষ্টদোষে যাঁতাকলের চাপায় পড়িয়াছিল তাহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে শুধু জাগে নাই, পরন্ত আধুনিক ভারতে ব্রিটিশের পরেই সামাজিকভাবে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক, সামরিকভাবে সর্বাপেক্ষা অধিক পৌরুষসম্পন্ন এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চুড়ান্ত মীমাংসাকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আপনাদিগকে নিজেদের বিশিষ্ট অংশ অনুযায়ী কাজ করিতে হইবে। যাহাতে আমরা পাকিস্তানের পথে জয়যাত্রা করিতে পারি, তজ্জন্য গঠনমূলক কার্য্যক্রম গ্রহণ করিবার পক্ষে ইহাই উপযুক্ত সময়।

জাতির শিক্ষক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিকও সাংস্কৃতিক উন্নতি বিধানকল্পে আপনাদের সকলের একযোগে পরামর্শ করিয়া যথোপযুক্ত ও শৃংখলাবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। আমি পুনরুক্তি করিয়া বলিতেছি যে, আমাদিগকে

www.nagorikpathagar.org

গঠনমূলক কার্য্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে, আমি আশা করি আপনারা ইহা পারিবেন। আমি উপসংহারে বলিতে চাইঃ আমাদের গন্তব্যস্থল নিকটবর্তী। ঐক্যবদ্ধ হইয়া অধ্যবসায় সহকারে অগ্রসর হউন। (উচ্চ হর্ষ ও বহুক্ষণ ব্যাপি উল্লাসধ্বনি এবং তুমূল 'কায়েদে আযম জিন্দাবাদ, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ, মোছলেম লীগ জিন্দাবাদ' ধ্বনি)। (সংক্ষেপিত)

[এই বক্তৃতাটি 'কয়েদে আযমের পত্র ও বক্তৃতাবলী' শীর্ষক গন্থ থেকে গৃহীত এর সম্পাদনা ও অনুবাদ করেছেন এম, জহুর হোসেন চৌধুরী,

উল্লেখ্য, এম, জহুর হোসেন চৌধুরী পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগে যোগ দেন এবং স্বাধীনতার পর মুজিব সরকারের মন্ত্রী হন]।

"মুসলিম লীগের আন্দোলন যে রূপ 'গদাই লস্করী' চালে চলছিল, তাতে আমি আমার অন্তরে কোন বিপুল সম্ভাবনার আশার আলোক দেখতে পাইনি। হঠাৎ লীগনেতা কায়েদে আযম সেদিন পাকিস্তানের কথা তুলে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন-"আমরা বৃটিশ ও হিন্দু দুই ফ্রন্টে ভারতের পূর্ন স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবে'-সেদিন আমি উল্লাসে চিৎকার করে বলেছিলাম-হাঁ এতদিন একজন সিপাহসালার সেনাপতি এলেন। আমার তজ্যের তলোয়ার তখন ঝলমল করে উঠলো।

-কাজী নজরুল ইসলাম

www.nagorikpathagar.org

আলবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫)

আমার দৃষ্টিতে জগতে

অনুবাদ : আবুল কাসেম ফজলুল হক

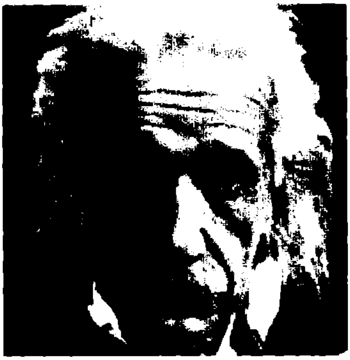

(এ **আবিভাবটি** Sonja Bargmann অণূদিত *Ideas and Opinions* by Albert Einstein গ্রন্থের (Rupa & Co. India, 1991) The World as I See It শীর্ষক প্রবন্ধের অনুবাদ) উক্ত গ্রন্থের প্রবন্ধটি সম্পর্কে উল্লেখ আছে: এটি প্রথম প্রকাশিত হয় Forum সিরিজের Living Philosophies বিষয়ক ত্রয়োদশ গ্রন্থ Form and Century- তে (খণ্ড ৮৪, পৃঃ ১৯৩-১৯৪)। *Living Philosophies* (New You Simon and Schusler, 1931) গ্রন্থেও প্রবন্ধটি সঙ্কলিত আছে।

আইনস্টাইন ছিলেন জাতিতে জার্মান, হিটলারের শাসনকালে তিনি মাতৃভূমি ছেড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান, এবং বাকি জীবন সেখানেই কাটান। আপেক্ষিকতাবাদের আবিষ্কারক, যুগান্তকারী প্রতিভার অধিকারী মহান দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের জন্ম ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে।

আমরা মরণশীল! কি অদ্ভুত আমাদের ভাগ্য আমরা প্রত্যেকে এখানে স্বল্প সময়ের অতিথি। আমরা কেউ জানি না কেন আমাদের এখানে আগমন। তবে আমরা কেউ কেউ কখনো কখনো অনুভব করে থাকি যে, জীবনের উদ্দেশ্য আমরা বুঝি। গভীর চিন্তায় না গিয়েও প্রতিদিনের জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝে থাকি যে, আমরা একে অন্যের জন্য বাঁচি। আমাদের জীবনযাপন প্রথমত তাদের জন্য যাদের আনন্দ ও কল্যাণের উপর আমাদের সুখ সম্পূর্ণ নির্ভরশী। যাদের আমরা চিনি না, যারা সংখ্যায় বিপুল, সেই মানুষদের নিয়তির সঙ্গেও আমাদের অস্তিত্ব সহমর্মিতার শৃঙ্খলে বাঁধা। প্রতিদিন শতবার আমি নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেই যে, আমাদর মনোজীবন ও দৈহিক জীবন জীবিত ও মৃতু অসংখ্য মানুষের শ্রমের ওপর নির্ভরশীল, যেভাবে আমি অন্যদের থেকে গ্রহণ করেছি এবং করছি সেভাবেই অন্যদেরকে আমার দান করে যাওয়াও কর্তকব্য। সরল জীবনযাত্রার প্রতি আমার আকর্ষণ তীব্র, এবং এই বোধ প্রায়শ আমাকে পীড়া দেয় যে, আমি আমারই মতো অন্য মানুষদের শ্রম অন্যায়ভাবে

www.nagorikpathagar.org

আত্মসাত করছি। শ্রেণী বৈষম্যকে আমি অন্যায় মনে করি ওগুএবং শেষ বিশ্লেষণে দেখতে পাই, এই বৈষম্যের ভিত্তি শক্তিপ্রয়োগ। আমি এও বিশ্বাস করি যে, সরল ও আড়ম্বরহীন জীবন প্রত্যেকের জন্য শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়েই ভালো।

দার্শনিক অর্থে মানুষের স্বাধীনতায় আমি একটুও বিশ্বাস করি না। তবে মানুষ যে কেবল বাইরের চাপে কাজ করে তা নয়, অন্তরের তাগিদেও সে কাজ করে। 'মানুষ যা খুশি তাই করার ইচ্ছা করতে পারে না সত্য, কিন্তু যতটুকু করার ইচ্ছা করতে পারে তার মধ্যে সে যা করতে চায় তা করতে পারে'- শোপেন হাওয়ারের এই উক্তি তরুণ বয়স থেকেই আমার মনে প্রকৃত প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। আমি অনুভব করি যে, এই উক্তি আমার নিজের ও অন্যদের জীবনে দুঃখ-দুর্দশার মুহূর্তে বার বার সান্ত্বনা রূপে দেখা দেয় এবং সহনশক্তি যোগায়। এই উপলব্ধি চৈতন্য-অবশকারী দায়িত্ববোধের চাপ কমিয়ে দেয় এবং নিজেদেরকে ও অন্যদেরকে অতিরিক্ত সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে দেখা থেকে বিরত করে। এ বাণী জীবনে রস সিঞ্চনের এক অফুরন্ত প্রস্রবণ এবং এ থেকে লাভ করা যায় এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি যা আনন্দকে জীবনে তার যোগ্য স্থান দেয়।

নিজের কিংবা অন্যসব প্রাণীর অস্তিত্বের অর্থ কিংবা তাৎপর্য সন্ধান বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সব সময় আমার কাঝে অবান্তর ব্যাপার বলে মনে হয়েছে। তবু আমি লক্ষ্য করেছি, প্রত্যেকের জীবনেই কিছু আদর্শ থাকে যা তার কর্ম প্রচেষ্টা ও বিচারশক্তির গতিপথ নির্ধারণ করে। এ অর্থে আরাম-আয়াস ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে কখনও আমি আমার জীবনের লক্ষ্য হিসাবে গণ্য করিনি। ভোগবাদ যে নৈতিক আদর্শের কাঠামো খাড়া করে, তাকে আমি শূকরের খোয়াড় বলে অভিহিত করি। যেসব আদর্শ আমার জীবনপথে আলো যুগিয়েছে এবং আনন্দের সঙ্গে জীবনযাপনে সাহস যুগিয়েছে সেগুলো হল সহানুভূতি, সৌন্দর্য ও সত্য। সমমনা লোকদের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধ আর বাস্তব জগতের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক না থাকলে এবং শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের জগতের চির-অধরাকে ধরবার নিরন্তর চেষ্টা না থাকলে জীবন আমার কাছে অন্তঃসারশূন্য মনে হত। গতানুগতিক জীবনধারায় মানুষ যা কিছুর জন্য প্রয়াসপর থাকে, যেমন-সম্পত্তি, ক্ষমতা, জাঁকজমক সেগুলো সব সময় আমার কাছে অবজ্ঞাযোগ্য মনে হয়েছে।

সামাজিক ন্যায়বিচার ও সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে আমার অনুভব অত্যন্ত তীব্র। কিন্তু অন্য লোকদের ও অন্য মানব-সম্প্রদায়সমূহের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনে আমার সুস্পষ্ট অনীহার কারণে আমার এই অনুভূতি সব সময় অদ্ভুত রকম বিসদৃশ রূপ নিয়ে থাকে। প্রকৃত অর্থেই আমি এক 'নিঃসঙ্গ পথিক', নিজের দেশ নিজের বাড়ি-ঘর নিজের বন্ধুবান্ধব-এমনকি নিজের একান্ত পরিবার-কোনো কিছুর সঙ্গেই আমি

www.nagorikpathagar.org

পরিপূর্ণভাবে একাত্ম হতে পারিনি। এইসব বন্ধনের মধ্যেও আমার বিচ্ছিন্নতাবোধ ও একাকি থাকার ইচ্ছা লোপ পায়নি, বরং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেবল বৃদ্ধি পেয়েছে। এমন মানুষও আছেন যিনি অন্য মানুষদের সঙ্গে সমঝোতা ও মিলনের অন্তরায় সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন, অথচ তার জন্য কোনো রকম দু:খবোধ করেন না। এমন ব্যক্তি তাঁর নিরীহতা ও নি:স্পৃহতা কিছুটা কাটিয়ে ওঠেন। কিন্তু অন্যদিক থেকে দেখলে দেখা যায়, ওই ব্যক্তি তাঁর চারপাশের লোকদের গতানুগতিক মতামত, অভ্যাস ও ভালো-মন্দ সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণা থেকে মুক্ত থাকেন এবং চিন্তাগত দুর্বল ভিত্তির উপর নিজের অন্তরের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার প্রলোভন পরিহার করেন।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমার আদর্শ গণতন্ত্র। প্রতিটি মানুষ ব্যক্তি হিসাবে সম্মান লাভ করুক এবং কাউকেই দেবতা বানানো না হোক-এই আমার কাম্য। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এই যে, আমার বেলায়, আমার নিজের কোনো দোষ কিংবা গুণ না থাকা সত্ত্বেও আমি আমার সঙ্গী-সাথীদের কাছ থেকে অত্যধিক প্রশংসা ও শ্রদ্ধা লাভ করেছি। নিরন্তর চেষ্টা দ্বারা দু একটি বিষয় বোঝার মতো সামান্য ক্ষমতা আমি আয়ত্ত করেছি। এটা অনেকেই আকাঙ্খা করেন, কিন্তু সকলে পেরে ওঠেন না। এ ক্ষেত্রে আমার কিঞ্চিত সাফল্যই বোধ হয় আমার এই সম্মানের কারণ। আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করি যে, কোনো যৌথ কাজের সাফল্যের জন্য সে সমন্ধে চিন্তা করার ও পরিচালনা করার সাধারণ দায়িত্ব একজন লোকের উপরই দেয়া উচিত। তবে যাঁরা পরিচালিত হবেন তাঁদের বাধ্য করা চলবে না; নেতা নির্বাচনের সুযোগ তাঁদের অবশ্যই থাকতে হবে। আমার বিশ্বাস, আনুগত্য আদায়ের বলপ্রয়োগ-নির্ভর স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা অচিরেই বিকারপ্রাপ্ত হয়। কারণ হিংসাশক্তি সর্বদাই নিম্নস্তরের নীতিবোধবিশিষ্ট লোকদের আকর্ষণ করে, এবং আমার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী এ এক অনিবার্য বিধান যে, আধিপত্যলিপ্সু শক্তিমানবলদর্পী স্বৈরতন্ত্রীদের উত্তরাধিকারীরা অপদার্থ হয়ে থাকে। আমার মতে মানব-জীবন-নাট্যের প্রকৃত মূল্যবান বস্তু কূটকৌশলপূর্ণ রাষ্ট্র নয়, তা হচ্ছে সৃষ্টিশীল অনুভূতিসমৃদ্ধ ব্যক্তি-ব্যক্তিত্ব। মহান ও মহীয়ান সবকিছুই ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি, আর পালবদ্ধ মানুষ চিন্তা ও অনুভূতির দিক দিয়ে নিস্তেজ।

এ প্রসঙ্গে পালবদ্ধ জীবনের সবচেয়ে খারাপ দিক সামরিক ব্যবস্থার কথা আসে। সামরিক ব্যবস্থাকে আমি ঘৃণা করি। কোনো ব্যক্তি সারবিদ্ধ হয়ে কুচকাওয়াজ করার আনন্দ পায়-এটুকু তথ্যই তার প্রতি আমার ঘৃণা জাগবার জন্য যথেষ্ট। নিতান্ত ভুলক্রমেই তাকে একটি বৃহত মস্তিষ্ক দেয়া হয়েছে, কেবল উন্মুক্ত মেরুদন্ডই তার জন্য যথেষ্ট ছিল। সভ্যতার এই দুষ্ট ক্ষতকে যত দ্রুত সম্ভব নিশ্চিহ্ন করা দরকার। আদেশ দিয়ে বীরত্ব তৈরি, কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত শক্তি প্রয়োগ এবং দেশপ্রেমের নামে আরও যেসব

www.nagorikpathagar.org

অপকর্ম দেখতে পাই সেগুলো আমি সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘৃণা করি। যুদ্ধকে আমার কাছে ঘৃণ্য কাজ বলে মনে হয়। আমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললেও আমি এমন ঘৃণ্য কাজে অংশগ্রহণ করব না। মানবজাতি সম্বন্ধে আমি উচ্চ ধারণা পোষণ করি। আমার বিশ্বাস, হীন ব্যবসায়িক ও হীন রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ধারাবাহিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিভিন্নজাতির সুস্থ চেতনাকে যদি দূষিত করে দেয়া না হত, তাহলে অনেক আগেই সেনাবাহিনীর ভূত বিলুপ্ত হত।

মধুরতম অনুভূতি আমরা লাভ করতে পারি রহস্য সন্ধানের কৌতূহল-সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে। প্রকৃত শিল্পকলা এবং প্রকৃত বিজ্ঞানের সূচনাবিন্দুতে থাকে রহস্য উদঘাটনের তীব্র আগ্রহ। এ আগ্রহ যার শেষ হয়ে যায়, যে আর বিস্মিত হয় না, কৌতূহলের আনন্দে কর্মচঞ্চল হয় না, সে মৃত-তার দৃষ্টিশক্তি নির্বাপিত। ধর্মের জন্ম দিয়েছে রহস্য সন্ধানের এই অভিজ্ঞতাই-সেক্ষেত্রে এ অভিজ্ঞতার মধ্যে ভয়ও যুক্ত থাকতে পারে। রহস্যময় কোনো সত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানার আগ্রহ আর গভীরতম যুক্তিবোধ ও দীপ্তিময় সৌন্দর্যবোধ ভিত্তিক আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ তীব্র অনুভূতি আমরা আমাদের সত্তায় অনুভব করতে পারি তাদের আদি ও অকৃত্রিম রূপে। এই আগ্রহ ও অনুভূতি দ্বারাই গঠিত হয় প্রকৃত ধর্মবোধ। এ অর্থে এবং কেবল এ অর্থেই, আমি গভীর ধর্মবোধসম্পন্ন মানুষ। আমি এমন কোনো ঈশ্বর কল্পনা করতে পারি না যিনি তাঁর সৃষ্ট জীবকে পুরস্কৃত করেন কিংবা শাস্তি দেন অথবা যিনি আমাদের ইচ্ছাশক্তির মতো কোনো প্রকার ইচ্ছাশক্তির অধিকারী। আমি যে কাজে আনন্দ পাই তা হল, অনন্ত জীবনপ্রবাহের আর অস্তিমান জগতের বিস্ময়কর রূপ সম্পর্কে চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত রাখা ও এসবের অস্পষ্ট আলো-আঁধারির রহস্য উদঘাটনের জন্য চেষ্টা করা। প্রকৃতিতে যে কার্য-কারণ সূত্রের প্রকাশ দেখতে পাই, তার যে কোনো ক্ষুদ্রতম অংশকে উপলব্ধি করার চেষ্টার মধ্য দিয়েই আমি লাভ করি অশেষ আনন্দ।

সূত্রঃ লোকায়ত, সামরিক পত্র, জুলাই ১৯৯৬

'স্রষ্টার পাশা খেলা' আইনস্টাইন ও জ্যোতির্ময় মহাবিশ্ব

মুহাম্মদ আলী রেজা

স্রষ্টা পাশা খেলেন না এ উক্তি আইনস্টাইন জার্মান বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তাবাদ তত্ত্বের কড়া সমালোচনা করে এটি শুধু প্রত্যাখ্যানই করেননি, সেই সাথে ক্ষিপ্ত হয়েছেন এই বলে যে, এটি প্রকারান্তরে স্রষ্টার পাশা খেলার ইঙ্গিত দেয়। শেষে তিনি বাকলড়াইয়ে বসেন, প্রতিপক্ষ তার সব যুক্তি খণ্ডন করে চলে। এবার প্রতিপক্ষের পালা।

www.nagorikpathagar.org

আইন্টাইন তার অবস্থানে দৃঢ় থাকার প্রয়াস চালান। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। একপর্যায়ে প্রতিপক্ষ শেষ অস্ত্রটি ছুড়ে মারল এ ভাষায়, 'আপনি যদি এই অনিশ্চয়তার নীতি মেনে না নেন তা হলে যে তত্ত্বের জন্য (ফটোইলেকট্রিক ইফেক্ট) আপনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, সেটিও আপনি আর নির্ভুল দেখাতে পারছেন না।' বিতর্ক থেকে সরে আসার কৌশল হিসেবে মুখ রাখার জন্য আইনস্টাইন বললেন, 'সঠিক হলেও এটি এখনো অসম্পূর্ণ, এর জন্য আরো কাজ করতে হবে।' পরবর্তী সময়ে অবশ্য আইনটস্টাইনের এ বিষয়ে মন্তব্য ছিলঃ মহাবিশ্বের সবকিছু আসলে অদৃশ্য জগতের।' আমরা এখন হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি এবং একজন আস্তিক হিসেবে আইনস্টাইনের এটি মেনে তিতে অনীহার কারণটি বিশ্লেষণ করে দেখব।

মহাবিশ্বের সবকিছুই পদার্থ দিয়ে গঠিত। আর সব পদার্থই অণু-পরমাণু দিয়ে গড়া, যা ভাঙলে পাওয়া যাবে ইলেকট্রন, প্রোটনের মতো বিচ্ছিন্ন কিছু ধরণের কণিকা। মূলত আকাশের অগণিত নক্ষত্র আর আমাদের পৃথিবীর নদ-নদী, গাছপালা ও প্রাণিজগৎ-এ সবকিচু কণিকারই সমাহারে গঠিত। কণিকা আবার তরঙ্গ বা আলোর মতো আচরণ করে থাকে। আলো তরঙ্গ দিয়ে গঠিত হলেও প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম বিকল্প বলে, কোনো কোনো অবস্থঅয় আলোর আচরণ এমন মনে হয় আলো বা তরঙ্গ কণিকা দিয়ে গঠিত। আলো শুধু প্যাকেট কিংবা কণিকারূপে নির্গত হতে পারে। কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় কণিকা এবং রঙ্গের ভেতরে দ্বিত্ব রয়েছে। কোনো কোনো উদ্দেশ্যে কণিকাগুলোকে রঙ্গরূপে চিন্তা করলেই সুবিধা হয়। আবার কোনো কোনো উদ্দেশ্যে রঙকে কণিকারূপে চিন্তা করলে আলো। বাস্তবে পদার্থ একই সাথে কণিকা এবং আলো বা তরঙ্গ এই 'ধরণের গুণাবলি প্রদর্শন করলে মগ্র বিশ্বজগতের পদার্থের ধর্মের আমূল পরিবর্তন দেখা যেত। কার্যত পদার্থ যখন আলো অর্থাৎ তরঙ্গের তো আচরণ করে তখন এ এক ভিন্ন মর্ম বা গুণ পায়। আর বস্তুর এই ধর্ম বা আচরণই পদার্থবিজ্ঞানের ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

পদার্থের আলোর মতো তরঙ্গায়িত পটি সর্বপ্রথম ডেভিসন ও চ্যারমেনের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে। এ দুই জন বিজ্ঞানী পরীক্ষাগারে নিকেল ফলকের ওপর ইলেকট্রন রশ্মি ফলে এর সাহায্যে ইক্টেট্রনের ক্ষেপণ সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন। আকস্মিকভাবে বায়ুর সংস্পর্শে এসে নিকেলের ওপর অক্সাইডের আবরণ পড়ায় নিকেল লক থেকে তাপ প্রয়োগে অক্সাইডের আবরণ অপসৃত করা হলো। কিন্তু ঘটে গেল এক অভূতপূর্ব অবাক করা ঘটনা। বিজ্ঞানীদ্বয় তরঙ্গ বা আলোকের ধর্মের সাথে ইলেকট্রন কণিকার পরিমাত্রা একাবর সর্বাধিক আর একবার সর্বাল্প হতে দেখলেন। এতে তাঁরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, এল ডি ব্রগলির মতবাদ অনুসারে কণিকা আলো বা তরঙ্গসদৃশ বলে নিকেল স্ফটিক দিয়ে ইলেকট্রন রশ্মির অপবর্তন ঘটেছে। পরবর্তী সময়ে সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী শ্রোয়েডিংগার তার পরমাণুবাদে জড় স্বভাবকে বাদ দিয়ে পরমাণু ও তার উপাদান ইলেকট্রন, প্রোটনকে শুধু আলো বা তরঙ্গেরই গুচ্ছরূপে কল্পনা করেন। এটিই তরঙ্গ বলবিদ্যার উদ্ভব ঘটায়। ইলেকট্রনের মতো পরবর্তী সময়ে প্রোটন, নিউট্রন এবং বিভিন্ন পরমাণুর ক্ষেওে তরঙ্গের মতো আচরণ পরিদৃষ্ট হয়। ১৯৯৪ সালে আয়োডিন অণুর ক্ষেত্রেও এটি পরিলক্ষিত হয়, যেনি হচ্ছে ইলেকট্রনের চেয়ে পাঁচ

www.nagorikpathagar.org

লাখ গুণ ভারী এবং ইলেকট্রনের চেয়ে অনেক অনেক বেশি জটিল। ১৯৯৯ সালে তার চেয়েও বেশি জটিল অণু ফুলারিন্স (Fullerences) বা বাকি বলস (Bucky balls) তরঙ্গায়িত এই ধর্ম প্রদর্শন করে। ফুলারিন্স হচ্ছে ফুটবলের মতো কার্বনের অণু। তাই বর্তমানে আমরা স্পষ্টত দেখছি জড়ে ও তরঙ্গ বা নুরে বা আলোতে কোনো প্রভেদ নেই। মহাবিশ্বের সব পদার্থের আরো একটি লুকায়িত বা অদৃশ্যরূপ রয়েছে আর এটি হচ্ছে জ্যোতিবা নূর বা আলোর মতোই তরঙ্গায়িত ধর্ম। অন্য দিকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ফরাসি বিজ্ঞানী মার্কুইস দ্য লাপ্লাস যুক্তি দেখিয়েছিলেন, মহাবিশ্ব সম্পূর্ণভাবে নির্ধারণীয় (বৈজ্ঞানিক নিয়মভিত্তিক)। লাপ্লাসের প্রস্তাবনা ছিল এমন এক গুচ্ছ বৈজ্ঞানিক বিধি থাকা উচিত, যার সাহায্যে মহাবিশ্বের যেকোনো এক সময়ের অবস্থা যদি পুরোপুরি জানা থাকে, তা হলে ভবিষ্যতে মহাবিশ্বে কী ঘটবে সে সম্পর্কে পুরোপুরি ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হবে। উনিশশ' কুড়ির দশকে হাইজেনবার্গ, এরভিন শ্রোয়েডিংগার এবং পল ডিরাক বলবিদ্যার পুনর্গঠন করে কণাবাদী বলবিদ্যা নামের নতুন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এই নতুন তত্ত্বেরই ভিত্তিটি ছিল অনিশ্চয়তাবাদ। এই তত্ত্ব অনুসারে কণিকাগুলোর আর পৃথক সুসংজ্ঞায়িত অপর্যবেক্ষণযোগ্য অবস্থান বা গতিবেগ রইলনা। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এনেছে ভবিষ্যদ্বাণী করার অসম্ভাব্যতা। জার্মান বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গ তার অনিশ্চয়তাবাদে দেখান, একটি কণিকার ভবিষ্যৎ অবস্থান ও গতিবেগ নির্ভুলভাবে মাপা প্রয়োজন। স্পষ্টতই এ কাজ করার সহজ পথ হচ্ছে, কণিকার ওপর আলো ফেলা। তা হলে কিছু আলো তরঙ্গকে এই কণিকাটি বিক্ষিপ্ত করে দেবে এবং তার ফলে তার অবস্থানের নির্দেশ পাওয়া যাবে। কিন্তু আলোর, দু'টি তরঙ্গ শীর্ষের দূরত্বের চেয়ে বেশি নির্ভুলভাবে ওই কণিকার অবস্থান নির্ধারণ করা যাবে না। সে জন্য প্রয়োজন হবে হ্রস্ব তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকপাত করা যাতে কণিকাটির অবস্থান সঠিকভাবে মাপা যায়। কিন্তু প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম প্রকল্প অনুসারে সাদৃচ্ছিক ক্ষুদ্র পরিমাণ আলোকে ব্যবহার সম্ভব নয় বলে অন্ততপক্ষে এক কোয়ান্টাম আলো ব্যবহার করতে হবে যেটি কণিকাকে অস্থির করে তুলে গতিবেগের এমন পরিবর্তন আনবে যে সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা, যাবে না। তা ছাড়া অবস্থানের মাপন যতো নির্ভুল হবে আলোকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যও ক্ষুদ্র হবে। সুতরাং এক কোয়ান্টাম শক্তির পরিমাণও হবে উত্ততর। তা হলে কণাটির গতিবেগের স্থিরত্বকে বৃহত্তর শক্তি বিঘ্নিত করে তুলবে। অন্যভাবে বলা যায়, একটি কণিকার অবস্থান যত নির্ভুলভাবে মাপার চেষ্টা করা যাবে, তার দ্রুতির মাপন হবে তত কম নির্ভুল এবং এর বিপরীতও সত্য হবে। অনশ্চিয়তার এই সীমা কণিকাটির অবস্থান মাপনের ওপর নির্ভরশীল নয়। কাজেই হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার এই নীতিটি বিশ্বের একটি মূলগত অনতিক্রমনীয় ধর্ম। মহাবিশ্ব সাপেক্ষে এই অনিশ্চয়তার নীতির নিহিতার্থ গভীর। আইনস্টাইন যদিও এই কোয়ান্টাম বলবিদ্যায়ই নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বিস্ময়কর মনে হলেও সত্য, প্রথমে তিনি এই তত্ত্ব মেনে নেননি। তার বিশ্বাস ছিল সৃষ্টি পরিচালনায় কোনো লটারি বা অনিশ্চয়তার সুযোগ নেই বা থাকতে পারে না, কেননা মহান সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই পাশা খেলেন না। ১৯১৭ সালের হাইজেনবার্গের এই অনিশ্চয়তা নীতির পর প্রায় এক শতাব্দী সময় কেটে যাচ্ছে, তারপরও বহু দার্শনিক ব্যাপারটির মর্ম সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। এই অনিশ্চয়তার নীতি বহু

www.nagorikpathagar.org

দ্বন্দ্বের মূলে রয়েছে। লাপ্লাসের স্বপ্ন ছিল বিজ্ঞানের এমন একটি তত্ত্ব মহাবিশ্বের এমন একটি প্রতিরূপ হবে সম্পূর্ণ নির্ধারণযোগ্য। অন্য দিকে অনিশ্চয়তা তত্ত্বে দেখা যাচ্ছে, নির্ভূলভাবে মহাবিশ্বের বর্তমান অবস্থানই যেখানে বলা সম্ভব হচ্ছে না, সেখানে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নির্ভূলভাবে বলার প্রশ্নই উঠতে পারে না। এই পরিস্থিতি লাপ্লাসের স্বপ্নের অন্তিম অবস্থারই ইঙ্গিত। **আজকের বিশিস্ট বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংয়ের মতে, 'তবে এই সুশৃঙ্খল মহাবিশ্বের সার্বিক বিশ্লেষণে বোঝা যায়, অবশ্যই এই মহাবিশ্বের কোনো এক অতিপ্রাকৃত সর্বশক্তিমানের এমন এক গুচ্ছ বিধি রয়েছে, যে বিধি ঘটনাবলিকে পুরোপুরি নির্ধারণ করে। তিনি কোনো ধরণের অস্থিরতা সৃষ্টি না করেই মহাবিশ্বের বর্তমান অবস্থান পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।'**

"আমি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী তথা মহাবিশ্ব এবং উহাদিগের অন্তবর্তী কোন কিছুই খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই-"আল-কোরান (৪৪:৩৮)

কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানে এটা স্পষ্টত মহাবিশ্ব জ্যোতি, নূর, আলো বা তরঙ্গ দিয়েই সৃষ্ট এবং এর প্রকৃত অবস্থান ও গতিবিধি সঠিক বা নির্ভূলভাবে নির্ণয় করা আমাদের সাধ্যের অতীত; আমাদের এই সর্বাধুনিক প্রযুক্তিরও সীমার বাইরে। মহাবিশ্ব যেন জ্যোতি বা নূর বা তরঙ্গেরই লীলাখেলা, ধরাছোঁয়া, স্পর্শের বাইরের এক রহস্যময় জগতের অদৃশ্য হাতছানিতে যেন সারাক্ষণ দোদুল্যমান। এক দিকে ঢেউ বা তরঙ্গ আকারে এই সূক্ষ্ম সত্তা আন্দোলিত হচ্ছে, অপর দিকে এই তরঙ্গেরই বহিঃপ্রকাশ আমাদের এই তরুলতা, গাছপালা, প্রাণিজগৎ এবং অগণিত নক্ষত্রের সমাহারে গড়া এই বিচিত্র বিস্ময়কর মহাবিশ্ব।

স্রষ্টা এবং সৃষ্টি অভেদ, এর ভিত্তিতে গড়ে ওঠে দার্শনিক মতবাদ সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism)। হিন্দু দর্শনে এটাকে বলে অদ্বৈতবাদ। আর এরই আরবি নাম ওয়াহদাতুল ওজুদ' যেটি সুফিদের মধ্যে বহু দিন থেকে প্রচলিত। এই তত্ত্বে স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে আদতে কোনো প্রভেদ দেখানো হয়নি। এ বিশ্বাস পরিশেষে একজনকে শিরকের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে বিধায় এটাকে ইসলামে বড় পাপ মনে করা হয় এবং এই মহাপাপেরই অভিযোগে মনসুর আল হাল্লাজের প্রাণদন্ড হয়েছিল। তিনি নিজেকে আনাল হক (হক আল্লাহতায়ালার গুণবাচক নাম) বলে দাবি করেন এবং এটি প্রত্যাহার করে নিতে বলা হলে তিনি তা অস্বীকার করেন এই বলে যে, 'আমি যে সত্যকে পেয়েছি, তাকে কী করে মিথ্যা বলি।' তার একটি কবিতা ছিল এরূপ-'আমি হচ্ছি তিনি (স্রষ্টা) যাকে আমি ভালোবাসি/ যাকে ভালোবাসি তিনিই আমি (স্রষ্টা)।'

যখন মৃত্যুদণ্ডের জন্য তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তিনি সমবেত লোকদের দিকে তাকিয়ে এই প্রার্থনাটি করেন, 'যারা তাদের ধর্মের প্রতি প্রবল ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে এবং তোমার আনুকুল্য লাভের আশায় এখানে জড়ো হয়েছে আমাকে হত্যার জন্য, হে মহাপ্রভূ! তাদের ক্ষমা করে দাও এবং তাদের প্রতি করুণা করো। যথার্থই আমার কাছে তুমি যা ফাঁস করেছ তাদের কাছে যদি এটি ফাঁস হতো, তারা এটা করত না, যা তারা করছে। তাদের কাছে যা গোপন রেখেছ আমার কাছে তা গোপন না রাখলে আমাকে একই যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো

www.nagorikpathagar.org

না।' মুসলিম বিশ্বের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ মুজাদ্দিদ ইমাম গাজ্জালী রহঃ যুক্তি দেখান, ব্লাসফিমাসের বা শিরকের অপরাধে তিনি দোষী না হলেও তার কাজটি নিঃসন্দেহে ছিল অবিজ্ঞের মতো। ষোড়শ শতাব্দীতে মুজাদ্দিতে আলফেসানি রহঃ আধ্যাত্মিক সাধনালব্ধ উপলব্ধির মাধ্যমে প্রকাশ করেন, "আধ্যাত্মিক জগতে অগ্রসর হলে একটা পর্যায়ে এসে সাধক স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ায়-সেখানে তার মনে হয় স্রষ্টা এবং সৃষ্টিতে কোনোই পার্থক্য যেন নেই। সবকিছুতেই সে শুধু স্রষ্টাকেই দেখতে পায়। কিন্তু এখানে এসে স্তব্ধ বা সম্মোহিত না হয়ে বরং এ স্তর অতিক্রম করে আরো উর্ধ্বে উঠলে দেখা যাবে, ওপরে রয়েছে আরো দুটি স্তর- 'জিল্লিয়াত' ও 'আবদিয়াত'। 'জিল্লিয়াত' স্তরে দেখা যাবে সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর নূরে (ঝ্যাতি/ আলো/ তরঙ্গ) দোল খেয়ে ফিরছে।" কুরআনপাকে এ দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, 'আল্লাহ নুরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ' (আল্লাহ আকাশ, মণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি) স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে আধ্যাত্মিক জগতের Pentheism (সর্বেশ্বরবাদ) বা 'অর্নাল হকে'র অভিজ্ঞতা আজকের কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের জ্যোতির্ময় বা আলোকময় বা তরঙ্গায়িত মহাবিশ্বের ধারণার সাথে কোথাও যেন একাকার হয়ে যায়, আর এ রহস্য উন্মোচনে 'সম্ভবত বাদ সাধে হাইজেনের অনিশ্চয়তার নীতি। মুজাদ্দিদ আল ফেসানি রহঃ-এর মতে, সাধক বা গবেষক যদি আরো এক ধাপ অতিক্রম করতে পারেন প্রকৃত সত্য তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 'আবদিয়াত' স্তরটিতে আসলেই সাধক বুঝতে পারবেন-'আল্লাহতায়ালা মহা মহীয়ান চিরগরীয়ান। বিশ্ব নিখিলের তিনিই পরম প্রভু আর আমরাই তার করুণার দান। বিজ্ঞান দিয়ে, প্রেম দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে কোনোক্রমেই তাকে ধরা যায় না। সব চিন্তা, অনুভূতি ব্যর্থ, হয়ে তাঁর দুয়ার থেকে ফিরে আসে।' হুইমার ভন ডিটফার্ড তার সায়েন্স, 'ফিলোসফি অ্যান্ড রিলিজিয়ন' গ্রন্থে লিখেছেন, আইনস্টাইনের সময় থেকে আমাদের মেনে নিতে হবে, আমরা কখনোই বিশ্বকে পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম হব না, কারণ আমাদের মস্তিষ্কের সহজাত গঠন তা করতে অপর্যাপ্ত।.... আমরা জানি, সামগ্রিক প্রকৃতির বিকাশের ধারায়, যা কোটি কোটি বছর ধরে চলছে। আমরা একাধারে স্বল্পায়ুধারী সাক্ষী ও অংশগ্রহণকারী। এভাবে জটিলতা ও সৌন্দর্যের মাঝে যে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তা আমাদের মানবিক ধ্যান ধারণার বোধগম্যতা অতিক্রম করেছে।' স্যার আর্থার এডিংটন লিখেন, 'এর আগে পদার্থবিদগণ যা ভাবতেন, তাকে পরিত্যাগ করলে বর্তমানে তারা মহাবিশ্ব সম্পর্কে যা ধারণা করে, তাকে আমি এভাবে বলতে পারি যে, 'এটা এখন আরো দৃঢ় রহস্যময়।

"অদৃশ্যের জ্ঞান কেবল তাঁরই, তাঁর জ্ঞান নিরূপণ কারো সধ্যের মধ্যে নয়।"-আলকুরান (৭২:২৬)

(সংগ্রহঃ দৈনিক নয়া দিগন্ত)

www.nagorikpathagar.org

বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২)

বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা

মাননীয় উপস্থিত ভগিনীবৃন্দ!

আপনারা আমার ন্যায় তুচ্ছ নগণ্য ব্যক্তিকে এ সময়ের জন্য সভানেত্রী পদে; বরণ করিয়া আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু আমি অবশ্যই বলিব যে, আপনাদের নিৰ্ব্বাচন ঠিক হয় নাই। কারণ আমি আজীবন কঠোর সামাজিক 'পর্দ্দার' অত্যাচার লোহার সিন্দুকে বন্ধ আছি-ভালরুপে সমাজে মিশিতে পাই নাই-এমনকি সভানেত্রীকে হাসিতে হয়, না কাঁদিতে হয়, তাহাও আমি জানি না। সুতরাং আমার ভাষায় কথায় অনেক ভুল-ভ্রান্তি থাকিবে তজ্জন্য আপনারা প্রস্তুত থাকুন।

শ্রদ্ধাস্পদা ভগিনি মিলিস্ লিন্ডসে আমাকে মুসলমান বালিকাদের শিক্ষা সম্বন্ধীয় অভাব অভিযোগের কথা বলিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সমবেত সুশিক্ষিতা গ্রাজুয়েট মহিলাদের সম্মুখে এ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারি, এমন যোগ্যতা আমার নাই। তবে ২০/২১ বৎসর হইতে সাহিত্য ও সমাজসেবা করিয়া,-বিশেষতঃ ১৬ বৎসর যাবৎ সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল পরিচালনা করিয়া যতটুকু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি, তাহাই আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহস করিতেছি।

স্ত্রীশিক্ষার কথা বলিতে গেলেই আমাদের সামাজিক অবস্থার আলোচনা অনিবার্য হইয়া পড়ে। আর সামাজিক অবস্থার কথা বলিতে গেলে, নারীর প্রতি মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের অবহেলা, ঔদাস্য এবং অনুদার ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষপাত অনিবার্য হয়। প্রবাদ আছে, "বলিতে আপন দুঃখ পরনিন্দা হয়।"

এখন প্রশ্ন এই যে, মুসলমান বালিকাদের সুশিক্ষার উপায় কি? উপায় তা আল্লাহর কৃপায় অনেকই আছে, কিন্তু অভাগিনীগণ তাহার ফলভোগ করিতে পায় কই? আপনারা হয়ত শুনিয়া আর্শ্চয্য হইবেন যে, আমি আজ ২২ বৎসর হইতে ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবের জন্য রোদন করিতেছি। ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব কাহারা জানেন? সে জীব ভারত-নারী! এই জীবগুলির জন্য কখনও কাহারও প্রাণ কাঁদে নাই। মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্য জাতির দুঃখে বিচলিত হইয়াছেন; স্বয়ং থার্ড ক্লাশ গাড়ীতে ভ্রমণ করিয়া দরিদ্র রেল-পথিকের কষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। পশুর জন্য চিন্তা

www.nagorikpathagar.org

করিবারও লোক আছে, তাই যত্রতত্র "পশুক্লেশ-নিবারণী সমিতি" দেখিতে পাই। পথে কুকুরটা মোটর চাপা পড়িলে তাহার জন্য এংলো-ইন্ডিয়ান পত্রিকাগুলোতে ক্রন্দনের রোল দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদের ন্যায় অবরোধ বন্দিনী নারীজাতির জন্য কাঁদিবার একটি লেকাও এ ভূ-ভারতে নাই।

নারী ও পুরুষ বিরাট সমাজ-দেহের দুইটি বিভিন্ন অংশ। বহুকাল হইতে নারীকে প্রতারণা করিয়া আসিতেছে, আর নারী কেবল নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছে। পুরুষের পক্ষে নারায়ণী সেনা আছেন বলিয়া তাহারা এ যাবৎ নারীর উপর জয়লাভ করিয়া আসিতেছেন। সুখের বিষয়, এতকাল পরে "শ্রীকৃষ্ণ" স্বয়ং আমার হিন্দু ভগিনীদের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করিয়াছেন। তাই চারিদিকে হিন্দু সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অবরোধ বন্দিনী মহিলাদের মধ্যে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহারা, বিশেষতঃ মাদ্রাজের মহিলাবৃন্দ সর্ব্ব-বিষয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছেন। এবার মাদ্রাজের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ডেপুটি প্রেসিডেন্টের পদে একজন মহিলা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সম্প্রতি রেঙ্গুনে একজন ব্যারিষ্টার হইয়াছেন। লেডী ব্যারিষ্টার মিস্ ঘোরাবজীর নামও সুপরিচিত; কিন্তু মুসলিম নারীর কথা কি বলিব?-তাহারা যে তিমিরে সে তিমিরে আছে।

মাতা যদি বিষ দেন আপন সন্তানে

বিক্রয়েন পিতা যদি অর্থ প্রতিদানে?

তাহাকে আর কে রক্ষা করিবে? আলীগড়ের প্রসিদ্ধ উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী শেখ মহম্মদ আবদুল্লাহ সাহেব এক সময় তাঁহার কোন বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "এদেশে বালক ও বালিকার শিক্ষায় পার্থক্য রাখার ফলে আমাদের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে যে আমাদের দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদে! বালিকাদের শিক্ষা না দেওয়া আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে, বরং ইহা আমাদের দুরপনেয় কলঙ্ক।" ইত্যাদি ইত্যাদি। অথ্যাৎ ২০ বৎসর পূর্ব্বে আমি হেন নগণ্য যাহা ১ম খন্ড "মতিচুরে" বলিয়াছি, সেই কথা এখন শেখ সাহেবের ন্যায় জ্ঞানবৃদ্ধ লোকের মুখেও শুনেতেছি। যাঁহারা ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, মুর্খতার অন্ধকার যুগে আরবগণ কন্যা বধ করিত। যদিও ইসলাম ধর্ম্ম কন্যাদের শারীরিক হত্যা নিবারণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলিমগণ অম্লান বদনে কন্যাদের মূর্খ রাখা এবং চতুস্প্রাচীরের অভ্যন্তরে আবদ্ধ রাখিয়া জ্ঞান ও বিবেক হইতে বঞ্চিত রাখা অনেক কৌলিন্যের লক্ষণ মনে করেন। কিছু কাল পর্যন্ত মিসর এবং তুরস্ক স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ঠকিয়া ঠকিয়া নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া এখন সুপথে আসিয়াছেন।

www.nagorikpathagar.org

সম্প্রতি তুরস্ক এবং মিসর, ইউরোপ ও আমেরিকার ন্যায় পুত্র ও কন্যাকে সমভাবে শিক্ষা দিবার জন্য বাধ্যতামূলক আইন করিয়াছেন। কিন্তু তুরস্ক আমেরিকার পদাঙ্ক অনুসরণে সোজা পথ অবলম্বন করেন নাই; বরং আমাদের ধর্ম-শাস্ত্রের একটি অলঙ্ঘনীয় আদেশ পালন করিয়াছেন। যেহেতু পৃথিবীতে যিনি সর্ব্বপ্রথমে পুরুষ স্ত্রীলোককে সমভাবে সুশিক্ষা দান করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনি আমাদের রসূল (স:) তিনি আদেশ করিয়াছেন যে, শিক্ষালাভ করা সমস্ত নরনারীর অবশ্য কর্তব্য। তের শত বৎসর পূর্ব্বেই আমাদের জন্য এই শিক্ষাদানের বাধ্যতামূলক আইন পাশ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের সমাজ তাহা পালন করে নাই, পরন্ত ঐ আদেশের বিরুদ্ধচারণ করিয়াছে এবং তদ্রুপ বিরুদ্ধাচরণকেই বংশ-গৌরব মনে করিতেছে। এখনও আমার সম্মুখে আমাদের স্কুলের কয়েকটি ছাত্রীর অভিভাবকের পত্র মজুদ আছে-যাহাতে তাঁহারা লিখিয়াছেন, যে তাঁহাদের মেয়েদের যেন সামান্য উর্দ্দু ও কোরাণ শরীফ পাঠ ছাড়া আর কিছু বিশেষতঃ ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া না হয়। এই ত আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা।

ভারতবর্ষে যখন স্ত্রীশিক্ষার বাধ্যতামূলক আইন পাশ হইবে, তখন দেখা যাইবে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, মুসলমান-যাঁহারা স্বীয় পয়গাম্বরের নামে (কিংবা ভগ্ন মসজিদের এক খন্ড ইস্টকের অবমাননায়) প্রাণ দানে প্রস্তুত হন, তাঁহারা পয়গাম্বরের সত্য আদেশ পালনে বিমুখ কেন? গত অন্ধকার যুগে যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা যে ভ্রম করিয়াছেন, তাহাও ক্ষমা করা যাইতে পারে; কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে যখন বারংবার স্ত্রী-শিক্ষার দিকে তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে যে, কন্যাকে শিক্ষা দেওয়া আমাদের প্রিয় নবী "ফরয" (অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য) বলিয়াছেন, তবু কেন তাঁহারা কন্যার শিক্ষায় উদাসীন?

এখন শিক্ষার অবস্থা এই যে, আমাদের দেশের গড়পরতা প্রতি ২০০ (দুইশত) বালিকার একজনও অক্ষর চিনে না; প্রকৃত শিক্ষিতা মহিলা বোধ হয় দশ হাজারের মধ্যে একজন পাওয়া যাইবে না। কেবল এই বঙ্গদেশে প্রায় তিন কোটি মুসলমানের বাস। গত জানুয়ারী মাসে শিক্ষা বিভাগ হইতে আমাকে একখানি পত্রে অনুরোধ করা হয়েছিল যে, বঙ্গদেশে যতগুলি মুছলিম মহিলা গ্রাজুয়েট আছেন, তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া যেন আমি অবিলম্বে পাঠাই। কিন্তু আমি বঙ্গের মাত্র একটি মহিলা গ্রাজুয়েট এবং আগা মইদুল ইসলাম সাহেবের কন্যাত্রয় ব্যতীত আর কাহারও নাম দিতে পারি নাই। আগা সাহেব বঙ্গদেশের অধিবাসী নহেন, সুতরাং তিন কোটি মুছলমানের মধ্যে মাত্র একটি মহিলা পাওয়া গেল, বলিতে হয়!! সম্ভবতঃ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা অনুসন্ধানের পর প্রেসিডেন্সী ও বর্ধমান বিভাগের স্কুলের ইনসপেকট্রেস

www.nagorikpathagar.org

মহোদয়া আমাকে মুসলিম মেয়ে গ্রাজুয়েট খুঁজিয়া বাহির করিতে বলিয়াছেন!! আবার আমি শেখ আবদুল্লাহ সাহেবের একটি বচন উদ্বৃত করিতেছি।

"স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীগণ বলে যে, শিক্ষা পাইলে স্ত্রীলোকেরা অশিষ্ট ও অনন্যা হয়। ধিক! ইহারা নিজেকে মুসলমান বলেন, অথচ ইসলামের মূল সূত্রের এমন বিরুদ্ধচরণ করেন। যদি শিক্ষা পাইয়া পুরুষগণ বিপথগামী না হয়, তবে স্ত্রীলোকেরা কেন বিপথগামিনী হইবে? এমন জাতি যাহারা নিজেদের অর্দ্ধেক লোককে মূর্খতা ও "পর্দ্দা " রূপ কারাগারে আবদ্ধ রাখে, তাহারা অন্যান্য জাতির যাহারা সমানে সমানে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন করিয়াছেন, তাহাদের সহিত জীবন সংগ্রামে কিরুপে প্রতিযোগিতা করিবে?"

ভারতবর্ষে এক কোটি লোক ভিক্ষাজীবী, তন্মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। সুতরাং তাহারা কোন মুখে অন্য জাতির সহিত সমকক্ষতা করিবে? আমরা আবার কৌলিন্যের বড়াই করি! ভিক্ষাবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা নীচ কার্য্য, আর মুছলমানের সংখ্যাই ইহাতে অগ্রণী। ইহার কারণ এই যে, তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধনে বঞ্চিত রাখিয়া সর্ব্ববিষয়ে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। ফলে তাহাদের গর্ভজাত সন্তান অলস ও শ্রমকাতর হয়: সুতরাং "বাপ দাদার নাম" লইয়া ভিক্ষা ছাড়া তাহারা আর কি কাজ করিবে? এখন স্ত্রীলোকেরা ভোট দানের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে,কিন্তু মুসলিম মহিলাগণ এ অধিকারের সদ্ব্যবহারে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত রহিয়াছেন। গত ইলেকশনের সময় দেখা গেল কলিকাতার মাত্র ৪ জন স্ত্রীলোক ভোট দিয়েছে। ইহা কি মুসলমানের জন্য গৌরবের বিষয়? তাঁহারা কোন্ সুযোগের আশায় বা অপেক্ষা বসিয়া আছেন?

যে পর্যন্ত পুরুষগণ শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য অধিকার দিতে স্বীকৃত না হয়, সে পর্যন্ত তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষাও দিবে না। যাহারা নিজেদের সমাজকে উদ্ধার করিতে পরিতেছে না , তাহারা আর দেশোদ্ধার কিরূপে করিবে? অর্ধ্বাঙ্গীকে বন্দিনী রাখিয়া নিজে স্বাধীনতা চাহে, এরূপ আকাঙ্খা পাগলেরই শোভা পায়। সদাশয় বৃটিশ গর্ভর্ণমেন্ট যেমন ভারতবাসীর উচ্চাকাঙ্খা সহ্য করিতে চাহেন না-আমার মনে পড়ে প্রায় ২১ বৎসর পূর্ব্বে মিষ্টার মর্লি বলিয়াছেন, "যদি তাঁহারা চাঁদের জন্য আবদার করে (If they cry for the Moon.) তাহা আমরা দিতে পারি না" ইত্যাদি এবং আমাদের অমূলমান প্রতিবেশীগণ এখন সাধারণতঃ যেরূপ মুসলমানদের দাবী-দাওয়া সহ্য করিতে পারেন না, সেইরূপ মুসলমান পুরুষগণও নারীজাতির কোন প্রকার উন্নতির অভিলাষ স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু আল্লাহ কুদরত বা প্রকৃতির নিয়ম অতি চমৎকার! তিনি এ বিশ্ব জগৎকে এক

www.nagorikpathagar.org

অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন-আমরা পরস্পরের সহিত এরূপভাবে জড়িত আছি যে, একে অপরকে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারি না। মুসলিম ভ্রাতৃগণ যতদিন আমাদের দুঃখ-সুখের প্রতি মনোযোগ না করিবেন, ততদিন তাঁহাদের কথাও ভারতের অপর ২২ কোটি লোকে শুনিবে না, আর যদ দিন ঐ ২২ কোটি লোকে ৮ কোটি মুসলমানকে উপেক্ষা করিবে ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের রোদনও বৃটিশ গভর্ণমেন্টের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে না!! বহুদিন হইল একটি বটতলার পুঁথিতে পড়িয়াছিলাম:

"আপনি যেমন মার খাইতে পারিবে
বুঝিয়া তেয়ছাই মার আমাকে মারিবে।"

হযরত ঈসা (আ) বলিয়াছেন, "তুমি নিজে অপরের নিকট যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর, অপরের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিও"। এস্থলে আমি শেখ সাহেবের আর একটি উক্তি উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না, তা এই:

"ভারতবর্ষে অবরোধ-প্রথা স্ত্রীলোকদের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। অবরোধ-প্রথা আমাদের সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত। ভ্রাতৃগণ! পর্দ্দার নাম শুনিবা মাত্র আপনারা হয়ত একযোগে বলিয়া উঠিবেন, 'তবে কি আমরা ইংরাজদের অনুকরণে বিবিদের রাজপথে বেড়াইতে দিব? তদুত্তরে বলি, আমি মুসলমান শাস্ত্রের সীমার মধ্যে থাকিয়া আপনাদের সহিত কথা বলিতে চাই। ভারতীয় পর্দ্দার সহিত শাস্ত্রীয় পর্দ্দার কোন সম্বন্ধ নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। "

পর্দ্দা সম্বন্ধে আমি নিজের কোন মত প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহি-কেবল এইটুকু বলি যে, শেখ সাহেব পর্দ্দাকে "সর্বাপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত" বলিয়াছেন, আমি তাহা মনে করি না। "যন্ত্রণাদায়ক" হইলে অবলাগণ "বাবারে! মারে! গেলুম রে!" বলিয়া আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ করিতেন। অবরোধ-প্রথাকে প্রাণঘাতক কার্ব্বনিক এসিড গ্যাসের সহিত তুলনা করা যায়। যেহেতু তাহাতে বিনা যন্ত্রনায় মৃত্যু হয় বলিয়া লোকে কার্ব্বনিক গ্যাসের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিবার অবসর পায় না! অন্তঃপুরবাসিনী নারী এই অবরোধ গ্যাসে বিনা ক্লেশে তিল তিল করিয়া নীরবে মরিতেছে।

'মুসলমান বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে কোরান শিক্ষাদান করা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। কোরান শিক্ষা অর্থে শুধু টীয়া পাখীর মত আরবী শব্দ আবৃত্তি করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় কোরানের অনুবাদ শিক্ষা দিতে হইবে। সম্ভাবতঃ এজন্য গভর্ণমেন্ট বাধ্যতামূলক আইন পাশ না করিলে আমাদের সমাজে মেয়েদের কোরান শিক্ষাও দিবে না! যদি কেহ ডাক্তার ডাকিয়া ব্যবস্থাপত্র (Prescription) লয়, কিন্তু তাহাতে লিখিত ঔষধ-পথ্য ব্যবহার না করিয়া সে

www.nagorikpathagar.org

ব্যবস্থা-পত্রখানাকে মাদুলী রূপে গলায় পরিয়া থাকে, আর দৈনিক তিনবার করিয়া পাঠ করে, তাহাতে কি সে উপকার পাইবে? আমরা পবিত্র কোরান শরীফের লিখিত ব্যবস্থা অনুযায়ী কোন কায্য করি না, শুধু তাহা তোতা পাখীর মত পাঠ করি আর কাপড়ের থলিতে পুরিয়া অতি যত্নে উচ্চস্থানে রাখি। কিছুদিন হইল, মিসর হইতে মিস্ যাকিয়া সুলেমান এলাহাবাদে এক বিরাট মুসলিম সভায় বক্তৃতাদানকালে বলিয়াছিলেন, "উপস্থিত যে যে ভদ্রলোক কোরানের অর্থ বুঝেন, তাঁহারা হাত তুলুন।" তাহাতে মাত্র তিনজন ভদ্রলোক হাত তুলিয়াছিলেন। কোরান-জ্ঞানে যখন পুরুষদের এইরূপ দৈন্য, তখন আমাদের দৈন্য যে কত ভীষন, তাহা না বলাই ভাল। সুতরাং কোরানের বিধিব্যবস্থা কিছুই আমরা অবগত নহি। স্থানীয় ভাষা বলিতে অন্য স্থানের ভাষা যাহাই হউক, কলিকাতার ভাষা কি হইবে? ষোল বৎসর যাবৎ এই সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল পরিচালনার ফলে আমি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে, এখানকার মুসলমানেরা মাতৃহীন-অর্থাৎ তাহাদের মাতৃভাষা নাই। তাহারা উর্দ্দুকে মাতৃভাষা বলিয়া দাবী করে বটে, কিন্তু এমন বিকৃত উর্দ্দু বলে যে, তাহা শুনিলে শ্রবণবিবর ক্ষত-বিক্ষত হয়! যাহা হউক, তথাপি উর্দ্দু এবং বাঙ্গালা উভয় অনুবাদই শিক্ষা দিতে হইবে। আমার অমুসলিম ভগিনীগণ! আপনারা কেহ মনে করিবেন না যে, প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কোরান শিক্ষা দিতে বলিয়া আমি গোঁড়ামীর পরিচয় দিলাম। তাহা নহে, আমি গোঁড়ামী হইতে বহুদূরে। প্রকৃত কথা এই যে, প্রাথমিক শিক্ষা বলিতে যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়, সে সমস্ত ব্যবস্থাই কোরানে পাওয়া যায়। আমাদের ধর্ম ও সমাজ অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য কোরান শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন।

মুসলমানদের যাবতীয় দৈন্য-দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ স্ত্রীশিক্ষার ঔদাস্য। ভ্রাতৃগণ মনে করেন, তাঁহারা গোটাকতক আলীগড় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর করিয়াই পুলসিরাত পার হইবেন-আর পার হইবার সময় স্ত্রী ও কন্যাকে হ্যান্ড ব্যাগে পুরিয়া লইয়া যাইবেন। কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তা বিধাতার বিধান যে অন্যরূপ-যে বিধি অনুসারে প্রত্যেককেই স্ব-স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং স্ত্রীলোকের উচিত যে, তাঁহারা বাক্স-বন্দী হইয়া মালগাড়ীতে বসিয়া সশরীরে স্বর্গলাভের আশায় না থাকিয়া স্বীয় কন্যাদের সুশিক্ষায় মনোযোগী হন। কন্যার বিবাহের সময় যে টাকা অলঙ্কার ও যৌতুক ক্রয়ে ব্যয় করেন, তাহারই কিয়দংশ তাহাদের সুশিক্ষায় ও স্বাস্থ্য রক্ষায় ব্যয় করুন। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য শারীরিক ব্যায়াম চর্চ্চা করা প্রয়োজন; আর প্রয়োজন বিশুদ্ধ বাতাসের। আল্লাহর দান বিশুদ্ধ বাতাস বিনা পয়সায় গ্রহণ করিতে মহিলাগণ কেন অনিচ্ছুক, আমি তাহা বুঝিতে পারি না। শীতকালে তাঁহারা এরূপভাবে জানালা-দ্বার, বিশেষতঃ সার্সী বন্ধ করিয়া রাখেন যে, আমার মনে হয়, গভর্ণমেন্ট কেন আইন করিয়া দ্বার-জানালার সার্সী ব্যবহার করা

www.nagorikpathagar.org

নিষিদ্ধ করেন না! পাঁচ ছয় বৎসর হইল, ডাক্তার মিস্ কোহেন বালিকা বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমাদের স্কুলের কতিপয় বালিকার স্বাস্থ্যের রিপোর্ট যখন তাহাদের মাতার নিকট এই অনুরোধ-সহ গেল যে, "স্কুলমে লাড়কী পড়েন কো দিয়া হায়, না বিচার করেন কো, কে আঁখ্ কমজোর, দাঁত কম-জোর, হলক মে ঘাও হয়, ফেঁকড়া খারাব হ্যায়! ইয়ে সব বোলনে সে হামারী লাড়কী কা শাদী ক্যায়সে হোগা? ইয়ে সব বাৎ রহনে দেঁ, হামারী লাড়কী কো ডাক্তারনীসে না দেখায়েঁ!" ইয়া আল্লাহ! মেয়ের প্রাণ লইয়া টানাটানি, অথচ শাদীর চিন্তায় মায়ের চোখে ঘুম ধরে নাই! ফল কথা, অশিক্ষিতা মাতার নিকট ইহা অপেক্ষা আর কি আশা করা যাইতে পারে?

আমাদের স্কুলের ছাত্রীগণ পরীক্ষার সময় প্রায়শঃ ভূগোল, ইতিহাস এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিষয়ে অকৃতকার্য (ফেল) হয়; ইহার কারণ এই যে, তাহারা নিজেদের বাসভবন এবং স্কুল-গৃহ ব্যতীত দুনিয়ার আর কিছুই দেখিতে পায় না, এই দুনিয়ার তাহাদের পিতা ও ভ্রাতা ছাড়া আরও কেহ আছে কিনা, তাহা তাহারা জানে না; রুদ্ধ বায়ুপূর্ণ কক্ষে আবদ্ধ থাকিয়া মা-মাসীকে অনবরত রোগ-ভোগ ও স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে দেখে। তাহারা কেবল জানে, অসুখ হইলে ডাক্তার ডাকিতে হয়। এই সকল কু-রোগের এক মাত্র ঔষুধ সুশিক্ষা।

উপসংহারে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল এবং আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলামের উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কলিকাতার মুসলিম সমাজের উন্নতির নিমিত্ত এই উভয় প্রতিষ্ঠাই প্রাণপণে যত্ন করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহারা এখনও পূর্ণ মাত্রায় সফলতা লাভ করে নাই। স্কুলটিকে হাই স্কুলে উন্নীত করা এবং ইহার জন্য একটা নিজের বাড়ী হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন এবং আঞ্জুমানটি মহিলা-সমাজে সর্ব্বজনপ্রিয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। আজ আপনাদের অনেকখানি সময় নষ্ট করিলাম, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া এখন আমি ইতি করি।

(ভাষনটি বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'রোকেয়া রচনাবলী' থেকে সংকলিত।)

www.nagorikpathagar.org

কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদ (১৮৮৪-১৯৭৫)

দুর্যোগের পাড়ি

উপমহাদেশের কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের এক সময় পুরোধা হয়ে উঠেছিলেন কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ (১৮৮৪-১৯৭৫) তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমাদের এ বাংলার বঙ্গোপসাগর উপকূলীয় দ্বীপ সন্দ্বীপে; অবশ্য জীবংকাল অতিবাহিত হয়েছে কলিকাতায় এবং সেখানেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়েছে।

কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ শুধুমাত্র রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না; তিনি একাধিক গ্রন্থ ও বহু মননশীল প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তিনি বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির সাথে জড়িত ছিলেন এবং এর মুখপত্র বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা, মোসলেম ভারতসহ অন্যান্য পত্রিকায় ইসলামসহ বিভির বিষয় প্রবন্ধ রচনা করেন। আমাদের জাতীয় নজরুলের সাথে তার বিশেষ সম্পর্কে ছিল; এ সম্পকে 'নজরুল প্রসংগ' শীর্ষক স্মৃতিগ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলে এছাড়াও উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে 'আমার জীবনও ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি 'শীর্ষক চমৎকার তথ্য সমৃদ্ধ বিখ্যাত স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

মুজাফ্ফর আহমদের আলোচ্য প্রবন্ধটি মোসলেম ভারত-এর ১ম বর্ষ, ১ম খন্ড: আশ্বিন ১৩২৭ এ প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধে তিনি যুগ সংকট কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (স:) প্রদর্শিত পন্থাকেই একমাত্র পাথেয় হিসাবে নির্দেশ করেছেন। প্রবন্ধটি কবি ফররুখ আহমদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে উৎপাদন কবি-নাংবাদিক আহমদ আখতারের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

গাছের পাতা একটুকুও নড়িতেছে না। সমস্ত আকাশ বোর কারো ঢাকিয়া ফেলিয়াছে এখটি নামিবে বিশ্ব বিধ্বংসী ঝড় আর বৃষ্টি। মাঝি বসিয়া ভাবিতেছে এ উত্তাল সমুদ্রে তরীর পাড়ি দিই কি না নিই। কেন পাড়ি দিবে না, মাঝি? তোমার যে পাড়ি দেওয়াই কাজ। ঝড় বৃষ্টি দুর্যোগকে আর যে ভয় করে করুক, মাঝি তুমি তোমার ভর করিলে চলিবে কেন? যাই বলিতেই মাঝি সেই অনাথের নাথ, বিশ্ব কর্ম আল্লাহর নাম স্মরণ করিয়া এখনি পাড়ি দাও। -------- কর্তব্যের আহবানে সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড় ভাই! তীর ত তোমার জন্য নিরাপদ নয়, নিবে বন্দিন্য কি করিবে তুমি? দেখিতেই না চারিদিকে কত দানবের কত লেলিহান জিহ্বা তোমাকে মুখ্যে ভিতর দরিয়া দেওয়ার জন্য লকলক করিতেছে। এপারে সুখ, আরাম, শান্তি কিছুই নাই, আজ দুর্যোক পাড়ি দিয়া আমরা পার হইব ওপারে,-যেখানে আমাদের লক্ষ্য রহিয়াছে। মাঝ সরিয়ার তুফান ও স্রোতের আবর্ভে পড়িয়া আমাদের ভরা ডিঙ্গা যদি ডুবিয়াও যায় ত যাক, -

www.nagorikpathagar.org

কর্তব্যের পথে, লক্ষ্যের পথে আমাদের মরাও সধিক হইবে। ভাই মাঝি, আর বসিয়া ভাবিও না, -চল ভাসিয়া পড়ি এখনি, এখনি।

মনে পড়ে কি ভাই সে দিনের কথা, সেই তেরশ বছর আগের? যখন কর্তব্যের আহবান আসিয়ছিল, তখন কি করিয়াছিলেন সেই অনাথ মাতৃ-পিতৃহীন মরুভূমির সন্তান? কত অত্যাচর, কত অবিচার হইয়াছিল হযরত, মোহাম্মদের (দঃ) উপর! মক্কার শহরে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি আরাফাতে ছুটিয়া গিয়াছিলেন সত্যের মহিমা বুঝিল না। আল্লাহ নামে তিনি যে আহবান করিয়াছিলেন নেই আহবানে কোনো সাড়া না দিয়া আরাফাতের নিষ্ঠুর লোকেরা তাহাকে এমন মার মরিল যে, তাহার শরীরে রক্তের নদী বহিয়া গেল। তার পর আরও কত অমানুষিক নির্যাতন সহিয়াছিলেন তিনি, কিন্তু এক তিলও দমিলেন না। সত্যকে এমনভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিলেন, লক্ষ্যের পথে এমটি চলা চলিলেন যে, একদিন সত্য সত্যই আরবে তাঁহার জয়-জয়কার পড়িয়া গেল। যাহারা ছিল হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর শত্রু, সকল কার্যের প্রতিবন্ধক, তাহারাই সমস্বয়ে বলিয়া উঠিল, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নাই, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লারই প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত ভূত্য।'

হযরত মোহাম্মদ (দঃ) চরিত্র হইতেছে আমাদের পক্ষে 'ওসওয়াতুল হাসনাৎ-মংগলপ্রদ আদর্শ, সুতরাং অনুকরণীয়। বিপদ ঘনীভূত হইয়া আসুক, দুর্যোগ বাড়িয়া যাক, লক্ষ্য বিঘ্ন সংকুল হউক, পাড়ি আমরা দিবই দিব। আমরা যদি কখনও কুলের নাগাল না পাই, তরী যদি আমাদের চিরতরে অতলের তলেও লেন হইয়া যায়, তাহা হইলেও আমাদের জীবন সাধনার কোন হানি হইবে না। এ পারে যে আমাদের এক চিহ্ন থাকিবে, তাহা দেখিয়া আমাদের পিছনে যাহারা, আসিবে, তাহারা সেই চিহ্ন দরিয়া ভাসিয়া পড়িবে। এমনিভাবে আমরা না পারি, আমাদের পুত্র, পুত্র না পারুক পৌত্র এক দিন ওপারে পৌছিবেই। সেখানে যে আমাদের ভান্ডার আমাদের জন্য পড়িয়া আছে। তাই বলি মাঝি ভাই, চল অন্তত: চিহ্নিটি সে জন্যও আমরা ভাসিয়া পড়ি। তাহাতেও যে লাভ আছে ভাই।

মেঘাছন্ন আকাশের নিচে এই কাল সমুদ্র বড় ভয়ঙ্কর, বড় ভীষণ; সত্য বটে, সমুদ্রের ঢেউ বড় প্রচন্ড, বড় শক্তিশালী, কিন্তু তাই বলিয়া সমুদ্র কি কেহ পার হয় না ভাই? কোথায় ছিল আমেরিকা কোন্ অজানার রাজ্য, মানুষ কি ইহাকে আবিষ্কার করে নাই ভীষণ সমুদ্র পার হইয়া? তরঙ্গের প্রচন্ডতা ও শক্তিমত্তকে দলিত করিয়া জাহাজ কি চলে না ভাই সমুদ্রে; আমরা কর্তব্যের আহবান শুনিয়াছি, সব বাধা, সব বিঘকে আমরা উপেক্ষা করিয়া চলিব? দুর্যোগের ভিতর চলিয়া চলিয়া আমাদের সাহস বাড়িয়া গিয়াছে। দুর্যোগকে আমরা আর ভয় করি না। ঝড় বৃষ্টি নামিয়া আসে আসুক চল মাঝি ভাই আমরা দুর্যোগের পাড়ি দিই, দে ভাই, তরীর বাঁধন মুক্ত করিয়া। ঐ শোন কবি গাতিতেছেন-

আমরা চলি সম্মুখ পানে
কে আমাদের বাঁধাবে?
দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাপার
নাঙিমতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার-নজরুল

www.nagorikpathagar.org

জ্ঞান তাপস ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯)

চট্টগ্রাম মুসলমান ছাত্র সম্মিলনে অভিভাষণ

বিস্‌মি-ল্লাহি-ররহ্ মানির্‌রহীম, নহ্‌মুদুহ ওা নুস্বল্লী আলা রাসূলিহি-ল্‌করিম।

দয়ালু দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে। আমরা তাঁহার স্তব করি এবং তাঁহার সম্মানিত পয়গম্বরের উপর তাঁহার আশীর্ব্বাদ করি।

প্রিয় ছাত্র-ভ্রাতৃগণ!

তোমরা আমার অনুজ। আমি তোমাদের অগ্রজ। তোমার পরম স্নেহাস্পদ। আমি চিরকাল তোমাদেরই আমি এবং আশা করি থাকিব। আজ তোমাদের মধ্যে বলিবার জন্য উচ্চস্থান প্রদান করিয়া, আমাকে যে আনন্দ দান করিলে, কেবল ধন্যবাদ জানাইয়া তাহার কৃতজ্ঞতা স্বীকার সমুচিত হইবে বলিয়া, আমার মনে হয় না। ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদিগকে আমার হৃদয় অর্পন করিতেছি। তোমরা কি তাহা গ্রহণ করিবে?

পিঞ্জরাবদ্ধ পাখি যেমন বহুদিন পর খোলা জায়গায় তাহার স্বজাতিকে দেখিল আনন্দে কাকলী ধ্বনি তুলে, আজি আমি তেমনি তোমাদিগকে পাইয়া আনন্দেমুখর হইয়াছি। আশা করি, আমার বাচালতা তোমাদের সহৃদয়তাগুণে ধৃষ্টতা বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

তোমাদিগকে দেখিলে আমার অতীত সোনারস্বপন, যাহা সংসার তাহার কঠোর করে নিঠুরভাবে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, যেন ফিরিয়া আসিয়া আমাকে মোহাবিষ্ট করে। সে স্বপ্নে দেখি এক বিরাট বিশাস সৌধ। সৌধের চূড়া চন্দ্রলোক স্পর্শ করিয়াছে। তারকা শশিকলা সেই চূড়ায় বিরাজ করিতেছে। জগতের লোক বিস্ময়মুগ্ধ-নেত্রে সেই অপূর্ব্ব প্রাসাদ নিরীক্ষণ করিতেছে। কোথায় আজ, আলহামরা, সেই প্রসাদের সৌন্দর্যের কাছে? সেই হর্ম্ম্যের ভিত্তি ঈমানের উপর তার প্রত্যেক প্রস্তর এক একটি মহৎ কর্ম্ম, প্রস্তরগুলি গ্রথিত জ্ঞান দ্বারা। বহু যুবকের উজ্জ্বল শোণিত এবং বহু বৃদ্ধের দীর্ঘ অমূল্য জীবন দ্বারা সেই সৌধের কারুকার্য্য রচিত। আমি বিস্ময়-বিহ্বল মনে ভাবিতেছি, এ বিরাট ভবন কাহার? ইহার নির্মাণকর্ত্তা কে বা কাহারা? সহসা আমার দৃষ্টি দ্বারফলকের প্রতি নিপত্তিত হইল। দেখিলাম, তাহাকে বাঙ্গালা, আরবী, পারসী, উর্দ্দু, ইংরেজি কত জানা অজানা ভাষায় লিপি রহিয়াছে। প্রথমেই বাঙ্গালা লিপিতে পড়িলোম 'কীর্ত্তিসৌধ বিশ্বমানবের জন্য।' অন্য যে যে ভাষা পড়িতে পরিলাম তাহারও মর্ম্ম বাঙ্গালা লিপিরই

www.nagorikpathagar.org

অনুরূপ। হর্ম্ম্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা কোনচক্ষু কখন দেখে নাই, কেন কর্ণ তাহার বিষয় শ্রবণ করে নাই, কোন হৃদয় তাহার বিষয় চিন্তা করে নাই। কীর্ত্তিসৌধের স্থপতিগণভকেও তথায় দেখিলাম, তাহারাপ অজর অমর হইয়া তথায় বসবাস করিতেছেন। তাঁহাদের অল্প কয়েকজনকে চিনিলাম- আলাওল, হোসেন শাহ্, শাহ জালাল, হাজী মোহাম্মদ মোহাম্মদ মোহসেন, মীর মোশার্রফ হোসেন প্রর্ভতি। আরও বহু নির্মাণ-কর্ত্তা দেখিলাম। কিন্তু তাঁহাদের কতকগুলির নাম জানিতে পারিলাম না এবং কতকগুলির (ইহারাই সংখ্যায় অধিক) মুখমণ্ডলে ভবিষ্যতের যবনিকা থাকায় চিনিতে পারিলাম না।

ছাত্র বন্ধুগণ তোমাদের প্রতিভাদীপ্ত নয়ন, গৌরবমণ্ডিত বদন, অধ্যয়নক্লিষ্ট গণ্ডদ্বয়, প্রতিজ্ঞা দ্যোতক ভ্রূযুগল, মহত্ত্বব্যঞ্জক ললাট এবং শ্রমসহিষ্ণু দেহ দেখিলে মনে হয় আশা পূর্ণ হইবে, আমার স্বপন সফল ইহবে। The dream of to-day is the reality of tomorrow.

নিজেকে চিন

তোমরা জান কি, কি গুরু, মহৎ কর্ম্মের ভার তোমাদের উপর? তোমরা ভাব কি সমস্ত মুসলমান সমাজ কত বড় আশা করিয়া তোমাদের মুখপানে তাকাইয়া আছে? ভাবিতেছে নগণ্য আমরা, কি কাজ করিব? ক্ষুদ্র আমরা, আমাদের আশা কোথায়? না, না। তোমরা নগণ্য নও, তোমরা ক্ষুদ্র নও।

ভুলিয়া যাও কেন, তোমরা মানুষ?

'এবং আমি নিশ্চয় আদমের সন্তানকে গৌরবান্বিত করিয়াছি' (কোরআন)।

'অতি উত্তম উপাদানে মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি' (কোরআন)।

'এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে, তাহা তিনি তোমাদের অনুগত করিয়াছেন' (কোরআন)।

তুমি আপনাকে ক্ষুদ্রদেহ মনে করিতেছ, কিন্তু বিশ্বজগৎ তোমাতে অন্তর্নিবিষ্ট (হজরত আলী)। ভুলিয়া যাও কেন, তোমরা মুসলমান?

আল্লাহ অঙ্গীকার করিতেছেন, তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিবে এবং সৎকর্ম করিবে তাহাদিগকে নিশ্চয় তিনি পৃথিবীতে অধিপতি করিবেন (কোরআন)।

এবং তোমরা হতাশ হইও না, শোক করিও না। নিশ্চয় তোমরাই উন্নত, যদি তোমরা মুমিন হও (কুরআন)।

www.nagorikpathagar.org

"অবধান কর, নিশ্চয় আল্লাহর দল, তাহারাই বিজয়ী" (কোরআন)।

মুসলিম হৈঁ হুম ওতন হৈ সারা যাহঁা হমারা;

ভুলিয়া যাও কেন, তোমরা বাঙ্গালী? তোমাদের ধমনীতে আর্য্য মোঙ্গলীয়, দ্রাবিড়ী, আরবী, পারসী, আফগানী, ও তুর্কি রক্ত মিশ্রিত আছে। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত, যাহাদের শরীরে যত পরিমাণে বাহিরের রক্ত মিশ্রিত থাকে, তত পরিমাণে তাহারা জীবন যুদ্ধের উপযোগী হয়। এই সকল বিবেচনা করিয়া বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ সম্বন্ধে সুপ্রজনন বিদ্যাবিশারদ বাবু শশধর রায় মহাশয় যাহা বলিয়াছেনব, তাহা অধিকতর সঙ্গতরূপে তোমাদের সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে- "ইহা নিশ্চয়ই ইহারা একদিন ভারতবর্ষে সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে"।

ভুলিয়া যাও, কেন, তোমরা ছাত্র। A Nation is built in the schools and colleges. জাতি বিদ্যালয়ে গঠিত হয়। ভবিষ্যতের মুসলমান সমাজ তোমরা। সমাজের ভবিষ্যৎ শুভামুভ তোমাদেরই হস্তে ন্যস্ত।

তবে মনে রাখিও তোমরা মানুষ, তোমরা মুসলমান, তোমরা বাঙ্গালী, তোমরা ছাত্র। যেমন ক্ষুদ্র বটবীজমধ্যে বটবৃক্ষ প্রকাশ থাকে, ক্ষুদ্র দেখালেও তোমাদের মধ্যেও সেইরূপ অতি বৃহৎ মনুস্যত্ব অপরিস্ফুট রহিয়াছে। কোথায় সে সাধনা, যাহা অনুকূল আবহাওয়ার ন্যায় তোমাদের মানুষ্যত্বকে বিকশিত করিয়া জগতের সম্মুখে বিশাল ফলবান বৃক্ষের ন্যায় মোহনীয় শোভনীয় লোভনীয় করিয়া বিরাজিত করিবে? যেমন বালুর ন্যায় দেখিতে নগণ্য অতি বিপুল তেজোরাশি লুক্কায়িত আছে, কিন্তু কোথায় সে দৃঢ় সংকল্প, যাহা স্ফুলিঙ্গের ন্যায় অন্তর্নিহিত তেজকে বিচ্ছুরিত করিয়া, সহস্য বিদ্যুৎস্ফুরনের ন্যায় জগতকে কম্পিত, স্তম্ভিত, বিস্মিত ও মোহিত করিবে?

কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কোন ভারতীয় ঋষি বলিয়াছিলেন, 'আত্মানং বিদ্ধি'- নিজকে চিন। য়ুনান হইতে কোন দার্শনিক তাহার প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিলেন Know thyself আমিও তোমাদিগকে বলি নিজকে চিন-জান তুমি ক্ষুদ্ররূপে কত বৃহৎ নগণ্যরূপে কত প্রবল। ছাত্রগণ, তোমরাই আমাদের আশাস্থল। কিন্তু তোমরা আত্মবিস্মৃত তাই আজ আমরাও অধঃপতিত। যতদিন পর্যন্ত তোমরা আপনাদিগকে না জানিতেছ, ততদিন পর্যন্ত আমাদের আশা ফলবতী হইতেছে না।

একটি সুন্দর উপকথা আছে। এক ছিলেন রাজা। তার ছিল এক ছেলে। সেই ছেলের বয়স যখন দু'বৎসর, তখন সেই ছেলে চুরি হইয়া যায়। রাজার লোকে অনেক সন্ধান করিল, তবু ছেলে পাওয়া গেল না। যে ছেলেকে আনিয়া দিবে কিংবা তাহার সন্ধান করিল, তবু ছেলে পাওয়া গেল না। যে ছেলেকে আনিয়া দিবে কিংবা তাহার

www.nagorikpathagar.org

সন্ধান বলিতে পারিবে তাহাকে সাতঘোড়া মোহর দিবেন বলিয়া রাজা ঘোষণা করিয়া দিলেন। তবু ছেলে পাওয়া গেল না। সেই দেশে ছিল এক গণৎকার। সে হাত দেখে লোকের ভূত-ভবিষ্যৎ বলিতে পারিত। একদিন সেই গণৎকার দেশ-বিদেশ বেড়াইতে বেড়াইতে দেখে এক দুর্গম পাহাড়ের উপরে ব্যাদদের বসতির কাছে কয়েকটি ছেলে খেলা করিতেছে। তার মধ্যে সে দেখিল, একটি ছেলে যেন গোবর গাদায় পদ্মফুল ফুটিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া গণৎকারে আশ্চর্য্য বোধ হইল। সে তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া তাহার হস্তরেখা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিল, সে সেই রাজার হারান ছেলে। গণৎকার তাহাকে বলিল, 'তোমার বাপের নাম কি জান?' সে বলিল, 'কেন? ভিখন ব্যাধ।' গণৎকার পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কি কর? সে উত্তর করিল, 'আমি শুয়ার চরাই, আর কখন কখন বাপের সঙ্গে হরিণটা আশটা শিকার করিয়া আনি।' গনজৎকার একটু হাসিয়া পুনরায় তাহাকে বলিল, 'ভবিষ্যতে তুমি কি করিবে? সে সরলভাবে জবাব দিল, 'কেন? শুয়ার চরাইব, হরিণ মারিব, পাখী মারিব, এইরূপে আমার দিন চলিয়া যাইবে। আর ভাল কথা মঙ্গলূর একটা মেয়ে আছে, তাকে বিবাহ করিব আর আমি নিজে একটা কুড়ে বাঁধিব। আমাদের দিন কেমন মজার যাইবে।' গনৎকার আবার হাসিল। পরে তাহার কানে কানে তাহার অতীত বৃত্তান্ত বলিল। শুনিয়া ছেলে ত একেবারে অবাক। কিছুতেই মানতে চায় না। গণৎকার বলিল 'আচ্ছা দেখত তোমার চেহারা, আর তোমার ঐ সঙ্গীদের চেহারা। তাদের চেহারা সঙ্গে, আর গায়ের রঙ্গের সঙ্গে তাহাদের মা বাপের চেহারার আর গায়ের রঙ্গের যেমন মিল আছে, তোমার কি তেমন আছে?' তখন সে বুঝিল সে ব্যাধের ছেলে নয়, সে রাজার হারান ছেলে। তারপর গণৎকার তাকে মহারাজার কাছে আনিয়া দিল। রাজা তাহাকে নিজের ছেলে বলিয়া চিনিলেন। বাপবেটা যেমন এক ছাঁছে ঢাকা। এখন রাজপুত্রের শিক্ষার জন্য কত লোক নিযুক্ত হইল। রাজপুত্রও অল্পদিনে সকল বিদ্যায় পারদর্মী হইয়া উঠিল। এদিন সেই গণৎকারের সহিত রাজপুত্রও অল্পদিনে সকল বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিল। একদিন সেই গণৎকারের সহিত রাজপুত্রের আবার সাক্ষাৎ। গণৎকার যেন তাহাকে চিনে না, এইরূপ ভাবে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার পিতৃদেবের নাম?' সে উত্তর করিল 'মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত অমুক বর্ম্মন' গণৎকার পুনরায় জিজ্ঞাসিল, 'আপনি কি করেন? রাজকুমার উত্তর করিল, 'আমি অন্য সকল শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছি, এক্ষেত্রে কেবল যুদ্ধবিদ্যার আলোচনা করিতেছি।' গণৎকার পুনরায় বলিল, ভবিষ্যতে আপনি কি চান।' রাজপুত্র গর্ব্বিতভাবে উত্তর দিল, 'দেশ-বিদেশ জয় করিব, বিজিত রাজ্য সুশাসন করিব। আমি এমন ভাবে রাজ্য করিব, যেন আমার নাম স্বার্ণক্ষরে ইতিহাস পৃষ্ঠায় অঙ্কিত থাকে।' গণৎকার হাসিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

www.nagorikpathagar.org

তাই বলিতেছি, তোমরা আপনাদের স্বরূপ চিন। যখন তোমরা আপনাদিগকে মানুষ বলিয়া চিনিবে, পশুত্ব তোমাদের ঘুচিবে। যখন তোমরা আপনাদিগকে মুসলমান বলিয়া চিনিবে, ধর্ম্মদ্রোহিতা তোমাদের চলিয়া যাইবে। যখন তোমরা আপনাদিগকে ছাত্র বলিয়া চিনিবে ঔদাসীন্য তোমাদের দূর হইবে।

শিক্ষা

তোমরা এখন ছাত্র। তোমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বিদ্যাশিক্ষা। পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডারের মধ্যে তোমরা দণ্ডায়মান। জ্ঞান লুটিয়া লও। জ্ঞান লুটিয়া লও! এ সুবর্ণ সুপথ হেলায় হারাইও না। যদি হারাও পরে অনুতাপের পরিসীমা থাকিবে না। এখন যাহাকে সামান্য প্রস্তর মনে করিয়া পায়ে ঠেলিতেছ, পরে দেখিবে তাহা এক এক খানি সাত রাজার ধন এক মাণিক। যখন বুঝিবে, তখন কিন্তু সেই মাণিককানি বহুদূরে ফেলিয়া আসিয়াছে, ফিরিয়া যাইবার আর সময় পাইবে না, তখন শুধু হা-হুতাশ সার হইবে।

তুমি ধনীর সন্তান, বিদ্যা উপার্জন কর। তুমি মানহীনের সন্ত্মান, তুমিও বিদ্যা উপার্জন কর।

বিদ্যা বিনয় দান করেদ, বিনয় হইতে লোক উপযুক্ততা লাভ করে, উপযুক্ততা হইতে ধন, ধন হইতে ধর্ম্মা, তথা হইতে সুখ লাভ করে।

বিদ্বানের অবস্থা ও রাজার অবস্থা কখন তুল্য নহে। রাজা স্বদেশে পুজিত হন। বিদ্বান সর্ব্বত্র পুজিত।

জ্ঞানই শক্তি!বর্ত্তমান যুগে মাংসপেশীর বলকে শক্তি বলা যায় না, মস্তিস্কের বলকেই শক্তি বলিয়া গণ্য করা হয়। যদি শক্তি চাহ, জ্ঞান লাভ কর।

অজ্ঞানতা পরম দুঃখ। জ্ঞান পরম আনন্দ এবং আনন্দই জীবন। যদি জীবন চাহ, জ্ঞান অর্জন কর।

–অতএব বিদ্যাউপার্জ্জনে সচেষ্ট হও, তাহার বিনিময়ে অন্য কিছু করিও না। কেননা সাধারণ লোক মৃত এবং বিদ্বান জীবিত। (হজরত আলী)।

তুমি জ্ঞানযোগী। যোগ্য যেমন একাগ্রচিত্তে দধ্যান করে, তোমাকেও তদ্রুপ একমনে অধ্যায়নে রত হইতে হইবে। বিদ্যার্থী বা কুতঃ সুখং সুখার্থী বা কুতো বিদ্যা। বিদ্যার্থীর সুখ কোথায়, সুখার্থীর বিদ্যা কোথায়? তুমি জ্ঞানযোগী। যাত্রা, গান, থিয়েটার, নাচ, তামাসা, তাস, পাশা এসব কি তোমার উপযুক্ত? এ সমস্ত চিত্তবিক্ষোভ আনয়ন করে, ইন্দ্রিয়গণকে অসংযত করে, একাগ্রতা নষ্ট করে। ছি ছি। জ্ঞানযোগী বিলাস বিভ্রম ছাড়িয়ে দেও। জ্ঞানের সাধনা কর। পবিত্র জ্ঞানমার্গ হইতে চ্যুত হইও না।

www.nagorikpathagar.org

তুমি জ্ঞানের মুযাহিদ (ধর্ম্মযোদ্ধা) তুমি ধীরে অস্খলিত পদে অগ্রসর হও। আলস্য, নৈরাশ্য, জড়তা, ভীরুতা, বিলাস, ব্যসন, দীর্ঘসূত্রতা, চঞ্চলতা তোমার পদতলে দলিত মথিত হউক। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' তোমার কঠোর পণ হউক।

যেমন চেষ্টা করিবে, সেইরূপ উন্নতি লাভ করিব। যে ব্যক্তি উন্নতিকামী হয়, সে বহুরাত্রি জাগরণ করে। যে ব্যক্তি মুক্তা আকাঙ্খা করে, সে সমুদ্রে ডুব দেয়, পরে দান ও প্রাধান্য দ্বারা অনুগৃহীত হয়। যে ব্যক্তি চেষ্টা ব্যতিরেকে উন্নতিকামী হয়, সে ব্যক্তি অসম্ভব বস্তুর অন্বেষণে আয়ু ক্ষয় করে।

ছাত্রগণ ভুলিও না, জীবনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। সংসারে তোমাকে যত বাধা বিঘ্ন ভোগ করিতে হইবে, ছাত্র জীবনে তাহার একাংশ মাত্র হয়ত তোমার ভাগ্যে নিপতিত হইবে। কখন হয়ত দরিদ্রতা তোমাকে বিকট রাক্ষসীর মত গ্রাস করিতে চাহিবে, তখন হয়ত অকৃতকার্যতা দুঃস্বপ্নের (night mare) ন্যায় তোমার শ্বাসরোধ করিবে। কিন্তু সাবধান! ভীত হইও না, হতাশ হইওনা, পলায়ন করিও না। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও এবং সর্ব্ববিপদনাশন আল্লাহকে স্মরণ কর। তোমার বাধা কাটিয়ে যাইবে, তোমার ভয় ঘুচিয়া যাইবে। Where there is a will. there is way যেখানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সেখানে উপায় আছেই।

আশা করি, ছাত্রগণ তোমরা এই উত্তম পুরুষই হইবে, মধ্যম বা নীচ পুরুষ হইবে না। True greatness lies not in never falling, but rising every time you fall প্রকৃত মহত্ত্ব পড়াতে নয়, কিন্তু যত বার পড়িবে ততবার উঠায়।

দুঃখ দারিদ্র্য বাধা বিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া যাহারা মানুষ হয়, তাহারাই মহৎব্যক্তি হইয়া থাকে। পারিপার্শ্বিকের সহিত অনবরত সংগ্রামই জীবন। রৌদ্র বৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাত না সহিলে গাছ মজবুত হয় না। ছায়ায় পালিত তরু দু'দিনে শুকাইয়া যায়। জানিও দুঃখ কষ্ট বাধা বিঘ্ন করুণাময়ের দান। তুমি তাহাকে মাথা পাতিয়া গ্রহণ কর। বীরের ন্যায় তাহাকে বহন কর। আল্লাহ আশ্বাসবাণী দিতেছেন–

নিশ্চয় দুঃখের সহিত সুখ আছে, অতপর নিশ্চয় সুখের সহিত দুঃখ আছে।

প্রথমেই চাই কার্য্যর রুটিন। দৈনন্দিন কর্ত্তব্য কার্য্য কোন সময়ে করবে, তাহার তালিকা করিবে। এই রুটিন বা কার্য্যতালিকা অনুযায়ী ঠিক সময়ে নির্দিষ্ট কার্য্য করিবে। রেলের টাইম টেবলের ন্যায় তোমরা রুটিন অবশ্য প্রতিপাল্য মনে করবে। আবশ্যকমত কার্য্যতালিকা পরিবর্তন করিবে। কিন্তু নির্দিষ্ট কার্য্যতালিকাকে কখন লঙ্ঘন করিবে না। যদি এই ছাত্রজীবন হইতে রুটিন অনুযায়ী চলিতে অভ্যাস কর, দেখিবে

www.nagorikpathagar.org

তোমার জীবনে কখনও কর্তব্য কার্য্যের জন্য সময়ের অভাবের জন্য আক্ষেপ করিতে হইবে না।

রুটিনের পরেই প্রত্যেক ছাত্রের একটি ডায়রী রুকা আবশ্যক। প্রত্যেকদিন শয়নের পূর্ব্বে ডায়রী লিখিবে। রুটিনের যদি কোন ব্যত্যয় থাকে, তাহা ডায়রীতে লিপিবদ্ধ করিবে। যদি কোন অন্যায় কার্য্য কর, তাহাও ডায়রীতে লিখিবে। রুটিন ও ডায়রী দ্বারা তোমাদের কর্তব্য পালন অতি সহজসাধ্য হইবে। পরীক্ষার জন্য আর হাঁপাহাঁপি করিয়া রাত্রি জাগিয়া পাঠ প্রস্তুত করিতে হইবে না। আমি অনেক মেধাবী ছাত্রকে দেখিয়াছি, বৎসরের প্রারম্ভে তাহারা খেলাধুলা করিয়া, থিয়েটার, সার্কাস দেখিয়া, আমোদ আহলাদ করিয়া, গল্পগুজবে মাতিয়া বা অন্য নানা কাজে পাঠে অবেহেলা করে। পরে পরীক্ষার দুই তিন মাস পূর্ব হইতে তিনরাত্রি খাটিয়া রাত্র জাগরণ করিয়া পরীক্ষার সময় কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত্ম হইয়া পরীক্ষাদানে অক্ষম কিংবা কোন প্রকারে পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলেও চিরজীবনের জন্য ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া যায়। প্রথম হইতে রুটিন অনুযায়ী চলিলে তাহাদের এ দুর্দ্দশা হইত না।

পাঠ স্কুলের সময় ব্যতীত গৃহে অন্ততঃ ৬ ঘন্টা পড়া চাই, পড়ার সময় একাগ্রচিত্তে পাঠে রত হইবে। প্রত্যহ বিদ্যালয়ের পাঠ ঘরে প্রস্তুত করিবে। যদি অপরিহার্য্য কারণবশতঃ কোন দিন তাহা হইয়া না উঠে, তবে ছুটির দিন তোমার বাকী বকেয়া পড়া সারিয়া লইবে। ছুটির দিনে পঠিত পাঠের পুনরাবৃত্তি করিবে।

নিদ্রা। নিদ্রার জন্য ৭ ঘন্টা যথেষ্ট। তবে পরীক্ষার সময়ে ৫ ঘন্টা নিদ্রার জন্য দিতে পারা যায়। ইহা অপেক্ষা নিদ্রা কম করিলে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে।

স্বাস্থ্য। ছাত্রগণ মনে রাখিও Sound mind in a sound body সবল মন সবল শরীরেই থাকে। স্বাস্থ্যের যে কেবল ছাত্র জীবনের সাফল্য নির্ভর করে তাহা নহে। সমস্ত জীবনের সাফল্য ইহার উপর নির্ভর করিতেছে। রোগ-ঘোণা যুবক লইয়া সমাজের কোন লাভ নাই, সে যত বড় পণ্ডিত বা যত বড় জ্ঞানীই হউক। বেচারা আজ অগ্নিমান্দ্য, কাল শিরঃপীড়া, পরশু ধাতুদৌর্ব্বল্য, তরশু হৃদরোগ লইয়াই আছে। সে আর সমাজের কি কাজ করিবে? দুই বৎসর পরে পরীক্ষায় পাস করে, সরকারী চাকরীর জন্য তাহাতে তবাধা থাকিতে পারে, কিন্তু সংসার জীবনে তাহাতে কিছু আসিয়া যাইবে না। সাংসারিক জীবনের জন্য তোমাকে দুইটি প্রধান মূলধন লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে- একটি অটুট স্বাস্থ্য সম্পন্ন শরীর, দ্বিতীয়টি জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মস্তিস্ক। তাড়াতাড়ি পাস করিবার প্রলোভনে অমূল্য স্বাস্থ্যধন নষ্ট করিও না। মনে রাখিও Health is Wealth.

এই স্বাস্থ্যের জন্য কয়েকটি নিষেধ বিধি তোমাকে পালন করিতে হইবে। এক শরীরে যত রক্ত ক্ষয় হয়, মস্তিস্ক চর্চা দ্বারা মস্তিস্কে তাহার ৫ গুণ অধিক রক্ত নিঃশেষিত হয়। এই ক্ষয়ের উপর, শরীরের উপর আর কোন অত্যাচার করিও না। প্রকৃতি অতি

www.nagorikpathagar.org

কঠিন নির্ম্মম শাস্তিদাত্রী। প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করিলে প্রকৃতি কিছুতেই তোমাকে নিস্কৃতি দিবে না। মনে কোন কুচিন্তা স্থান দিবে না। সাবধান। তোমার নয়ন মন যেন তোমাকে বিপদগামী না করে। শুন, তোমার কোরান শরীফ কি বলিতেছে–

নিশ্চয় শ্রবণ, নয়ন এবং হৃদয় ইহাদের প্রত্যেকের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইবে।

মন বিমল না হইলে চরিত্র বিশুদ্ধ থাকিতে পারে না। চরিত্র বিশুদ্ধ না হইলে স্বাস্থ্য ভাল তাকিতে পারে না। সর্বদা সংযত থাকিবে। কুরুচিপূর্ণ পুস্তক, যাত্রা, (বর্তমানে বিদেশী চ্যানেল) থিয়েটার, গান–বাজনা সকল একেবারে বর্জন করিবে। এইগুলি মনের স্থৈর্য্য নষ্ট করিয়া তাহাকে পাপ–প্রবণ করিয়া দেয়। দীর্ঘ রাত্রি জাগরণ, গুরপাক ও উত্তেজক পান–ভোজন, এবং একাকী বৃথা–ভ্রমণ পরিত্যাগ করিবে। কোন কারণে ইন্দ্রয়চঞ্চল্য উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সংযত শক্তি প্রার্থনা করিবে। পেটে ঔষধ অনেক সময় বিপরীত ফল আনয়ন করে; তাহা হইতে সাবধান হইবে। এস্থানে আর একটি কথা বলিয়া রাখি, অন্যূন ২৪ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ করিবে না বলিয়া তোমাদের কঠোর পণ থাকা উচিত। ২৪ বৎসর বয়সে পুরুষের এবং ১৬ বৎসর সময়ে স্ত্রীলের শরীরের গঠন ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়। ইহার পূর্ব্বে বিবাহ করিলে পরিণামে পিতামাতার অকালবার্দ্ধক্য ও সন্তানের রুগ্নতা অবশ্যম্ভাবী।

ছাত্রজীবন সংসার রঙ্গালয়ের সাজঘর। ভবিষ্যৎ জীবনে তুমি যে পার্ট প্লে করিবে, ছাত্রজীবনে তাহার ফুল ড্রেস রিহার্শাল দেও। তবেই তুমি সংসারক্ষেত্রে সফল হইতে পারিবে। সংসার যেন যুদ্ধক্ষেত্র, ছাত্রজীবন তাহার শিক্ষানবিশী সময়। এখন হইতেই যদি যুদ্ধক্ষেত্রের উপযোগীরূপে আপনাকে শিক্ষিত না কর, সংসার সমরাঙ্গণে তোমার মরণ বা পরাজয় নিশ্চিত।

সাধারণ শিক্ষার পর কি ব্যবসায় অবলম্বন করিবে, প্রথম হইতেই তাহা স্থির করিয়া লইবে। বিদ্যাশিক্ষা যেমন অবশ্য কর্তব্য, সৎপথে থাকিয়া সম্মানিত ভাবে ধনোপার্জ্জনের চেষ্টাও তেমনি অবশ্য কর্তব্য। আমাদের পয়গম্বর যিনি বলিতেন অল্ ফক্রু ফখরী-দরিদ্রতাই আমার গৌরব-তিনিই উপদেশ দিয়াছেন-আঁল্ ফক্রু ফীদ্ দারয়ন- দারিদ্রতা ইহপরকালে সুখের কালিমা। বন্ধুগণ, জানিও দারিদ্রতা পাপ। দরিদ্রকে তুমি ভালবাসিও, কিন্তু দারিদ্রতাকে তুমি ঘৃণা করিও। পৃথিবীর সমস্ত শোভা, সমস্স্থ উত্তম বস্তু তোমার জন্য। হেলায় খোদার দানকে পায়ে ঠেলি।

তোমাদেরকে সমস্ত ভূভাগে একচ্ছত্র অধিপতি করিয়াছিলেন। কিন্তু তোমরা খোদা ও রছুলের আদেশ ভুলিয়া আত্ম-কলহ করিয়া, বিলাসী হইয়া, মূর্খ হইয়া অলস হইয়া

www.nagorikpathagar.org

আপনারা আপনাদের পায়ে কুঠার মারিলে। তোমাদের রাজ্য গিয়াছে, ধন-দৌলত গিয়াছে, মান সম্ভ্রম নষ্ট হইয়াছে তবু ত তোমাদের চেতন হইল না।

নিশ্চয় আল্লাহ কোন জাতি সম্বন্ধে কিছু পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তাহারা আপনাদের সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন করে।

বন্ধুগণ! মুসলমান সমাজে দরিদ্রতারূপ পাপ মোচনের ভার তোমাদেরই উপর। এই জন্য তোমাকে সাধারণ শিক্ষার পর অর্থকারী বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইবে। সংসারে প্রবেশ করিয় সম্মানিত ভাবে অর্থোপার্জ্জনের জন্য তোমাকে ছাত্র জীবনেই তোমার ভবিষ্যৎ ব্যবসায় ঠিক করিয়া লইতে হইবে।

(ভাষণটি কিছুটা সংক্ষেপিত)

ঢাকা সাহিত্য শতদল-১৯৯৪, প্রকাশিত ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ সংখ্যা থেকে সংগৃহিত)

www.nagorikpathagar.org

মওলানা ভাসানী (১৮৮৫-১৯৭৬)

সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত
বিশ্বশান্তি সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ (নভেম্বর ১৯৫৪)

মজলুম জননেতা, ফারাক্কা বাধ মরক ফাঁদ ভেঙ্গে দাও গুড়িয়ে দাও শ্লোগান দিয়ে লং মার্চ করে এই বিশ্ব-খ্যাত মুকুটহীন সম্রাট।

বন্ধুগণ, বিগত দেড়শ বছর সুইডেনের মহান অধিবাসীগণ যুদ্ধ থেকে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত রাখতে পেরেছেন। আজ সেই দেশের মাটিতে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে বক্তৃতা করবার সৌভাগ্য হওয়ায় আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। আমি শান্তিকামী পাকিস্তানবাসীদের পক্ষ থেকে সুইডেন ও তার অধিবাসীদের জন্য বহন করে এনেছি মৈত্রী সৌভ্রাতৃত্ব ও শান্তির বাণী।

প্রিয় বন্ধুগণ, আজ থেকে সাত বছর আগে ১৯৪৮ সালে এই স্টকহোম শহর থেকেই সর্বপ্রথম উত্থিত হয় শান্তির আওয়াজ। 'স্টকহোম আবেদন' নামে খ্যাত শান্তির আবেদন স্বাক্ষর দানও স্বাক্ষর সংগ্রহে সেদিন যাঁরা উদ্যোগী হয়েছিলেন, আমি তাঁদের সকলকে জানাই শ্রদ্ধা। আমি শ্রদ্ধা জানাই সেই মহান বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনকে যিনি আমরণ সংগ্রাম করেছেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে। আমি অভিনন্দন জানাই বিশ্ব সাহিত্যিক জর্জ বার্নার্ড শকে যিনি ছিলেন বিশ্বশান্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। আমি শ্রদ্ধা জানাই বৈজ্ঞানিক জুলিও কুরীকে যাঁর জীবনের একমাত্র সাধনা মানবতাকে হানাহানি ও রক্তারক্তি থেকে মুক্তি দিয়ে পৃথিবীর বুকে শাশ্বত শান্তির নির্মল পরিবেশ সৃষ্টি করা। আমি শ্রদ্ধা জানাই সোভিয়েত ইউনিয়নের কালজয়ী ঔপন্যাসিক ইলিয়া ইরেনবুর্গকে যাঁর অমর লেখনী আজ নিয়োজিত মানুষের মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধ ও চিরস্থায়ী মৈত্রী স্থাপনের কাজে।

সভাপতিমন্ডলীর দিকে মুক ফিরিয়ে তিনি বললেনঃ দুনিয়ার মানুষের হে মহান সাহাবাগণ, তোমরা পাকিস্তানবাসীর আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ কর।

শ্রদ্ধাবনত মস্তকে মওলানা ভাসানী তাঁদের দিকে একবার দৃষ্টি ফেললেন। অমনি সারাটা হল তুমুল করতালি ও হর্ষধ্বনিতে মুখরিত হয়। সভাপতি ও সভাপতিমন্ডলীর সদস্যগণ আবার উঠে দাঁড়ালেন বক্তার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন হলসুদ্ধ মানুষ। সবার মুখে হাসি। সবার মুখে উচ্ছ্বাস। সবার মুখে আনন্দ।

www.nagorikpathagar.org

বক্তৃতা চললঃ বিশ্ব শান্তি সম্মেলনের বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে আমার মনপ্রাণ আজ এই ভেবে ভরে উঠেছে যে, **এমন একটি ধর্মের আমি অনুগামী যার অর্থই হচ্ছে শান্তি। ইসলাম আমার ধর্ম। ইসলাম আমার দর্শন। ইসলাম আমার সাধনা। আর সে ইসলামের উৎপত্তি আরবী শব্দ 'সলম' থেকে যার অর্থই হচ্ছে শান্তি। কাজেই আমি বিশ্বাস করি কোন মুসলমানই শান্তির প্রশ্নে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না।** যাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করার স্পর্ধা রাখেন, তাঁরা ইসলামের প্রকৃত অনুগামী কিনা একমাত্র আল্লাহই সে কথার জবাব দিতে পারেন। তবে শান্তির ধর্মের অনুগামীরূপে বাকী জীবনটি আমার উৎসর্গ করেছি শান্তির কাজে, মানবতার কাজে। বিশ্বব্যাপী আজকের শান্তিআন্দোলন আমার কাছে তাই ধর্মীয় কর্তব্য। পৃথিবীর বুক থেকে আরেকটি মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা চিরতরে বিদূরিত করার উদ্দেশ্যে আমার ক্ষুদ্র শক্তি আমি আপনাদের জন্যে মওজুদ রেখেছি, উৎসর্গ করেছি।

আবার হাততালি । আবার হর্ষধ্বনি।

মাতৃভূমি পাকিস্তানের কথায় এবার এলেন তিনি। বললেনঃ আমার স্বদেশভূমি পাকিস্তান ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের মতো যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না হলেও যুদ্ধের যে ধাক্কা তার উপর দিয়ে গিয়েছে, সে অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ আমাদের এখনও সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। ধন্য-ধান্যে-পুষ্পে ভরা দেশ আমাদের। প্রকৃতি কানায় কানায় ভরে দিয়েছি তাকে সম্পদ-প্রাচুর্যে। সে দেশে প্রায় সব আছে। সর্বাধিক আছে সে দেশের মানুষের পর্বত প্রমাণ সহিষ্ণুতা, মাটির ন্যায় ধৈর্যশীলতা, শিশুসুলভ সরলতা এবং সকলের জন্যে হৃদয়াবেগ। তবুও সে দেশের মানুষকে অনাহার -দুর্ভিক্ষ-মহামারীর হাত থেকে বাঁচাতে আমরা এখনো পারিনি। নদ-নদী আর জল-বৃষ্টির প্রাচুর্য সত্ত্বেও বিজ্ঞানকে আমরা কাজে লাগাতে পারিনি। প্রকৃতিকে পারিনি জয় করতে। আদিমকালের ন্যায় আজো প্রকৃতিই আমাদেরকে পদানত রেখেছে। বিজ্ঞানের অধিকারী বর্তমান সভ্য জগতের অধিবাসী হয়েও অর্থাভাবে প্রকৃতির হাতে বারবার পরাজয় বরণ করেছি। পরাজয়ের সে গ্লানি আজো বহন করে চলেছি।

কিন্তু বন্ধুগণ, আমাদের জাতীয় সম্পদ ব্যয়তি হয় কোথায়? সে সম্পদ ব্যয় করি আমরা তথাকথিত দেশরক্ষার কাজে, আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে। শতকরা প্রায় ষাট ভাগ জাতীয় ব্যয় আমাদের সামরিক খাতে, তথাকথিত দেশরক্ষার নামে। সে যেন হাতী পোষা। কিন্তু দেশের সম্পদ আজ যদি দেশের উন্নতির কাজে ব্যয় করা যেতে, তবে স্বল্পকালের মধ্যেই পাকিস্তানের মানুষের মুখ ভরে উঠত হাসিতে। ভরে উঠত জীবনের তৃপ্তিতে। পাকিস্তানেসর মতো একটি নতুন দেশের পক্ষে তাই যুদ্ধের সম্ভাবনার কথা চিন্তা করাও যায় না। জাতিগঠন কখনো যুদ্ধের মাধ্যমে হয় না। জাতিগঠনে চাই নিরবচ্ছিন্ন শান্তি। সে শান্তি শুধু এশিয়ায় নয়, সে শান্তি শুধু

www.nagorikpathagar.org

ইউরোপেও নয়, সে শান্তি চাই সারা বিশ্বে। একমাত্র বিশ্বশান্তিই দুর্বল রাষ্টগুলোর পক্ষে দেশগঠনের গ্যারান্টি। এ কারণে আমাদের দেশ পাকিস্তান শান্তি ব্যতীত অন্য কিছু চিন্তাও করতে পারে না। পাকিস্তানবাসীর সেই শান্তির কামনাই আজ শোনাতে এসেছি বিশ্বের দরবারে।

ঃ বিশ্বাস করুন বন্ধুগণ, শান্তি আমাদের ঈমানের বস্তু। শান্তি আমাদের অক্ষুন্ন রাখতেই হবে। নইলে যুদ্ধের ধাক্কায় আমাদের মতো একটি দরিদ্র দেশ ধূলায় বিলীন হয়ে যাবে। পাঁচ কোটি মানুষ অধ্যুষিত বৃটেন পর পর দুটি মহাযুদ্ধের চোট সামলিয়ে উঠেছে সত্য কথা। জার্মানি-জাপানের মতো দেশও যুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়ে আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে । তারা শক্তিশালী, বিজ্ঞান তাদের হাতের মুঠোয়। তাই বিভীষিকাময় ধ্বংসের মধ্যে দিয়েও তারা আবার আত্মপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে।

ঃ কিন্তু বিজ্ঞানে পশ্চাৎপদ, শিল্পে অনগ্রসর পাকিস্তানের মতো একটি দরিদ্র দেশের পক্ষে যুদ্ধের ধাক্কা সামলিয়ে উঠা সহজসাধ্য নয়। দেশগঠনের প্রাক্কালে আমরা অতবড়ো ঝুঁকি গ্রহণ করতে পারি না। দেশগঠনের পরেও না। আমরা চাই পৃথিবীর মানচিত্রে সগৌরব অবস্থান। এ কারণে, একদিকে আমরা যেমন অন্য কোন দেশ আক্রমণের পক্ষপাতী নই, অপরদিকে তেমনি চাই না অপর কোন দেশ আমাদের জন্মভূমি আক্রমণ করুক।এমনকি, অপর কোন শক্তি পাকিস্তানের নওজোয়ানদের কামানের খোরাক করুক আমা তারও ঘোরতর বিরোধী। বলাবাহুল্য, পাকিস্তানের জনসাধরণের স্কন্ধে বন্ধুক-কামান রেখে যুদ্ধ করবার যে প্রস্তুতি যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চালাচ্ছে, সর্বশক্তি নিয়োগে তা প্রতিরোধের জন্যে পাকিস্তানবাসীরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

মওলানা ভাসানীর এই দ্বিধাহীন ঘোষণায় হলের মধ্যে অপূর্ব আনন্দ পরিলক্ষিত হয়। মুখে মুখে গুঞ্জন এবং হাতে হাতে করতালিতে হলপ্রকোষ্ঠ আবার মুখরিত হয়ে উঠে।

একটু দম ধরে পরে মওলানা সাহেব ধীরে ধীরে তাঁর অবনত মস্তকটি উত্তোলন করেন। ধীর-গম্ভীর স্বরে বললেনঃ

বন্ধুগণ, এবার আমি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার যুদ্ধজোট সম্পর্কে দুচারটি কথা বলব। সিয়েটা সামরিক জোটের কথায় আসতেই রাহুর কবলে নিপতিত সূর্যের ন্যায় শ্রোতৃবৃন্দের মুখমন্ডল হয় ম্লান। কিন্তু পর মুহূর্তেই সে মুখ উঠল আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে যখন মওলানা ভাসানী বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেনঃ গায়ের জোরে কোন আদর্শ প্রতিরোধ করা যায় না। আদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রয়োজন আরেকটি আদর্শের। কাজেই বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যদি মনে করে থাকে তারা সিয়োটা মেডো ন্যাটো বা আঞ্জুস প্রভৃতি সামরিক জোটের মাধ্যমে নবজাগ্রত এশিয়া-আফ্রিকার আজাদীর আন্দোলন রোধ করবেন তবে বলতে আমার একটুও সংকোচ নেই যে তারা নির্বোধের স্বর্গে বাস করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

তিনি বলেন ঃ প্রথম মহাযুদ্ধের ভিতর দিয়ে পৃথিবীর বুকে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট সোভিয়েত রাশিয়ার জন্ম লাভ ঘটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং এশিয়ার চীন কোরিয়া ও ইন্দোচীনসহ সৃষ্টি হয় আরো কতিপয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

তুমুল করতালির মধ্যে মওলানা ভাসানী বলেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে 'মিত্রশক্তি' জয়লাভ করলেও বৃটেন আমেরিকা ফরাসী বেলজিয়াম হল্যান্ড প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর চরমভাবে পরাজিত হয়েছে। পাকিস্তান ভারত, বার্মা, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, মিসর, সিরিয়া, ইরাক ও লেবানন প্রভৃতি দেশগুলোর স্বাধীনতা লাভ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ পরিণতি। ফ্যাসিস্ট শক্তি সেদিন যে মরণকামড় মারে তাতে বিজয়ী মিত্রপক্ষের ধনতান্ত্রিক দেশগুলো নৈতিক পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্তি লাভ করেনি।

কণ্ঠে আবেগ ও উত্তেজনা এনে মওলানা ভাষানী ঘোষণা করেন ঃ হে সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স! তোমরা যদি মনে করে থাক যুদ্ধজোটের নামে ভুয়া নিরাপত্তার নামে পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে অপরের প্রতি ছুঁড়বে গুলী তবে তোমাদের আমি নিরাশ করছি। সদ্যআজাদীপ্রাপ্ত এশিয়াবাসী প্রাণ দেবে কিন্তু তাঁবেদার আর হবে না। আজাদী তাদের জীবনের চেয়েও প্রিয়।

সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনকে উদ্দেশ্য করে মওলানা সাহেব বলেন,

ঃ বিশ্বাসঘাতকতা আর মোনাফেকি সম্বল করে তোমরা একদিন হরণ করেছিলে ভারতবর্ষ আরবজাহান, মালয়, সিংহল, বার্মা প্রভৃতি দেশের আজাদী। তোমরা কি মনে কর এশিয়াবাসী সে ইতিহাস বিস্মৃত হয়েছে?

ঃ মহাচীনের কথা তুলে তিনি আমেরিকাকে হুঁশিয়ার করে দেন। বলেন ঃ মহাচীনের চরম দৈন্যের সুযোগ সাম্রাজ্যবাদীরা ক্রমে ক্রমে গ্রাস করেছিল পৃথিবীর বৃহৎ দেশটিকে। তোমার রাজকোষে স্বর্ণ-ডলার যোগাড় করে যেয়ে প্রতি বছর সে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ আত্মাহুতি দিয়েছে খাদ্যভাবে। মহাচীন আজ আজাদ। ফরমোজায় অবস্থান করে চীনের উপর প্রতিশোধ তুলবার বাসনা যদি তোমাদের এখনো থেকে থাকে, তবে দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি একবার চেষ্টা করে দেখতে পার।

ঃ হে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ!

ঃ তোমার সঙ্গীনের খোঁচায় আহত ইন্দোচীনবাসীর দেহে ক্ষতের জ্বালা প্রশমিত হয়নি এখনো। সে জ্বালা তাকে আজো দহন করছে বারবার। আলজিরিয়া-মরক্কোর দেশপ্রেমিকগণের বুকের রক্তে উত্তর আফ্রিকার মরুপ্রান্তর রঞ্জিত হয়েছে। তোমার রক্তপায়ী দানবীয় চরিত্রের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটেনি। তোমরা কি মনে কর তোমাদের হিংস্রতা ক্ষমার্হ?

ঃ হে ডাচ সাম্রাজ্যবাদ!

www.nagorikpathagar.org

ঃ তোমরা ইন্দোনেশিয়ার জনসাধরণকে পশুর মতো কাজে লাগিয়েছিল আপন ভোগের রসদ সংগ্রহের জন্যে। সে নিপীড়নে অতিষ্ঠ ইন্দোনেশিয়াবাসী তোমাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে একদিন রুখে দাঁড়িয়েছিল। রক্তের বিনিময়ে রক্ত, আর গুলীর বিনিময়ে গুলীর ইতিহাস সে দেশের প্রতিটি মানুষের মনে আজো প্রেরণা যোগায়। সে সব কথা কি এতো সহজেই বিস্মৃত হয়েছে? এখনো কি তোমাদের স্পর্ধা জাগে ধর্মের ভাঁওতা দিয়ে স্বাধীন ইন্দোনেশিয়াকে আবার পদানত করবার? কণ্ঠস্বর একটু ভারী করে মওলানা সাহেব বিশ্বশান্তি সম্মেলনকে বললেন ঃ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস কপটতার ইতিহাস। সকল মানুষকে সকল কালের জন্য সে ইতিহাস প্রবঞ্চিত করতে পারে না বটে কিন্তু সাময়িকভাবে হলেও সাম্রাজ্যবাদ বিভিন্ন দেশে কতিপয় ভাড়াটে সমর্থক যোগাড় করতে সমর্থ হয়। তাদের সে সমর্থন যোগায় শাসকমহল, স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল। অর্থ পদমর্যাদার বিনিময়ে তারা হাতের লাঠিরুপে কিছু সংখ্যকা লোককে দেশের জনসাধরণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবার প্রয়াস পায়। কিন্তু সাধারণ মানুষের স্বাদেশিকতা ও দেশপ্রেম প্রমাণের উর্ধ্বে। আজ সারা দুনিয়ার সাধারণ মানুষ সকল প্রকার সামরিক প্রস্তুতির বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিপক্ষে। তারা চায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। তারা চায় নির্মল শান্তি। সে মানুষ আছে আমেরিকায়। সে মানুষ আছে বৃটেনে ও ফরাসী দেশে। সে মানুষ আমি দেখেছি ইতালী জার্মানি হল্যান্ড সর্বত্র। সে জনতার মিছিলে শরিক হয়েছেন আমেরিকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক হেমিংওয়ে হাওয়ার্ড ফাস্ট সঙ্গীতজ্ঞ পল রবসন বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন আর রোজেনবার্গ দম্পত্তির মতো অসংখ্য পরিবার। সে মিছিলে আছেন বৃটেনের ধর্মীয় নেতা ক্যান্টারবেরীর ডীন ডকটর হিউলেট জনসন, সমাজকর্মী মাদাম মনিকা ফেলটন, আইনজ্ঞ ডি.এন. প্রীট এবং বৈজ্ঞানিক জে.ডি. বার্নাল। আর আছেন ফরাসী দেশের বৈজ্ঞানিকদের গুরু জুলিও কুরী বেলজিয়ামের সমাজকর্মী মাদাম ব্লুম। তাঁদের সকলের সঙ্গে আছেন সে সব দেশের লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ। মহান শান্তিবাদীদের এই মহাশক্তি প্রতিরোধ করবে এমন শক্তির জন্ম পৃথিবীতে আজো হয়নি।

মওলানা ভাসানীর শেষের কটি কথা শেষ হতো না হতেই সম্মেলন হলটি আবার করতালিতে মুখরিত হয়।

("ভাষনটি মাওলানা ভাষানীকে নিয়ে বই 'ভাষন ও বিবৃত্তি' হতে সংগ্রহ করা হয়েছে)
সূত্রঃ খোন্দকার মোঃ ইলিয়াস, ভাষানী যখন ইউরোপ, (মুক্তধারা, ১৯৭৮)

www.nagorikpathagar.org

এম. এন. রায় (১৮৮৭-১৯৫৪)

ইসলামের উত্থান

[মানবেন্দ্র নাথ রায় (১৮৮৭-১৯৫৪) যিনি ইতিহাস, এম. এন. রায় নামেই বহুল পরিচিত। উপমহাদেশের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পরবর্তীতে রেডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট' আন্দোলনের পুরোধা এই ব্যক্তি লেনিন-ষ্ট্যালিনের সহকর্মী ও কমরেড হিসাবে কাজ করেন এবং সুপ্রিম সোভিয়েতের পোলিট ব্যুরোর সদস্য ছিলেন। সানইয়াৎ সেনসহ বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সকল বিশ্ব ব্যক্তিত্বের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং তাঁরই নেতৃত্বে আমেরিকায় গড়ে উঠেছিল বিশ্বের দ্বিতীয় সমাজতান্ত্রিক দল। অন্তত দশবার তিনি নিজের নাম পরিবর্তন করেছেন পুলিশী হাঙ্গামা এড়াবার জন্য এবং পিকিং থেকে পায়ে হেঁটে মস্কো পৌঁছে গেছেন 'বিশ্ব বিপ্লবের স্বপ্নে'।

তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী ক্ষমতাধিকারী ও মানব সভ্যতার প্রতি মমতাময় দূরদৃষ্টির অধিকারী এম. এন. রায় ছিলেন একাধারে রাজনীতিবিদ, লেখক ও দার্শনিক। তিনি আরবী, ফারসী, রুশ ও ইংরাজী ভাষায় সমান দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও তুর্কী, রুশীয় এবং তৎকালীন উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্বদের সাথে তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিরিশের দশকে জেলে থাকাকালীন তিনি ইসলামের সম্পর্কে গভীর আগ্রহে অধ্যায়ন করেন এবং এর প্রাণশক্তি তাকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে; যার ফলশ্রুতিতে তিনি The Historical Role of Islam নামক অসাধারণ বইটি রচনা করেন। উপমহাদেশে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের উদ্যোক্তা তথা বিশ্ব কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের প্রত্যয়ী এম. এন. রায় তিরিশের দশকে ইসলামী আদর্শে যে প্রাণ খুঁজে পেয়েছিলেন, তা আজকের পূর্ব ইউরোপীয় কম্যুনিষ্ট দেশগুলোর শিক্ষার ক্ষেত্রে- একটি মাইল ফলক।

উল্লেখিত বইটি ১৯৩৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৯৪৮ সালে বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়। ইতিমধ্যে কম্যুনিজমের অগ্রপথিক এম. এন. রায় কম্যুনিজম ত্যাগ করে রেজিক্যাল হিউম্যানিজমের আদর্শে দিক্ষীত হয়েছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধটি The Historical Rule of Islam বইয়ের ভূমিকা থেকে নেয়া হয়েছে-সম্পাদক

মহাপুরুষ মোহাম্মদের অনুশাসিত ইসলামের আকস্মিক উত্থান এবং নাটকীয় বিস্তৃতি মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাসে একটা বিরাট চমকপ্রদ অধ্যায়। নিতান্ত নির্লিপ্ত ও নৈর্ব্যক্তিক মন নিয়ে মানব ইতিহাসের এই অধ্যায়টি পাঠ করলে দ্বন্দ্বসঙ্কুল বর্তমান

www.nagorikpathagar.org

ভারতের জন্য অনেক আশায় আলোর সন্ধান পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক দিক থেকে এর অনুশীলনের মূল্য আপনার গুরুত্বেই অধিক, তা ছাড়া একটা সাধারণ জ্ঞানানুসন্ধিৎসা নিয়ে পড়লেও যে কেউই এর থেকে প্রভূত উপকার লাভ করতে পারবে। কিন্তু ইসলাম ইতিহাসে তথা মানব সভ্যতার সংস্কৃতিকে কি দিয়েছে, তা বিশেষ করে ভারতীয় হিন্দুদের যথাযথভাবে জানা, পারস্পরিক বিদ্বেষ নিষে জর্জরিত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভাগ্যকাশে একটা বিরাট আশার এবং অশেষ মঙ্গলেরই ইঙ্গিত দেয়।

এদেশে মুসলমানের সংখ্যা কম নয় এবং মুসলমান শাসিত যে কোন দেশের অধিবাসী থেকে যে অনেক বেশী তা আমরা খুব কম সময়েই ভেবে দেখি। মুসলমানেরা এদেশে আসার পর বহুশত বছর গত হয়ে গেলো, তবুও ভারতের অধিবাসীদের এই বিপুল জনসমষ্টিকে এখনও অনেকে একটা বহিরাগত উৎপাত বলেই মনে করে থাকে। এ দৃষ্টিভঙ্গী শুধু অদ্ভুত নয়, নিতান্ত দুঃখেরও। ভারতের জাতীয় জীবনে এই ব্যবধানের ঐতিহাসিক কারণও আছে। আক্রমণকারীর বেশেই মুসলমানেরা প্রথমে ভারতে এসেছিলো। কয়েক শতাব্দী ধরে তারা এদেশ আর তার শাসকদের জয় করেছে। জেতা ও বিজিতের এই সম্পর্ক আমাদের জাতীয় ইতিহাসের উপর এমনভাবে চিহ্ন রেখে গেলো যে ভারতের দৃই বৃহত্তর সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানকে তার ফল সমানভাবেই ভোগ করতে হচ্ছে। বর্তমান পরাধীনতার নাগপাশজনিত সমদুর্দশা তাদের অতীতের অপ্রীতির স্মৃতি অনেকটা ম্লানও যে করেনি তা নয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয় মুসলমানদের জন্য যেমন ক্ষতিকর ও বেদনাদায়ক, ভারতীয় হিন্দুর পক্ষেও তেমনি মারাত্মক। ভারতের মুসলমানেরা ভারতবর্ষের এমন এক অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে যে ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের ইতিহাস, ভারতের ইতিহাসের যে অভিন্ন অধ্যায়, তা স্বীকার না করে উপায় নেই। বস্তুতঃ অতীতের বেদনাদায়ক স্মৃতির নিরসনে জাতীয়তাবাদ আরও অগ্রসর হয়েছে।

বর্তমান অপমানের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে গৌরবোজ্জ্বল দিকে চেয়ে সান্ত্বনা পাবার প্রয়াসই ভারতের মুসলমান শাসকদের একটা উজ্জ্বল জাতীয়তার রঙ্গে রঞ্জিতকরেছে।

তবু সম্রাট আকবরের রাজ্যের সুখ সমৃদ্ধিতে বিশ্বাসী কিংবা সম্রাট শাজাহানের শিল্প–সাধনার উৎকর্ষে গর্ববোধকারী এমন হিন্দুও, ভারত ইতিহাসের অলঙ্কার, বিরাট ব্যক্তিত্ব ও খ্যাতিসম্পন্ন সেই সম্রাটদেরই ধর্ম ও সম্প্রদায়ভূক্ত, প্রতিবেশী মুসলমানদের থেকে আজও নিজেকে একটা সীমাহীন দূরত্বের মধ্যে সরিয়ে রাখতে চায়। ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে সনাতনপন্থী হিন্দুদের সংখ্যাই অধিক। এদের কাছে সদ্বংশজাত, সুশিক্ষিত এমনকি প্রশংসনীয় সংস্কৃতিসম্পন্ন মুসলমানেরা পর্যন্ত 'স্বেচ্ছা"–অসভ্য বর্বরই

www.nagorikpathagar.org

রয়ে গেলো। নিম্নতম হিন্দুরা এদের কাছ থেকে যে সামাজিক ব্যবহার পায়, এইসব মুসলমানদেও তাদের কাছ থেকে তার চেয়ে কিছু উন্নততর ব্যবহার পাবার অধিকারী বলে এরা মনে করে না।

এই অত্যদ্ভুত অবস্থার কারণ অবশ্য আমরা খুঁজে পাই তাদের অহেতুক জাতীয় অভিমানে এবং একটা বিজিত ও পীড়িত জাতি আক্রমণকারী ও বিদেশী বিজেতার প্রতি যে স্বভাবিক ঘৃণা পোষণ করে– তার মধ্যে। যে রাজনৈতিক সম্বন্ধ থেকে এর উৎপত্তি তা সুদূর অতীতেরই ঘটনা। তবু সেই অভিমান ও সংস্কারবোধ এখনও এমন অন্তর্লীন হয়ে রয়েছে যে তা শুধু জাতীয় জীবনের একীকরণে বাধাই সৃষ্টি করলো না, নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ইতিহাস বিচারেও একটা অন্তরায় হয়ে রইলো। শত শত বৎসরব্যাপী দু'টো সম্প্রদায় এক সঙ্গে একই দেশে বসবাস করলো, অথচ পরস্পরেরস সভ্যতা, সংস্কৃতি সহানুভূতির সঙ্গে বুঝবার চেষ্টাই করলো না। পৃথিবীর ইতিহাসে সত্যি এমন দৃষ্টান্ত আর মেলে না। পৃথিবীর কোন সভ্য জাতিই ভারতীয় হিন্দুদের মতো ইসলামের ইতিহাস সম্বন্ধে এমন অজ্ঞ নয় এবং ইসলাম সম্বন্ধে এমন ঘৃণার ভাবও পোষণ করে না। ভারতীয় হিন্দুদের জাতীয়তাবাদিতার আদর্শই হলো আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু ইসলাম তথা মোহাম্মদের ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচারে হিন্দুদের এই অপ্রশংসনীয় মনোবৃত্তি আরও উগ্র আকর ধারণ করে। আরবের নবীর জীবন যে বাণী ও শিক্ষা বহন করে এনেছে, তাঁর সম্বন্ধে এদের একটা অত্যন্ত ভুল ধারণা রয়ে গেছে। ইসলামের অসাধারণ বৈপ্লবিক গুরুত্ব আর তাঁর বৃহত্তর সাংস্কৃতিক তাৎপর্য সম্বন্ধে অধিকাংশ শিক্ষিত হিন্দুরই সহৃদয় অনুশীলন তো দুরের কথঅ, সামান্যতম ধারণাও নেই। ক্ষতিকর ফলাফলের সম্ভাবনা না থাকলে তাদের এই অজ্ঞতাসূলভ মনোভাব হাস্যকর বলে উড়িয়ে দেওয়া যেতো। ভারতের অধিবাসীদের কল্যাণে এবং বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক সততার স্বার্থে, তাদের এ বিরূপ মনোভাবের নিরসন অপরিহার্য কর্তব্য। ভারতবর্ষ ইতিহাসের যে চরম পর্যায়ের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে ইসলামের সাংস্কৃতিক তাৎপর্য সম্যক উপলব্ধির গুরুত্ব আজ অপরিসীম হয়ে উঠেছে।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক গীবন ইসলামের উত্থান ও ব্যাপ্তিকে, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ইতিহাসে যেসব বিপ্লব একটা নূতন ও চিরস্থায়ী চিহ্ন রেখে গেছে, তাদের মধ্যে অন্যতম ও স্মরণীয় বলে বর্ণনা করে গেছেন। নূতন বিশ্বাসে ঐকান্তিক আগ্রহ সমন্বিত আরব মরুভূমির অপেক্ষাকৃত ছোট, একটা বেদুইন দলের নিকট প্রাচীনকালের বৃহৎ সাম্রাজ্য অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে কিভাবে ধর্মান্তর গ্রহণ ও পরাজয় বরণ করলো, তা ভাবলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। সশস্ত্র অভিযানের বিরুদ্ধে মোহাম্মদের শান্তিবাণী প্রচারের অতুলনীয় ধর্মদিশারী ভূমিকা অবলম্বনের পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই তাঁর

www.nagorikpathagar.org

অনুসারীরা একদিকে ভারতের প্রান্ত সীমানা থেকে অন্যদিকে আটলান্টিক মহাসাগরের তীর পর্যন্ত ইসলামের পতাকাকে জয়যুক্ত করে তুলেছিলেন। দামেস্কের প্রথম খলিফারা এতবড় বিরাট রাজ্য শাসন করতেন যে দ্রুতগামী উটের সাহায্যে এমনকি পাঁচমাসেও তা পার হওয়া যেতো না। হিজরীর প্রথম শতাব্দীর শেষে 'আমিরুল মুমেনীনরা' পৃথিবীর অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ ও ক্ষমতাসম্পন্ন শাসনকর্তা ছিলেন।

জাতীয় জীবনে নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেক ধর্ম প্রচারকই অত্যদ্ভুত কোন কান্ড কিংবা অপরূপ কোন অলৌকিক ঘটনার সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন। সেদিক দিয়ে মহাপুরুষ মোহাম্মদ তাঁর পূর্বের ও পরের যে কোন পয়গম্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হবার যোগ্য। জগতে যত অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে, ইসলামের প্রসার তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আগাষ্টাসের রোমক সাম্রাজ্য বীর ট্রাজানের সাহায্যে পরবর্তী যুগে আরও বড় হয়েছিলো। সাতশ' বছর ধরে বিরাট ও বিখ্যাত জয়ের উপরেই তা ভিত গড়ে উঠেছিলো। তবুও তা একশ' বছরেরও কম সময়ে আরব সাম্রাজ্য যেভাবে কেঁপে উঠেছিলো, তার সমকক্ষতা লাভ করতে পারেনি। আলেকজান্ডারের রাজত্ব খলিফাদের সাম্রাজ্যের তুলনায় কিছুই নয়। প্রায় এক হাজার বছর পারস্য সাম্রাজ্য রোমের আক্রমণের বিরুদ্ধে টিকেছিলো কিন্তু দশ বছরেরও কম সময়ে ইসলামের তরবারির কাছে তাকে হার মানতে হয়। আধুনিক কোন ঐতিহাসিক ইসলামের এই অপরূপ ও অভিনব অলৌকিকত্বের ব্যাখ্যা করতে প্রয়াস পাবেন কি?

'এর পূর্বে আরব রাষ্ট্রের হদিস কেউ কোনদিন পায়নি, তাদের সুসংগঠিত সেনাবাহিনী বা রাজনৈতিক আদর্শের কথা কেউ কোনদিন শোনেনি। আরবেরা ছিলো কবি- স্বপ্নবিলাসী, তারা করতো যুদ্ধ আর ব্যবসা। তারা রাজনীতির ধার ধরতো না, যে ধর্মের পূজারী তারা ছিলো, তার মধ্যে একীকরণের কিংবা স্থিতির কোন শক্তিই কোনদিন তারা প্রত্যক্ষ করেনি। বহু দেব-দেবীর উপাসনা করতো তারা-তাও অত্যন্ত জঘণ্যভাবে। অথচ কিছুকাল পর এই অন্ধ অসভ্যরাই জগতে একটা বৃহত্তম শক্তির অধিকারী হয়ে উঠলো- সিরিয়া এবং মিশর করলো জয়, পারস্যকে করলো পদানত এবং ইসলামে দীক্ষিত পশ্চিম তুর্কীস্থান এবং পাঞ্জাবের কতকাংশের উপর করলো আধিপত্য বিস্তার। বাইজানটাইন এবং বেরবের জাতির (Berbers of Algeria) কাছ থেকে আফ্রিকা নিলো ছিনিয়ে, আর স্পেন নিলো ভিসিগথদের থেকে কেড়ে। পশ্চিম কনষ্টানটিনোপোলের পূব্ প্রান্ত ফ্রান্স তাদের ভয়ে কেঁপে উঠলো। আলেকজান্দ্রিয়া ও সিরিয়ার বন্দরগুলিতে তাদের জাহাজ হলো তৈরী, ভূমধ্যসাগরে নির্ভয়ে করলো চলাফেরা, গ্রীক দ্বীপগুলোকে করলো লুট আর বাইজানটাইন সাম্রাজের নৌশক্তিকে জানালো প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহবান। একমাত্র পারস্যবাসীরা ও এ্যাটলাস পার্বত্য অঞ্চলের

www.nagorikpathagar.org

বেরবেরেরা ছাড়া তাদের তেমন কোন বাধাই কেউ দিতে পারলো না। এত সহজে তারা কৃতকার্য হলো যে অষ্টম শতাব্দীর শুরুতে এই প্রশ্নই সকলের মনে জাগলো– সত্যি তাদের এই অবাধ জয়ের পথে আর কোন বাধাই দেওয়া যাবে না। ভূমধ্যসাগরের উপর রোমকদের আধিপত্য গেলো নষ্ট হয়ে। ইউরোপের একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সারা খ্রীষ্ট জগৎ প্রাচ্যের এক নবীন বিশ্বাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত নূতন প্রাচ্য সভ্যতার সামনে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলো। (A History of Europe: H.A.L. Fisher, Page No-137)।

এ যেন এক ভীষণ ঐন্দ্রজালিক কান্ড। কিভাবে এতবড় আজগুবি ব্যাপার সম্ভব হলো এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকেরা আজও হতভম্ব হয়ে যান। আজকে জগতের সত্যিকার শিক্ষিত লোকেরা 'ইসলামের উত্থান শান্ত ও সহিষ্ণু লোকদের উপর গোঁড়ামির জয়', এই ঘৃণা অভিমত পরিত্যাগ করতে বাদ্য হয়েছেন। ইসলামের এই বিজয় অভিযানের কারণ ছিলো এক অনুভূতপূর্ব বৈপ্লবিক সুরের মধ্যে লুকিয়ে; গ্রীস, রোম, পারস্য, চীন, এমনকি ভারতবর্ষেরও প্রাচীন সভ্যতায় ঘুণ ধরে যাওয়ায়, বিপুল জনসাধারণ যে চরমতম দুঃখ-দুর্দশর সম্মুখীন হলো, তা থেকে বাঁচিয়ে ইসলাম এক আলোঝলকিত দেশের নির্দেশ তাদের দিতে পেরেছিলো বলেই তার এই অসাধারণ বিস্তার সম্ভব হয়েছিলো।

www.nagorikpathagar.org

মাও সে তুং (১৮৯৩-১৯৭৬)

লং মার্চ– পৃথিবীর বিস্ময়

ম, নুরুন্নবী

আজকাল যখন তখন 'লং মার্চ' করার কথা শোনা যায়। কিন্তু যে কোন দীর্ঘ যাত্রাকেই 'লং মার্চ' হিসবে আখ্যায়িত করা যায় না। এর একটা পৃথক অর্থ ও তাৎপর্য্য রয়েছে। ১৯৩৪-৩৬ সালে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মহান শিক্ষক বিশ্বের শোষিত, নিপীড়িত ও সর্বহারা জনগণের মুক্তির মহানায়ক, গণচীনের কমিউনিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান কমরেড মাও সেতুং এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি, শ্রমিক ও কৃষকের লাল ফৌজ জাপানী দখলদার শক্তি এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের তাবেদার চিয়াং কাইশেকের সামরিক কুওমিনতাং বাহিনীর বিরুদ্ধে বন্ধুর পথে দুঃসাহসিক যুদ্ধ করতে করতে প্রায় ছ'হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে গণচীনের পশ্চিমাঞ্চলের ইয়েনানে গিয়ে উপস্থি হন। পৃথিবীর ইতিহাসে এই মহান দুঃসাহিসিক দীর্ঘ যাত্রাকেই 'লং মার্চ' হিসাবে অভিহিত করা হয়। চীনের জনগণ এই অভিযানকে 'চ্যাং চেঙ' বা 'পঁচিশ হজার লি পরিক্রমণ' বলে উল্লেখ করেন।

এই 'লং মার্চের' প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এটা পরিচালিত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীর শক্তির বিরুদ্ধে সর্বহারা ও শোষিত জনগণের দ্বারা।

এর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হলো সুসজ্জিত সামরিক শক্তিবলে বলিয়ান একটি শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে প্রায় ছ' হাজার মাইল হেঁটে পৃথিবীর সবচেয়ে খরস্রোতা ও দূরতিক্রম্য নদী, দূর্লংঘ্য পাহাড়, মালভূমি, গহীনবন, দুর্গম তৃণভূমি অতিক্রম করা আর তার সাথে প্রাকৃতিক বাধা, শত্রুর আক্রমণ ও অবরোধ মোকাবেলা করা।

চেয়ারম্যান মাও সেতুঙ এর নেতৃত্বে পরিচালিত এই 'লং মার্চে' যেমন রয়েছে বিস্ময়কর ও লোমহর্ষক ঘটনা, তেমনি রয়েছে আনন্দদায়ক ও প্রেরণা সৃষ্টির মতো অনেক কাহিনী। এই ক্ষুদ্র লেখায় এর সামান্যও উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাস। চিয়াং কাই-শেক নয় লক্ষ সৈন্য ছেড়ে দিয়েছে কমিউনিষ্ট দমন করার জন্যে। এদিকে লাল ফৌজ, সংরক্ষিত ডিভিশন মিলে এক লক্ষ আশি হাজারের মতো হবে। দু'লক্ষের মতো হবে প্রতিরক্ষী ও লাল রক্ষী বাহিনী। অস্ত্রের মধ্যে মাত্র এক লক্ষ রাইফেল, কিছু গ্রেনেড, কিছু শেল আর গেলাবারুদ।

চিয়াংএর প্রধান উপদেষ্টা জার্মান বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ ভন ফকেন হাউসেন দ্বারা তৈরী কমিউনিষ্ট খতমের নীল নকসা অনুসারে এই পঞ্চম অভিযানে শুধু নানকিঙ ও

www.nagorikpathagar.org

বোমাবর্ষণ, মেশিনগানের গুলি ও নির্যাতনের ফলে প্রায় ষাট হাজার লাল ফৌজের মৃত্যু হয়েছে। সোভিয়য়েত কিয়াংসি পূর্ণর্মুক্ত করার সময় কুয়োমিনতারে সংবাদ অনুসারে প্রায় দশ লক্ষ লোক যুদ্ধে ও অনাহারে মারা পরেছে। কিন্তু এর সত্ত্বেও লাল ফৌজের 'প্রাণকোষ' ধ্বংশ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

জুইচিন নামক স্থানে লালদের সামরিক সভা অনুষ্ঠিত হলো। সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রায় নব্বই হাজারের মতো লাল ফৌজ রাতের গভীরে দক্ষিণে কিয়াংশির উতু নামক স্থানে এসে জমায়েত হলো।

১৯৩৪ সালের ১৬ই অক্টোবর (মতান্তরে ১৮ই অক্টোবর) সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে চীন বিপ্লবের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। কমরেড মাও সেতুং উতু'র পাহাড়ের ধারে এক মন্দিরে থাকতেন। মাত্র কুড়িজন সঙ্গীসহ তিনি যাত্রা করলেন এই লাল ফৌজের সাথে মিলিত হবার জন্যে। এই যাত্রা থেকেই লং মার্চের শুরু। তখন বিকেল পাঁচটা। চেয়ারম্যানের সাথে ছিল দু'টো কম্বল, একটি জীর্ণ ওভার কোট, একটি সুতির চাদর, একটি ভাঙা ছাতা, একটি ওয়েলক্লথ আর এক বান্ডিল বই।

পথে শিয়াং নদী। প্রচণ্ড ঢেউ, ভয়ংকর গর্জন আর ঠাণ্ডা বাতাস। এর তীর চেয়ে উতু থেকে প্রায় মাইল সাতেক আসার পরেই লাল ফৌজ চেয়ারম্যানের সাথে মিলিত হলো।

যুদ্ধে যাবার সে কি আনন্দ। হাজার হাজার মশাল, তার সাথে গান, হাসি আর হট্টোগোলের আওয়াজ।

ডিঙি নৌকা সাজিয়ে নদী অতিক্রম করার জন্যে সেতু তৈরী করা হয়েছে। আর সেই সেতু দিয়েই লাল ফৌজের হাজার হাজার সদস্য একে একে নদী অতিক্রম করলেন। চেয়ারম্যান এখানে পেলেন কুপি আর শিনতিয়েন দখলের সংবাদ। গ্রামবাসীও সৈন্যরা মহা আনন্দে এখানে পালন করলেন সেই বিজয় উৎসব।

শত্রুদের অবরোধ লাইন ভেঙেগ ১৯৩৪ সালের নভেম্বরে লাল ফৌজ কোয়াংসি ও হোনানের সীমান্তবর্তী কড়ো রাস্তায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। মাথার উপর শত্রুদের বিমান। যুদ্ধ করতে করতে তাঁরা গিয়ে পৌঁছলেন মিয়াও অঞ্চলে। মিঁয়াওরা সেখানকার সংখ্যালঘু জাতি। তাঁরাও কুয়োমিন্টাং শ্বেত বাহিনীর অত্যাচারে জর্জরিত। চেয়ারম্যান ও লাল ফৌজকে পেয়ে তারা আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন। মিঁয়াও অঞ্চলেও শত্রুদের বিমান হামলা হলো। অসংখ্য ঘরবাড়ী ও মাঠের ফসল নষ্ট করলো তারা।

নভেম্বরের রাত। কনকনে ঠান্ডা। চাঁদের কোন পাত্তা নেসই। দুর্গম পথ। পাহাড়ে উঠলে মনে হয় আকাশ মাথায় ঠেকবে। সারারাত ধরে তাঁরা পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করলেন। এভাবে তাঁরা ডিসেম্বরের শেষ দিনে কোয়েইচো প্রদেশের হুয়াংপিং কাউন্টির কাছে হৌচ্যাং এ এসে পৌঁছালেন। কোয়েইচোতে পাঁচটি শত্রুবাহিনীতে তাঁরা

www.nagorikpathagar.org

ধ্বংশ করে দিলেন । প্রত্যেকটি বাহিনীতে ছিল হাজার হাজার সৈন্য। লাল ফৌজের দখলে এর প্রদেশপাল ওয়াঙের প্রধান দফতর ও রাজ প্রাসাদ। এখানে প্রায় বিশ হাজার লোক লাল ফৌজে যোগ দিল।

এর পর তপাঁরা উ নদী পেরিয়ে সুনই দখলের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। বীরের মতো তাঁরা উ-নদীও পেরিয়ে গেলেন দ্রুতগতিতে। সমস্যা দেখা দিল সোনালী বালুকা নদী অতিক্রম করা নিয়ে। তখন নদীতে জোয়ারের তেজ। ক্রুদ্ধ ড্রাগণ–শীর্ষ ঢেউ।

১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাস। প্রথ, পঞ্চম ও নবম লাল ফৌজ বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যগণ এই সোনালী বালুকা নদীরে তীরে গিয়ে পৌঁছালেন। এই বাহিনীগুলো প্রথম ফ্রন্ট লাল ফৌজ বা মূল লাল ফৌজের অন্তর্ভূক্ত।

শত্রুরা এখানে তাদের আক্রমণ তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুললো। সমস্ত খাদ্যশস্য সরিয়ে ফেললো।

দখলে মাত্র কয়েকটি নৌকা। অথচ এই প্রমত্ত ঢেউ পাড়ি দিতে হবে। তিনদিন তিনরাত ধরে হাজার হাজার ফৌজ সোনালী বালুকা নদী পার হলেন।

নদী অতিক্রম করার কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁরা দক্ষিণ-পূর্ব সিকাং এর মিয়েনিং এ গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে তাঁরা টাটু নদী পেরোবার ও য়ি অধ্যুষিত এলাকার দিকে অগ্রসর হবার সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রত্যেকের সাথে ছিল চৌদ্দ দিনের খাবার, একটি বাঁশের লাঠি ও সাত মিটার লম্বা দড়ি।

দু'দিন পর তাঁরা মিঁয়েনিং ত্যাগ করলেন। মে'র এ সোনালী দুপুরে তাঁরা গিয়ে পৌঁছুলেন য়িদের এলাকায়। য়ি-রা উপজাতি। চেয়ারম্যান মাও সে তুং এবং লাল ফৌজকে পেয়ে তাঁরা জানালো এক প্রাণঢালা অভ্যর্থনা।

এর পর য়ি-দেব পাহাড়ী এলাকা থেকে প্রায় দুশো লি দুরে তারা এসে পৌঁছুলেন টাটু নদীর তীরে আনশুনচাঙে। তীর বেয়ে তাঁরা এগুলেন উত্তর দিকে। সেটা ছিল ঘনঘাসের পথহীন নির্জন পাহাড়ী এলাকা। খাড়া পথ বেয়ে তাঁরা যতই উপরে উঠলেন ততই দেখা গেল ঘনজঙ্গল। এক গোধূলী লগ্নে তাঁরা গিয়ে পৌঁছলেন পাহাড়ের এক উঁচু চূড়ায়। আনশুনচাঙ তখন অনেক পিছনে।

পরদিন সকালে তাঁরা চললেন মোসিমিয়েন নামক একটি শহরের উপর দিয়ে লুটিং এর দিকে। পথে সেই ভয়ংকর প্রসস্ত গভীর ও প্রমত্ত নদী। টাটু নদী দখলের সময় দুর্ধর্ষ লোলো আদিবাসীরাও এ্ই সংগ্রামে যোগ দিল।

নদীর অপর পাড়ে ছেচুয়ান প্রদেশের এক নায়ক-সেন্যাধ্যক্ষ লিউ ওয়েন-হুইয়ের সৈন্যদল অপেক্ষা করছিল। লাল ফৌজের অবস্থান ও গতি ঠিক করতে না পেরে তারা বিশ্রাম নিচ্ছিল। তাই দলের সেনা নায়ক তিনটে নৌকায় করে নদীর এ পারে আত্মীয় স্বজনদের সাথে আমোদ আহলাদ করতে এল। লাল ফৌজ এসেই এই তিনটি নৌকা

www.nagorikpathagar.org

দখল করলো। প্রতি নৌকায় আশি জন করে সৈন্য যাত্রা করলো। শত্রুদের তখন তীব্র গোলাগুলি চলছে। কমিউনিষ্টরা ওপাড়ের খোলা অবস্থানগুলোর উপর নদীর দক্ষিণ পাড়ের পাহাড় থেকে তাক করে নৌকার দু ধারে একটা রক্ষা আবরণী তৈরী করে বসলো। হঠাৎ মেশিন গানের গুলিতে শত্রুরা ছুটাছুটি করতে লাগলো। নৌকার যাত্রীরাও ওপারে গিয়ে এই আক্রমণ আরো তীব্রতর করে তুললো। শত্রুরা খানিকটা পিছনে সরে গেল। লালেরা এই তিনটে নৌকোয় করে তীব্র স্রোতের মধ্যে কখনো দু ঘন্টায়, কখনো চার ঘন্টায় এ নদী অতিক্রম করতে লাগলো। এভাবে সমস্ত মালামালসহ নদী অতিক্রম করতে গেলে লাগবে কয়েক সপ্তাহ। ততক্ষণ হয়তো শত্রুরা এসে ঘিরে ফেলবে। মিটিং বসলো। সিদ্ধান্ত হলো আমজেন চা'ঙ থেকে প্রায় চার শ' লি পশ্চিমে খুব উঁচুতে নদী যেখানে সংকীর্ণ অথচ গভীর ও খরস্রোতা; সেখানে একটি ঝুলন্ত সেতু আছে সেটা দিয়ে নদী পার হবার। সেতুটি নাম 'লিউ তিঙ চিয়াও' বা লিউ'র তৈরী সাঁকো। চওড়া মাত্র দুমিটার। তাতে ছিলো দু পাশের পাহাড়ের মধ্যে প্রোথিত বিরাট লোহার খুঁটির সঙ্গে আটকানো তেরোটি ইস্পাতের শিকল। দু পাশে রেলিং হিসাবেও দুটো শিকল। টাটু পেরোবার এটাই সর্বশেষ পথ। নগ্নপদ ফৌজেরা কয়েক হাজার ফুট পাহাড়ের উপরে উঠলো। পথ খুবই বন্ধুর। এই সাঁকো যদি অতিক্রম করা সম্ভব না হয় তাহলে শত্রুদের তীব্র আক্রমণ মোকাবেলা করতে করতে প্রায় এক হাজার লি ঘুরে যেতে হবে পশ্চিম তিব্বত সীমান্তের লিকিয়াঙের দিকে।

রাতের অন্ধকারে প্রায় দশ হাজার মশাল জ্বেলে তাঁরা চললেন সেই সেতুর দিকে। এ দিকে সেচুয়ান বাহিনী পথ রোধ করে থাকায় অগ্রগামী বাহিনীও সামান্য পিছিয়ে পরলো। দুরবীণে দেখা গেল শত্রু বাহিনীও সেই সেতুর দিকে দ্রুত এগুচ্ছে। লৌহ শিকলের উপর কাঠের তক্তা বসিয়ে এই সেতুটি বানানো হয়েছে। লাল ফৌজ এই সেতুর কাছে এসে দেখলো যে তক্তাগুলোর অধিকাংশই সরানো হয়েছে। নগ্ন শিকলগুলো পানির উপর ঝুলছে। এ ছাড়াও সেতুমুখের কাছে শুত্রুপক্ষ তার মেশিন গান নিয়ে তাক পেতে আছে।

যেভাবেই হোক নয়া শত্রু বাহিনী এসে পৌঁছার আগেই সেই সেতু অতিক্রম করতে হবে, নইলে এতোগুলো লালের জীবন বাঁচানো অসম্ভব হয়ে পরবে। লাল ফৌজের সদস্যদের প্রতি নদীতে ভেসে থাকা তক্তাগুলো সংগ্রহের জন্য জীবন উৎসর্গ করার আহ্বান জানানো হলো। সামনেই শত্রু পক্ষের মেশিনগানগুলো তাক করে আছে। এরই মধ্যে তিরিশ জন আত্মোৎসর্গ করতে রাজী হয়ে গেলেন। হাত বোমা আর 'মার্জার' নামক রাইফেল পিঠে নিয়ে লৌহ শৃংখল আঁকরে ধরে তক্তাগুলো সংগ্রহের জন্য তীব্র খরস্রোতা নদীতে তারা ঝাঁপিয়ে পরলেন। শত্রুদের মেশিনগানের গুলিতে প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয় করে বেশ কয়েকজন নদীর অতল গভীরে তলিয়ে গেলেন। অবশেষে একজন তক্তার উপর হামাগুড়ি দিয়ে উঠে বসতে সক্ষম হলেন। তার পরেই শত্রুর ছাউনীর উপর পর পর কয়েকটা হাত বোমা মারলেন। এর পর আরো অনেক লাল ফৌজ তক্তার উপর উঠতে সক্ষম হলো। শত্রুরা প্রথমে তক্তাগুলো

www.nagorikpathagar.org

তুলে ফেলার চেষ্টা করলো। সম্ভব না হওয়ায় ঘন তেন ঢেলে দিয়ে অগ্নি সংযোগ করলো। দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল তক্তাগুলো। লালেরাও শত্রুর মেশিনগান ছোড়ার ঝুপরিির মধ্যে ফেলতে লাগল হাত বোমা। শত্রুরা ছুটে পালাতে লাগল। লাল ফৌজ দৌড়ে গিয়ে মেশিনগানগুলো দখল করে তার মুখ তীরের দিকে ঘুরিয়ে দিল। এরপর জলন্ত কক্তাগুলো নিভিয়ে আবার সেতুতে বসানো শুরু হলো।

জানা গেল যে, শত্রুবাহিনী পিছন থেকে এগিয়ে আসছে। তাঁরা এক পাশ থেকে তাদের উপর আক্রমণ চালালেন। শত্রুরা যে যেখানে পারলেন ছুটে পালালো। এরই মধ্যে প্রায় শতাধিক শত্রু সৈন্য এসে লাল ফৌজে যোগ দিল।

ঝুলন্ত নড়বড়ে সেতুটির উপর দিয়ে হাজার হাজার সৈনিক, কেউ সর্তক পদক্ষেপ, কেউ শিকল ধরে, কেউ গল্প করতে করতে আবার কেউ হাসতে হাসতে এই সেতুটি অতিক্রম করে ফেলল।

আনজেন চা'ঙ ও লিউ তিঙ চিয়াও তে এই বীরেরা যে বীরত্ব দেখালেন তার জন্যে তাঁদেরকে চীনের লাল ফৌজের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করা হলো৷

টাটু নদী পেরিয়ে তাঁরা প্রথম হুয়ালিং পিং ও পরে সেখানে থেকে শুইৎ সেতির দিকে যাত্রা করলেন। পথে তাঁরা পাহাড়ী এলাকায় শত্রুদের বিমান দ্বারা আক্রান্ত হলেন। চেয়ারম্যান মাও সেতুং ও বোমার ধোয়ার মধ্যে একবার ঢাকা পরলেন। এখানে রক্ষী বাহিনীর নেতা কমরেড হু চ্যাং-পাও বোমা বর্ষণের ফলে নিহত হন।

১৯৩৫ সালে জুন মাস টাটু নদী পেরিয়ে তাঁরা পৌঁছলেন বরফ ঢাকা চিয়াচিন পর্বত শৃংগের পাদদেশে। চিয়াচিন পাহাড়ের চূড়াটা ছিল লম্বা, উঁচু ও সরু। সূর্য্যের আলোকচ্ছটায় সেটা ঝকঝক করছিল। বিরাট বিরাট ছাতার মতো বরফের মেঘের আনা গোনা ছিল চূড়াটার চারপাশে। প্রথম দিকে বরফ তেমন গভীর ছিল না বলে হাঁটতে তেমন কষ্ট হচ্ছিল না। পরে বরফ তেমন গভীর ছিল না বলে হাঁটতে তেমন কষ্ট হচ্ছিল না। পরে বরফ জমে পথ হলো পিচ্ছিল ও বন্ধুর। সামান্য অসতর্কের জন্যেই গভীর খাদে পরার সম্ভাবনা। বরফের মধ্যে সবার এমন অবস্থা যে দু'কদম এগিয়ে গেলে আবার এক কদম পিছিয়ে আসতে হয়। পাহাড়েরর মাঝখানে উঠতেই প্রচন্ড ঝড়ো হাওয়া বইতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বরফ বৃষ্টি হতে লাগল শরীরের উপর। প্রচার দলের কর্মীরা চিৎকার করে বলতে লাগলেন "কমরেডগন। শক্ত হোন! হাল ছেড়ে দেবেন না। অধ্যবসায় মানেই বিজয় অর্জন।" গিরি পথের উপরে তাঁরা উড়ালেন লাল পতাকা।

পাহাড়ের যতই উপরে তাঁরা উঠতে লাগলেন ততই বাতাসের চাপ বেশী অনুভূত হলো। কারো কারো এমন মনে হচ্ছিল যে দেহের দুদিক থেকে যেন দু'টো পাথর চাপা দেয়া হয়েছে। মনে হয় গোটা হৃৎপিন্ডটি একবার মুখ হা করলেই বেরিয়ে আসবে। অবশেষে তারা গিরিপথের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করলেন। কিছুক্ষণ পরে তারা পাহাড়ের অন্য ধারে চতুর্থ ফ্রন্ট বাহিনীর সাথে মিলিত হাবার জন্যে ঢালু পথে পা

www.nagorikpathagar.org

বাড়ালেন। নামার পথটিও বন্ধুর। প্রচন্ড কনকনে হাওয়া ও কালো ঘনমেঘ নিচের দিকে নামার পথকে আরো দুর্গম করে তুললো। কনকনে শীতের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে, পিছলাতে পিছলাতে এবং গড়াতে গড়াতে তাঁরা পাহাড়ের অপর পাড়ে চতুর্থ ফ্রন্ট বাহিনীর সাথে মিলিত হলেন। তাঁদের পতাকায় লেখা "উত্তর-পশ্চিম শেচুয়ানে বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকাকে বিস্তৃত করো।" বরফ ঢাকা পাহাড় চূড়ায় তখন পতপত করে উড়ছিল লাল পতাকা।

পাহাড় থেকে নামার পর তারা মাও কুং এ বিশ্রাম নিলেন। এর পর তাঁরা বরফের পাহাড় মেংপেই অতিক্রম করে চোকে-চিতে পৌঁছলেন। সেখান থেকে তাঁরা কখনো খাড়া পাহাড়, কখনো গহীন বনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন। পথে প্রচন্ড ঝড় ও বৃষ্টি। এর ভিতর দিয়েই তাঁরা এসে পৌঁছলেন মাওয়ের কাই-এ। এরপর চিংহাই সিকাং সীমান্তের তৃণভূমি পেরোবারার জন্যে প্রস্তুতি নেয়ার পালা। এখানে তারা এক মাসের মতো কাটালেন। এরপর চিংহাই–সিকাং সীমান্তের তৃণভূমি পেরোবার জন্যে প্রস্তুতি নেয়ার পালা। এখানে তাঁরা এক মাসের মতো কাটালেন। এরপর ১৯৩৫ সালের আগষ্ট মাসে যাত্রা করলেন সেই কথা চিন্তাও করেনি। মাত্র চল্লিশ লি অতিক্রম করেই তাঁরা এসে পরলেন এক গবীন, প্রাগৈতিহাসিক অরণ্যে। কুটকুটে অন্ধকার। যোদ্ধারা আগুণ জ্বালালো। আগুণ দেখে বনের পশু পাখীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে চিংকার, ছুটাছুটি ও উড়াউড়ি করতে লাগল। কেননা এরা এর আগে কোনদিন আগুণ দেখেনি। এখানে কমরেডগণ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন। এরপর এই প্রাগৈতিহাসিক অরণ্য ফেলে তাঁরা সেই বিরাট নির্জন তৃণভূমিতে প্রবেশ করলেন। ঘরবাড়ী বা মানুষের কোন চিহ্নমাত্র নেই। বুনো ঘাসগুলো বেশ বড় বড়। প্রচুর কাদামাটি। একটু অসর্তক হলেই জলাভূমির গভীর কাদায় পা আটকে নিশ্চিত মৃত্যু ডেকে আনবে। ঠাণ্ডা আবহাওয়া। কখনো কখনো ঝড়ো বরফ বৃষ্টি। অবশেষে এই দুর্গম পথ পেরিয়ে তাঁরা এসে পৌঁছলেন পানিউ-এতে।

সেপ্টেম্বরে সেখান থেকে তাঁরা এসে পৌঁছলেন লাৎসেকৌর কাছে। এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ গিরিপথ। কেননা সেজুয়ান ও কানসু প্রদেশকে এটি যুক্ত করেছে। উত্তর শেনসীতে পৌঁছার জন্যে এ গিরিপথ ধরে এগুতে হবে। যুদ্ধ করে গিরিপথটিকে শত্রু সেনাদের হাত থেকে মুক্ত করতে হলো। সেপ্টেম্বরের শেষে শুই নদী পেরিয়ে তাঁরা লুংশান পর্বতমালা থেকে বেরিয়ে আসা লিউপান গিরিশৃঙ্গের দিকে যাত্রা করলেন। উত্তর শেনসি যাবার জন্যে এটাই শেষ বড় গিরিশৃঙ্গ। প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি ও ভয়ানক বিপদসঙ্কুল পথে লিউপথ গিরিশৃঙ্গ পেরিয়ে পাহাড়ের পাদদেশের কানসুর হুই অঞ্চলে তাঁরা প্রবেশ করলেন। হুই জাতি কমরেডগণকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করলেন।

কানসু'র হুয়ান শিয়েন কাউন্টি ত্যাগের পর তাঁরা একটি পাহাড়ের পাদদেশ গিয়ে এগুচ্ছেন। এমন সময় শত্রুদের ঘেরাও অভিযানকে ব্যর্থ করে দিয়ে পঁচিশ ও ছাব্বিশতম বাহিনী তাঁদের হর্ষ ধ্বনি দিয়ে উঠলো।

www.nagorikpathagar.org

ছু' ছি থেকে কানসু-শেসসির উচু আলপথ ধরে মাত্র আশি লি কুয়োমিনতাং মা হুং কুয়েইর অশ্বারোহী সেনা বাহিনীর সাথে তাঁদের আঠারোবার যুদ্ধ করতে হলো। অবশ্য প্রত্যেক বারই শত্রুপক্ষের যোদ্ধারা যুদ্ধ করার চেয়ে ঘোড়া নিয়ে পৈতৃক জান বাঁচানোর ব্যাপারেই বেশী সচেষ্ট ছিল। যা, হোক এর পরেই তাঁরা উত্তর শোনসী'র ঘাঁটি এলাকায় প্রবেশ করার প্রস্তুতি নিলেন। পথে শত্রু সেনাদের সাথে আরেক দফা যুদ্ধ শুরু হলো। লাল ফৌজের মেশিনগানের গুলিতে শত্রু সেনাদের ঘোড়াগুলো হ্রেসা ধ্বনি দিয়ে ছুটো ছুটি করতে লাগল। অসংখ্য শত্রু সেনাকে নিমূল করে চেয়ারম্যান প্রাদেশিক সোভিয়েত কেন্দ্র শিয়া শিওয়ানের দিকে যাত্রা করলেন। শিয়া শিওয়ানে পৌঁছতেই অসংখ্য শিশু, পুরুষ, নারী প্রচন্ড আনন্দ ধ্বনি দিয়ে ড্রাম ও ঘন্টা বাজিয়ে, ছোট ছোট লাল ও সবুজ ব্যানার আন্দোলিত করে চেয়ারম্যান মাও ও লাল ফৌজকে অভ্যর্থনা জানালো। তারা আওয়াজ তুললোঃ–

স্বাগতম মাও
স্বাগতম কেন্দ্রীয় লাল ফৌজ,
চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি দীর্ঘজীবী হোক। ইত্যাদি।

এখানে নেতৃস্থায়ীন কমরেডগণ যেমন কমরেড লিউ চি-তান, ২৫ তম লাল ফৌজের কমাণ্ডার কমরেড শু হাই-তুং, চৌ এন লাউ, তুং পি-উ শু তে-লি, গিণ পো-চু এবং শিয়ে চুয়ে-সাই প্রভৃতি কমরেডগণ চেয়ারম্যান মাও ও কেন্দ্রীয় লাল ফৌজকে অভ্যর্থনা জানালেন।

এই লং মার্চে লাল ফৌজ ও অন্যান্যরা সর্বমোট ১৮০৯৮ লি (এক লি প্রায় $\frac{২}{৩}$ মাইলের সমান) বা ছয় হাজার মাইল পথ অতিক্রম করেছে। এ অভিযানে সর্বমোট ৩৬৮ দিনের মধ্যে গড়ে প্রতিদিনই যুদ্ধ করতে হয়েছে। ১৫ দিন যুদ্ধ করতে হয়েছে মাটিতে পরে থেকে। ২৩৫ দিন দিনের আলোতে এবং রাতে কদম কদম চলতে হয়েছে ১৮ দিন ধরে। প্রতি ১১৪ মাইল হেঁটে যাওয়ার পর তারা একবার থেমেছে। ৫৬ দিন কেটেছে উত্তর পশ্চিম সেচুয়ানে। বাঁকী চল্লিশ দিন তারা পেয়েছে বিশ্রাম। ১৮টি গিরিশৃঙ্গ, ১৪টি খর স্রোতা নদী, ১২টি প্রদেশ তারা অতিক্রম করেছে। ৬২টি নগর বা শহর তারা অধিকার করেছে, ১০ জন যুদ্ধবাজ ভূস্বামীকে তারা পরাজিত এবং ছটি এমন আদিবাসী এলাকা তারা অতিক্রম করেছে যেখানে কোনদিন কোন চীনাও যেতে সক্ষম হয়নি। তারা প্রায় ২০ কোটি অধ্যুষিত এলাকা অতিক্রম করেছে, আর করেছে অসংখ্য খন্‌যু যুদ্ধ। এই বিস্ময়কর অভিযানে সমস্ত দখল কৃত স্থানে তারা অসংখ্য জনসভা ও বক্তৃতা করে মুক্তি, সাম্য ও গণতন্ত্রের স্বপক্ষে বক্তব্য রেখেছে, নাটক দেখিয়েছে, অত্যাচারী ধনীদের উপর ট্যাক্স ধরেছে এবং বহু দাসকে মুক্ত করেছে।

www.nagorikpathagar.org

পৃথিবীতে অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু মনে হয় সমস্ত বিস্ময়কর ঘটনাগুলোর মধ্যে 'লং মার্চ'ই বিস্ময়কর ঘটনাগুলোর অন্যতম। পৃথিবীর সবচেয়ে দূর্গম মালভূমি, প্রায় দশ হাজার পাহাড়, তৃণভূমি, দূরতিক্রম্য নদী, গহীন বন, বরফ বৃষ্টি ও ঘনকালো মেঘে ঢাকা আকাশ, কুচকুচে অন্ধকার পথ, পদে পদে শত্রুর অবরোধ, আক্রমণ আর প্রাকৃতিক বাধা অতিক্রম করে ছ' হাজার মাইল যুদ্ধরত অবস্থায় এ অভিযানে সমাপ্তি– এ এক সত্যিই পৃথিবীর ইতিহাসে বিস্ময়কর ঘটনা গুলোর মধ্যে বিস্ময়কর। বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের ফলে পৃথিবী ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে– সব কিছুই সহজ থেকে সহজতর হচ্ছে কিন্তু তবুও এই 'লং মার্চের' ঘটনা পৃথিবীতে যুগে যুগে ভবিষ্যত বংশধরদের কাছে সকল প্রকার সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা হিসাবে কাজ করবে।

'লং মাচ' চলাকালীন সময়েই এর উপরে মাও–সেতুং কবিতা লিখেছে। একজন বাঙালী কবি সেটা অনুবাদ করেছে।

কবিতাটি উল্লেখ করেই এই আলোচনার সমাপ্তি টানা হলো।

" হাজার দশেক এবড়ো থেবড়ো পাহাড় ভেঙে
পেরিয়ে অসংখ্য জলস্রোত
ভয়ে কাতর নয় লাল বাহিনী, লঙ মার্চের
কষ্টে ওদের পরোয়া নেই।
বাতাসের শান্ত লহরী পঞ্চ শিখরে,
জাঁকালো উমেঙ পাকায় কাদা মাটির পিল।
উষ্ণ রাখ সোনালী বালুর চুয়ানো পানিতে
ভেজা খাড়া পাহাড়গুলো
উষ্ণ রাখো, আর
ঠাণ্ডা রাখো, টাটু নদী পারাপার শিকল।
বরফ– জড়োয়া–ঢাকা মিনশান হাজার লী পেরিয়ে
পরমানন্দে, আবেগে উজ্জ্বল মুখ এগিয়ে চলেছে তিনটে বাহিনী।"

(সংগ্রহ-বই, পূবার্চী, সংখ্যা, ১৯৭৯)

মাও জীবনে অনেক ভাষণ দিয়েছেন-তাঁর একটি গুরুত্ব পূর্ণ ভাষণের কিছু অংশ-

সমাজ বিকাশের বর্তমান যুগে দুনিয়াকে সঠিকভাবে জানার ও বদলে দেয়ার দায়িত্বটি ইতিহাস সর্বহারাশ্রেণী ও তার পার্টির কাঁধে ন্যস্ত করেছে। বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান অনুসারে নির্ধারিত, দুনিয়াকে বদলে দেয়ার এই প্রক্রিয়া তথা এই অনুশীলন ইতোমধ্যেই বিশ্বজনীন ক্ষেত্রে এবং চীনের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক লগ্নে পৌছে

www.nagorikpathagar.org

গেছে, তা হলো এমন এক লগ্ন যা মানবোতিহাসের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব, অর্থাৎ তা হলো দুনিয়া থেকে ও চীন থেকে অন্ধকারকে সম্পূর্ণ নির্বাসন দেয়ার এবং দুনিয়াকে ইতিপূর্বকালে কখনই যেমন ছিল না তেমন এক আলোকিত দুনিয়ায় বদলে দেয়ার লগ্ন। দুনিয়াকে বদলে দেয়ার জন্যে সর্বহারাশ্রেণী ও বিপ্লবী জনগণের সংগ্রামের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে নিম্নোক্ত কর্তব্যগুলোর পরিপূর্ণতা দান: বস্তু জগতের পরিবর্তন সাধন আর, একই সাথে, নিজেদের মনোজগতের পরিবর্তন সাধন-নিজেদের জ্ঞানার্জন ক্ষমতার পরিবর্তন সাধন এবং মনোজগৎ ও বস্তু জগতের মধ্যেকার সম্পর্কের পরিবর্তন সাধন। এইরূপ পরিবর্তন ইতোমধ্যেই বিশ্বের একাংশ, সোভিয়েত ইউনিয়নের এসে গেছে। সেখানে জনগভ পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়াটি সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। চীনের ও বাকী দুনিয়ার জনগণ এইরূপ পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলেছে কিংবা চলবে। আর যে বস্তুজগতের পরিবর্তন করতে হবে তার অন্তর্ভূক্ত রয়েছে এই পরিবর্তনের সমস্ত বিরোধীরাও, যাদেরকে, পরিবর্তিত হওয়ার উদ্দেশ্যে, স্বেচ্ছামূলক তথা সচেতন পরিবর্তনের পর্যায়ে প্রবেশ করার পূর্বে বাধ্যতামূলক একটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অবশ্যই যেতে হবে। বিশ্ব সাম্যবাদের যুগ সেদিনই আসবে যেদিন গোটা মানবজাতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও সচেতনভাবে নিজেকে ও বিশ্বজগৎকে পরিবর্তন করবে।

অনুশীলনের মাধ্যমেই সত্যকে আবিষ্কার করুন, আবার অনুশীলনের মাধ্যমেই সত্যকে যাচাই ও বিকশিত করুন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান থেকে শুরু করুন এবং তাকে সক্রিয়ভাবে যৌক্তিক জ্ঞানে বিকশিত করুন; তারপর যৌক্তিক জ্ঞান থেকে শুরু করুন এবং মনোজগৎ ও বস্তুজগৎ-উভয়টিকে বদলে দেয়ার জন্যে সক্রিয়ভাবে বিপ্লবী আদর্শ অনুশীলন করুন। অনুশীলন, জ্ঞান, পুনরায় অনুশীলন, আর পুনরায় জ্ঞান। এই রূপটি চলতে থাকে অন্তহীন চক্রাবর্তে, আর প্রত্যেকটি চক্রাবর্তে অনুশীলন ও জ্ঞানের অন্তর্বস্তু উচ্চতর স্তরে আরোহণ করে।

(সংগ্রহ-বই মাওজেদঙ অনুশীলন ও দ্বন্দ্ব সম্পর্কে পৃষ্ঠা-১৮)

www.nagorikpathagar.org

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত

বাঙালি মুসলমান সমাজের সঙ্কীর্ণতা ও কবি নজরুল ইসরামের প্রতি সে সমাজে একাংশের বিদ্রূপতার প্রতিক্রিয়ায় 'বঙ্গীয় মুসলমান তরুণ সঙ্ঘে'র গৃহীত সিদ্ধান্ত (১৯৩০) অনুসারে সিরাজগঞ্জে সঙ্ঘের সম্মেলন আহ্বান করে তাকে নজরুলকে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ সম্মেলনে কবি একটি লিখিত ভাষণ দেন। এটি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাষণ।

আমার প্রিয় তরুণ ভ্রাতৃগণ!

আপনারা কি-ভাবিয়া আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে সভাপতি নির্বাচন করিয়াছেন, জানিনা। দেশের জাতির ঘনঘোর-ঘেরা দুর্দিনে দেশের, জাতির শক্তি-মজ্জা-প্রাণ স্বরূপ তরুণদের যাত্রাপথের দিশারী হইবার স্পর্ধা বা যোগ্যতা আমার কোনো দিন ছিল না, আজও নাই। আমি দেশ-কর্মী, দেশ-নেতা নই, যদিও দেশের প্রতি আমার মমত্ববোধ কোনো স্বদেশ-প্রেমিকের অপেক্ষা কম নয়। রাজ-লাঞ্ছনা ও ত্যাগ স্বীকারের মাপকাঠি দিয়া মাপিলে হয়তো আমি তাঁহাদের কাছে খর্ব pigmy বলিয়া অনুমতি হইব, তবু দেশের জন্য অন্তত এইটুকু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি যে, দেশের মঙ্গল করিতে না-পরিলেও অমঙ্গল-চিন্তা কোনদিন করি নাই, যাঁহারা দেশের কাজ করেন তাঁহাদের পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াই নাই। রাজ-লাঞ্ছনার চন্দন-তিলক কোনোদিন আমারও ললাটে ধারণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, কিন্তু তাহা আজ মুছিয়া গিয়াছে। আজ তাহা লইয়া গৌরব করিবারও অধিকার আমার নাই।

আমার বলিতে দ্বিধা নাই যে, আমি আজ তাঁহাদেরই দলে যাঁরা কর্মী নন-ধ্যানী। যাঁহারা মানবজাতির কল্যাণ সাধন করেন সেবা দিয়া, কর্ম দিয়া তাঁহারা মহত; কিন্তু সেই মহত হইবার প্রেরণা যাঁহারা জোগান তাঁহারা মহত যদি নাই হন, অন্তত ক্ষুদ্র নন। ইহারা থাকেন শক্তির পেছনে রুধির, ধারার মতো গোপনে, ফুলের মাঝে মাটির মমতা-রসের মতো অলক্ষে...। আমি কবি। বনের পাখির মতো স্বভাব আমার গান করার। কাহারও ভালো লাগিলেও গাই, ভালো না-লাগিলেও গাহিয়া যাই। বায়স ফিঙে

www.nagorikpathagar.org

যখন বেচারা গানের পাখিকে তাড়া করে, তীক্ষ্ণ চঞ্চু দ্বারা আঘাত করে, তখনও সে এক গাছ হইতে উড়িয়া আন গাছে গিয়া গান ধরে। তাহার হাসিতে গান, তাহার কান্নায় গান। সে গান ধরে আপনার মনের আনন্দে, যদি তাহাতে কাহারও অলস তন্দ্রা, মোহনিন্দ্রা টুটিয়া যায়, তাহা একান্ত দৈব। যৌবনের সীমা পরিভ্রমণ আজও আমার শেষ হয় নাই, কাজেই আমি যে গান গাই, তাহা যৌবনের গান। তারুণ্যের ভরা-ভাদরে যদি আমার গান জোয়ার আনিয়া থাকে, তাহা আমার অগোচরে। যে চাঁদ সাগরে জোয়ারে জাগায়, সে হয়ত তাহার শক্তি সম্বন্ধে আজও লা-ওয়াকিফ।...

আমি বক্তাও নহি। আমি কমবক্তার দলে। বক্তৃতায় যাঁহারা দ্বিগ্বিজয়ী বক্তিয়ার খিলজি, তাঁহাদের বাক্যের সৈন্য-সামন্ত অত দ্রুতবেগে কোথা হইতে কেমন করিয়া আসে, বলিতে পারি না। তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণ সেন অপেক্ষাও আমরা বেশি অভিভূত হইয়া পড়ি। তাঁহাদের বাণী আসে বৃষ্টিধারার মতো অবিরল ধারায়। আমাদের কবিদের বাণী বহে ক্ষীণ ভীরু ঝর্ণাধারার মতো। ছন্দের দু কূল প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিয়া সে সঙ্গীত গুঞ্জন করিতে করিতে বহিয়া যায়। পদ্মা ভাগীরথীর মতো খরস্রোতা যাঁহাদের বাণী, আমি তাঁহাদের বহু পশ্চাতে।

আমার একমাত্র সম্বল আপনাদের তরুণদের প্রতি আমার অপরিসীম ভালবাসা, প্রাণের টান। তারুণ্যকে, যৌবনকে আমি যে দিন হইতে গান গাহিতে শিখিয়াছি সেই দিন হইতে বারে বারে সালাম করিয়াছি, তাজিম করিয়াছি, সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করিয়াছি। গানে-কবিতায় আমার সকল শক্তি দিয়া তাহারই জয় ঘোষণা করিয়াছি-স্তন রচনা করিয়াছি। জবাকুসুম সঙ্কাশ তরুণ অরুণকে দেখিয়া প্রথম মানব যেমন করিয়া সশ্রদ্ধ নমস্কার করিয়াছিলেন, আমার প্রথম জাগরণ-প্রভাতে তেমনই সশ্রদ্ধ বিস্ময় লইয়া যৌবনকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি, তাহার স্তব-গান গাহিয়াছি। তরুণ অরুণের মতোই যে তারুণ্য তিমির-বিদারী, সে-যে আলোর দেবতা রঙের খেলা খেলিতে তাহার উদয়, রঙ ছড়াইতে ছড়াইতে তাহার অস্ত যৌবন-সূর্য যেথায় অস্তমিত, দুঃখের তিমির-কুন্তলা নিশীথিনীর সেইতো লীলাভূমি।

আমি যৌবনের পূজারী, কবি বলিয়াই যদি আমায় আপনারা আপনাদের মালার মধ্যমণি করিয়া থাকেন,তাহা হইলে আমার অভিযোগ করিবার কিছুই নাই। আপনাদের এই মহা দান আমি সানন্দে শির নত করিয়া গ্রহণ করিলাম, আপনাদের দলপতি হইয়া নয়-আপনাদের দলভুক্ত হইয়া, সহযাত্রী হইয়া। আমাদের দলে কেহ দলপতি নাই; আজ আমরা শত দিক হইতে শত শত তরুণ মিলিয়া তারুণ্যের শতদল ফুটাইয়া

www.nagorikpathagar.org

তুলিয়াছি। আমরা সকলে মিলিয়া এক সিদ্ধি, এক ধ্যানের মৃণাল ধরিয়া বিকাশিত হইতে চাই।

আজ সিরাজগঞ্জে আসিয়া সর্বপ্রধান অভাব অনুভব করিতেছি, আমাদের মহানুভব নেতা, বাঙলার তরুণ মুসলিমের সর্বপ্রথম অগ্রদূত, তারুণের নিশান-বার্দার মৌলানা ইসমাইল হোসেন শিরাজী সাহেবের। সিরাজগঞ্জের শিরাজীর সাথে বাঙলার সিরাজ, বাঙলার প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে। যাঁহার অনলপ্রবাহ-সম বাণীর গৈরিক নিঃস্রাব, জ্বালাময়ী ধারা মেঘ-নিরন্ধ্র গগনে আপরিসীম জ্যোতি সঞ্চার করিয়াছিল, নিদ্রাতুরা বাঙ্গদেশ উম্মাদ আবেগ লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিল,"অনলপ্রবাহে'র সেই অমর কবির কণ্ঠস্বর বাণীকুঞ্জে আর শুনিতে পাইব না। বেহেশতের বুলবুলি বেহেশতে উড়িয়া গিয়াছে। জাতির , কওমের,দেশের যে মহা ক্ষতি হইয়াছে, আমি শুধু তাহার কথাই বলিতেছি'না, আমি বলিতেছি আমার একার বেদনার-ক্ষতির কাহিনী। আমি তখন প্রথম কাব্য-কাননে ভয়ে ভয়ে পা টিপিয়া টিপিয়া প্রবেশ করিয়াছি–ফিঙে বায়স বাজপাখির ভয়ে ভীরু পাখির মতো কণ্ঠ ছাড়িয়া গাহিবারও দুঃসাহস সঞ্চয় করিতে পারি নাই, নখ–চঞ্চুর আঘাতও-যে না-খাইয়াছি এমন নয়। এমনি ভীতির দুদিনে মনি ওর্ডানে আমার নামে দশটি টাকা আসিয়া হাজির। কুপনে শিরাজী সাহেবের হাতে লেখা – "তোমার লেখা পড়িয়া দশটি টাকা পাঠাইলাম ফিরাই দিওনা ব্যাথা পাইব। আমার থাকিলে দশ হাজার টাকা পাঠাতাম।" চোখের জলে স্নেহ–সুধা–সিক্ত ঐ কয় পঙক্তি লেখা বারে বারেপড়িলাম; টাকা দশটি লইয়া মাথায় ঠেকাইলাম। তখনও আমি তাঁহাকে দেখি নাই। কাঙাল ভক্তের মতো দুর হইতেই তাঁহার লেখা পড়িয়াছি, মুখস্থ করিয়াছি, শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি। সেইদিন প্রথম মানস–নেত্রে কবির স্নেহ–উজ্জ্বল মূর্তি মনে মনে রচনা করিলাম; গলায়, গায়ে ফুলের মালা পরাইলাম।তাহার পর ফরিদপুর বঙ্গীয় প্রদেশিক কনফারেন্সে তাঁহার জ্যোতিবিমন্ডিত মূর্তি দেখিলাম। দুই হাতে তাঁহার পায়ের ধূলি কুড়াইয়া মাথায় মুখে মাখিলাম। তিনি আমায় একেবারে বুকের ভিতর টানিয়া লই্ে; নিজ হাতে করিয়া মিষ্টি খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। যেন বহুকাল পরে পিতা তাহার হারানো পুত্রকে ফিরাইয়া যাওয়া। তাঁহার রুহু মোবারক হয়ত আজ এই সভায় আমাদের ঘিরিয়া রহিয়াছে। তাঁহারই প্রেরণায় হয়তো আজ আমরা তরুণ্যের, এই যৌবনের আরাফাত ময়দানে আসিয়া মিলিত হইয়াছি। আজ তাঁহার উদ্দেশ্যে আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে শ্রদ্ধা তসলিম নিবেদন করিতেছি, তাঁহার দোয়া ভিক্ষা করিতেছি।.....

www.nagorikpathagar.org

আপনারা যে অপূর্ব অভিনন্দন আমায় দিয়েছেন, তাহার ভারে আমার শির নত হইয়া গিয়াছে, আমার অন্তরের ঘট আপনাদের প্রীতির সলিলে কানায় কানায় পূরিয়া উঠিয়াছে, সেই পূর্ণঘটে আর শ্রদ্ধা প্রতিনিবেদনের ভাষা ফুটিতেছেনা। আমার পরিপূর্ণ অন্তরের বাক্‌হীন শ্রদ্ধা-প্রীতি-সালাম আপনারা গ্রহণ করুন। আমি উপদেশের শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করিতে আসি নাই। প্রয়োজনের অনুরোধ যাহা না-বলিলে নয়, শুধু সেইটুক বলিয়াই আমি ক্ষান্ত হইব।

আমি সর্বপ্রথমে বলিতে চাই, আমাদের এই তরুণ মুসলিম সম্মেলনের কোনো সার্থকতা নাই যদি আমরা আমাদের পরিপূর্ণ শক্তি লইয়া বার্ধক্যের বিরুদ্ধে, জরার বিরুদ্ধে অভিযান ঘোষণা করিতে না-পারি। বার্ধক্য তাহাই যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃতকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ তাহারই যাহারা মায়াচ্ছন্ন; নবমানবের অভিনব জয়যাত্রার পথে শুধু বোঝা নয়- বিঘ্ন; শতাব্দির নবযাত্রার চলার ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া যাহারা কুচ্‌কাওয়াজ করিতে জানে না-পারে না, যাহারা জীব হইয়াও জড়, যাহারা অটল সংস্কারের পোষণ-স্তুপ আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে। বৃদ্ধ তাহারাই যাহারা নব অরুণোদয় দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে। আলোক-পিয়াসী প্রাণচঞ্চল শিশুদের কলকোলাহলে যাহারা বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাত করিতে থাকে, জীর্ণ পুঁথি চাপা পড়িয়া যাহাদের নাভিশ্বাস বহিতেছে, অভিজ্ঞানের অগ্নিমান্দ্যে যাহারা আজ কঙ্কালসার-বৃদ্ধ তাহারাই। ইহাদের ধর্মই বার্ধক্য। বার্ধক্যকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। বহু যুবককে দেখিয়াছি যাহাদের যৌবনের উর্দির নিচে বার্ধক্যের কঙ্কাল-মূর্তি। আবার বহু বৃদ্ধকে দেখিয়াছি যাঁহাদের বার্ধক্যের জীর্ণাবরণের তলে মেঘলুপ্ত সুর্যের মতো প্রদীপ্ত যৌবন। তরুণ নামের জয়-মুকুট শুধু তাহার, যাহার শক্তি অপরিমাণ, গতিবেগ ঝঞ্ঝার ন্যায়, তেজ নির্মেঘ আষাঢ়-মধ্যাহ্নের মার্তণ্ডপ্রায়, বিপুল যাহার আশা , ক্লান্তিহীন যাহার উৎসাহ, বিরাট যাহার ঔদার্য, অফুরন্ত যাহার প্রাণ, অটল যাহার সাধনা, মৃত্যু যাহার মুঠিতলে। তারুণ্য দেখিয়াছি আরবের বেদুইনদের মাঝে, তারুণ্য দেখিয়াছি মহাসমরের সৈনিকের মুখে, কালাপাহাড়ের অসিতে, কামাল-করিম-মুসোলিনি সানইয়াত-লেনিনের শক্তিতে। যৌবন দেখিয়াছি তাহাদের মাঝে যাহারা বৈমানিকক রূপে অনন্ত আকাশের সীমা খুঁজিতে গিয়া প্রাণ হারায়, আবিষ্কারক রূপে নব-পৃথিবীর সন্ধানে গিয়া আর ফেরে না, গৌরীশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষদেশ অধিকার করিতে গিয়ে যাহারা তুষার ঢাকা পড়ে, অতল সমুদ্রের নীল মঞ্জুষার মণি আহরণ করিতে গিয়া সলিল-সমাধি লাভ করে, মঙ্গলগ্রহে, চন্দ্রলোকে যাইবার পথ আবিষ্কার করিতে গিয়ে নিরুদ্দেশ হইয়া যায়, পবন-গতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাহারা উড়িয়ে যাইতে চায়, নব নব গ্রহ-নক্ষত্রের সন্ধান করিতে করিতে যাহাদের নয়নমণি

www.nagorikpathagar.org

নিভিয়া যায়, যৌবন দেখিয়াছি সেই দুরন্তের মাঝে। যৌবনের মাতৃরূপ দেখিয়াছি-শব বহন করিয়া যখন সে যায় শ্মশান- ঘাটে-গোরস্থানে, অনাহারে থাকিয়া যখন সে অন্ন পরিবেশন করে দুর্ভিক্ষ-বন্যাপীড়িতদের মুখে, বন্ধুহীন্ রুগীর শয্যাপার্শ্বে যখন সে রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া পরিচর্যা করে, যখন সে পথে পথে গান গাহিয়া ভিখারি সাজিয়া দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য ভিক্ষা করে, যখন সে দুর্বলের পাশে বল হইয়া দাঁড়ায়, হতাশের বুকে আশা জাগায়।

ইহাই যৌবন, এই ধর্ম যাহাদের তাহারাই তরুণ। তাহাদের দেশ নাই, জাতি নাই, অন্য ধর্ম নাই। দেশ-কাল-জাতি-ধর্মের সীমার উর্ধে ইহাদের সেনানিবাস। আজ আমরা মুসলিম তরুণেরা যেন অনুষ্ঠিত চিত্রে মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি-ধর্ম আমাদের ইসলাম, কিন্তু প্রাণের ধর্ম আমাদের তারুণ্য, যৌবন। আমরা সকল দেশের, সকল জাতির, সকল ধর্মের সকল কালের। আমরা মুরিদ যৌবনের। এই জাতি, ধর্ম, কালকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে যাঁহাদের যৌবন, তাঁহারাই আজ মহামানব, মহাত্মা, মহাবীর। তাঁহাদিগকে সকল দেশের সকল ধর্মের সকল লোক সমান শ্রদ্ধা করে।

পথপার্শ্বের যে অট্টালিকা আজ পড় পড় হইয়াছে, তাহাকে ভাঙিয়া ফেলিয়া দেওয়াই আমাদের ধর্ম, ঐ জীর্ণ অট্টালিকা চাপা পড়িয়া বহু মানবের মৃত্যুর কারণ হইতে পারে। যে ঘর আমাদের আশ্রয় দান করিয়াছে তাহা যদি সংস্কারাতীত হইয়া আমাদেরই মাথায় পড়িবার উপক্রম করে, তাহাকে ভাঙিয়া নতুন করিয়া গড়িবার দুঃসাহস আছে একা তরুণেরই। খোদার দেওয়া এই পৃথিবীর নিয়ামত হইতে যে নিজেকে বঞ্চিত রাখিল , সে যত মোনাজাতই করুক, খোদা তাহার কবুল করিবেন না। খোদা হাত দিয়েছেন বেহেশতি চিজ অর্জন করিয়া লইবার জন্য, ভিখারির মতো হাত তুলিয়া ভিক্ষা করিবার জন্য নয়। আমাদের পৃথিবী আমরা আমাদের মনের মতো করিয়া গড়িয়া লইব। ইহাই হউক তরুণের সাধনা।

গোঁড়ামী ও কুসংস্কার

আমাদের বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে যে গোঁড়ামী, যে কুসংস্কার, তাহা পৃথিবীর আর কোনো দেশে, কোনো মুসলমানদের মধ্যে নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। আমাদের সমাজের কল্যাণমুখী যেসব মৌলানা সাহেবান খাল কাটিয়া বেনোজল আনিয়েছিলেন তাঁহারা যদি ভবিষতদর্শী হইতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন- বোনোজলের সাথে সাথে ঘরের পুকুরের জলও সব বাহির হইয়া গিয়াছে। উপরন্তু সেই

www.nagorikpathagar.org

খাল বাহিয়া কুসংস্কারের অজস্র কুমির আসিয়া ভিড় করিয়াছে। মৌলানো-মৌলবি সাহেবকে সওয়া যায়, মোল্লাকেও চক্ষু-কর্ণ বুঝিয়া সহিতে পারি, কিন্তু কাঠমোল্লার অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইসলামের কল্যাণের নামে ইহারা-যে কওমের, জাতির, ধর্মের কি অনিষ্ট করিতেছেন তাহা বুঝিবার মতো জ্ঞান নাই বলিয়াই ইহাদের ক্ষমা করা যায়। ইহারা প্রায় প্রত্যেকেই 'মন মে শা ফরিদ, বগলমে ইট!' ইহাদের নীতি-'মুর্দা দোজখ মে হায়, য়্যা বেহেশত মে যায়, মেরা হালুয়া রুটি সে কাম।'

'দুষ্ট গরুর চেয়ে শূণ্য গোয়াল ভালো'-নীতি অনুসরণ না-করিলে সভ্য জগতের কাছে আমাদের ধর্ম, জাতি আর লাঞ্ছিত ও হাস্যস্পদ হইবে। ইহাদের ফতুয়া-ভরা ফতোয়া! বিবি তালাক ও কুফরি ফতোয়া তো ইহাদের জাম্বিল হাতড়াইলে দু-দশ গন্ডা পাওয়া যাইবে। এই ফতুয়াধারী ফতোয়াবাজদের হাত হইতে গরিবদের বাঁচাতেই যদি কেহ পারে তো সে তরুণ! ইহাদের হাতের 'আশা' বা ষষ্টি মাঝে মাঝে আজাদাহা রূপ পরিগ্রহ করিয়া তরুণ মুসলিমদের গ্রাস করিতে আসিবে সত্য, কিন্তু এই 'আশা' দেখিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিলে চলিবে না। এই ঘরোয়া যুদ্ধ-ভাইয়ের সহিত-আত্মীয়ের সহিত যুদ্ধই সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক। তবু উপায় নাই। যত বড় আত্মীয়ই হোক, তাহার যক্ষ্মা বা কুষ্ঠ হইলে তাহাকে অন্যত্র না-সরাইয়া উপায় নেই। যে হাত বাঘে চিবাইয়া খাইয়াছে, তাহাকে কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া ছাড়া প্রাণ রক্ষার উপায় নাই। অন্তরে অন্তরে পীড়া অনুভব করিয়াই এসব কথা বলিতেছি। চোগা-চাপকান -দাড়ি-টুপি দিয়া মুসলমান মাপিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর আর সব দেশের মুসলমানদের কাছে আজ আমরা অন্তত পাঁচ শতাব্দি পিছনে পড়িয়া রহিয়াছি। যাঁহারা বলেন, 'দিন তো চলিয়া যাইতেছে, পথ তো চলিতেছি,...তাঁহাদের বলি, ট্রেন-মোটর-এরোপ্লেনের যুগে গরুর গাড়িতে শুইয়া দুই ঘন্টায় এক মাইল হিসাবে গদাইলস্করি চালে চলিবার দিন আর নাই। যাহারা আগে চলিয়া গিয়াছে তাহাদের সঙ্গ লইবার জন্য যদি আমাদের একটু মাত্রায় দৌড়াইতে হয়, এবং তাহার জন্য পায়জামা হাঁটুর কাছেই তুলিতে হয়, তাই নাহয় তুলিলাম। ওইটকুতেই কি আমার ইমান বরবাদ হইয়া গেল? ইমলামই যদি গেল, মুসলিম যদি গেল, তবে ইমান থাকিবে কাহাকে আশ্রয় করিয়া? যাক, আর শত্রু বৃদ্ধি করিয়া কাজ নাই। তবে ভরসা এই যে, বিবি তালাকের ফতোয়া শুনিয়াও কাহারও বিবি অন্সত্মত বাপের বাড়িও চলিয়া যায় নাই, এবং কুফরি ফতোয়া দেওয়া সত্ত্বেও কেহ 'শুদ্ধি' হইয়া যান নাই।

www.nagorikpathagar.org

অবরোধ ও স্ত্রীশিক্ষা

আমাদের পথে মোল্লারা যদি হন বিন্ধ্যাচল, তাহা হইলে অবরোধ প্রথা হইতেছে হিমাচল। আমাদের দুয়ারের সামনের এই ছেঁড়া চট-যে কবে উঠিবে খোদা জানেন। আমাদের বাঙলাদেশের স্বল্প শিক্ষিত মুসলমানদের যে অবরোধ, তাহাকে অবরোধ বলিলে অন্যায় হইবে, তাহাকে একেবারে শ্বাসরোধ বলা যাইতে পারে। এই জুজুবুড়ীর বালাই শুধু পুরুষদের নয়, মেয়েদেরও যেভাবে পাইয়া বসিয়াছি তাহাতে ইহাকে তাড়াইতে বহু সরিষা-পোড়া ও ধোঁয়ার দরকার হইবে। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত বা অর্ধ শিক্ষিত লোকই চাকুরে, কাজেই খরচের সঙ্গে জামার অঙ্ক ভালো সামলাইয়া চলিতে পারেনা। অথচ ইহাদেরই পর্দার ফখর সর্বাপেক্ষা বেশি। আর ইহাদের বাড়িতে শতকরা আশি জন মেয়ে যক্ষ্মায় ভুগিয়া মরিতেছে আলো-বায়ুর অভাবে এইসব যক্ষ্মারোগগ্রস্থা জননীর পেটে স্বাস্থ্য-সুন্দর প্রতিভাদীপ্ত বীর সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে কেমন করিয়া? ফাঁসির কয়েদিরও এইসব হতভাগিনীদের অপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা আছে। আমরা ইসলামি সেই অনুশাসনগুলির প্রতিই জোর দিয়া থাকি যাহাতে পয়সা খরচ হইবার ভয় নাই।

কন্যাকে পুত্রের মতোই শিক্ষা দেওয়া-যে আমাদের ধর্মের আদেশ, তাহা মনেও করিতে পারিনা। আমাদের কন্যা-জায়া-জননীদের শুধু অবরোধের অন্ধকারে রাখিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, অশিক্ষার গভীরতর কূপে ফেলিয়া হতভাগিনীদের চির-বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের শত বর্ষের এই অত্যাচারে ইহাদের দেহ-মন এমনই পঙ্গু হইয়া গিয়াছে যে, ছাড়িয়া দিলে ইহারাই সর্বপ্রথমে বাহিরে আসিতে আপত্তি করিবে। ইহাদের কি-যে দুঃখ, কিসের-যে অভাব, তাহা চিন্তা করিবার শক্তি পর্যন্ত ইহাদের উঠিয়া গিয়াছে। আমরা মুসলমান বলিয়া ফখর করি, অথচ জানিনা-সর্বপ্রথম মুসলমান নর নহে, নারী।

বৃদ্ধদের আয়ুর পুঁজি তো ফুরাইয়া আসিল, এখন আমাদের তরুণদের সাধনা হউক আমাদের এই চির-বন্দিনী মাতা-ভগ্নিদের উদ্ধার সাধন। জন্ম হইতে দাঁড়ে বসিয়া যে পাখি দুধ-ছোলা খাইয়াছে, সে ভুলিয়া গিয়াছে যে, সেও উড়িতে পারে। বাহিরে তাহারই স্বজাতি পাখিকে দেখিয়া অন্য কোনো জীব বলিয়া ভ্রম হয়। এই পিঞ্জরের পাখির দ্বার মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। খোদর দান এই আলো-বাতাস হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার অধিকার কাহারও নাই। খোদার রাজ্যে পুরুষ আজ জালিম, নারী আজ মজলুম। ইহাদেরই ফরিয়াদে আমাদের এই দুর্দশা, আমাদের মত হীনবীর্য সন্তানের জন্ম।

www.nagorikpathagar.org

শুধু কি ইহাই? আমাদের সম্মুখে কত প্রশ্ন, কত সমস্যা,তাহার উত্তর দিতে পারে তরুণ, সমাধান করিতে পারে তরুণ। সে বলিষ্ঠ মন ও বাহু আছে একা তরুণের। সম্মুখে আমাদের পর্বতপ্রমাণ বাধা, নিরাশার মরুভূমি, বিধি-নিষিধের দুস্তর পাথার; এইসব লঙ্ঘন করিয়া অতিক্রম করিয়া, যাইবার দুঃসাহসিকতা যাহাদের, তারা তরুণ।

সঙ্ঘ-একানিষ্ঠতা

ইহার জন্য চাই আমাদের একাগ্রতা, একনিষ্ঠ সাধনা, চাই সঙ্ঘ। আজ আমরা বাঙলার মুসলিম তরুণেরা যুথভ্রষ্ট। আমাদের সঙ্ঘ নাই, সাধনা নাই, তাই সিদ্ধিত নাই। আমাদেরই চারিপাশে আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু যুবকদের দেখিয়াছি-কি অপূর্ব তাহাদের ঐক্য, ত্যাগ, সাধনা! তাহারা সকলে যেন একদেহে, একপ্রাণ। সকল বৈষম্য-বিরোধের উর্ধে তাহারা তাহাদের যে সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। জগতের যে কোনো যুব-আন্দোলনের সঙ্গে তাহারা আজ চ্যালেঞ্জ করিতে পারে। এই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার ভিত্তিমূলে কত বিপুল ত্যাগ স্বীকার রহিয়াছে, তাহা হয়তো আমরা অনেকেই জানিনা। ইহারা পিতামাতার স্নেহ, ভাই-ভগ্নির প্রীতি, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের ভালোবাসা, প্রিয়ার বাহু-বন্ধন, গৃহের সুখ-শান্তিম, ঐশ্বর্যের বিলাস, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মোহ, সমস্ত ত্যাগ করিয়াছে জাতির জন্য, দেশের জন্য, মানবের কল্যাণের জন্য। এই তরুণ বীরসন্ন্যাসীর দল আছে বলিয়াই আজও জন্য, দেশের জন্য, মানবের কল্যাণের জন্য। এই তরুণ বীরসন্ন্যাসীর দল আছে বলিয়াই আজও আমরা দিনের আলোকে মুখ দেখাইতে পারিতেছি। মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়াইয়া ইহারা নচিকেতার মতো প্রশ্ন করে, মৃত্যুর বজ্যমুষ্ঠি হইতে জীবনের সঞ্চয় ছিনাইয়া আনে। এই বনচারী বীরাচারীর দলই দেশের যৌবনে ঘুন ধরিতে দেয় নাই।.....আমাদের মতো ইহাদের স্কন্ধে চাকুরির দৈত্য সিন্দাবাদের মতো চাপিয়া বসে নাই। ইহারাই সত্যকার আজাদ, বাঁধনহারা। সকল বন্ধন, সকল মায়াকে অস্বীকার করিয়া তবে আজ ইহারা এত বড় হইয়া উঠিয়াছি। ইউনিভার্সিটির কত উজ্জ্বলতম রত্ন-যাহারা আজ অনায়াসে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট ব্যারিস্টার-প্রফেসর হইয়া নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপন করিত তাহারা আজ ম্যালেরিয়া-কালাজ্বর, দুর্ভিক্ষ, অশিক্ষা-কুশিক্ষা-পীড়িত পল্লির ধূলি-কর্দমাক্ত রাস্তায় রাস্তায় প্রাণ ফিরি করিয়া ফিরিতেছে। ইহারা আছে বলিয়াই তো মেরুদণ্ডহীন বাঙ্গালী জাতি আজও টিকিয়া আছে। দীপ–শলাকার মতো ইহারা নিজেদের আয়ু ক্ষয় করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে প্রাণ-প্রদীপ জ্বালাইয়া তুলিতেছে। ...আমাদের মুসলমান

www.nagorikpathagar.org

তরুণেরা লেখাপড়া করে জ্ঞান অর্জনের জন্য নয়, চাকুরি অর্জনের জন্য। গাধার 'ফিউচার প্রসকেপটি'র মতো আমরা ঐ চাকুরির দিকে তীর্থের কাকের মতো হা করিয়া চাহিয়া আছি। বি-এ, এম-এ পাশ করিয়া কিছু যদি না-হই, অন্তত সাব-রেজিস্ট্রার বা দারোগা হইবই হইব, এই যাহাদের লক্ষ, এত স্বল্প যাহাদের আশা, এতদ নিম্নে যাহাদের গতি, তাহাদের কি আর মুক্তি আছে? এই ভূত ছাড়িয়া না-গেলে আমরা যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিয়া যাইবে। এই ভূতকে ছাড়াইবার ওঝা আপনারা যুবকের দল। আমাদেরই প্রতিবেশী তরুণ শহিদের আদর্শ যদি আমরা গ্রহণ করিতে না-পারি, তাহা হইলে আমাদের স্থান সভ্য জগতের কোথাও নাই। চাকুরির মোহ, পদবির নেশা, টাইটেলের বা 'টাই' ও 'টেলের' মায়া যদি বিসর্জন না-করিতে পারি তবেদ আমাদের সজ্ঘ প্রতিষ্ঠার আশা সুদূর পরাহত। কোথায় আছ সেই শহিদের দল? বাহিরিয়া আইস আজ এই মুক্ত আলোকে-উদার আকাশের নীল চন্দ্রাতপ-তলে! তোমাদের অস্থি-মজ্জা-প্রাণ-দেহ, তোমাদের সঞ্চিত জ্ঞান, অর্জিত ধনরত্নের উপর প্রতিষ্ঠা হইবে আমাদের সজ্ঘের-তরুণ সজ্ঘের। সকল লোভ-লোভ-যশ-খ্যাতিকে পদদলিত করিয়া মুসাফিরের বেশে ভিক্ষুকের ঝুলি লইয়া যে বাহির হইয়া আসিতে পারিবে, এ সাধনা তাহারই, এ শহিদি দরজা শুধু তাহারই।

সঙ্গীত-শিল্প

আমাদের লক্ষ হইবে এক, কিন্তু পথ হইবে বহুমুখী। যে দুর্দ্ধর্ষ সে কাল-বৈশাখীর কেতন উড়াইয়া অসম্ভবের অভিযানে যাত্রা করুক, যে বীর তাহার জন্য রহিয়াছে সংগ্রাম- ক্ষেত্র, যে কর্মী তাহার জন্য পড়িয়া রহিয়াছে কর্মের বিপুল উপত্যকা; কিন্তু যে ধ্যানী, যে সুন্দরের পূজারী সে কল্প-পাখায় ভর করিয়া উড়িয়া যাক স্বপ্নলোকে, উদার নিঃসীম নীল নভে। সেই স্বপ্নপুরী হইতে সে যে স্বপন-কুমারীকে, রূপ-কুমারীকে জয় করিয়া আনিবে, তাহার লাবনীতে আমাদের কর্মক্লান্ত ক্ষণগুলি স্নিগ্ধ হইয়া উঠিবে। যে গাহিতে জানে, গানের পাখি যে, তাহাকে ছাড়িয়া দিব দূর-বিথার বনানীর কোলে-আমাদেরই আশে-পাশে থাকিয়া অবসাদ-ক্লিষ্ট মুহূর্তকে সে গানে গানে ভরিয়ে তুলিবে, প্রাণে নব-প্রেরণার সঞ্চার করিবে। ইহারা আমাদের সুন্দর সাথী। বাড়ির উঠানের ফুলে ফুলে ফুল্ল লতাটির পানে চাহিয়া যেমন রৌদ্র-দগ্ধ চক্ষু জুড়াইয়া লই, তেমনই করিয়া ইহাদের কবিতায়-গানে-ছবিতে আমরা আমাদের বুভুক্ষু অন্তরের তৃষ্ণা মিটাইব-অবসাদ ভুলিব।

www.nagorikpathagar.org

বিধি-নিষেধের বাধা আমরা মানিব না। গান গাওয়াই যাহার ভাব, সেই গানের পাখিকে কোন অধিকারে গলা টিপিয়ে মারিতে যাইব? সুন্দরের সৃষ্টির শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি যে, কে তাহার সৃষ্টিকে হেরিয়া কুফরির ফতোয়া দিবে? এই খোদার উপর খোদাকারি আর যাহারা করে করুক, আমরা করিব না।

পৃথিবীর অন্যান্য মুসলমান প্রধান দেশের কথা নাহয় ছাড়িয়াই দিলাম, এই ভারতেই সকল প্রদেশের আজও যাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ গুণী-কি কণ্ঠসঙ্গীতে, কি যন্ত্রসঙ্গীতে-তাঁহাদের প্রায় সকলেই মুসলমান। অথচ সে দেশের মৌলভ-মৌলানা সাহেবান আমাদের দেশের মৌলভী সাহেবানের অপেক্ষাও জবরদস্ত। তাঁহাদের ঐসব গুণীদের অপমান বা সমাজচ্যুত করিয়াছেন বলিয়া জানি না। বরং তাঁহাদের যথেষ্ট সম্মান করেন বলিয়াই জানি। সঙ্গীত-শিল্পের বিরুদ্ধে মোল্লাদের-সৃষ্ট এই লোকমতকে বদলাইতে তরুণদের চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে, যাহা সুন্দর তাহাতে পাপ নাই। সকল বিধি-নিষিধের উপরে মানুষের প্রাণের ধর্ম বড়।

আজ বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে একজনও চিত্র-শিল্পী নাই, ভাস্কর নাই, সঙ্গীতজ্ঞ নাই, বৈজ্ঞানিক নাই, ইহা অপেক্ষা লজ্জার আর কি আছে? এইসবে যাহারা জন্মগত প্রেরণা লইয়া আসিয়াছিল, আমাদের গোঁড়া সমাজ তাহাদের টুটি টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে ও ফেলিতেছে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের সমস্ত শক্তি লইয়া বুঝিতে হইবে। নতুবা আর্টে বাঙালি মুসলমানদের দান বলিয়া কোনো কিছু থাকিবে না। পশুর মতো সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া বাঁচিয়া আমাদের লাভ কি, যদি আমাদের গৌরব কিছুই না থাকে। ভিতরের দিকে আমরা যত মরিতেছি, বাহিরের দিকে তত সংখ্যায় বাড়িয়ে চলিতেছি। এক মাঠ আগাছা অপেক্ষা একটা মহীরুহ অনেক বড়-শ্রেষ্ঠ।

শেষকথা

আমার অভিভাষণ হয়তো অতিভাষণ হইতে চলিল। আমার শেষ কথা-আমরা যৌবনের পূজারী, নব নব সম্ভাবনার অগ্রদূত, নব-নবীনের নিশান-বর্দার। আমরা বিশ্বের সর্বাগ্রে চলমান জাতির সহিত পা মিলাইয়া চলিব। ইহার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবে যে, বিরোধ আমাদের শুধু তাহার সাথেই। ঝঞ্ঝার নূপুর পরিয়া নৃত্যায়মান তুফানের মতো আমরা বহিয়া যাইব। যাহা থাকিবার তাহা থাকিবে, যাহা ভাঙিবার তাহা আমাদের চরণাঘাতে ভাঙিয়া পড়িবে। দুর্যোগ-রাতের নিরন্ধ্র অন্ধকার ভেদ করিয়া বিচ্ছুরিত হউক আমাদের প্রাণ-প্রদীপ্ত। সকল বাধা-নিষেধের শিখর-দেশে স্থাপিত হউক আমাদের উদ্ধত বিজয়-পতাকা। প্রাণের প্রাচুর্যে আমরা যেন সকল সঙ্কীর্ণতাকে পায়ে দলিয়া চলিয়া যাইতে পারি।

www.nagorikpathagar.org

আমরা চাই সিদ্দিকের সাচ্চাই, উমরের শৌর্য ও মহানুভবতা, আলির জুলফিকার, হাসান-হোসেনের ত্যাগ ও সহনশীলতা। আমরা চাই খালেদ-মুসা-তারেকের তরবারি,বেলালের প্রেম। এইসব গুণ যদি অর্জন করিতে পারি তবে জগতে যাহারা আজ অপারাজেয় তাহাদের সহিত আমাদের নামও সসম্মানে উচ্চারিত হইবে।

(সূত্রঃ নবারুন, মাসিপত্রিকা, ২০০৭)

নজরুলের অসাধারণ একটি বাণী-

একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আমার কোন প্রভূ নাই। তাঁর আদেশ পালন করাই একমাত্র মানব ধর্ম। আল্লাহ্ আমার প্রভু, রাসুলের আমি উম্মত আলকরান আমার পথ প্রদর্শক এই পৃথিবীর বাজরাজশ্বর একমাত্র আল্লাহ্ যারা এই পৃথিবীতে নিজেদের রাজত্বের দাবী করে, তারা শয়তান। সেই শয়তানকে সংহার করে আমরা পৃথিবীতে আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করব।

"আসিতেছে শুভদিন,

দিনে দিনে বুহ্ বাড়িয়াছে দেনা

শুধিতে হইবে ঋন।"-নজরুল

(সূত্রঃ কবি ও সাহিত্যিক, বির্বতন প্রকাশন, আজিমপুর-ঢাকা)

www.nagorikpathagar.org

আয়াতুল্লা খোমেনী (১৯০০-১৯৮৯)

ইমামদের সম্মেলনে আগত বিদেশী মেহমানদের উদ্দেশে ভাষণ (মে২৩, ১৯৮৪)

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে

সম্মানিত ভদ্র মহোদয়গণ। আপনারা যারা দূর দূরান্ত থেকে এক মহান লক্ষ্যে আপনাদেরই স্বদেশে এসেছেন তাদেরকে আমি আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আপনারা এমন এক দেশে এসেছেন যে দেশ ক্রামাগতভাবে নিপীড়নের সম্মুখীন হয়েছে, কঠোর কষ্ট ভোগ করেছে এবং ইসলামী লক্ষ্য অর্জন করার জন্য শাহাদতকে স্বাগত জানিয়েছে। আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করছি যেন তিনি আপনাদেরকে ইসলামী আদর্শ রূপায়নে সফলতা দান করেন।

এ সমাবেশে বিভিন্ন দেশ থেকে জুম্মা ও জামাতের সম্মানিত ইমামগণ যোগদান করেছেন। মুসলিম বিশ্বের উপর আপতিত দুঃখ দুর্দমা ও সেগুলোর সমাধান নিয়ে এ সমাবেশে বিস্তারিত ও খোলাখুলি আলোচনা হয়েছে। এ বিষয়ে বেশী উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমি শুধু আপনাদেরকে একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আর তা হচ্ছে মহানবী (দঃ) ও মহান ইমামগণের (রাঃ) আচরণ সম্পর্কে। মহানবী (দঃ) যখন একা ছিলেন দু-একজন ছাড়া আর কেউ সাথী ছিলেন না, তখনও তিনি ঐক্য বিধানের দিকে লোকদেরকে আহবান জানাতে থাকেন। বিপুল সংখ্যক অনুসারী বা সাথী সংগ্রহ না হওয়া পর্যন্ত তিনি লোকদেরকে দাওয়াতের জন্যে অপেক্ষা করেন নাই। বরং তিনি লোকদেরকে দাওয়াতের জন্যে অপেক্ষা করেন নাই। বরং তিনি শুরু থেকেই মানুষকে ইসলাম ও সত্য পথের দিকে আহবান জানাতে থাকেন। এমন কি তিনি যখন মদীনায় হিজরত করলেন এবং সরকার গঠন করলেন তখনও তিনি পর্যাপ্ত শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে অপেক্ষা করেননি। সেখানে তিনি আরো ব্যাপকভাবে তাঁর দাওয়াত অব্যাহত রাখলেন এবং মানুষকে তাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার দিকে আহবান জানাতে থাকলেন। মক্কা ও মদীনা উভয় জীবনেই পবিত্র কুরআনের আহবান শকুর আল্লাহর সঙ্গে বান্দার ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয়েই ছিলো না। এটি স্পর্শ করেই বলা যায় যে, ঐশী দাওয়াতের যে অংশ যা ব্যক্তিগত কর্তব্য, ইবাদত বন্দেগী, আল্লাহর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয়, সেসবও সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য মুক্ত ছিলো না।

মহানবী (দঃ) পর আমরা লক্ষ্য করি মুসলমানদের ইমামগণ উমাইয়্যা ও আব্বাসীয় রাজত্বের প্রচণ্ড চাপ সত্ত্বেও অবিরতভাবে জনগণের কাছে তাদের মতামত পৌঁছাতে থাকেন এমন কি তারা তাদের ইবাদত ও প্রার্থনার মাধ্যমেও দাওয়াতের কাজ

www.nagorikpathagar.org

করে যান। যদি আপনারা ইমাম সাজ্জাদ (শীয়াদের চতুর্থ ইমাম) ও অন্যান্য ইমামগণের দোয়াগুলো অধ্যয়ন করেন তাহলে দেখবেন যে, সাধারণভাবে যা মনে করা হয় সেগুলোর চেয়েও উচ্চতর এক উদ্দেশ্য জণগণকে শিক্ষিত করা তাদের লক্ষ্য ও চেষ্টা ছিলো। তওহীদের আহবান আত্মার উন্নতি সাধনা, নির্জন ইবাদত বন্দেগীর অর্থ কখনও এই নয় যে মানুষ ঘরের কোনে বসে থাকবে এবং মুসলমানদের সমস্যাবলী উপেক্ষা করে শুধু প্রার্থনা ও আল্লাহকে ডাকাতেই ব্যস্ত থাকবে। মাহানবী (দঃ) তার ব্যক্তিগত কর্তব্য পালনের পাশাপাশি সরকার গঠন করেছেন, দুনিয়ার মানুষকে দ্বীন ও ঐক্যের পথে আহবান জানানোর জন্য দূত প্রেরণ করেচেন। মহানবী (দঃ) সালাতে তেলাওয়াত অব্যাহত রেখেছেন আত্মিক উন্নয়নের জন্যে, কিন্তু সেগুলো শুধু তাঁর নিজের জন্য নয়, সাথে সাথে জনগণের উন্নতির জন্যও। তিনি জনগণের মধ্যে প্রতিরোধ শক্তি সৃষ্টি করেছেন। মহানবী (দঃ) ও ইমামগণের (রঃ) দোয়া ও প্রার্থনা- যা ছিলো মানুষকে আধ্যাত্মিকতার প্রতি আহ্বান, সেগুলোরও উদ্দেশ্য ছিলো মুসলমানদের সমস্যা সমাধান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এসব কিছুতেই আজ বিচ্ছুতি ঘটেছে। সম্ভবতঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে আব্বাসীয়রাই ইসলামী বিষয়াবলী ইস্যুগুলোর বিচ্যুতির জন্য দায়ী।

মহাগ্রন্থ আল কুরআন বা মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে সকল প্রকার বিচ্যুতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে তার দিকে গভীরভাবে মনোনিবেশ করলে একথা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে জনগণকে শুধু ঘরের মদ্যে আবদ্ধ থেকে জেকর আজকার ও ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকার আহ্বান জানানো তার উদ্দেশ্য নয়। বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে ইবাদতের কাজ হিসেবে জামাতের (সংঘবদ্ধতার), রাজনীতি ও সরকার পরিচালনার দিকে আহ্বান জানানো।

ইবাদতকে কখনই রাজনৈতিক বিষয়াবলী থেকে পৃথক করা হয়নি এবং সমস্ত কাজ যা ইসলাম নির্দেশ করেছে সেগুলোর মধ্যে ইবাদতের দিক রয়েছে। এমনকি কলকারখানায়, ক্ষেতে খামারে কাজ করা, শিক্ষকতা ও জনগণকে শিক্ষাদান ইত্যাদি কাজেও ইবাদত হয়। তারা (শত্রুরা) কখনও কুরআন নির্দেশিত ইসরামকে প্রতিষ্ঠিত করেনি, তারা তা করেনি কারণ এতে তাদের স্বার্থ বিনষ্ট হওয়ার আশংকা ছিলো। শুরু থেকেই তারা কুরআন ঐসব আয়াত যা তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে বলে মনে করতো সেগুলোর অর্থ বিকৃত ও ভুল ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়াস পেয়েছে, কেননা মূল আয়াত সমূহকে কোরআন থেকে সরানো সম্ভব ছিলো না। যে সমস্ত আলেম তাদের দরবারের সঙ্গে সংশ্লিষণ্ট ছিলে তাদেরকে কুরআনকে ভুল ব্যাখ্যা ও বিকৃত করার জন্য বাধ্য করা হতো। আল্লাহর শুকরিয়া আল কুরআন অবিকৃত অবস্থায় থেকে গেলো, কেউই তা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতে পারলো না। যদি তারা পারতো তবে তারা তা করতো। তাদের কেউ কুরআন থেকে একটা শব্দ পরিবর্তন করতে চেয়েছিল কিন্তু একজন আরব তরবারী বের করে বললেন যে, এর মাধ্যমে তিনি তার জবাব দেবেন। তারা কেন্তু পবিত্র কুরআনকে বিকৃত হতে দেয়নি। এতএব বর্তমানে যে কুরআন আছে তা ঠিক

www.nagorikpathagar.org

সেই কুরআন যা মহানবী (দঃ) উপর নাজির হয়েছিল - এর মাধ্যমে সামান্যতমও নতুন কিছু নেই। এতএব আমরা এমন একটি গ্রন্থ লাভ করতে পেরেছি যা সমস্ত ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সরকারী স্বার্থ ও কল্যাণকে বেষ্টন করে আছে, এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন নির্ভরযোগ্য তফসীরকারগণ। আমরা নিজ ইচ্চামত তার ব্যাখ্যা করতে পারিনে। সে অনুসারে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে পবিত্র কুরআনকে সর্বাধিক ব্যাপক ও উত্তমভবে পেশ করা। কুরআনকে ঐশী সূত্র থেকে প্রাপ্ত গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যে এদিক দিয়ে আমরা সমৃদ্ধ। কিন্তু প্রাথমিক যুগ থেকেই ক্ষমতাসীনরা বিকৃতি ছড়িয়েছে, এবং বর্তমান যুগেও শাসকরা কুরআনের নির্দেশের বিপরীতে অনৈক্য ও বিরোধ ছড়াচ্ছে।

মহান কুরআন বাণীঃ "তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না ...." কিন্তু তারা (শত্রুরা) অনৈক্য ও বিরোধের কথা বলে। আমরা আশা করি না যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এছাড়া অন্য কিছু চায়। তারা চায় মহান কুরআন ও ইসলামকে ধবংস করতে। কারণ ইরান মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করছে আর অন্যদিকে তারা তাদের প্রচার মাধ্যম ও প্রচারক দলের মাধ্যমে ইসলামকে দুর্বল করার জন্যে আক্রমণ চালিয়ে ও ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে আসছে। যদি ইরান আমেরিকা বা রাশিয়ার দিকে এক প্রদক্ষেপও এগুতো তারা ইরানের প্রশংসায় নিয়োজিত হত। কিন্তু যেহেতু ইরান তাদের বিরোধিতা করছে তাই কার্যতঃ সমস্ত প্রচারতন্ত্র ইরানের বিরুদ্ধে আক্রমন চালাচ্ছে ও প্রচার করছে যে ইরানে ইসলাম বিপন্ন।

সম্মানিত ভদ্র মহোদয়গণ! যারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন তারা সাবই আলেম। আপনাদেরকে মহানবী (দঃ) ও ইমামগহণের ঐতিহ্য যা তারা আমাদের জন্য রেকে গেছেন তা অনুসরণ করে চলতে হবে। এমন কি ঐসব সময়েও তারা তাদের হাত বাঁধা ছিলো, তদানীন্তন সরকারী নীতির বিরুদ্দে একটি কথা বলতে পারছিলেন না, তখনও তারা মানুষকে সালাতে ইবাদত বন্দেগীতে আব্বান জানিয়েছেন। তারা সালাত আদায় করেছেন। দোয়ার মাধ্যমে তারা জনগণকে আহ্বান জানিয়েছেন এবং যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনই জনগণকে ভালো কাজের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। আমরা অবশ্যই তাদেরকে অনুসরণ করে চলবো এবং অনুসরণ এবং অনুসরণ করবো পবিত্র কুরআনকে যা আপনাদেরকে ঐক্যের দিকে আহ্বান জানায় এবং বিরোধ ও অনৈক্য থেকে বিরত থাকতে ও নিষ্ক্রীয় না হতে আহ্বান জানায়।

দুর্ভাগ্যবশতঃ তথাকথিত ইসলামী সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতক উলামা নিষ্ক্রীয়তা সৃষ্টি করছে। যারা ইসলামের কেন্দ্রে বসে ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে পারছে না, তাই তারা ইরানের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাচ্ছে,ত কারণ ইরান ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। হিজাজ, মিসর অন্যান্য অঞ্চলের বিচারকগণ মহান কুরআনের বিরুদ্ধে কাজ করছে এবং মুসলমানদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে

www.nagorikpathagar.org

চাচ্ছে। তারা হচ্ছে বিশ্বাসঘাতক, আপনারা তাদের বিরোধিকতা করুন ও মুকাবেলায় রুখে দাঁড়গান।

যখন আপনারা দেশে ফিরে যাবেন তখন আপনাদের জুম্মার নামাজের ভাষণে রাজনৈতিক বিষয় অবশ্যই থাকা উচিত যা ছিলো ইসলামে প্রাথমিক যুগের বৈশিষ্ট্য। শুক্রবারের জুম্মা একটি রাজনৈতিক সমাবেশ এবং বস্তুতঃ ইবাদতের রাজনৈতিক কার্যক্রম। দুঃখজনভাবে কোথাও কোথাও শুক্রবার জুম্মা নামাজে জাতির প্রয়োজনের কোন স্থান নেই। (সেগুলো মুসলমানের প্রয়োজন ও সমস্যা থেকে দুরে)। প্রাথমিক যুগে জুম্মা নামাজ, মসজিদ, জামাত ও নামাজ সবকিছুরই সঙ্গে রাজনৈতিক দিক যুক্ত ছিলো। মুসলিম সেনাবাহিনী মসজিদেই সম্মিলিত করা হ'তো। এবং যুদ্ধে পাঠানো হতো। কেননা, মসজিদ ছিলো তখন রাজনৈতিক কর্মকণ্ডের কেন্দ্র, কিন্তু দুঃখজনক ভাবে আমরা মসজিদগুলোকে মুসলমানদের সমস্যাবলী আলোচনা থেকে মুক্ত রেখেছি এবং আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার ক্ষেত্র আমরাই তৈরী করেছি আর আজ তার বিষময় ফলও দেখতে পাচ্ছি। মুসলমানদেরকে অবশ্যই জেগে উঠতে হবে এবং যে সরকার ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করছে তাদেরকে প্রতিরোধ করতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে তাদের খুতবার ও দোয়ার মাধ্যমে জালেম, অত্যাচারী ও ইসলামের শত্রুদের বিরেুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। আপনাদের খুতবা শুধু কতিপয় দোয়া প্রার্থনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবেন না বরং তার বিষয় বস্তুকে সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধ করুন। আপনারা যথেষ্ট শক্তিশালী, জনগণের সমর্থন আপনাদের পিছেনে রয়েচে। জনগণ অত্যাচারী সরকারকে নয় বরং আলেমদের সমর্থন করে। ইরানী আলেমগণ যেভাবে এখানে যে শক্তি অধিকারী আপনারা আপনাদের দেশে সেই শক্তির অধিকারী। ইরানী আলেমগণ এ অঞ্চলের অপ্রতিদ্বন্দী একটি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। ইরানের সাধারণ মানুষ, কৃষক শ্রমিক উলামা কর্তৃক ইসলামের সত্যিকার শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ ও জাগরিত হয়ে এ শক্তিকে আক্রমণ করেছে। ধ্বংস করেছে, উৎখাত করেছে। আপনারাও তা করতে পারেন। আপনাদের সরকারই আপনাদের জন্য কাজ করে দেবে এর জন্য অপেক্ষা করবেন না। তারা তাদের জন্য কাজ করছে। আনারা নিজ নিজ দেশে ইসলামে শক্তিশালী করুন এবং জুম্মার সালাতে ইসলামী বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা করুন, যা মূলতঃ এ উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হয়। সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করুন; ব্যক্তিগত দিক পরিহার করুন।

যদি আপনারা এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করেন তাহলে জনগণ প্রতিক্রিয়া দেখাবে। যদি সরকার আপনার জুম্মার নামাজ আপনার খুতবার জন্যই নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তাহলে জনগণের প্রতিক্রিয়াকে অবশ্য সরকারের মুকাবেলা করতে হবে যা আমরা চাই। সেনাবাহিনী বা অস্ত্র জোগাড়ের জন্য অপেক্ষা করবেন না, কেননা আমরা যুদ্ধ করতে চাইনে বরং আপনাদেরকে মুসলমানদের স্বার্থের কথা বলতে হবে। শক্তি সঞ্চয় প্রথমে করবেন, তারপর কথা বলবেন এটা নয় বরং আলোচনা ও কথা অব্যাহত রাখুন তাহলে শক্তি সঞ্চয় হবে - ইরানে তাই ঘটেছে। তারা (ইরানীরা) ক্ষমতার্জন বা শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে অপেক্ষা করে নাই। যদি এমনি করে অপেক্ষা করতে থাকতো তাহলে কোন দিনই কোন কিছুই সংঘটিত হতো না।

www.nagorikpathagar.org

মুহাম্মদ রেজার (শাহ) শক্তি ও ক্ষমতার মুকাবেলা করতে গিয়ে ইরানী আলেমগণ অভ্যুত্থানের পূর্বে ব্যাপক বিরোধিতার জন্য অপেক্ষা করেননি। বরং তারা প্রতিটি সুযোগেই নিভিকভাবে জনগণকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। মসজিদ থেকে তারা লোকদের আহ্বান জানিয়েছেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চয় করেচেন। আপনাদেরকেও সেই একই পথ অনুসরণ করতে হবে। আপনারা তা পারেন। যদি মনে করেন যে তা করতে আপনারা সমর্থ নন, তাহলে কোনদিনই হয়তো সক্ষম হবেন না। আপনাদের মধ্যে আত্ম বিশ্বাস সৃষ্টি করুন যে তা পারবেন এবং তাহলে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবেন। যাবতীয় কাজ প্রথমে চিন্ত ার মধ্যে উদগম হয়, তকাজের পূর্বে প্রত্যেকটি দিক বিবেচনা করুন, যাচাই করুন। যদি আপনারা ভেতর থেকেই দুর্বল থাকেন তাহলে আপনারা কিছুই করতে পারবেন না। আপনাদের হৃদয় ও মনকে শক্তিশারী করুন। আল্লাহকে ভুলবেন না; তাঁর উপর নির্ভর করুন, কেননা সমস্ত শক্তির উৎসের নিকট আপনারা প্রার্থনা জানাচ্ছেন, আল্লাহ ছাড়া কোন শক্তির নিকট সাহায্য চাইবেন না। তাহলে আপনাদের মধ্যে শক্তির সঞ্চার হবে যে আল্লাহর মহান ক্ষমতা আপনাদের পিছনে রয়েছে। আল্লাহর উপর বিশ্বাস আছে এমন ব্যক্তির কোন শক্তিকে ভয় করা উচিত নয়। আপনারা কিসের ভয় করছেন? আপনারা কি শাহাদাতের ভয় ভীত। আপনারা কি কারাবরণ ও অত্যাচারকে ভয় করেন? আল্লাহর পথে অত্যাচারকে ভয় করা কি কারো উচিত?

ইরানী জাতি আল্লাহর পথে প্রভূত কষ্ট স্বীকার করছে কিন্তু কখনও তারা নিরুৎসাহিত হয়নি। আলেমগণ তাদেরকে সংগঠিত করেছে ও রিবর্তন করেছে। আজ প্রত্যেক ব্যক্তি একজন সদ্য কথা শিখা শিশু থেকে শুরু করে একজন বৃদ্ধ যিনি তার অনেক প্রিয়জনকে হারিয়েছেন আজ সবাই জেগে উঠেছে এবং পরাশক্তির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছে। একথা বলবেন না যে 'পারবেন না'। মনে করবেন না 'আপনারা পারবেন না'। সবসময়ই ইতিবাচকভাবে চিন্তা করবেন। মনে রাখবেন আল্লাহ আপনাদের সঙ্গে রয়েছেন। মনে রাখবেন ইসলাম আপনাদের সম্মানের প্রতীক, একে অবশ্যই শক্তিশালী করতে হবে। যদি আপনারা দুর্বলতা দেখান তাহলে বৃহৎশক্তিগুলো ইসলামকে সমূলে উৎখাত করবে। ইরান থেকে তারা বুঝতে পেরেছে যে যদি ইসলামের আবির্ভাব কোন এলাকায় ঘটে তাহলে তাদের সেখানে পা রাখার জায়গা থাকবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কতক আলেম ও সরকার এ বিষয়টা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে। তারা ইসলাম ও ইরানকে শক্তিশালী বিপদের কারণ মনে করে। তাঁ ইরান অবশ্য আমেরিকা, রাশিয়ার জন্য বিপদের কারণ, মুসলমানদের জন্যে নয়। ইরান বরং মুসলমানদের জন্য একটি রহমত।

আপনাদের নিকট প্রচার করা হয়েছে যে ইরানে কোন নিরাপত্তা নেই, রাস্তায় লোকজন হত্যা করা হচ্ছে এমনকি শিশুদেরকেও বাদ দেয়া হচ্ছে না; গর্ভবতী মহিলাদেরকেও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হচ্ছে, আরো কত কি? এখন আপনারা ইরানে এসেছেন, ইরানের কারাগারগুলো দেখেছেন, সম্ভবতঃ রাণাঙ্গনগুলোতে আপনারা গিয়েছেন,

www.nagorikpathagar.org

আপনারা মসজিদগুলোতে যেখানে অধিকতর নামাজ ও দোয়া আদায় করা হয় সেগুলো বর্তমান অবস্থাও আপনারা দেখেছেণ।

ইরানে মতো জেগে উঠার জন্যে লোকদের আহ্বান জানান। ইরানের পরিচিতি তুলে ধরুন। তারা প্রচার করছে করাগারগুলোতে মধ্যযুগীয় অত্যাচার করা হচ্ছে। অবশ্যই আমেরিকা এসব কিছুর প্রচারক এবং আমেরিকাই সারা দুনিয়ার উপর পাশবিক অত্যাচার চালাচ্ছে। তাদের সে অত্যাচার ও যন্ত্রণা মধ্যযুগীয় অত্যাচার ও যন্ত্রনার চেয়ে অধিকতর জঘন্য। সোভিয়েত ইউনিয়নও এ ধরনের অভিযোগ তুলেছে ও প্রচার করচে। তারা ইসলামকে মধ্যযুগীয় একটা কিছু মনে করে। মুসলামানদেরকে জেগে উঠতে হবে। মুসলমানদের উপরই দায়িত্ব ইসলামকে সংরক্ষণ করা। অন্য কেউ ইসলামকে সংরক্ষণ করবে এ আশায় অপেক্ষা করা উচিত নয়। কেউই করবে না যদি মুসলামনঘণ দায়িত্ব পালনে ব্যার্থ হয়। পরাশক্তি ও তাদের এজেন্টরা ইসলামের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। যখন মিসরীয় সরকার ইরানের বিরুদ্ধে আরবদের ঐক্যবদ্ধ হতে বলে তাখন তার অর্থ কি দাঁড়ায়? ইরান কি তাদের বা ইসলামের জন্যে বিপজ্জনক? প্রকৃতপক্ষে আরবদের ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বান মূলতঃ ইসলামের বিরোধিতায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান। ইসলামকেই তারা তাদের স্বার্থের পথে বাধা মনে করে।

জুম্মার ইমাম ও ইসলামের আলেমদের বুঝতে হবে সারা দুনিয়া ইরানের বিরুদ্ধে নয়, ইসলামের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। সতর্ক হোন। বর্তমানে আমাদের দায়িত্ব কয়েকজগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি আপনারা সতর্ক ন হ'ন তাহলে তারা (শত্রুরা) ইসলামকে উৎখাত করার জন্য সুযোগ খুঁজবে। গতকাল যা পরিস্থিতি ছিল আজ তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজ তারা বুঝতে পারছে যে ইরানের মতো একটি ক্ষুদ্র স্থানে থেকে যদি ইসলামের আওয়াজ ধ্বনিত হয় তাহলে সে আজ এমনকি আমেরিকাতেও প্রতিধ্বনিত হবে। নিশ্চিতভাবে এটা তারা সুস্পস্টভাবে বুঝতে পেরেছে।

তাদের সমস্ত স্বার্থ বিনষ্ট হয়েছে এবং তারা চায় পারস্য উপমহাসাগরের উপর আধিপত্য রাখতে যাতে তারা এ অঞ্চলের তেল সম্পদ লুণ্ঠন করতে পারে। কিন্তু ইসলামের শক্তি তা করতে দিচ্ছে না। আমেরিকা ও রাশিয়া সারা দুনিয়ার উপর তাদের আধিপত্য চাপিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ্ই ভালো জানেন যে পৃথিবীর কি অবস্থা হবে যদি তারা পরস্পর বিরোধী হিসেবে একে অন্যের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ায়। তারা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে মানবাধিকার, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের কথা বলে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আপনারা জানেন এবং তারাও জানে যে তারা মিথ্যা বলছে। এগুলো তারা পারস্পরিক প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে প্রচারণা হিসেবে বলছে। তারা জনগণের স্বার্থের কথা নয় বরং নিজেদের স্বার্থের জন্যেই সব করছে। একমাত্র ইসলামই জাতিসমূহের স্বার্থের বিষয় উদ্বিগ্ন। ইসলাম বর্ণবাদী পার্থক্যকে মুছে দিয়েছে, কেননা ইসলাম মনে করে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী ও বর্ণের মধ্যে পাথৃক্য নেই। ইসলাম বলে যে মানুষে মানুষে পার্থক্য করার একটি মাত্র মানদণ্ড রয়েছে আর তা হচ্ছে ন্যায়পরতা, বর্ণ, গোত্র, বংশ দেশ বা অন্য কিছু নয়। তারা (শত্রুতা) বর্ণবাদী ও প্রাধান্য অর্জন ও শোষণের জালে অন্য গোষ্ঠীকে আবদ্ধ করতে চায়। ইসলাম তার বিরোধিতা করে। তারা চায় ইসলামের ও মুসলমানদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রন করে তাদের নিজদের স্বার্থের অনুকূলে পরিচালনা করতে। আমরা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করছি যে ইরান ও ইসলাম আমেরিকা ও রাশিয়ার স্বার্থের ঘোর

www.nagorikpathagar.org

বিরোধী। আমরা আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করবো এবং তাদের নীতিমালা কখনও গ্রহণ করবো না। আমরা আশা করি স্বাধীনতা ও মুক্তির আলো একদিন সারা দুনিয়া মজলুম জনতাকে আলোড়িত করবে এবং পরিণামে জালেমদের হাত থেকে তারা মুক্তিলাভ করবে। এবং আলেমদের উপর জরুরী যে তারা মানুষের মুক্তি লাভে সাহায্য করবে।

আমি দোয়া করছি, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মুসলমানদের ও অমুসলিম নিগৃহীতদের সমৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য দান করেন। আমরা প্রার্থনা জানাই যেন তিনি জালেমদের নিগড় থেকে তাদেরকে মুক্তি দেন। আমি মনে করি তিনি আপনাদের সাথে রয়েছেন। ইসলামের আলেমগণ! ইসলামের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখুন, তাকে ছাড়া কাউকে ভয় করবেন না। আল্লাহ্ ছাড়া কোন শক্তির প্রয়োজন নেই। সমস্ত শক্তি ক্ষমতা আল্লাহর, সবকিছু তার পক্ষ থেকে, তাঁর শক্তির সামনে আমরা কিছুই নই। আপনাদের সবার প্রতি শান্তি ও কল্যাণ ও আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হোক।

হে আল্লাহ! ভ্রাতৃত্ব রক্ষা সম্বন্ধে তোমার যাবতীয় নির্দেশ ও মুসলমান ভাইদের সম্বন্ধে তোমার উপদেশ আমরা পালন করেছি। আমরা তাদেরকে শান্তি ও এখলাসের দিকে আহবান জানিয়েছি এবং বিভক্তি ও বিরোধ সম্বন্ধে তাদেরকে সতর্ক করেছি।

তুমি তাদেরকে উদাসীনতার নিদ্রা থেকে জাগিয়ে দাও। তারা জাহান্নামের গর্তের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে এবং ইসলামের ভাগ্য আল্লাহর দুশমনদের হাতে সোপর্দ করে দিয়েছে। তারা আজ তাদের কার্যকলাপের অশুভ পরিণতি সম্বন্ধে অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান ও ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা থেকে রক্ষা করে পদমর্যাদা ও দুনিয়ার ভাগ সম্পদের বন্ধ কামনা থেকে আমাদেরকে ফিরিয়ে রাখ। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে ডান ও বাম শক্তির প্রীতি থেকে বাঁচাও এবং তাদের মধ্যে ইসলামী ও মানবিক দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টি করে দাও। মুসলিম জাতি ও সরকার সমূহকে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের পথে পরিচালিত কর, তোমার সমস্ত করুনা ইরানী হজ্জযাত্রীদের উপর বর্ষণ কর; তারা তোমার মহান লক্ষ্য অর্জনের পথে অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা দুঃখ-কষ্ট যন্ত্রণা, তিরস্কার, বন্দীদশা সহ্য করেছে। মুসলিম দেশসমূহ থেকে লুণ্ঠনকারীদের হাত কেটে দাও। আমাদেরকে তোমার সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত কর। ইসলামী শক্তিসমূহকে তাদের দেশ ও নিপড়িত জনতার প্রতিরক্ষায় বিজয় দান কর এবং দখলদার ইসরাঈল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে দাবিয়ে দাও। ইসলাম ও মুসলমানদেরকে শক্তি দাও এবং বিদেশী আক্রমণকারী ও সীমা লংঘনকারীদের যন্ত্রণা থেকে তাদেরকে নিরাপদ রাখ।

তুমিই আমাদের বিজয় ও রহমতের প্রভু।

- ইমাম খোমেনী।

(সংগ্রহ-বই ১৯৮৫ ইসলামী ঐক্য, ইসলামী প্রজাতন্ত্র
ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা)

We call your to Islam, the rules of Islam, the teaching of Islam, the guidience of Islam if this meens potitics to you then this is our pulitics.

Hasanuil Banna

We canot expect the rest of mankind to embrace Islam without any effort on our part

Abul Ala Moududi

www.nagorikpathagar.org

নাজিব মাহ্‌ফুজ (১৯১১-২০০৬)

আমি সন্তান দুই সভ্যতার

আরবী সাহিত্যে একমাত্র নোবেল বিজয়ী

নাগিব্‌ মাহ্‌ফুজ নোবেল পুরস্কার পান ১৯৮৮ সালে। তাঁকে পুরস্কার প্রদানের সময় বলা হয়েছিলঃ ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ– এই দেখা গেল স্পষ্টতই বাস্তবতাঘন তো পরক্ষণেই অস্বচ্ছ–সাহিত্য কর্মে যিনি এক আরব্য কথনশিল্পের জন্মদাতা যা সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রযোজ্য।

ভদ্র ও ভদ্রমহোদয়বৃন্দ,

আমি শুরু করতে চাই সুইডিশ একাডেমি এবং নোবেল কামিটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে যারা আমার দীর্ঘ ও নিরবিচ্ছিন্ন প্রয়াসকে আমলে নিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে আপনাদের অনুরোধ করব আমার আজকের বক্তৃতাটি সহনশীলতার সঙ্গে গ্রহণ করবার জন্য। কারণ এমন এক ভাষা এর বাহন যা আপনাদের অনেকেরই অজানা। কিন্তু এই ভাষাই এই পুরস্কারের প্রকৃত বিজেতা। তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে, এ সুরছন্দ প্রথমবারের মত ভাসতে যাচ্ছে আপনাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মরুদ্যানে। আমার গভীর প্রত্যাশা এটিই যেন শেষবার না হয় যে আমার জাতির সাহিত্য লেখিয়েরা আপনাদের আন্তর্জাতিক লেখকদের সবচেয়ে প্রতিভাবান সেই অংশটির সঙ্গে বসছেন যাঁরা আমাদের তীব্র দুঃখ ভরা পৃথিবীতে আনন্দ আর প্রজ্ঞার সৌরভ ছড়িয়েছেন।

কায়রোতে এক বিদেশি সাংবাদিক আমাকে বলেছিলেন, যে মুহূর্তে আমার নামটি উচ্চারিত হয়েছিল এই পুরস্কারটির সঙ্গে, একটি নীরবতার পর্দা নেমে এসেছিল চারদিক, অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে, আমি আবার কে? তাহলে আমাকে অনুমতি দিন নিজেকে ততটুকু নৈর্ব্যক্তিকতার সঙ্গে উপস্তাপন করার যতটুকু মানবিক সামর্থ্যের মধ্যে সম্ভব। আমি হচ্ছি এমন দুই সভ্যতার ঔরসপুত্র যারা ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট যুগে এসে মিলিত হয়েছে সুখী দাম্পত্যে। এদের মধ্যে প্রথমটি সাত হাজার বছর পুরনো ফারাও সভ্যতা; দ্বিতীয়টি এক হাজার চারশ বছরের পুরনো, ইসলামিস ভ্যতা। বোধকরি এই দুইটির কোনটির সঙ্গেই আপনাদের মত অভিজাত ও শিক্ষিতজনদের নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু পারস্পরিক জানা-শোনা ও চিন্তার অংশীদারিত্বের প্রশ্নে বিরাজমান পরিস্থিতিতে সামান্য মনে করিয়ে নেওয়াতে ক্ষতির কিছু নেই।

www.nagorikpathagar.org

যেখানে ফারাও সভ্যতার প্রশ্নে আমি এই সাম্রাজ্যের দেশ জয় বা ইমারত নিয়ে কথা বলব না। এগুলো হচ্ছে বহু ব্যবহারে জীর্ণ গৌরবগাথা, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আধুনিক রুচিবোধ এতে অস্বস্তিবোধ করে। একই সেঙ্গ কিভাবে এই সভ্যতা মানুষের চৈতন্য বিকাশের ঊষালগ্নে প্রথমবারের মত ঈশ্বরের অস্তিতের দিকে ধাবিত হয়েছিল তা নিয়েও যিনি নবী রাজা আখেনতোনের কথা জানেন না। এমনকি আমি সাহিত্য ও শিল্প কলায় এই সভ্যতার অর্জন বা পিরামিড, স্ফিংস এবং কারনাকের মত বিখ্যাত ও অলৌকিক নির্মাণ শৈলী নিয়েও কথা বলতে আগ্রহী নই। কারণ যিনি স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ পাননি তিনিও এই স্থাপনাগুলো বিষয়ে পড়েছেন, ভেবেছেন এগুলোর আকার আকৃতি নিয়ে।

তাহলে আসুন খানিকটা গল্পের মত কিছু দিয়ে ফারাও সভ্যতাকে পরিচয় করিয়ে দিই, যেহেতু আমার ব্যক্তিগত পরিস্থিতি নির্ধারণ করে দিয়েছে যে আমি একজন বলিয়েই হব। এই হচ্ছে সেই নথিকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা: প্রাচীন প্যাপিরাস থেকে জানা যায় যে, ফারাও সম্যাট একদিন তার দরবারেরই কতিপয় সভাসদের সাথে নিজের হারেমের বিবিদের কয়েকজনের অবৈধ সম্পর্কেও কথা জানতে পারেন। যুগের নিয়ম অনুযায়ী এটাই স্বাভাবিক ছিল যে তিনি সাথে সাথে তাদের শেষ করে ফেলবেন। কিন্তু তা না কের তিনি নিজে হাজির হলেন সংশ্লিষ্ট আইন কর্তাদের কাছে এবং তাদের নির্দেশ দিলেন বিষয়টি তদন্ত করে দেখবার। তিনি তাদের বলেছিলেন যে তিনি সত্য ঘটনা জানতে চান যেন নিজের রায় তিনি ন্যায়বিচারের সঙ্গে দিতে পারেন।

আমার মতে এই ব্যাপারটি একটি সাম্রাজ্য স্থাপন বা পিরামিড নির্মাণের চেয়েও মহত্তর। যে কোন সমৃদ্ধি বা ঔজ্জ্বল্যেও চাইতেও এটি একটি সভ্যতার শ্রেষ্টত্ব আরো বেশি তুলে ধরে। সেই সভ্যতা আজ নেই, পিরামিডও হয়তো একদিন মিলিয়ে যাবে কিন্তু সত্য আর ন্যায়বিচার টিকে থাকবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন মানুষের একটি সদা চিন্তাশীল মন এবং জীবন্ত চৈতন্য থাকবে।

ইসলামিক সভ্যতার প্রশ্নে আমার প্রসঙ্গ এর স্বাধীনতা, সাম্য আর ক্ষমশীলতার জমিনে সৃষ্টিকর্তার অভিভাবকত্বে তাবৎ মানবজাতির ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদার আহ্বান নয়। এর নবীর শ্রেষ্ঠত্ব ও আমার প্রসঙ্গ নয়, কারণ আপনাদের চিন্তকদের মাঝেও এমন কেউ কেউ আছেন যারা তাকে ইতিহাসের শ্রেষ্ট মানব হিসেবে মানেন। ইসলামের দেশজয়ের কথাও আমি বলছি না, যার তৈরি হাজারো মিনার হতে ভারত চীন ভূখন্ড থেকে শুরু করে ফ্রান্সের সীমান্ত পর্যন্ত বিশাল ভূ-ভাগ জুড়ে প্রার্থনা, আত্মনিবেদন আর শুভেচ্ছাদের দিকে আহ্বান ধ্বনিত হয়ে চলেছে আজো। আমি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ইসলামের সহনশীল আর উদার আলিঙ্গনের মধ্যে দিয়ে অর্জিত

www.nagorikpathagar.org

ভ্রতুত্ববোধের কথাও বলছি না যার নজির মানবাজতির ইতিহাসে এর আগে বা পরে নেই।

তার বদলে আমি এই সভ্যতাটির পরিচয় দিতে চাই একটি প্রবহমান নাটকীয় পরিস্থিতিতে স্পষ্ট হয়ে উঠা এর সচরাচর অস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলোর একটির কথা বলে। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জিতে যাওয়া একটি যুদ্ধে এই সভ্যতা যুদ্ধবন্দীদের ফেরত দিয়েছিল প্রচীন গ্রিক জ্ঞান ঐতিহ্যেও কিছু দর্শন, চিকিৎসা আর গনিতবিষয়ক বইয়ের বিনিময়ে তাঁদের জ্ঞান পিাাসার মানবিক চেতনার উপস্থিতির এটি একটি বড় স্মারক যেখানে ঈশ্বরে বিশ্বাসী কোন জ্ঞান পিপাসু দাবি করছেন এমন এক জ্ঞানের যা একটি পৌওলিক সভ্যতার ফসল।

এটা ছিল আমার নিয়তি, ভদ্রমহোদয়বৃন্দ, আমাকে জন্মাতে হয়েছে এই দুটি সভ্যতার কোলে। তাদের স্তন্যপান করে, তাদের সাহিত্য আর শিল্প কলায় পুষ্ট হয়েছি আমি। তারও পরে পান করেছি আপনাদের সমৃদ্ধ ও মনোমুগ্ধকর সংস্কৃতির ঘন রস। এই সব কিছুরই অনুপ্রেরণায়-সেই সঙ্গে আমার নিজের দুশ্চিন্তায়-শব্দগুলো নিঃসৃত হয় আমার মাঝ থেকে। এই শ্বদমালার সৌভাগ্র হয়েছে আপনাদের স্বনামধন্য একাডেমির প্রশংসা অর্জনের যা আমার প্রয়াসকে ভূষিত করেছে মহান নোবেল পুরস্কারে। আমার নামের সঙ্গে ধন্য হোক সেই সব মহান তথাগত নির্মাতাদের নাম যাঁরা গড়েছিলেন এই দুই সভ্যতা।

ভদ্র ও ভদ্রমহোদয়বৃন্দ,

আপনারা ভেবে আশ্চার্য হতে পারেন, তৃতীয় বিশ্ব থেকে আসা এই মানুষটি কিভাবে মনে গল্প লেখার স্থির প্রশান্তি পেল? আপনারা পুরোপুরি সঠিক। আমি এমন এক বিশ্ব থেকে আসা যে বিশ্ব ঋণের বোঝা পিঠে মজুর খেটে চলেছে দীর্ঘদিন, যে ঋণ শোধ করতে গিয়ে অনাহার বা তার কাছাকাছি কোন কিছুর দিকে এগিয়ে চলেছে। এই বিশ্বের একাংশ মানুষ এশিয়াতে মারা যায় বন্যায় আর এক অংশ আফ্রিকাতে মারা যায় দুর্ভিক্ষে। মানবাধিকারের এই যুগেও শুধু দক্ষিণ আফ্রিকাতেই মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ প্রত্যাখ্যাত ও বঞ্চিত হয়েছে সবধরনের মানবাধিকার থেকে, যেন তাঁদের মানুষ হিসেবেই গন্য করা হয় না। পশ্চিম তীর ও গাজায় মানুষেরা নিজের অধিকার হারাচ্ছে, যদিও সত্য হচ্ছে এই যে, তাঁরা বাস করছে নিজেদের ভূমিতে তাঁদের পিতা পিতামহ, প্রপিতামহের ভূমিতে। তারা দাবি তুলেছে আদিম মানুষের প্রথম সংরক্ষিত অধিকারটি রক্ষার; প্রথমত, তাঁদের একটি যথাযথ ভূখণ্ড চাই যে টিকে থাকার তাঁদের নিজেদের বলে অন্যরা স্বীকৃতি দিবে। এই মহান ও সাহসী আন্দোলনের প্রতিফল তাঁদের দেওয়া হয়েছে আবলবৃদ্ধবণিতা নির্বিশেষে শরীরের হাড় ভেঙ্গে বুলেটে হত্যা করে। তাঁদের

www.nagorikpathagar.org

ঘরবাড়ি ধবংশ করে এবং কারাগার আর ক্যাম্পে অমানুষিক নির্যাতন করে। তাঁদের চারপাশের পনের কোটি আরব জনগোষ্ঠী ক্ষোভ আর হতাশা নিয়ে দেখছে এখানে কি ঘটছে। যারা ন্যায় আর বিস্তৃত শান্তির আকাঙ্খা রাখেন সেই সব মানুষের প্রজ্ঞা যদি একে রক্ষা করতে না পারে তবে এক ভয়াবহ বিপর্যয় অপেক্ষা করছে এই অঞ্চলের জন্য।

হ্যা, তাহলে কিভাবে তৃতীয় বিশ্ব থেকে আসা একজন মানুষ গল্প লিখবার মত মানসিক প্রশান্তি খুঁজে পেল? সৌভাগ্যক্রমে শিল্প উদার এবং সহমর্মী। সুখী মানুষকে যেমন সঙ্গ দেয় তেমনি শিল্প দুঃখী মানুষকে ও ছেড়ে যায় না। শিল্প বুকের ভেতরে যা কিছু স্ফুরিত হয় তা প্রকাশের সহজ উপায় করে দেয় সবাইকেই।

মানবতার আর্তনাদ বৃথাই হারিয়ে যাবে শূন্যে, সভ্যতার ইতিহাসের এই ক্রান্তি লগ্নে এটা একেবারেই অবান্তর এবং অগ্রহণযোগ্য? নিঃসন্দেহের মানবজাতির এক নতুন সময়ে এসে পৌঁছেছে আমাদের সময় পরাশক্তিগুলোর মাঝে সৌহার্দ্য আশা করে। মানব মন এখন সমস্ত ধবংশ আর হত্যা যজ্ঞের কারণ নিমূরের কর্তব্য বোধ করে। বিজ্ঞানীরর যেভাবে কারখানায় দূষণ থেকে পরিবেশ রক্ষার জন্য এগিয়ে আসেন তেমনি বুদ্ধিজীবিদেরও এগিয়ে আসতে হবে নৈতিক দূষণ থেকে মানবতাকে রক্ষার জন্য। এটা একই সঙ্গে আমাদের অধিকার এবং কর্তব্য আজকের সভ্যতার দেশগুলোর বড় বড় নেতৃবৃন্দ এবং অর্থনীতিবিদদের কাছে এমন বাস্তব পদক্ষেপের দাবি তোলা যা তাদের সময়ে পাদপ্রদীপে নিয়ে আসতে পারবে।

প্রাচীনকালে একজন নেতা কেবল নিজর জনগোষ্ঠীর মঙ্গলের জন্যই কাজ করতেন। তার বিবেচনায় অন্যরা ছিল সম্ভব্য শত্রু অথবা শোষণের ক্ষেত্র। শ্রেষ্ঠত্ব আর ব্যক্তিগত গৌরব ছাড়া আর কিছুই মূল্যবান বলে স্বীকৃত ছিল না। এই কারণে বলি হয়েছে বহু নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক অনেক কিছুকেই জায়েজ করা হয়েছে; হত্যা করা হয়েছে বহু প্রাণ, মিথ্যা, চাতুর্য, বিশ্বাসঘাতকতা এবং নিষ্ঠুরতা রাজত্ব করেছে যুগের প্রতীক এবং শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন হিসেবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী আজ বদলে ফেলতে হবে সমূলে। আজকের দিনে একজন সভ্য নেতার শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হওয়া উচিত তার দৃষ্টিভঙ্গীর বিশ্বজনীনতা এবং পুরো মানবজাতির প্রতি দায়িত্ববোধ। উন্নত বিশ্ব এবং তৃতীয় বিশ্ব এক পরিবারের মত। প্রতিটি ব্যক্তি মানুষেরই জ্ঞান, প্রজ্ঞা আর সভ্যতার প্রশ্নে যে মাত্রার অর্জন আছে সেই মাত্রাতেই তার দায়িত্বে রয়েছে এর প্রতি। কথাগুলো আমি নিজেকে তৃতীয় বিশ্বের অবস্থানে রেখে বললেও বোধকরি নিজের কর্তব্যের সীমা লজ্ঘন হয় না; আমাদের দুঃখ-দুর্দশার দর্শক বলে থাকবেন না আপনারা। এখানে আপনাদের দুঃখ-দুর্দশার দর্শক বনে থাকবেন না আপনারা। এখানে

www.nagorikpathagar.org

আপনাদের মর্যাদার সাথে মানানসই একটি মহান ভূমিকা পালন করার আছে। আপনাদের শ্রেষ্ঠত্বের অবস্থান থেকেই পৃথিবীর চারভাগের যে কোন ভাগেই প্রাণী বা উদ্ভিদেরও যে কোন ধরনের বিপন্নতার জন্য আপনারাই দায়ী হয়ে পড়েন, মানুষের কথা কিছু নাই বা বললাম। কথা আমরা অনেক বলেছি। এখন পদক্ষেপ নেওয়ার সময়। সময় হয়েছে লুটেরা আর সুদখোরদের যুগের ইতি টানার। আমরা এমন এক যুগে এসেছি যখন নেতাদের দায় দায়িত্ব রয়েছে পুরো ভূগোল জুড়েই। আফ্রিকার দক্ষিনে দাসত্বের নিগড়ে বাঁধা মানুষদের রক্ষা করুন। আফ্রিকার বুভুক্ষু মানুষগুলোকে বাঁচান। প্যালেস্টাইনিদের গুলি আর নির্যাতনের হাত থেকে। অনড় অর্থনৈতিক আইনের নাগপাশ থেকে রক্ষা করুন ঋণগ্রস্তদের। এই বাস্তবতার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন যে মানবজাতির প্রতি তাদের দায়িত্বশীলতার প্রশ্নটি সেকেলে হয়ে যাওয়া একটি বিজ্ঞানের নিয়ম কানুনের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতার প্রশ্নেরও আগে আসে।

আমি আপনাদরে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, ভদ্রে ও ভদ্রমহোদয়বৃন্দু, আমার মনে হচ্ছে আমি হয়তো কোনভাবে আপনাদের প্রশান্তির বিঘ্ন ঘটিয়েছি। কিন্তু তৃতীয় বিশ্ব হতে আসা একজনের কাছে আপনারা আর কিই বা আশা করতে পারেন? সমস্ত বোতলই কি তার ভিতরের বস্তুটির রঙ ধারণ করে না? তাছাড়া, মানবিক আর্তনাদ আপনাদের সভ্যতার মরুদ্যানটি ছাড়া আর কোথায়ই বা প্রতিধ্বনিত হওয়ার জায়গা খুজে পেতে পারে যার মহান প্রতিষ্ঠাতা বিজ্ঞান সাহিত্য আর মানবিক মূল্যবোধের সেবায় নিয়োজিত থেকে এর বুনিয়াদ গয়েছেন? তিনি যেমন একদিন নিজের সমস্ত ধন উৎসর্গ করেছেন মানুষের মঙ্গল কামনায়, ক্ষমাপরায়ণতা অর্জনে, আমরা তৃতীয় বিশ্বের শিশুরা, সমর্থদের কাছে, সভ্যদের কাছে দাবি রাখচি তার দৃষ্ঠান্ত অনুসরণের তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণের, তাঁর দৃষ্টির গভীরতা অনুধাবনের।

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়বৃন্দ,

আমাদের চারপাশে এতকিছু ঘটতে থাকা সত্ত্বেও আমি শেষ পর্যন্ত আশাবাদের প্রতিই দায়বদ্ধ। আমি কান্টের সাঙ্গে সুর মেলাতে রাজি নই যে মঙ্গলের জয় হবে অন্য পৃথিবীতে। মঙ্গলের জয় ঘটছে প্রতিদিনই। এমন ও হতে পারে যে অমঙ্গল বা অশুভ আমরা যতটা ভাবি তারচেয়েও দুর্বল। আমাদের সামনেই রয়েছে তার অনপরেয় প্রমান: জয় যদি সব সময় মঙ্গলের পক্ষে না থাকত, ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো মানুষের পক্ষে কখনো সম্ভব হতো না জীবজন্তু, পোকা মাকড়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভয়, আর আত্মম্ভরিতার প্রতিকুলে বিকশিত হওয়া, সংখ্যাগত বিস্তৃতি লাভ করা। তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না জাতি গঠন করা, সৃজনশীলতা আর উদ্ভাবনে উৎকর্ষ লাভ করা, পৃথিবীর

www.nagorikpathagar.org

বাইরের জগতে পা রাখা বা মানবাধিকার ঘোষণা করা। বাস্তব সত্য হচ্ছে অমঙ্গল সবসময়ই ডামাডোল ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ এক সমাবেশ নিয়ে আসে এবং মানুষকে যা কিছু আঘাত করে তা মানুষ যা কিছু আনন্দ দেয় তার চেয়ে বেশি দিন মনে রাখে। আমাদের মহান কবি আবুল-আল আল-মা' আরি যথার্থই বলেছিলেন:

"মৃতুকালের একটি দু:খ

জন্মকালের শতগুণ আনন্দের

চেয়েও অনেক বেশি কিছু"

আমি আবারো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং আপনাদের ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

(ভাষনটি অনুবাদ করছেন, বখতিয়ার আহমেদ)

(সংগ্রহ-হায়াৎমামুদ, বাক থেকে পামুক পৃ:৮৪)

www.nagorikpathagar.org

নেল্‌সেন মেন্ডেলা (১৯১৮-------)

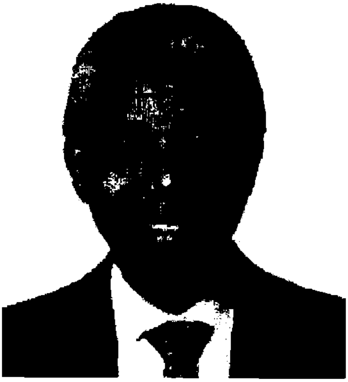

(দক্ষিণ আফ্রিকার বর্নবাদ বিরোধী বিশ্ববরেন্য নোবেল বিজয়ী নেতা প্রায় ৪০ বৎসর কারা ভোগের পর, ১৯৯৪ সালে ১০ই মে যে ভাষনাটি দেন, তার মূল অংশ)

আজ আমাদের গভীরতর ভয় এটা নয় যে, আমরা অপ্রতুল। আমরা কল্পনাও করতে পারিনা যে আমরা কতটা ক্ষমতাবান আমরা আলোহীন তাই আমরা অন্ধকার ভয়ে ভীত নই আজ আমরা আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, আমরা কে? আমাদেরকে কে প্রজ্ঞাবান, ঐজ্বল্য, চৌকষ ও অবিশ্বাস্য রকম হতে হবে? প্রকৃতপক্ষে আপনারা এমন কি যে আপনাদের তা হতে হবে? আপনারা ইশ্বরের সন্তান। আপনার নিজেদের কে নিয়েই ক্ষুদ্র ভাবনা করছেন, যা দুনিয়ার কাজে আসবে না। আমাদের গুটিয়ে সাওয়ার মধ্যে কোন ঔজ্জল্য নেই, যাহাতে আমাদের জনগণের মুক্তি আসবে। আমরা শিশুদের ন্যায় সরলতার দিকে আগুয়ান হবো। আমাদের জন্ম হয়েছে বিধাতার মহিমা প্রতিষ্ঠার নির্মিত্তে যা আমাদের অন্তরে প্রোথিই ইহা শুধু আমাদের মধ্যেই নয়, ইহা সর্বত্র সকল মানুষের মধ্যেই প্রোথিত। এবং যদি আমরা আমাদের প্রজ্ঞাকে বিকশিত করি তবে আমরা নৈ:শব্দিকভাবে অন্যদেরও মহৎ কাজে অনুপ্রাণিত করতে পারব। যদি আমরা আমাদের জড়তা হতে মুক্ত হতে পারি তবে আমাদের দৃঢ়তা অন্যদের কেও মুক্ত করবে।

The Healing Light Institute of Spirituality

"Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, and fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small doesn't serve the world. There's nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We are born to make manifest the glory of God that is within us. It's not just in some of us, it's in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.

(ওয়েভ সাইট থেকে সংগ্রহ)

www.nagorikpathagar.org

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম

এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবাই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসমব্লি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সংগে বলতে হয় ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আয়ুব খান মার্শাল-ল জারী করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমাদের ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন-গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হোল। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করছি। আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাঁকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমি বললাম ঠিক আছে, আমরা এসেমব্লিতে বসবো। আমি বললাম, এসেমব্লির মধ্যে আলোচনা করবো- এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশী হলেও একজন যদিও সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

www.nagorikpathagar.org

ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম-আপনারা আসুন, বসুন আমরা আলাপ করে, শাসনতন্ত্র তৈরি করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেমব্লি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে, যদি কেউ এসেমব্লিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত সব জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেমব্লি চলবে। তারপরে হঠাৎ ১ তারিখে এসেমব্লি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসাবে এসেমব্লি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাবো। ভুট্টো বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হল আমাকে। বন্ধ করার পর এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কল-কারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোল। কি পেলাম আমরা? আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে-তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু-আমরা বাঙ্গালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

টেলিফোনে আমার সঙ্গে তাঁর কথা হয়। তাঁকে আমি বলেছিলাম, জেনারেঃল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরীবের উপর, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কি করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুণ। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে।

আমি তা অনেক আগেই বলে দিয়েছি কিসের রাউন্ড টেবিল, কার সঙ্গে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসবো? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘন্টার গোপন বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন তাতে সমস্ত দোষ তিনি আমার উপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।

ভায়েরা আমার, ২৫ তারিখে এসেমব্লি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঐ শহীদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আর.টি.সি-তে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। এসেমব্লি কল করেছেন, আমার দাবী

www.nagorikpathagar.org

মানতে হবে। প্রথম সামরিক আইন মার্শাল-ল উইথ্‌ড্রো করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেমব্লিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে এসেমব্লি বসতে আমরা পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারী আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুরগাড়ী, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে-শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গর্ভণমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা কোনকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটি গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে 'হত্যা' করা হয়-তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে, এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা আছে সবকিছু-আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমার আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামীলীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা-পয়সা পৌছে দেবেন। আর এই ৭ দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌছে দেবেন। সরকারী কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হোল-কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রু বাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায়-হিন্দু মুসলমান, বাঙালী, অ-বাঙ্গালী যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্বে আপনাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালী রেডিও ষ্টেশনে যাবেন না। ২ ঘন্টা ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে, যাতে

www.nagorikpathagar.org

মানুষ তাদের মাইনে-পত্র নিতে পারে। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ দেয়া নেয়া চালাবেন।

কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালীরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল। এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো, এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়াবো ইনশাআল্লাহ। **এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।**

(সংগ্রহ বই-১৯৭১–এ ৭ই মার্চ রেস কোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ:-)

১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামিক সম্মেলন সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনের প্রাক্কালে ওআইসি'র একটি শুভেচ্ছা মিশন বঙ্গবন্ধুকে সম্মেলনে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঢাকায় আসে। এই মিশনের সদস্যদের মধ্যে আরব আমিরাতের আল্‌নাহিয়ান এবং আলজিরিবার প্রেসিডেন্ট হুয়ারী বুমেদীনও ছিলেন। তিনি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজের ব্যক্তিগত বিমান নিয়ে এসেছিলেন। ১৯৭৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু লাহোরের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। লাহোরে তাঁকে বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জানান। এই ঐতিহাসিক শীর্ষ সম্মেলনেও বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে প্যালেষ্টাইনী আরব ভাইদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। ভাষণের মাঝে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা বিপুল করতালির থেকে সরাসরি প্রচার করে। সম্মেলনে ভাষণ দানকালে বঙ্গবন্ধু বলেন:

"... .... মানুষ এখন বস্তুগত দিক থেকে বৃহত্তর শক্তি অর্জন করেছে, যা সে আর কখনো পারেনি। সে পৃথিবীকে ধ্বংস করার ক্ষমতা অর্জন করেছে। আমরা যুদ্ধের জন্য শক্তি অপব্যবহার করতে দেখিনি, জনগণকে নিপীড়ন করতে দেখেছি। আমরা তাদের ন্যায়সংগত অধিকার অস্বীকার করতে দেখেছি। অবর্ণনীয় দুর্ভোগের মধ্যে তাদের ঠেলে দিতেও দেখেছি। আর এসব অকথ্য যাতনার চূড়ান্ত নিদর্শন হয়ে আছেন আমাদের প্যালেষ্টাইনী ভাইয়েরা। আর এ জন্যই অতীতের তুলনায় আজ এই শক্তিকে প্রজ্ঞার সাথে কাজে লাগানোর প্রয়োজন বেশি। ধ্বংস নয় সৃষ্টি, যুদ্ধ নয় শান্তি, দুর্ভোগ নয় মানুষের কল্যাণে আমাদের কাজ করতে হবে। **আমরা যদি মহানবীর (সাঃ) প্রচারিত মানব প্রেম ও মর্যাদার স্বাশ্বত মূল্যবোধ আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারি, তা থেকে বর্তমান কালের সমস্যা সমাধানে মুসলিম জনসাধারণ সুস্পষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এসব মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে শান্তি ও ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে আমরা একটি নতুন আন্তর্জাতিক ঐতিহ্য গড়ে তুলতে পারি।** এই সম্মেলনে শুধু আরব ভাইদের সংগ্রামের প্রতি সমর্থনে আমাদের ঐক্য সংহত করার জন্যই নয়, বরং জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর সাথে এবং সারা বিশ্বের শান্তি ও প্রগতিশীল শক্তিগুলোর সাথে আমাদের একত্মতা ঘোষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবাদ ও সকল প্রকার শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বিশ্বের নিদারুণ অবিচার হয়েছে অবশ্যই তার অবসান ঘটাতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

অন্যায়ভাবে দখলকৃত আরব ভূমি অবশ্যই ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। জেরুজালেমের উপর ... . আল্লাহ্‌র কৃপায় আমরা এখন আমাদের সম্পদ ও শক্তি এমনভাবে সুসংহত করতে পারি, যাতে আমাদের সকলের জন্য শান্তি ও ন্যায় বিচার অর্জন করা যায়। এই সাফল্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশের দশ কোটি মানুষ সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ আমাদের সকল যৌথ-প্রচেষ্টা সফল করুন।"

লাহোকে অনুষ্ঠিত ইসলামিক সম্মেলন সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ সারা আরব বিশ্বে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করে। কারণ তাঁর এই ভাষণটি গতানুগতিক ছিলো না। সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী ছিলো তিনি তাঁর ভাষণে প্যালেষ্টাইনী ভাইদের অধিকার আদায়ের প্রতি যেমন জোর দিয়েছেন তেমনি মহানবীর (সা) আদর্শ বা সত্যিকার ইসলামী বোধকে বিশ্বের শোষিত বঞ্চিত মানুষের কল্যাণে ব্যবহারের প্রস্তাব করেছেনঃ বিশ্বের সকল নিপীড়িত জনগণের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। তাতে করে তিনি ওআইসি'কে পরাশক্তির প্রভাবমুক্ত হয়ে সত্যিকার মানব কল্যাণে নিবেদিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

(সূত্রঃ অগ্রপথিক, জাতীয় শোক দিবস সংখ্যা ২০০০, ইফাঃ বাঃ)

যত দিন রবে পদ্মা মেঘনা গৌরী যমুনা রহমান,

তত দিন রবে কৃর্তিতোমার শেখ মুজিবুর রহমান।

অন্নদা সংকর রায়ঃ-

www.nagorikpathagar.org

ড. মাহাথির মুহাম্মদ (১৯২৫-----)

ও.আই.সি'র দশম শীর্ষ সম্মেলনে প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণ

আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার তৃতীয় বিশ্বের দূরদর্শী ও সকল নেতা। মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধান মন্ত্রী

(১৬ অক্টোবর ২০০৩, মালেশিয়ার প্রশাসনিক রাজধানী পুত্রাজায়ায় অনুষ্ঠিত)

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যাঁর করুণায় আমরা ইসলামী সম্মেলন সংস্থার নেতৃবৃন্দ মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামের ভবিষৎ গতিপথ নির্ধারণের লক্ষ্যে আজ এখানে সমবেত হতে পেরেছি।

আমি প্রথমেই বলতে চাই, গোটা বিশ্ব আজ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। নিশ্চিতভাবেই ১৩০ কোটি মুসলমান, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক-ষষ্ঠাংশ মানুষ আজ এ সম্মেলনের দিকে আশা নিয়ে চেয়ে আছেন, যদিও ইসলাম ও মুসলমানদের মান-মর্যাদা পুনরুদ্ধারে আমাদের সদিচ্ছা ও সামর্থ্য সম্পর্কে তাদের সংশয় থাকতে পারে। আরো বেশি সংশয় থাকতে পারে ভাইবোনেরা আজ যে নীপিড়ন ও অবমাননার শিকার হচ্ছে তা থেকে তাদের মুক্ত করতে আমাদের সদিচ্ছা ও সামর্থ্য সম্পর্কে।

আমাদের লাঞ্ছনা ও নিপীড়নের ঘটনাবলীর হিসাব করতে আমি যাব না। আমাদের নিন্দুক ও নিপীড়কদের আরো একবার ধিক্কার জানাতেও আমি যাচ্ছি না। সেটা হবে অর্থহীন, কারণ আমরা তাদের নিন্দা জানালেই তারা তাদের মানসিকতা পরিবর্তন করবে না। যদি আমাদের নিজেদের ও ইসলামের মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে হয়, তাহলে আমাদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমাদের কাজ করতে হবে।

সব মুসলিম দেশের সরকার আরো কাছাকাছি আসতে পারে, সব বিষয়ে না হলেও কিছু প্রধান বিষয়ে, যেমন ফিলিস্তিন বিষয়ে একটা সাধারণ অবস্থানক গ্রহণ করতে পারে। আমরা সবাই মুসলমান। আমরা সবাই নিপীড়িত। আমরা লাঞ্ছনা ও অবমাননার শিকার হচ্ছি। কিন্তু আমরা যারা আল্লাহর রহমতে দেশ পরিচালনার দায়িত্বে পেয়েছি তারা কখনোই সত্যিকার অর্থে বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বে ও ঐক্য সৃষ্টির চেষ্টা করিনি। অথচ মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য রক্ষায় ইসলাম আমাদের সৃস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছে।

শুধু যে আমাদের সরকারগুলোই বিভক্ত তা নয়, গোটা মুসলিম উম্মাহও বিভক্ত হয়ে পড়েছে। বিভক্তি চলছে তো চলছেই। গত ১৪০০ বছরে ইসলামের ব্যাখ্যাকারীগণ, জ্ঞানীগণ, ওলামাগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর এক ও অভিন্ন

www.nagorikpathagar.org

ইসলামকে এতই ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, এখন এক ইসলামের মধ্যে হাজারটা ধর্ম, আর সেগুলোর একটা থেকে অন্যটা এতটাই আলাদা যে আমরা প্রায়শই পরস্পরের যুদ্ধে লিপ্ত হই এবং পরস্পরকে হত্যা করি। একটি অভিন্ন উম্মাহ থেকে আমরা বিভক্ত হয়েছি অসংখ্য গোত্রে, মাজহাবে, তরিকায়। প্রত্যেকেই দাবি করছি যে আমাদেরটাই সত্যিকারের ইসলাম। কিন্তু লক্ষ্য করেছি না যে, আমরা সত্যিকারের মুসলমান কিনা তা নিয়ে আমাদের নিন্দুক ও নিপীড়কদের কোনই মাথাব্যথা নেই। তাদের কাছে আমরা সবাই মুসলমান, এমন ধর্ম ও পয়গম্বরের অনুসারী যাঁকে তারা সন্ত্রাসবাদরে প্রবক্তা হিসেবে প্রচার করতে চায়। আমরা সবাই তাদের কসম খাওয়া শত্রু। তারা আমাদের আক্রমণ করবে, হত্যা করবে আমাদের দেশে দেশে আগ্রাসন চালাবে, শিয়া হোক, সুন্নী হোক, আলাবাইত বা দ্রুজ হোক, আমাদের সরকারগুলোকে উৎখাত করবে। আর আমরা নিজেরা পরস্পরকে আক্রমন করে নিজেদের শক্তি ক্ষয় করার মধ্য দিয়ে তাদের সহযোগিতা করে চলেছি। কখনো কখনো তাদের কথঅ মতো কাজ করেছি, অন্য মুসলিম রাষ্ট্রের ওপর হামলা চালানোর কাজে তাদের প্রক্সি হিসেবে কাজ করছি। আমরা আমাদের সরকারগুলোর পতন ঘটানোর চেষ্টা করি সহিংসাতার মাধ্যমে, আমরা আমাদের দেশগুলোকে দুর্বল ও দরিদ্র করে ফেলছি। মুসলিম উম্মাহ ও আমরা ইসলামী দেশগুলোর সরকারসমূহ ঐক্যবদ্ধ থাকার এবং পরস্পরকে ভাই বলে গ্রহণ করার ইসলামী নির্দেশ পুরোপুরি উপেক্ষা করেছি এবং কখনো করে চলেছি।

ইসলামী শিক্ষাকে আমরা উপেক্ষা করেছি-এটাই সব কথা নয়। আমাদের বলা হয়েছে ইক্‌রা-জ্ঞান অর্জনের জন্য পড়। প্রথম যুগের মুসলমানরা জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রিক ও ইসলাম-পূর্ব পন্ডিতদের গ্রন্থাদি অনুবাদ ও পাঠ করার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের মদ্যে বহু গণিতজ্ঞ, বিজ্ঞানী, পন্ডিত, গবেষক, চিকিৎসক ও জ্যোতির্বিদের জন্ম হয়েছিল। ইসলাম নিয়ে পড়াশুনা ও ইসলাম পালনের পাশাপাশি তারা তাদের যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। ফলে নিজেদের দেশে তারা সম্পদ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন এবং বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করেছিলেন। এভাবে তারা নিজেদের জনগণকে রক্ষা করেছিলেন। মধ্যযুগের ইউরোপীয় জনগণ যখন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও পশ্চাৎপদ ছিল, তখন আলোকিত মুসলমানরা এক মহান ইসলামী সভ্যতা গড়ে তুলেছিল, যে সভ্যতা ছিল মর্যাদাপূর্ণ ও ক্ষমতাশালী। পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশ তার কাছে ছিল নগণ্য। বিদেশী আগ্রাসন থেকে মুসলিম উন্মাহকে রক্ষার করার সামর্থ্য তাদের ছিল। ইউরোপীয়দের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐতিহ্য পুরোটাই এসে গিয়েছিল মুসলমানদের হাতে। সেসবের জন্য মুসলমান পন্ডিতদের পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসতে হতো ইপরোপীয়দের।

কিন্তু মহান ইসলামী সভ্যতা নির্মাণের মাঝপথে দেখা দিলেন ইসলামের নতুন ব্যাখ্যাকারীগণ। তারা এসে বললেন, মুসলমানের জ্ঞান অর্জন মানের শুধু ইসলাম ধর্ম পাঠ করা। বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদির প্রতি তারা মুসলমানদের নিরুৎসাহিত

www.nagorikpathagar.org

করতে লাগলেন। এভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে মুসলমানরা পিছিয়ে পড়তে শুরু করলেন। এর ধারাবাহিকতায় মহান মুসলিম সভ্যতা ক্ষয়ে যেতে থাকল। ওসমানীয় সম্রাজের উত্থান না হলে ১৪৯২ সালে গ্রানাডার পতনের মধ্য দিয়েই মুসলিম সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে যেত। কিন্তু ওসমানীয় সাম্রাজের প্রাথমিক সাফল্যের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির নবজাগরণের সম্পর্কে ছিল না। বুদ্ধিবৃত্তির পরিবর্তে পরিবর্তে তারা বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল চোস্ত-পায়জামা আর খাড়া টুপি ইসলামসম্মত কিনা, ছাপাযন্ত্রের ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে কিনা বা মসজিদগুলোকে আলোকিত করতে বিদুৎ ব্যবহার করা ইসলামসম্মত হবে কিনা এসব মামুলি প্রশ্ন নিয়ে। ফলে মুসলমানরা শিল্পবিপ্লবের সুফল লাভে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। তাদের এ অধোগতি চলতে থাকে তুর্কি শাসনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ও ফরাসিদের বিদ্রোহের উসকানিতে ওসমানীয় শাসকদের পতন পর্যন্ত।

আমরা নতুন 'জাত-রাষ্ট্র' ছাড়াও পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধারণা গ্রহণ করেছি। এতেও আমরা বিভক্ত হয়েছি, কারণ আমরা যেসব রাজনৈতিক দল-গোষ্ঠী গড়ে তুলেছি তাদের মধ্যে কেউ নিজেকে ইসলামের দাবিদার বলে ঘোষণা করে, অন্য দলের ইসলামকে নাকচ করে ক্ষমতায় যেতে না পারলে গণতান্ত্রিক চর্চার ফলাফল মানে না এবং সহিংসতার আশ্রয় নেয়। এভাবে মুসলিম দেশগুলো অস্থিতিশীল ও দুর্বল হয়ে পড়ে। এসব মিলিয়ে গত কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলিম উম্মাহ ও মুসলিম সভ্যতা এতই দুর্বল হয়ে পড়ে যে, এমন একটিও মুসলিম দেশ ছিল না, যারা ইউরোপীয়দের কলোনিতে পরিণত হয়নি বা তাদের আধিপত্যের শিকার হয়নি। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা অর্জিত হলেও মুসলমানরা আর শক্তি ফিরে পায়নি। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ছিল দুর্বল ও অদক্ষভাবে পরিচালিত। সবসময় বিপর্যস্ত অবস্থা চলেছে সেসব দেশে। মুসলিম অধ্যুষিত ভূখন্ডগুলোতে ইউরোপীয়রা যা চেয়েছে তাই করতে পেরেছে। অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, ইহুদী সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইল সৃষ্টির জন্য বেলফোর ঘোষণা ও জায়নবাদী আগ্রাসন ঠেকাতে মুসলমানরা বস্তুত কিছুই করতে পারেনি।

আমাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস, এসব কিছু সত্ত্বেও আমাদের জীবন আমাদের নিন্দুকের চেয়ে ভালো। অনেকে মনে করেন, দারিদ্রই ইসলামসম্মত, দুঃখ-যন্ত্রণা ও নিপীড়ন ভোগ করা ইসলামসম্মত। ইহকাল আমাদের জন্য নয়। পরকালই আমাদের আসল ঠিকানা, আমাদের জন্য আছে আখেরাতে বেহেস্তের সুখ। আমাদের শুধু ধর্ম কর্ম করতে হবে, নির্দিষ্ট ধরণের পোষাক পরতে হবে এবং একটা নির্দিষ্ট চেহারা ধারণ করতে হবে। আমাদের যেসব ভাইবোন নিপীড়ন হচ্ছে তাদের সাহায্য করতে আমাদের দুর্বলতা, পশ্চাৎপদ ও অক্ষমতা আল্লাহর ইচ্ছায় অংশ; আখেরাতে বেহেস্তের সুখ-শান্তি ভোগ করার আগে এই দুঃখ-যন্ত্রনার মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হবে। আমাদের এ নিয়তি মেনে নিতে হবে। আমাদের কিছু করার প্রয়োজন নেই। আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা কিছুই করতে পারি না।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু এ কথা কি সত্য যে, এটা আল্লাহরই ইচ্ছা? আমরা কি কিছুই করতে পারি না? সূরা আর-রাদ এর ১১ আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্ ততক্ষণ কোনো সম্প্রদায়ের ভাগ্য পরিবর্তন করবেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করবে।"

আমাদের সংখ্যা এখন ১৩০ কোটি। বিশ্বে সবচেয়ে বড় তেলের মজুদ আছে আমাদের। আমাদের আছে বিরাট সম্পদ। জাহিলি যুগে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন আমরা তাদের মতো অশিক্ষিতও নই। আমরা বিশ্বে অর্থনীতি ও অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে জানি। পৃথিবীর ১৮০ টি দেশের মধ্যে ৫২ টিই আমরা নিয়ন্ত্রণ করি। আমাদের ভোটে আন্তার্জাতিক সংস্থাগুলো ভেঙে যেতে পারে। তবুও জাহিলি যুগে যে স্বল্পসংখ্যক মানুষ হযরত মুহাম্মদকে (সা.) তাদের নবী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, আমরা যেন তাদের চেয়েও বেশি অসহায়। কেন? আল্লাহর ইচ্ছায়? নাকি আমরা আমাদের ধর্মকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করছি বলে? নাকি আমাদের ধর্মের সঠিক শিক্ষা মেনে চলতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি বলে? নাকি আমরা অনেক ভুল করেছি বলে?

উম্মাহকে রক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ রয়েছে আমাদের ধর্মে। কিন্তু দুঃখ বিষয়, আমরা প্রতিরক্ষার প্রতি জোর না দিয়ে জোর দিচ্ছি নবীর আমলে ব্যবহৃত অস্ত্রপাতির দিকে। ওইসব অস্ত্র আর ঘোড়া এখন আর আমাদের প্রতিরক্ষার কাজে লাগবে না। আমাদের দরকার বন্দুক, রকেট, বোমা ও যুদ্ধবিমান। দরকার ট্যাঙ্ক ও যুদ্ধজাহাজ। কিন্তু যেহেতু আমরা আমাদের আখেরাতের জন্য কল্যাণজনক নয় বলে বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতির চর্চাকে নিরুৎসারিত করেছি, তাই আমাদের প্রতিরক্ষার জন্য নিজস্ব অস্ত্র তৈরির ক্ষমতা আজ আমাদের নেই। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, আমাদের অস্ত্র কিনলে তা কিনতে হবে আমাদের নিন্দুক ও শত্রুদের কাছ থেকেই। কোরআনের অগভীর ব্যাখ্যার কারণেই এটা হয়েছে। নবীর সুন্নাহর মূল বিষয় ও কোরআনের নির্দেশকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে হিজরতের প্রথম শতকে ব্যবহৃত প্রথা ও পন্থার ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। ইসলামের অন্যান্য শিক্ষার ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। আল্লাহর বাণীই অন্তর্নিহিত অর্থের চেয়ে এর বাহ্যিক অর্থের ব্যাপারই আমরা বেশি সচেতন। আমরা নবীর আদর্শের আক্ষরিক ব্যাখ্যার প্রতিই বেশি অনুগত। ইসলামসম্মত জীবনযাপনের সত্যিকার পন্থা ধরে নিয়ে সে সময়কার জীবন প্রবাহের চর্চার মাধ্যমে সম্ভবত আমরা হিজরতের প্রথম শতকেই ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছি। কিন্তু এটা করা উচিত নয়। এর ফলে আমাদের যে পশ্চাৎপদতা ও দুর্বলতা সৃষ্টি হবে, আমাদের নিন্দুক ও শত্রুরা আমাদের ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য তার সুযোগ নেবে। ইসলাম শুধু খ্রিষ্টান সপ্তম শতাব্দির জন্য নয়। ইসলাম সব সময়ের জন্য। সময় বদলে গেছে। আমরা পছন্দ করি বা না-ই করি আমাদের বদলাতে হবে। আমাদের ধর্মকে পরিবর্তন করার কথা বলছি না। বর্তমান বিশ্বের পটভূমিতে ইসলামী শিক্ষার প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে হবে। কারণ বর্তমান বিশ্ব হিজরতের প্রথম শতক থেকে পুরোপুরি ভিন্ন। ইসলাম ধর্ম ভুল নয়। কিন্তু আমাদের ইসলামী চিন্তাবিদরা যেভাবে

www.nagorikpathagar.org

একে ব্যাখ্যা করেছেন তা ভুল হতে পারে । কারণ তারা যতই শিক্ষিত হোন না কেন, তারা নবী নন। আমাদের নবী যে ইসলাম প্রচার করেছিলেন আমরা ঠিক সে ইসলামটিই বিশ্বাস করি কি না এবং তারই চর্চা করি কিনা তা যাচাই করতে আমাদের ইসলামের মৌলিক শিক্ষার কাছে ফিরে যেতে হবে। যখন আমাদের একের বিশ্বাস অন্যের থেকে এত ভিন্ন তখন আমরা সবাই শুদ্ধ ও সঠিক ইসলাম পালন করছি-এটা হতে পারে না। আজ আমাদেরকে, পুরো মুসলিম উম্মাহকে ঘৃণা ও অমর্যাদার চোখে দেখা হচ্ছে। আমাদের ধর্ম আজ কালিমালিপ্ত। আমাদের পবিত্র স্থানগুলো অপবিত্র করা হয়েছে। দখল করে নেয়া হয়েছে আমাদের ভূখন্ড। আমাদের জনগণকে ক্ষুধায় মরতে হচ্ছে, তাদের হত্যা করা হচ্ছে। আমাদের কোন দেশই সত্যিকার অর্থে স্বাধীন নয়। আমাদের ওপর যারা নির্যাতন চালাচ্ছে, তাদের অনেক ইচ্ছা মেনে চলতে আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। আমরা কীভাবে আচরণ করব, কীভাবে আমাদের দেশ চলবে, এমনকি কীভাবে চিন্তা করব-সে ব্যাপারেও তাদের ইচ্ছা আমাদের ওপ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আজ যদি তারা আমাদের দেশে অভিযান চালায়, আমাদের জনগণকে হত্যা করে কিংবা আমাদের গ্রাম ও শহরকে ধবংস করে তবে আমাদের করার তেমন কিছুই নেই। ইসলামই এসবের কারণ? নাকি আমাদের ধর্ম অনুযায়ী দায়িত্ব পালনে আমরা ব্যর্থ হয়েছি বলে এটা হয়েছে?

এসব ব্যাপারে আমাদের একমাত্র প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ক্রুদ্ধ থেকে ক্রুদ্ধতর হওয়া। ক্রুদ্ধ মানুষ যুক্তির সঙ্গে চিন্তা করতে পারে না। আমাদের কিছু মানুষকে বিচারবুদ্ধিহীন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে দেখা গেছে। তারা তাদের ক্ষোভ ও হতাশা প্রশমনে হামলা চালিয়ে তাদের সমগোত্রীয় মুসলিমসহ যে কাউকে হত্যা করছে। তাদের সরকার তাদের বিরত রাখতে কিছুই করতে পারে না। শত্রুরা পাল্টা ব্যবস্থা নিচ্ছে এবং সরকারগুলোর ওপর আরো চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে স্বাধীনভাবে পদক্ষেপ নেওয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে শত্রুদের নির্দেশিত পন্থা গ্রহণ করা ছাড়া সরকারগুলোর কোন উপায় থাকছে না। এর ফলে এসব দেশের জনগণ ও উম্মাহ ও উম্মাহ আরো ক্ষুদ্ধ হয়ে উঠেছে এবং তাদের সরকারগুলোর পতন ঘটাচ্ছে। আরো বেশি নির্বিচার হামলার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রক্রিয়া নসাৎ করে দেওয়া হচ্ছে। শত্রুদের ক্রোধকে আরো বাড়িয়ে দিতে এবং শান্তিপূর্ণ মীমাংসাকে প্রতিরোধ করতে হিসাবনিকাশ করেই এসব হামলা চালানো হচ্ছে। কিন্তু হামলায় কোন সমস্যার সমাধান হয় না। এতে মুসলমানরা আরো বেশি নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। মুসলিম দেশসমূহ ও এর জনগণ আজ অসহায় বোধ করছে। সঠিকভাবে তারা কিছুই করতে পারে না-এ বোধ তাদের মধ্যে কাজ করছে। তারা বিশ্বাস করে, পরিস্থিতি শুধু আরো বেশি খারাপ খারাপই হতে পারে। মুসলমানরা চিরকাল ইউরোপীয় ও ইহুদিদের দ্বারা নির্যাতিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে। তারা চিরকাল দরিদ্র, পশ্চাৎপদ ও দুর্বল থাকবে। কিছু মুসলমান বিশ্বাস করে, মুসলমানদের যথার্থ রাষ্ট্র হবে দরিদ্র হবে দরিদ্র ও বর্তমান বিশ্বে তারা নির্যাতিত হবে- এটাই আল্লাহর ইচ্ছা। কিন্তু এটা কি সত্য যে, আমরা নিজেদের জন্য কিছুই করতে

www.nagorikpathagar.org

পারি না? ১৩০ কোটি জনগণ তাদের চেয়ে অনেক ক্ষুদ্র একদল শত্রুর অবমাননা ও নির্যাতনের হাত থেকে নিজেদের রক্ষার কোন শক্তিই পাচ্ছে না, এও কি সত্য হতে পারে? তারা শুধুই ক্রোধান্ধ হয়ে পাল্টা আঘাত হানতে জানে? আমাদের তরুণ জনগোষ্ঠীকে আত্মঘাতী হয়ে মানুষ হত্যা করতে আহবান জানানো ছাড়া, আমাদের জনগণকে আরো গণহত্যার দিকে ঠেলে দেওয়া ছাড়া আর কি কোন পথ নেই? এটা হতেই পারে না। ১৩০ কোটি কয়েক লাখ ইহুদির কাছে পরাজিত হতে পারে না। উপায় অবশ্যই আছে। অমরা যদি একটু ধীরে সুস্থে আমাদের দুর্বলতা ও সামর্থ্য খুঁজে এর ভিত্তিতে কৌশল গ্রহণ করি এবং পাল্টা ব্যবস্থা নেই, শুধু তাহলেই আমরা পথ খুঁজে পেতে পারি।

আমরা জানি, নবীজি ও তাঁর প্রথম দিকের অনুসারীরা কুরাইশদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিন কি পাল্টা হামলা চালিয়েছিলেন? না। তিনি কৌশলগত প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর সেসব অনুসারীদের একটি খ্রিষ্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি নিজেও পরে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর অনুসারীদের সমবেত করেন, প্রতিরক্ষা ক্ষমতা তৈরি করেন এবং তাঁর অনুসারীদের ইচ্ছায় বিরুদ্ধে একটি অন্যায্য চুক্তি স্বাক্ষর করতে প্রস্তুত ছিলেন। এ চুক্তির ফলে যা শান্তি সূচীত হয় তার ফলে তিনি শক্তি সঞ্চয় করেন এবং এক পর্যায়ে তিনি মক্কায় প্রবেশ করতে ও সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এমনকি তখনো তিনি প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করেননি। মক্কার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। এদের অনেকে তাঁর সবচেয়ে শক্তিশালী সমর্থকে পরিণত হন। এরা পরবর্তীকালে মুসলমানদেরকে তাদের শত্রুদের হাতে থেকে রক্ষা করেন। আল্লাহ আমাদের যে চিন্তাশক্তি দিয়েছেন, তা ব্যবহার করলে আমরা বুঝতে পারব, আমরা অযৌক্তিক আচরণ করছি। আমরা শুধু শত্রুদের আঘাত করি, কারণ তারা আমাদের আঘাত করে। এ ছাড়া আমরা যে সংগ্রাম চালাচ্ছি তার কোন উদ্দেশ্য লক্ষ্য নেই। নির্বোধের মত আমরা প্রত্যাশা করি, তারা আত্মসমর্পণ করবে। আমরা অপ্রয়োজনে জীবন দেই, তাতে শত্রুদের আরো প্রতিশোধ নেওয়া ও আমাদের অবমাননা করার সুযোগ দেওয়া ছাড়া অন্য কোন কাজই হয় না। আমরা প্রকৃতপক্ষে খুবই শক্তিশালী। ১৩০ কোটি মানুষকে স্রেফ নিশ্চিহ্ন করা যাবে না। ইউরোপনীয়রা ১২ মিলিয়ন ইহুদিদের মধ্যে ৬ মিলিয়নকে হত্যা করেছিল। কিন্তু বর্তমানে ইহুদিরাই তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে পৃথিবী শাসন করেছে। তারা যুদ্ধ করতে ও তাদের জন্য জীবন দিতে অন্যদের ব্যবহার করছে। আমরা হয়তো তেমনটা করতে সক্ষম নই। আমরা ১৩০ কোটি মুসলমানের একতাবদ্ধ করতেও হয়তো সক্ষম নই। আমরা মুসলিম সরকারগুলোর মধ্যে ঐক্যমত্য আনতে সক্ষম নাও হতে পারি। কিন্তু আমরা যদি একত্রে কাজ করার জন্য উম্মাহ ও মুসলিম দেশগুলোর এক-তৃতীয়াংশকে পাই, তবে এখনই আমরা কিছু করতে পারি। মনে করে দেখুন, নবী (সা.) যখন মদীনায় যান তখন তাঁর প্রচুর অনুসারী ছিল না। কিন্তু সেখানে তিনি আনসার ও মুহাজিরদের একত্র

www.nagorikpathagar.org

করেছিলেন এবং এক পর্যায়ে ইসলামকে রক্ষার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। এ একতা ছাড়াও আমাদের যা অবশ্যই দরকার তা হলো আমাদের সম্পদ সম্পর্কে ধারণা। আমি ইতোমধ্যে আমাদের জনসংখ্যা ও তেলসম্পদের পরিমাণের উল্লেখ করছি। বর্তমান বিশ্বে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আর্থিক দিক থেকে আমাদের প্রচুর প্রভাব রয়েছে। সামরিক ক্ষেত্রে আমাদের যেটুকু দুর্বলতা আছে তা কাটিয়ে উঠতে এটা যথেষ্ঠ। আমরা আরো জানি, সব অমুসলিম আমাদের বিরুদ্ধে নয়। এমনকি ইহুদিদের মধেও অনেকে আছেন যারা ইসরাইলের কর্মকান্ড সমর্থন করেন না। প্রত্যেককে আমাদের শত্রু ভাবা উচিত হবে না। আমাদের তাদের মন জয় করতে হবে। শুধু অস্ত্রশস্ত্রে নয়, প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। আমাদের দেশগুলোকে স্থিতিশীল হতে হবে, ভালভাবে পরিচালনা করতে হবে, অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হতে হবে, শিল্প-প্রযুক্তির দিক থেকে এগিয়ে যেতে হবে। এতে সময় লাগবে বটে, কিন্তু এটা করা সম্ভব।

আমরা জানি, জাহিলী যুগের আরবরা নিজেদের মধ্যে মারামারি-কাটাকাটিতে লিপ্ত ছিল শুধু এই কারণে যে, তারা ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের মানুষ। মহানবী (সা.) তাদেরকে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বাণী শুনিয়েছিলেন ও তারা পারস্পরিক ঘৃণা থেকে বেরিয়ে এসে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন এবং মহান ইসলামী সভ্যতা গড়ে তুলতে সহযোগিতা করেছিলেন। জাহেল বা অজ্ঞরা যা করতে পেরেছিল, আমরা আধুনিক মুসলমানরা তা পারব না? যদি সবাই না পারি, আমাদের কিছু অংশ অবশ্যই পারব। যদি আমাদের মহান সভ্যতার পূনর্জাগরণ ঘটাতে নাও পারি, অন্তত মুসলিম উম্মাহর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে। এমন নয় যে, করণীয় কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য আমাদের মতপার্থক্য বিসর্জন দিতে হবে। আমাদের কেবল একটি বোঝাপড়ায় আসতে হবে, যাতে করে কতগুলো সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সমস্যা মোকাবিলার লক্ষ্যে, যেমন ধরুন, ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আমরা একত্রে কাজ করতে পারি।

যে কোন লড়াই-সংগ্রামে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সম্মিলিত ও সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ; সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন শৃংখলা। ওহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর পরাজয় ঘটেছিল, কারণ তাঁর বাহিনীর যোদ্ধাররা শৃংখলা ভেঙেছিল। আমরা জানি, এখনো আমরা নিয়ম-শৃংখলা মেনে চলতে আগ্রহী নই, অনিয়ম আর অসমন্বিত কর্মকান্ড ত্যাগ করতে রাজি নই। আমাদের সাহসী হতে হবে, কিন্তু হঠকারী, অবিমৃষ্যকারী হলে চলবে না। আমাদের শুধু আখেরাতের পুরস্কারের কথা ভাবলেই চলবে না, ইহজগতেও আমাদের কর্মের ফলাফলের কথা ভাবতে হবে।

পবিত্র কোরআন আমাদের বলে, শত্রু যখন শান্তি স্থাপনে আগ্রহ দেখায় তখন আমাদের ইতিবাচক সাড়া দেওয়া উচিত। সত্য যে, আমাদের সাথে যে চুক্তির প্রস্তাব করা হয়েছে তা আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক নয়। কিন্তু আমরা তা নিয়ে আলাপ-আলোনা করতে পারি। হুদায়বিয়াতে মহানবী (সা.) ও তাই করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরাই জয়ী হয়েছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

আমি জানি, আমার এসব চিন্তাভাবনা জনপ্রিয় হবে না। ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধরা সরাসরি নাকচ করে দিতে চাইবেন। এমন কি তারা এসব ভাবনা চিন্তার প্রতি সমর্থনকারীদের খামোশ করে দিতে চাইবেন। তারা আরো বেশি করে তরুণ তরুণীদের চূড়ান্ত শাহাদাত বরণের জন্য পাঠাতে চাইবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব কোথায় গিয়ে ঠেকবে? এপথে বিজয় আসবে না নিশ্চয়। গত ৫০ বছর ধরে ফিলিস্তিনের যুদ্ধে আমরা কোন ফসল ঘরে তুলতে পারিনি। আমরা আসলে আমাদের পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়েছি। ভেবে দেখুন, আমরা এমন এক জাতির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি যারা চিন্তা করে। ২০০০ বছর ধরে তাদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন-হত্যাযজ্ঞ চলছে, তারপরও তারা টিকে আছে, পাল্টা আঘাত করে নয়, চিন্তার সাহায্যে। তারা সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদ, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র আবিষ্কার করেছে এবং সাফল্যের সঙ্গে এগুলোর প্রচার করেছে, যাতে করে তাদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনকে বিশ্ববাসীর কাছে অন্যায় বলে মনে হয়, যাতে করে তারা অন্যদের সঙ্গে সম-অধিকার ভোগ করতে পারে। এসব দিয়েই তারা আজ বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে এবং তারা, এই ছোট্ট জনগোষ্ঠীটি এখন এক বিশ্বশক্তি হয়ে উঠেছে। আমরা শুধু বাহুবলে লড়াই করে তাদের সঙ্গে পেরে উঠব না, মগজ খাটাতে হবে।

সাম্প্রতিক সময়ে ক্ষমতার দম্ভে এবং দৃশ্যত সাফল্যের কারণে তারা উদ্ধৃত হয়ে উঠেছে। উদ্ধৃত লোকরা ক্রুদ্ধদের মতই ভুল করবে, চিন্তা করতে ভুলে যাবে। ইতোমধ্যেই তারা ভুল করতে শুরু করেছে এবং আরো ভুল করবে। আমাদের জন্য এখনও ভবিষ্যত সুযোগের জানালা খুলে যেতে পারে। এ সুযোগগুলোর আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। কথা ভালো জিনিস। কথার মাধ্যমে আমাদের ওপর যেসব অন্যায় করা হচ্ছে, তা প্রকাশ করা যায় এবং হয়তো আমাদের পক্ষে কিছু সহানুভূতি ও সমর্থনও আদায় করা যায়। এর মাধ্যমে আমাদের মনোবল, ইচ্ছাশক্তি ও শত্রুকে মোকাবিলা করার সংকল্প আরো দৃঢ় হতে পারে।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে পারি এবং আমাদের তা করা উচিত কেননা, তিনিই শেষ পর্যন্ত স্থির করবেন আমাদের জয় না পরাজয় হবে। আমাদের প্রচেষ্টায় তাঁর রহমত ও সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন কি করবেন না, আমাদের বিজয়ী করবেন কি করবেন না, তা নির্ধারিত হবে আমরা কী করব, কীভাবে করব তা দ্বারা। তিনি পবিত্র কুরআনে সূরা আর্-রাদ এর ১১ আয়াতে তা বলেই রেখেছেন।

www.nagorikpathagar.org

শুরুতেই বলেছি, সমগ্র পৃথিবী আমাদের দিকে চেয়ে আছে। সমগ্র মুসলিম উম্মাহ ইসলামী দেশগুলোর নেতৃবৃন্দের এই সম্মেলনের ওপর তাদের আশা-ভরসা ন্যস্ত করেছে। তারা চায় না আমরা এখানে কথায় ও আকারে-ইঙ্গিতে শুধু আমাদের হতাশা আর ক্রোধ ব্যক্ত করি, শুধু আল্লাহর রহমত কামনা করি। তারা চায় আমরা কিছু করি, বাস্তব পদক্ষেপ নেই। আমরা মুসলিম দেশসমূহের নেতৃবৃন্দ বলতে পারি না যে, আমাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। আমরা বলতে পারি না যে, আমাদের ধর্ম ও আমাদের উম্মাহ যখন বিপন্ন তখনো আমাদের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। আমরা জানি তা সম্ভব। অনেক কিছুই আমরা করতে পারি। আমাদের অনেক সম্পদ রয়েছে। আমাদের শুধু প্রয়োজন কাজ করার ইচ্ছাশক্তি। মুসলমান হিসাবে আমাদের ধর্মের নির্দেশনার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। যা করা প্রয়োজন তা আমাদের করতে হবে সদিচ্ছার সঙ্গে, দৃঢ় সংকল্প নিয়ে। আল্লাহ আমাদেরকে অর্থাৎ মুসলিম নেতৃবৃন্দকে শুধু নিজেদের ক্ষমতা উপভোগের জন্য অন্যদের উপরে স্থান দেননি। যে ক্ষমতা আমরা ভোগ করছি তা আমাদের জনগণের জন্য, মুসলিম উম্মার জন্য, ইসলামের জন্য। আমাদের অবশ্যই এ ক্ষমতাকে সুবিবেচনার সঙ্গে কাজে লাগাতে হবে, দূরদর্শিতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। অবশেষে একদিন আমাদের জয় হবেই ইনশাআল্লাহ।

আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, মালয়েশিয়ার পুত্রজায়ায় ওআইসির এই দশম সম্মেলন থেকে আমরা যেন একটি নতুন ও ইতিবাচক দিক-নির্দেশনা লাভ করি। আমরা যেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ, আর-রহমান, আর-রাহিমের অনুগ্রহ লাভ করি।

("ভাষনটি 'মাহথির মুহম্মদ এর ভাষন সমগ্র' বই থেকে নেয়া হয়েছে")

www.nagorikpathagar.org

প্রফেসর আবদুস সালাম (১৯২৬-১৯৯৬)

১৯৭৯ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ আবদুস সালাম প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা-দুনিয়ার পদার্থ-বিদ্‌গণের স্বপ্ন চারিটি প্রাকৃতিক বলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। আইনস্টাইন মহাকর্ষ ও বিদ্যুতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য কঠোরভাবে চেষ্টা করিলেও সফলতা লাভ করিবার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ডাঃ আবদুস সালাম দুর্বল নিউক্লিয়ার বল ও তড়িত চুম্বকীয় বলের মধ্যে সমন্বয় সাধনে সফলতা লাভ করেন ও নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। সাপ্তাহিক রোববার পত্রিকার ১৯/১০/৮০ইং তারিখের এক প্রতিবেদনে "আপনার জীবনের আনন্দ কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে ডঃ সালাম বলেন-

"বিজ্ঞান ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে কোন বিরোধ খুঁজিয়া পাই নাই। আল্লাহ্ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন সৌন্দর্য, সামঞ্জস্য ও হারমনির (ঐক্য) আইডিয়া নিয়া। ইহার সঙ্গে রহিয়াছে রেগুলারিটি (নিয়মানু-বর্তিতা)। এখানে কেওসের (বিশৃঙ্খলা) কোন স্থান নাই। কুরআন প্রাকৃতিক সূত্রগুলির উপর বারবার জোর দিয়াছে। আমরার বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনায় তাই ইসলামের ভূমিকা বিরাট। আল্লাহ্ কি ভাবিয়াছেন আমরা তাহাই অনুসন্ধান করিয়া বোঝার চেষ্ট করিতেছি। অবশ্য তাহার চিন্তা-ভাবনার অতি সামান্যই উদ্‌ঘাটন করিতে সক্ষম হইয়াছি আমরা। যতটুকু পারিয়াছি তার মধ্যেই সৃষ্টিকর্তার সত্যতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমার নিজের ক্ষেত্রে বলিতে চাই, ৭৫০ থেকে ১২০০-খ্রীষ্টবাদ্ পর্যন্ত বিজ্ঞান ছিল ইসলামিক। বিজ্ঞানের জগৎ তখন ছিল মুসলমানদের হাতেই। আমি সেই স্বর্ণযুগের ঐতিহ্যই ধারণ করিয়া আগাইয়া চলিয়াছি।"

কণা-পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন অংশে আব্দুস সালাম তাঁর প্রতিভার কালজয়ী স্বাক্ষর রেখেছেন প্রায় পঞ্চাশ বছরের নিরলস গবেষণার মাধ্যমে। এই সেই ঝাং-এর পাঞ্জাবী কিশোরের কাহিনী যে একজন সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানী হয়ে উঠেছেন। কিন্তু আরো একজন আব্দুস সালাম আছেন যিনি সবচেয়ে আধুনিক ইহজাগতিক মানুষ, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যিনি সমান দক্ষ এবং তৃতীয় বিশ্বের বিজ্ঞান সংগঠনের জন্যে একজন অক্লান্তকর্মী মানুষ-যাঁর স্বদেশ হল সারা পৃথিবী।

আব্দুস সালাম তাঁর নিজের দেশের বিজ্ঞানের জন্যে উল্লেখযোগ্য কিছু না করতে পারলেও তাঁর সহকর্মী বিজ্ঞানীদের তিনি কখনও ভোলেন নি। ১৯৫৫ সালে জাতিসংঘ

www.nagorikpathagar.org

কর্তৃক আহত শান্তির জন্যে পরমাণু সম্মেলনের তিনি বৈজ্ঞানিক সচিব ছিলেন। ঐ বিখ্যাত সম্মেলন অনেকের মতো সালামকেও অভিভূত করেছিল এবং মানুষের উপকার করার বিশ্ববিজ্ঞানের অপূর্ব ক্ষমতা তিনি প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেছিলেন। পদার্থবিজ্ঞানের জন্যে একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের চিন্তা এখান থেকেই তাঁর মনে আসে এবং তৎকালীন পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে পরে আন্তর্জাতিক পারমাণবিক সংস্থায় তিনি এ ধরনের কেন্দ্র স্থাপন করার প্রস্তাব করেন। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তাঁকে এ ব্যাপারে নানা দেশে অক্লান্তভাবে লবি করতে দেখেছি এবং ট্রিয়েস্টের পিয়াৎসা ওবারডানে যখন এই কেন্দ্রটি প্রথম স্থাপন করা হয় সেসব দিনের স্মৃতি আজো আমাদের অনেকের মনে উজ্জ্বল। প্রথম দিকে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এমন কি ভারতও এই কেন্দ্রের ব্যাপারে উৎসাহী ছিল না এবং কোন কোন দেশ সক্রিয়ভাবে এর বিরোধিতা করেছে যদিও পরবর্তীকালে এসব দেশই এই কেন্দ্রের সুযোগসুবিধা ভোগ করেছে সবচেয়ে বেশি। সেদিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কেন্দ্রের খরচের বেশিরভাগই যুগিয়েছে ইটালী সরকার, তাঁরাই কেন্দ্রের জন্যে এড্রিয়াটিক সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের ওপরে এমন একটি অপূর্ব আন্তর্জাতিক কেন্দ্র তৈরি করে দিয়েছেন যার তুলনা মানুষের ইতিহাসে আর নেই। বিজ্ঞানের মানচিত্রে এই আন্তর্জাতিক কেন্দ্রকে চিরস্থায়ী করার কৃতিত্ব অবশ্য আব্দুস সালামের এবং তাঁর সহকর্মীদের, যাঁদের মধ্যে বুডিনিচ, ফ্রেন্সডাল, বারুট, স্ট্র্যাডডি এবং ডেলবুর্গোর নাম অবশ্যই করতে হয়। তাঁরাই বিশ্বের প্রথম সার্থক আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী।

ট্রিয়েস্ট কেন্দ্রে সারা পৃথিবী থেকে অসংখ্য বিজ্ঞানী আসেন। এখানে তাঁরা আসেন নতুন জ্ঞান লাভের জন্যে এবং তাঁদের নিজেদের বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলতে-যা গবেষণার জন্যে অবশ্য প্রয়োজনীয়। এভাবেই ট্রিয়েস্ট কেন্দ্র 'মগজ পাচার' বন্ধ করবে আশা করেছিলেন আব্দুস সালাম। সেটা অবশ্য হয় নি কিন্তু সেজন্যে তাঁকে দোষ দেয়া যায় না। তৃতীয় বিশ্বের অতলস্পর্শী দারিদ্র্যের কবল থেকে মেধাবী তরুণ-তরুণী মুক্তি পেতে চাইবে এর মধ্যে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই এবং এই দারিদ্র্যের নাগপাশ থেকে মেধাবী বিজ্ঞানীকে রক্ষা করা একটি মাত্র কেন্দ্রের পক্ষে যে সম্ভব নয় এটা আব্দুস সালামও বোঝেন। তাই তিনি এখন সারা পৃথিবীতে এই ধরনের অন্তত বিশটি কেন্দ্র স্থাপন করার জন্যে প্রস্তব করেছেন-যার মধ্যে বাংলাদেশের নামও আছে।

আসলে অনুন্নত দেশগুলি বিধ্বস্ত অবস্থা সম্বন্ধে আব্দুস সালাম যেমন আন্তরিকতার সঙ্গে মর্মস্পর্শী ভাষায় সোচ্চার তেমন বোধ হয় আর কেউই নয়। ষ্টকহোল্‌ম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সামনে তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক শোষণের কথা বিশদভাবে

www.nagorikpathagar.org

ব্যাখ্যা করার পর আব্দুস সালাম ওমর খৈয়ামের এই কয়েকটি পঙক্তি আবেগের সঙ্গে বলে উঠেছিলেন–

আঃ ভালবাসা! তুমি আর আমি ভাগ্যের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে

দুঃখজনক সব ব্যাপারের নক্‌শা যদি একত্র করতে পারতাম,

তাহলে কি আমরা এ সব কিছু ভেঙে টুকরো টুকরো করতাম না?

আর তারপরে আমাদের অন্তরের অন্তরতম ইচ্ছা অনুসারে

আবার তা নতুন করে গড়ে তুলতাম না?

তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্য তাঁকে গভীরভাবে ব্যথিত করে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করেই যে দারিদ্র্যের অভিশাপ মোচন করা যায় একথা তিনি দেশে দেশে চারণকবির মতো বলে বেড়িয়েছেন। তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, "আমার কাছে সবসময় অত্যন্ত আশ্চর্য লেগেছে যে, ধনী দেশের কত অল্পসংখ্যক ব্যক্তি পৃথিবীর দারিদ্র্যের তীব্রতা সম্বন্ধে বাস্তবিকই সচেতন।"

তিনি বিজ্ঞানকে পেশা হিসেবে কখনই দেখতে চান নিসারাদেশের জীবনযাত্রার মান দ্রুত উন্নয়নের জন্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাই তিনি সারাজীবন বলেছেন। তিনি বলেছেন, "আমাদের সকলের বোঝা উচিত যে, এই বিজ্ঞান মোটেই চটকদারী প্রকৃতির নয়; এখানে প্রধানত দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের কথাই বলা হয়। অতিপরিচিত প্রযুক্তির কিছু কিছু দক্ষতা অর্জনের এটা এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া। আমাদের মানবিক এবং বস্তুগত যে সম্পদ রয়েছে তারই সবচেয়ে ভাল প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবহারের চিন্তাশীল হিসাব-নিকাশই হল এই বিজ্ঞান।"

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জনের এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় যদি তৃতীয় বিশ্ব একদিন সত্যিকারের সাফল্য অর্জন করে তবে তখন আব্দুস সালামের নাম অবশ্যই গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হবে, এখন যেমন তাঁর নাম কণা-পদার্থবিজ্ঞানে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হ। ১৯৯৬ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

(সূত্রঃ সপ্তাহিক রোববার ১৯/১০/৮০ সংখ্যা)

www.nagorikpathagar.org

আর্নেস্তো চে গুয়েভারা (১৯২৮-১৯৬৭)

১৯৬৭ সালে উৎস অক্টোবর নিরস্ত্র অবস্থায় নয়নি গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল বন্দী চে গুয়েভারাকে। সেই নয়টি গুলিতে মারা যায়নি চে'র মতবাদ। জন্ম আর্জেন্টিনায়, ১৯২৮ সালে। মেহনতী মানুষের জন্য ছিলেন আজন্ম বিপ্লবী।

আজন্ম বিপ্লবীর পুনর্জন্ম

৯ অক্টোবর, ১৯৬৭। বলিভীয় সেনাবাহিনী দম্ভভরে ঘোষণা করল, তারা হত্যা করতে পেরেছে চে গুয়েভারাকে। হত বাঁধা অবস্থায় একে একে নয়টি গুলি চালিয়ে আর্জেন্টাইন সেই 'সন্ত্রাসী'কে মেরে ফেলতে পেরেছে এক মদ্যপ সৈনিক। বলিভীয় সেনাবাহিনীর এমন 'মহা সাহসী কর্মে উল্লসিত নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকা সে সময় লিখেছিল, একজন মানুষের সঙ্গে সঙ্গে একটি মিথও চিরতরে বিশ্রামে চলে গেল।' সেদিনের সেই লেখক কি বেঁচে আছেন? বেঁচে থাকলে আজ লজ্জায় তাঁর মুখ লুকানোর কথা। কারণ সেই মানুষটি আসলে মরেননি, মরেননি তাঁর মতাদর্শও। খোদ ইউরোপ-আমেরিকাতেই বিয়ার, ফুটবল, পানি, ড্রিংকস-সবকিছুর বুকে এক সেই 'সন্ত্রাসী'র ছবি। পণ্যের ছবি দিয়েও অমর মানুষ চে গুয়েভারা। আর বলিভিয়া, কিউবা, আর্জেন্টিনা, ভেনেজুয়েলা, কানাডা, ফিলিস্তিন থেকে শুরু করে নেপাল, এমনকি বাংলাদেশ পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষের বদলের স্বপ্ন হয়ে আছে অমর চে গুয়েভারার আদর্শ, চে'র মিথ!

মানুষ চে গুয়েভারা মারা গেছেন চার দশকেরও বেশি সময় আগে। কিন্তু এই একবিংশ শতাব্দীতে পা দিয়ে আমরা পরম বিস্ময়ে লক্ষ করছি, তিনি আরও বেশি করে মানুষের অপ্রাপ্তি-বঞ্চনার বিপক্ষে রুখে দাঁড়ানোর অনুপ্রেরণা হয়ে উঠছেন। চে গুয়েভারাকে নিয়ে গবেষণা করতে থাকা আর্জেন্টাইন এক সাংবাদিক মাইকেল ক্যাসে বলছিলেন, 'আমার মনে হয় না যে দুনিয়াজুড়ে লোক বিপ্লবী চেতনার কারণে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তবে আমাদের আর্জেন্টিনায় বা লাতিন আমেরিকায় এখন তাঁকে সত্যিকার অর্থেই অনুসরণ করা হচ্ছে।'

লাতিন আমেরিকায় চে গুয়েভারাকে বাঁচিয়ে রাখার সবচেয়ে বড় কাজটি করছেন তছার বন্ধু ও বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো। চে'র চেহারা বিপ্লবী হিসেবে মানুষের মধ্যে ধরে রাখতে অসাধারণ ভূমিকা রাখছেন ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগো শাভেজও। শাভেজ তাঁর বিভিন্ন ভাষণে বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'একুশ শতকের সমাতন্ত্রের' জন্য চাই চে'র মতো আত্মত্যাগ। সেই আত্মত্যাগ নিজে করার প্রতিশ্রুতি যেমন দেন, তেমনি তরুণদেরও ডাক দিচ্ছেন এ কাজ করতে।

www.nagorikpathagar.org

শাভেজ-কাস্ত্রোর আরেক মিত্র ইভো মোরালেসের ভূমিকা অবশ্য আরও উল্লেখযোগ্য। নিয়মিত এক অদ্ভুত খেলা হয়েই যেন বলিভিয়ার ক্ষমতায় এসেছেন আদিবাসী নেতা ইভো মোরালেস। যে বলিভিয়ায় একদিন কাপুরুষোচিতভাবে হত্যা করা হয়েছিলচে গুয়েভারাকে, সেই বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট এখন চে'র আদর্শে পথ চলছেন। প্রতিনিয়ত সবাইকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন, রোগবালাই-দারিদ্র্যের বিপক্ষে সংগ্রাম করতে চে্কে অনুসরণ করতে হবে।

আর্জেন্টিনায় এখন ছাত্রদের বিক্ষোভ কিংবা নাগরিক অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ করা হচ্ছে চে গুয়েভারার ছবিসংবলিত প্লাকার্ড হাতে নিয়ে। চে'র জন্মভূমিতে আজন্ম বিপ্লবীর এই পুনর্জাগরণ পর্যবেক্ষণ করছেন এলাদিও গঞ্জালেস। ভদ্রলোক একসময় চে'গুয়েভারা মিউজিয়াম' নামের একটি জাদুঘর চালাতেন। তিনি বলেছেন, 'এখন গুয়েভারা আমাদের এখানে সব জায়গায় আছেন। তার পুনর্জন্ম হয়েছে বলা চলে।'

অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই, আপস না করা ,চিরন্তন বিপ্লবে বিশ্বাসে; বিজ্ঞাপনের চে'কে ছাপিয়ে আদর্শিক এই চেহারা ফুটে উঠেছে উত্তর আমেরিকায়ও। কানাডায় গত বছরের জুনে আয়োজিত হয়েছিল চে বিষয়ক প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক সম্মেলন-'থিয়কার অ্যান্ড ফাইটার'। এই একুশ শতকেও চে গুয়েভারার মতাদর্শ কার্যকর কি না, এ-ই ছিল সে সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য। কানাডা, কিউবা, ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্যপ্রাচ্যের শতাধিক আলোচক অংশ নিয়েছিলেন সম্মেলনে। আলোচকেরা মোটামুটি একমত হয়েছেন, বর্তমান বিশ্বে শোষণের বিপক্ষে, কুশাসনের বিপক্ষে চে'র অনুপ্রেরণা সমান কার্যকর। এই আলোচকদের কথার প্রমাণ মিলবে নেপালের রাস্ত াঘাটে। গাড়ির বনেট, ক্যাফের সাইনবোর্ড কিংবা টি শার্ট-সব জায়গাতেই চে। সেটা কথা নয়; কথা হলো, এই দেশের তরুণ প্রজন্মের চে'কে নিয়ে চিন্তা। নেপালের রাস্তায় দৈবচয়নের ভিত্তিতে কয়েকজন তরুণকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল- কে ছিলেন? প্রায় সবার বক্তব্য ছিল 'একজন প্রলেতারিয়েত; যিনি সারা জীবন অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন।

দেশটির তরুণেরা তাদের যেকোনো আন্দোলন সংগ্রামে চে'র ছবি হাতে রাস্তায় নামতে অভ্যস্ত। তাদের বক্তব্য, এতে তারা বাড়তি অনুপ্রেরণা পায়। 'ইয়ুথ কমিউনিস্ট লিগ' নামের একটি সংগঠন সেখানে নিজেদের উদ্যোগে ট্যাক্সিক্যাব থেকে শুরু করে পাবলিক বাসে সেঁটে দিয়েছে চে'র স্টিকার। ডাক দেওয়া হয়েছে দিনবদলের। আন্দোলনকারীদের মধ্যে এই চে-প্রিয়তা লক্ষ করা যাবে ফিলিস্তিন কিংবা সুদানেও। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই দেশগুলোতেই চে'র যেন সত্যিকারের মুক্তি ঘটেছে। এসব দেশে চে আর শুধু বামপন্থীদের লড়াইয়ের হাতিয়ার হিসেবে আটকে নেই, যেকোনো অন্যায়ের বিপক্ষে যেকোনো আন্দোনকারীর প্রতীক এখানে চে। বিশ্বায়নবিরোধী কিংবা যুদ্ধবিরোধী। সমাবেশগুলোতেও এখন চে'র প্লাকার্ড। এখানেও ভিন্ন এক লড়াকু হিসেবে আবির্ভূত চে গুয়েভারা। এখানেও দাপটের সঙ্গে টিকে আছেন তিনি। তাহলে নিউইয়র্ক টাইমসই ভুলটা করেছিল? আসলে ভুলটা করেছিল চে'র হত্যাকারীরা। একটা মানুষকে মেরে একটা আদর্শ মেরে ফেলতে চেয়েছিল। তাই কি হয়।

হয়েছিল উল্টোটা। গুলিবিদ্ধ লাশের শোয়ানো ছবি প্রকাশ করেছিল বলিভিয়ার সরকার। তারা ভেবেছিল, এতে লোকজন চে'র প্রতি আকর্ষণ হারাবে। অথচ সেই

www.nagorikpathagar.org

ছবিকেই এখন বলা হচ্ছে 'ক্রুশ থেকে নামানো খ্রিষ্টের ছবি! সেই ছবিই এখন মানুষকে নতুন করে ভাবাচ্ছে।

ঠিক এই সময়টার কথাই বোধহয় মৃত্যুর মুহূর্তে কল্পনা করছিলেন চে। তাঁকে মারতে স্কুলঘরে ঢুকেছে মদ্যপ সৈনিক। চে'কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'কী ভাবছ তুমি?' চে স্মিত হেসে জবাব দিলেন, 'বিপ্লবের অবিনশ্বরতার কথা ভাবছিলাম।'

সূত্রঃ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

বিবিসি নিউজ নেপাল টাইমস ও আয়ারল্যান্ডের সোশ্যালিষ্ট ভিউ অবলম্বনে

চে' নিজের উপলব্ধির কথা লিখেছেন, "সে আরো কিছু বলেছিলেন-এখন আমি জানি, আমি জানতাম পথ নির্দেশক সত্তা মানবতাকে দুইপথে চালিত করে। আমাকে মানুষের সঙ্গে থাকতে হবে। আর আমি জানি-কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম-আমার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে, আমার বিশ্বাস আর কাজের প্রতিক্রিয়ায়। মানসিকভাবে আমি গড়ে-পিটে উঠেছি। যে কোনো শত্রু-রক্ত, ভীতি, খানা-খন্দক কিছুই আমাকে রুখতে পারবে না। আমি হাত বাড়ালেই সব শত্রু পরাজিত হবে। আর তখন আমার সত্তা উৎসর্গীত হয়েছে বিপ্লবের জন্য। ব্যক্তি, সত্তার গড়পড়তা স্তর থেকে উঠে এসেছে-ভিতর থেকে উচ্চারিত হচ্ছে শব্দ দুটি 'মিয়া কালপা'। আমি অনুভব করলাম আমার নাক ফুলে উঠেছে-আমি বারুদের গন্ধ পাচ্ছি, রক্তের গন্ধ পাচ্ছি-আমার শত্রুরা ধ্বংস হচ্ছে। আমি শরীরে হাত বুলালাম, যুদ্ধের জন্য প্রসউত, নতুন এক আশা, নতুন এক উত্তেজনা সংক্রামিত হল আমার মধ্যে-যেমন উত্তেজনা আর আশা থাকে সংগ্রামী প্রোলেতারিয়েতের মধ্যে।"

মৃত্যু আসন্ন তিনি হয়ত বুঝেছিলেন,
তাই তিনি এক চিঠিত লিখেছিলেন,

"মৃত্যু যদিও আমাদের বিস্মিত করে তবুও আমরা তাকে স্বাগত জানাই। কারন এর ফলে আমাদের যুদ্ধের হুঙ্কার অন্যদের কানে পৌঁছে যাবে এবং আরো অনেক মানুষ আমাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিবে। কেও কেও আমাদের শেষ কৃত্য করবে, মেশিনগান গান পাইবে, নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হবে এবং বিজয় আসবে।

কয়েকটি বাণী-

"Better to die standing, than live on your knees."

"It is a sad thing not to have friends but it is ever sadder not to have enemies."

"Live your life not celebrating victories but overcoming defeats."

"Words that do not match clean are unimpootant fault."

"Knowledge makes us accountable."

(ওয়েভসাইট থেকে)

চে-এর সবচেয়ে পছন্দের বাণী-

"বিপ্লব ধ্বংস নয়, সৃষ্টির প্রসব বেদনা"

www.nagorikpathagar.org

মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র (১৯২৯-১৯৬৮)

আমি স্বপ্ন দেখি

[ওয়াসিংটন ডিসিতে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র আগস্ট ২৩, ১৯৬৩ সনে ওয়াংটন ডি.সি.তে দুই লক্ষ লক্ষাধিক নিগ্রো শ্বেতাঙ্গে উপস্থিতিতে HAVE A DREAM শিরোনামের এই ঐতিহাসিক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। তাঁর স্বপ্ন আমেরিকার নিগ্রোদের স্বপ্ন হয়ে ওঠে। মহাত্মা গান্ধী'র 'Non Violent' এর অনুসারী এবং বিশ্বাসী মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র বিশ্বনেতার মর্যাদার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। এই ভাষণের ফলে নিগ্রোদের সামাজিক সমানাধিকার সহজ হয়। উল্লেখ্য, ভাষণটি আজ যুক্তরাষ্ট্রের স্কুল-কলেজের পাঠ্য বইয়ের অন্তভূক্ত। শাষিতের এই মহান নেতা মার্টিন লুথির কিং জুনিয়র (১৯২৯-১৯৬৮) যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে জন্ম নেন এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। মা ছিলেন স্কুল শিক্ষিকা। বাবা Baptis Minister. অত্যন্ত মেধাবী মার্টিন লুথার ১৯৫৫ সনে Systematic Theology- তে Ph.D শেষ করেন। স্ত্রী করেটা স্কটও কলেজে লেখাপড়া শেষ করেন।

মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র ১৯৫৪-১৯৬০ পর্যম্স্থ অ্যালবামার Baptist Church Pastor হিসেবে কাজ করেন। ১৯৬৩ সনে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাগাজিন তাঁকে MAN OF TEH YEAR নির্বাচিত করেন। পরের বছর তিনি নোবেল শান্তি পুরষ্কার পান এবং এই ধারায় তিনি সর্বকনিষ্ঠ। ৪ এপ্রিল.১৯৬৮ সালে টেনেসি'র হোটেল লবিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেন।]

আজ আমি বলি, বন্ধুগণ, যদিও হতাশায় নিমগ্ন আমাদের ভবিষ্যত, তবুও আমি স্বপ্ন দেখি। এই স্বপ্ন আমাদের সত্তার উৎস থেকে উঠে আসা স্বপ্ন। আমার স্বপ্ন প্রকৃত সত্যের মূলে এই জাতি একদিন সোজা হয়ে দাঁড়াবেঃ "আমরা এই সত্যকে স্বতঃসিদ্ধ জানি, স্রষ্টার সৃষ্টি সকলেই সমান।"

আমি স্বপ্ন দেখি একদিন–

জর্জিয়ার লাল পাহাড়ি এলাকায় প্রাক্তন ক্রীতদাসের সন্তান এবং প্রাক্তন ক্রীতদাস মনিবের সন্তাস ভ্রাতৃসজ্ঝে মিলিত হবে। আমি স্বপ্ন দেখি অন্যায় আর নিপীড়নে জর্জরিত মিসিসিপি রাজ্য একদিন ন্যায় আর মানবিক উচ্চারণের তীর্থস্থান হবে। আমি

www.nagorikpathagar.org

স্বপ্ন দেখি এমন দেশের যেখানে আমার চার সন্তান একদিন বড় হবে নিগৃহীত বর্ণের পরিচয়ে নয় বরং তাদের সত্তার বৈশিষ্ট্যে। আজ আমি স্বপ্ন দেখি।

আমি স্বপ্ন দেখি একদিন এলাবামাতে....ছোট ছোট নিগ্রো বালক এবং নিগ্রো বালিকা ছোট ছোট শ্বেতাঙ্গ বালক এবং শ্বেতাঙ্গ বালিকা হাতে হাতে রেখে আত্মার বন্ধনে মিলিত হবে। আমি আজ স্বপ্ন দেখি একদিন প্রত্যেক পাহাড় পর্বত অবনত হয়ে উপত্যকায় মিশে গেছে। আঁকাবাঁকা অসমতল পথগুলো সরল মসৃন পথে পরিণত করা হয়েছে....।

এই আশা আর বিশ্বাস নিয়ে আমি ফিরে যেতে চাই দক্ষিনে। এই সত্যকে বুকে রেখে হতাশার গ্লানি মুখে আমরা প্রত্যাশার স্তম্ভ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো। এবং আমার বিশ্বাস আমরা একসাথে চলতে পারবো, এক সাথে সংগ্রাম করতে পারবো, আমাদের মুক্তির জন্য এক সাথে রুখে দাঁড়াতে এই আশায়, একদিন আমরা স্বাধীন হবো। সেদিন আর দূরে নয়, যেদিন সমগ্র মানুষ মুক্তির আনন্দে নতুন করে গাইবে, "জয় হে স্বাধীনতা।"

স্বাধীনতার জয়ধ্বনি হোক নিউ হ্যাম্পসায়ারের পাহাড় চূড়া থেকে।

স্বাধীনতার জয়ধ্বনি হোক কলোরডার তুষার ঢাকা শিলাস্তূপ থেকে। শুধু তাই নয় স্বাধীনতার জয়ধ্বনি হোক জর্জিয়াল শিলা পাহাড় এবং টেনেসির প্রহরী পর্বত থেকে প্রত্যেক পাহাড়, টিলাখন্ড এবং পাহাড়তল থেকে।

যেদিন স্বাধীনতা আমাদের হবে-আমরা তার ঘোষণা শুনতে পাবো প্রত্যেক মহল্লা এবং নিভৃত গ্রাম থেকে। প্রত্যেক শহর এবং প্রদেশ থেকে। তখনই আমরা সেদিনকে কাজে পাব যখন সমগ্র মানবজাতি নিগ্রো এবং শ্বেতাঙ্গ, ইহুদি এবং প্যাগান প্রোটেষ্টট্যান্ট এবং ক্যাথলিক নিগ্রো আত্মার সাথে এক হয়ে ঘোষণা করবে, "মুক্ত অবশেষে, মুক্ত অবশেষে, হে সর্বশক্তিমান আমরা মুক্ত অবশেষে।"

(সূত্র: ওয়েভ সাইট থেকে)

www.nagorikpathagar.org

শহীদ জিয়াউর রহমান (১৯৩৬-১৯৮১)

প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলাদেশের জনগণ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের কর্মসূচীকে গ্রহণ করলেও তারা এখনও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মূল দর্শনকে বুঝে উঠতে পারেনি। অপ্রিয় হলেও এটা সত্য যে দেশের জনগণ এবং দলীয় কর্মীরা দূরে থাক, দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মূল দর্শন ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারেনি।

স্বাধীনতার পরবর্তীতে আজকে আমাদের করণীয় কি? স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে দুটো জিনিস পক্ষে অবশ্যকরণীয় হয় পড়ে। প্রথমত স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলা। এখন এই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলতে হলে, একে জনগণের মাঝে পৌছে দিতে হলে, প্রয়োজন অর্থনৈতিক এবং সমাজে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী প্রণয়ন এবং যথাযথভাবে এর বাস্তবায়ন। কিন্তু একটা দল গড়ে উঠে একটি দর্শনকে ভিত্তি করে এবং সে আলোকেই বাহীত হয় বিভিন্ন কর্মসূচী। সেই দর্শনকে যদি আমরা বুঝতে না পারি তবে কমূসূচী বাস্তবায়ন দূরে থাক সামান্য আঘাত আসলে তা সামলিয়ে উঠতে পারবন না। দলীয় দর্শণ না বুঝবার যে দুর্বলতা তার ফলে আমরা অনেক জায়গায় মার খাচ্ছি এবং আপনাদের মধ্যে অনেকে বিপদগামী হয়ে লাইসেন্স পারমিটের পিছনে দৌড়াচ্ছে। কারণ, আপনারা ভাবছেন এই তো সুযোগ, কিছু করে নেই। নইলে সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যাবে। বস্তুত আমাদের দেশে রাজনীতি ব্যক্তিস্বার্থভিত্তিকই ছিলো এবং এখনও আছে। তাই আমরা পার্টির দর্শন ও দেশের স্বার্থকে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে তুলে ধরতে এখনও শিখিনি। দর্শন ব্যাপারটা আসলে কিন্তু অত্যন্ত সহজ। যদি মন পরিস্কার থাকে এবং রাজনৈতিক নিয়ত ঠিক থাকে তাহলে এটাও বুঝতে বেশি সময় লাগার কথা না। এমন কি আধা ঘন্টার মধ্যেই দলীয় দর্শন রপ্ত করা যেতে পারে। কিন্তু উদ্দেশ্যটা যদি ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের মতো অন্য কিছু হয় তবে যতই বুঝানো হোক না কেন দলীয় দর্শন কোনদিনই মগজে ঢুকবে না।

একটা কথা আমি পরিস্কারভাবে বলে দিতে চাই যে, আজ আমাদের পার্টি এমন অবস্থায় উপনীত হয়েছে যে, যদি দর্শন ঠিকভাবে বুঝে উঠতে না পারেন তবে আপনারা আগামী দিনে টিকতে পারবেন না। এতদিন যে টিকে গেছেন তা হুজুকের ফলেই সম্ভব হয়েছে। এখন সময় এসেছে, ব্যক্তিগত কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যেককে দলে টিকে থাকতে হবে। দলের যে কর্মসূচি রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়িত করতে হবে এবং পার্টিগতভাবে নির্বাচন পর্যন্ত বছর দু'য়েক আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হবে। আপনাদের অনেকে তাদের ওপর যে পার্টি যে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলো তা অক্ষুন্ন রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন।

বলাবাহুল্য, দেশের রাজনীতিতে এবং জনগণের মন মানসিকতার অনেক পরিবর্তন এসেছে। এ পরিবর্তন আমরাই ঘটিয়েছি। আমাদের রাজনীতি ও রাজনীতির ধারাতে পরিবর্তন সূচীত হয়েছে। যেমন কেউ কেউ আপত্তি করলেও আমরা 'স্বনির্ভর গ্রাম সরকার' গঠন করেছি। এর ফলে দেশ একটা রাজনৈতিক সিস্টেম লাভ করলো। এ সিসটেমের কারণে দেশ টিকে যাবে। আমি না থাকতে পারি, প্রেসিডেন্ট কে হলো না হলো তাতে কিছু যায় আসে না এবং আপনি এম. পি না থাকলে তাতেই বা কি হলো। কিন্তু এদেশ ও জাতি থাকবে, চিরদিন থাকবে। এ জন্য চাই সিসটেম। চিরকার কেউ থাকতে পারে না। তাই আমরা পার্টিকে একটা সিসটেমের মধ্যে দীর্ঘকাল চালাতে চাই। পার্টি যেমন একটা সিসটেম তেমনি সরকারও একটা সিসটেম। স্বনির্ভর গ্রাম সরকারও তাই আমাদের সামাজিক জীবনের সবচেয়ে বড় সিসটেম। "লা জেন লা কাজাদেক লাক" এর অর্ত হচ্ছে,- "আল্লাহতালাহ এক দলকে নিয়ে আরেক দলকে ব্যালেন্স করেছেন।" আর তা যদি না হতো তাহলে দুনিয়াতে ফ্যাসাদ সব সময় লেগে থাকতো। এখান থেকেই আমাদের গণতন্ত্র শুরু হয়েছে। গণতন্ত্র হলো ব্যালেন্সের একটা প্রসেস। আরবীতে আর একটা কথা আছে-, "হাম্মূল ওয়াতানমিন আল ঈমান"- অর্থাৎ, "দেশপ্রেম জাগ্রত হয় ঈমান থেকে।" তাহলে কি দাঁড়ালো? ঈমান মানে কিসের ঈমান? অর্থাৎ, আল্লাহতালার উপর ঈমান। আর তা করতে হলে দেশের প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে। আর সেটা হলো জাতীয়তাবাদ। সে জন্য বলা হয়ে থাকে যে- রসুল্লাহই (সা) সব চেয়ে বড় দেশ প্রেমিক বড় জাতীয়তাবাদী।

এখন প্রশ্ন হলো "জাতীয়তাবাদ কি?" ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় এ বিশ্বের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের জাতীয়তাবাদ এর উন্মেষ ঘটেছে। 'রেসিয়াল' বা জাতিভিত্তিক জাতীয়তাবাদের কথা এ প্রসেঙ্গ সর্ব প্রথমেই এসে যায়। আরব ন্যাশনালিজমের কথা আজ সর্বজন বিদিত। এর ভিত্তিতে জন্ম নিয়েছে 'আরব লীগ'। মিশরের পরলোকগত প্রসিডেন্ট গামাল আবদাল নাসের আরব জাতীয়তাবাদকে একটা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'আরব জাতীয়তাবাদ' আজও আছে এবং সমগ্র বিশ্বে গর্বের সঙ্গে মাথা উঁচু করে আছে।

এরপর আসে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের কথা। বাঙালি জাতীয়তাবাদের শ্লোগান এ ধ্যান-ধারণা থেকেই উৎসারিত। এ কারণেই আওয়ামী লীগরা 'বাঙালি

www.nagorikpathagar.org

জাতীয়তাবাদ'-এর স্বপ্নে এখনও বিভোর রয়েছে। আবার মুসলিম লীগ, আইডিএল এবং জামাতিরা বলে থাকে-ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের কথা। এ শতকের গোড়ার দিকে জামাল উদ্দিন আফগানি প্যান ইসলামি ইজমের যে শ্লোগান তোলেন ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনা উৎস সেখানে থেকেই। সত্যি করে বলতে গেলে বলতে হয়, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই ধর্মভত্তিক জাতীয়তাবাদের নামে Politics of Explaytation 'পলিটিক্স অব এক্সপ্লয়টেশন' পাকিস্তানকে এক রাখতে পারলো না। প্রতিষ্ঠিত হলো স্বাধীন স্বার্বভৌম বাংলাদেশ।

একটি অঞ্চলকে ভিত্তি করে রাজনীতি চলতে পারে, গড়ে উঠতে পারে এক নতুন জাতীয়তাবাদ। এক্ষেত্রে ইইসি-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ইইসি-এর রয়েছে পার্লামেন্ট অর্থাৎ ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট। এ গোষ্ঠীভূক্ত দেশগুলোর কারো কারো সঙ্গে স্থল যোগাযোগ পর্যন্ত নেই। কিন্তু বিভিন্ন সূত্রে তারা নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রে নতুন চেতনা, নতুন ধ্যান- ধারণার উন্মেষ ঘটাতে সমর্থ হয়েছে। নিজেদের একটা স্বতন্ত্ররূপ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। মোটামুটিভাবে একথা বলা যেতে পারে যে, তারা 'জাতীয়তাবাদ'- এর পথে ধাবিত হচ্ছে। অন্যদিকে যুদ্ধ ও জাতীয়তাবাদের একটা প্রক্রিয়া হতে পারে। তবে তা কম্পোলসারি বা অত্যাবশ্যক নয়।

এসব উপাদানগুলোর সমন্বয়েই 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' গড়ে উঠেছে। তাই আমরা বলি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। আমাদের আছে জাতিগত গৌরব ও রয়েছে সমৃদ্ধশালী ভাষা এবং আছে ধর্মীয় ঐতিহ্য। ভৌগোলিক অবস্থান হিসেবে আমরা এক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের বাসিন্দা। আমাদের আছে নতুন অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার স্বপ্ন। আর এসব রক্তাক্ত স্বাধীনতা যুদ্ধের অবগাহিত। একটা জাতীয়তাবাদ চেতনার মধ্যে এত উপাদানের সমাবেশ ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি।

তাই কেউ যদি বলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ধর্মকে অবলম্বন করে হচ্ছে না তবে বুল হবে। ধর্ম বিশ্বাস বা ধর্মের প্রতি অনুরক্ত থাকা বাংলাদেশী জাতির এক মহান ও চিরঞ্জীব বৈশিষ্ট্য। সেই সঙ্গে পবিত্র কোরআনে বলা আছে,- "লা ইকরা ফিদ্দীনেঃ, অর্থাৎ, "ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। সুতরাং, 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' একদিকে যেমন ধর্ম ভিত্তিক নয়, তেমনি আবার ধর্মবিমুখও নয়। এ জাতীয়তাবাদ প্রত্যেকের ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মীয় অধিকারকে নিশ্চিত করে। একই সঙ্গে কেউ যদি বলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ কেবল মাত্র ভাষা ভিত্তিক তবে সেটাও ভুল বলা হবে। আবার কেউ যদি বলে আমাদের কেবল মাত্র একটা অর্থনৈতিক কর্মসূচী রয়েছে কিন্তু কোন দর্শন নেই সেটাও ভুল। আমাদের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের

www.nagorikpathagar.org

ফিলসপিতে এবজরশন পাওয়ার আছে। এলবো রুমও রয়েছে। যদি কোথাও ঘাটতি থাকে অন্যটি থেকে এনে সেটা পুরো কর দিতে বা নিতে পারবেন। আমাদের অলটারনেটিভ আছে। সে কারণেই আমরা টিকে আছি। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ক্রমেই জনপ্রিয়তা লাভ করছে।

এবার কিছু সমস্যা, কিছু হুমকি প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক। দেশ ও জাতি মূলত সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ ও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ প্রভৃতির দ্বারা আজও হুমকির সম্মুখীন। এসবের কারণেই দু'শত বছর আমরা পরাধীন ছিলাম। এ ম্যাশিনগুলোই আমার, আপনার উপর চালানো হয়েছিলো। এ হুমকি এখনো আছে। কিন্তু যদি আপনারা গণপ্রতিনিধি হিসাবে পরিপূর্ণভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন, পার্লামেন্টের ভেতরে ও বাইরে যদি কর্তব্যনিষ্ঠ হোন তবে কেউ কিছু করতে পারবেন না। এ হুমকিগুলোকে যথার্থভাবে মোকাবেলা করতে হলে টার্গেট নিতে হবে জনগণকে সচেতন এবং সংগঠিত করে তোলার। জাতীয়তাবাদের টার্গেট হবে জনগণ। কারণ, জনগণ সকল শক্তির উৎস। এ জন্যই আমরা গ্রামে গ্রামে সংগঠন করছি। প্রতিষ্ঠা করেছি সামাজিক অর্থনৈতিক স্বনির্ভর গ্রাম সরকার।

প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক জাতির একটা স্বপ্ন থাকে। তেমনি আমাদের মনেও রয়েছে অনেক স্বপ্ন। সে স্বপ্নই হলো দর্শন। এ দর্শন দিয়েই 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' বাস্তবায়িত করতে হবে। এ স্বপ্ন আমরা কিসের স্বপ্ন দেখছি? আমরা স্বপ্ন দেখছি একটা শোষণ মুক্ত সমাজ গঠনের, সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে সকলের অধিকার নিশ্চিত করার। তাই স্বপ্ন হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য, চরম লক্ষ্যও বলতে পারেন। দলের চরম লক্ষ্য থাকবে কি থাকবে না এ প্রশ্নে মতভেদ কারো মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে। এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য অত্যন্ত পরিস্কার, চরম লক্ষ্য অবশ্যই থাকতে হবে। তবে সেই চরম লক্ষ্য প্রয়োজনে রদবদল করতে হবে। একইভাবে দর্শনের ক্ষেত্রেও মাঝে মধ্যে ফিগার চেঞ্জ করতে হবে নতুবা আপনারা আমরা সবাই আউট অব টাইমস হয়ে যাবো। এ কারণেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে বিশেষ করে রাশিয়ায় এখন উন্নয়ন তৎপরতায় ভাটার টান চলেছে। কারণ তারা মানুষের এনার্জিকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করছে না। এখন তারা সিলিং-এ পৌঁছে গেছে। ফলে হিউম্যান এনার্জি সেখানে স্টেইল হয়ে যাচ্ছে। চায়না (চীন) সেটা বুঝতে পেরে তাদের বিভিন্ন ব্যবস্থায় রদবদল ঘটিয়েছে। এ রদবদল প্রত্যক্ষভাবে দেখার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। বছর দু'য়েকের মধ্যে তারা অজস্র রদবদল ঘটিয়ে ফেলেছে। তারা দর্শনটাকে ঠিক রেখে দর্শনের এপ্লিকেশন এবং একসটেন্ড গুলোতে রদবদল ঘটাচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

দুনিয়া প্রত্যেকদিন একই থাকে না। এ মুহূর্তে দুনিয়াটা যে অবস্থায় আছে কালকে তা থাকবে না। প্রকৃতিতেও বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন সূচীত হয়। আল্লাহ তালা যখন নেচারই চেঞ্জ করছে তখন আপনার টার্গেটগুলোকে চেঞ্চ করবে না কেন? আপনার চাহিদার ক্ষেত্রেও তো রদবদল রয়েছে। দশ বছর বয়সে আপনার যে চাহিদা ছিলো ২০ বছর বয়সে তা নেই এবং ৪০ বছর বয়সে চাহিদার প্রেক্ষিতে তখন ভিন্নতর হয়ে যাবে। কারণ সোসিয়ালিজম বলতে আমরা বোঝাতে চাই সুষমবন্টন অর্থাৎ আমাদের উদ্দেশ্য ন্যায় নীতি ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। আমাদের দেশে মানুষে মানুষে আয় এবং সম্পদের ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে ম্যান টু ম্যান ডিসপ্যারিটি- অন্তত" বেতন কাঠামোর দিক দিয়ে অনেক বেশি। তাই আমাদের শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করতে হলে আমাদেরকে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। খালি পেটে দর্শন হয় না, কাজ করা যায় না। রাজনীতি তো করা যায়-ই না। তাই সর্বক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

আমাদের দর্শনের মধ্যে ধর্মীয় দর্শনও অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। খালি ইহজগতের কথা ভাবলেই চলবেনা, পরলোকের কথাও ভাবতে হবে। সুতরাং আমরা মানুষকে যে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শন দিতে যাচ্ছি তাতে তিন ধরনের খোরাক আছে। যেমন-

১। ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য অন্ন সংস্থানের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির আহ্বান।

২। স্বাবলম্বী জীবন- যাপনের জন্য অনুপ্রেরণা।

৩। পারলৌকিক জগতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে আত্মার শান্তি অর্জনের প্রচেষ্টা।

এ কারণেই আমরা বলছি ধর্মের এলিমেন্ট যদি রাজনীতিতে না থাকে তবে সেটা ভুল হবে। 'সেকুলার স্টেট' বলে অনেক দেশের পরিচয় দেয়া হয়ে তাকে। উদাহরণস্বরূপ ইংল্যান্ডের কথাই ধরা যাক। ১৯৭৭ সালে গিয়েছিলাম 'কমনওয়েলথ সিলভার জুবিলি' উৎসবে। কথায় কথায় বাইবেল। কোন কিছুই শুরু হয় না বাইবেল ছাড়া। তারা সেকুলার হলো তাহলে কোথায়? এরপর আসুন প্রতিবেশী ভারতের কথায়। সারা দুনিয়ায় 'সেকুলার স্টেট' বলে সে নিজেকে পরিচয় দিচ্ছে। কিন্তু আসলে কি তাই? না, আমার মতে ভারত সেকুলার নয়। একজন ভারতীয় সাংবাদিককে বলেছিলাম এ কথা। বলেছিলাম- 'ভারতে উঠতে বসতে চলতে ফিরতে সর্বক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মমত প্রতিপালন করা হচ্ছে। অন্য দর্শাবলম্বীদের যথার্থ মর্যাদা দেওয়া হয় না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিবছর কতশত সংখ্যালঘু মারা যায়।' এতে উক্ত সাংবাদিক রুষ্ট

www.nagorikpathagar.org

হলেন। কিন্তু রুস্ট হলে কি করা যাবে? আমাদের সাধারণ মানুষের চেয়ে ভারতীয়দের অবস্থা ভালো না হলেও তারা এটমবোম, ট্যাংক বানিয়ে চলেছে।

আমাদের কথা হলো, মানুষের হাত পা বেঁধে কোন কিছু করাতে চাই না। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে এখানেও আমাদের পার্থক্য। তারা মানুষকে কাজ করতে বাধ্য করে আর আমরা জনগণকে জনগণের শক্তিকে দেশ গঠনের কাজে স্বেচ্ছা প্রণোদিতভাবে লাগানোর জন্য অনুপ্রাণিত করি, উদ্‌বুদ্ধ করি। এ জন্য আমরা বলি সমগ্র স্বাধীনতার কথা। স্বাধীনতার অর্ত এ নয় যে, যার যা খুশি তাই করবে। স্বাধীনতার পাশাপাশি দায়িত্ব বলতে একটা শব্দ আপনা-আপনি এসে যায়। আপনাদের স্বাধীনতা আছে অথচ দায়িত্ব পালন করছেন না। আসলে গলদ এখানেই। আপনাদের কেউ কেউ এথিকস্ ফলো করছেন আবার কেউ কেউ করছেন না। তাই আমরা আমাদের জনশক্তিকে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগাতে পারছি না। কারণ আমাদের মানুষগুলো সংগঠিত নয়। আমরা বলি গ্রামে মাছ আছে, পানি আছে, স্বপদ আছে এবং মানুষও আছে। কিন্তু এগুলোর মধ্যে সমন্বয় নেই। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন হিসাবে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার গঠন করেছি। গ্রামে সব কিছুই আছে, কিন্তু নেতৃত্ব নেই। সোসিও ইকনমিক ফ্রিডম থাকতে হবে এবং এ জন্য চাই সংগঠন। গ্রাম সরকার গঠনের পেছনে এ লক্ষ্য ক্রিয়াশীল রয়েছে।

স্বনির্ভর গ্রাম সরকার হলো বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শনের প্রোডাকশন। অবশ্য হালে দাবিদার দু'একজন বেরিয়ে গেছে। আওয়ামী লীগ দাবি করছে যে এটা নাকি তাদের কর্মসূচী ছিলো। জাসদও বলছে এটা নাকি তাদের লক্ষ্য। আমি কিন্তু এর আগে এদের মুখে এ ধরনের কোন কথা শুনিনি। সে যাই হোক- মানুষ, দেশের মানুষ জানে স্বনির্ভর গ্রাম সরকার বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শনের প্রোডাকশন এবং আমরা এটাকে রূপ দিয়েছি।

দর্শন হলেই তো শুরু চলবে না। তা বাস্তবায়নে সংগঠন চাই। এ জন্য রাজনৈতিক সংগঠনের পাশাপাশি স্বনির্ভর গ্রাম সরকার এবং তারই সঙ্গে গ্রাম প্রতিরক্ষা দল গঠন করা হয়েছে। আর সব কিছু মিলেই আমরা শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের ডাক দিয়েছি। '৭১-এর মতো রক্তাক্ত বিপ্লবের প্রয়োজন নেই। আজ প্রয়োজন দেশ গঠনের। আর তার জন্য চাই আভ্যন্তরীণ শান্তি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের ধাঁচে দেশ গঠন- তাই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

www.nagorikpathagar.org

শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের রূপরেখা নিম্নরূপঃ

১। জাতীয় স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্বকে সুসংহত করা।

২। কৃষি সংস্কার।

৩। শিক্ষা সংস্কার।

৪। পরিবার পরিকল্পনা।

৫ শিল্প উৎপাদন ও বিদ্যুতায়ন।

৬। সমাজ সংস্কার।

৭। প্রশাসনিক সরকার।

৮। ধর্ম।

৯। আইন সংস্কার।

১০। শ্রম আইন সংস্কার।

১১। নারী–পুরুষ নির্বিশেষে জনশক্তির উন্নয়ন।

১২। খনিজ তথা সকল প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ।

১৩। সংস্কৃতিক বিকাশ সাধন।

এগুলো হলো আমাদের বৈপ্লবিক কমৃসূচীর মূল ব্যাপার। কোন স্পপ্নের কোন লক্ষ্যের জন্য এ বিপ্লব? অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মানুষের এ পাঁচটি মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা কায়েমই হলো আমাদের স্বপ্ন। –'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের–এর মূল লক্ষ্য।' (কিছুটা সংক্ষেপিত)

(শহীদ জিয়ার বিরচিত প্রবন্ধ–ভাষণ,; বই যুগস্রষ্ট শহীদ জিয়াউর রহমান; পরশমনি প্রকাশনী, ঢাকা; পৃ: ৩৪ হতে সংগৃহীত)

www.nagorikpathagar.org

বারাক হোসেন ওবামা (১৯৬১-----)

কায়রো ভাষণের পুরো বিবরণ

আস্‌সালামু আলাইকুম

আপনাদের ধন্যবাদ এবং শুভ অপরাহ্ন। আমি এইকালোত্তীর্ণ কায়রো নগরীতে এসে এবং দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের আতিথেয়তায় সম্মানিত বোধ করছি। হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে আলআজহার ইসলামি শিক্ষার আলোকবর্তিকা হয়ে থেকেছে এবং এক শতকেরও অধিকাল ধরে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় মিসরের অগ্রগতির উৎস হয়ে থেকেছে এবং একত্রে আপনারা ঐতিহ্য ও প্রগতির মধ্যে এক ধরনের ঐকতানের প্রতিনিধিত্ব করেন। আমি আপনাদের এবং মিসরের জনগণের আতিথেয়তার জন্য কৃতজ্ঞ এবং আমি মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য আমেরিকার জনগণের জন্য শুভেচ্ছা এবং শান্তির শুভ কামনা বহন করতে পেরে গর্বিত বোধ করছি। আস্‌সালামু আলাইকুম।

আমরা যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের মধ্যে একটি প্রচন্ড উত্তেজনার মুহূর্তে মিলিত হয়েছি, যে উত্তেজনার শেকড় গ্রথিত রয়েছে ঐতিহাসিক উপাদানের মধ্যে যা কিনা নীতি সম্পর্কিত যে কোনো চলমান বিতর্ককে অতিক্রম করে যায়। ইসলাম ও পশ্চিমের মধ্যকার সম্পর্কের মধ্যে যেমন রয়েছে সহাবস্থান ও সহযোগিতা, তেমনি রয়েছে সঙ্ঘাত ও ধর্মযুদ্ধের ঘটনাও। আরো সম্প্রতিককালে এ উত্তেজনায় ইন্ধন জুগিয়েছে উপনিবেশবাদ যা কিনা অনেক মুসলমানকে তার অধিকারও সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে। আর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোকে, তাদের নিজেদর আকাঙ্খার প্রতি কোনো তোয়াক্কা ছাড়াই প্রায়ই শীতল যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। তা ছাড়া আধুনিকতা ও বিশ্বায়নের কারণের যে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার ফলে অনেক মুসলমানই পশ্চিমকে ইসলামের ঐতিহ্যের প্রতি বৈরী বলে গণ্য করেছে।

সহিংস উগ্রপন্থীরা এসব উত্তেজনাকে একটি ক্ষুদ্র অথচ সম্ভাবনাময় সংখ্যালঘু মুসলিমদের মধ্যে ব্যবহার করেছে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের আক্রমণ এবং অসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে সহিংসতায় লিপ্ত হতে এসব উগ্রপন্থীর অব্যাহত প্রচেষ্টার কারণে আমার দেশেরও কিছু লোক ইসলামকে আমেরিকা ও পশ্চিমা দেশগুলোর প্রতিই কেবল নয়, মানবাধিকারেও প্রতি বৈরি বলে গণ্য করেছে। এর ফলে আরো আশাঙ্কা ও অবিশ্বাস যুক্ত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

যে পর্যন্ত আমাদের আমদের সম্পর্ক আমাদের মধ্যকার বিভেদ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হবে, আমরা তাদেরকেই ক্ষমতাশালী করে তুলব যারা শান্তির বদলে ঘৃনার বীজ বপন করেছে এবং যারা সহযোগিতার পরিবর্তে সঙ্ঘাতকে উৎসাহিত করেছে। সহযোগিতাই আমাদের সব জনগণের জন্য সুবিচার ও সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে। এই সংশয় ও মতানৈক্যের চক্র আমাদের ভাঙতেই হবে।

আমি এখানে, এই কায়রোতে এসেছি পারস্পরিক স্বার্থ ও পারস্পরিক মর্যাদাবোধের ওপর ভিত্তি করে যুক্তরাষ্ট্র ও মুসলিম বিশ্বের মধ্যে এক নতুন সূচনার সন্ধানে যার ভিত্তি হবে এই সত্য যে আমেরিকা ও ইসলাম পরস্পর থেকে পৃথক নয় এবং তাদের মধ্যে কোনে প্রতিযোগিতারও প্রয়োজন নেই। বরং তারা কোথাও কোথাও পরস্পর সম্পৃক্ত এব ংতাদের অভিন্ন নীতি রয়েছে সুবিচার ও সমৃদ্ধির নীতি; সব মানুষের প্রতি সহিষ্ণুতা ও সম্মানের নীতি। আমি জানি এই ভাষণ সম্পর্কে যথেষ্ট প্রচার হয়েছে কিন্তু কোনো একটি মাত্র ভাষণ বহু বছরের অবিশ্বাস মোচন করতে পারে না এবং এই বিকেলে আমার এই সময়সীমার মধ্যে সেসব জটিল প্রশ্নেরও আমি উত্তর দিতে পারব না যা আমাদের এই বিন্দুতে নিয়ে এসেছে। তবে আমি নিশ্চিত যে সামনে এগিয়ে যেতে হলে আমাদের খোলাখুলিভাবে পরস্পরকে সেসব কথা বলতে হবে যা আমাদের মনের মধ্যে আমরা রেখে দিয়েছি কিংবা যেসব কথা প্রায়ই রুদ্ধদ্বার কক্ষে বলা হয়। যেমনটি পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'আল্লাহার সম্পর্কে সচেতন থেকো এবং সময়ে সত্য কথা বলো।' আর আমি সেটাই আজ করার চেষ্টা করব সত্য বলার আপ্রাণ চেষ্টা করব। আমাদের সামনে যে কাজ রয়েছে, বিনীতভাবে সেটা গ্রহণ করে এবং দৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস পোষণ করে যে মানুষ হিসেবে আমরা যে অভিন্ন স্বার্থ পোষণ করি তা সেসব শক্তির চেয়েও শক্তিশালী যা আমাদের পরস্পরকে বিভক্ত করে।

আমার এই বিশ্বাসের একটি অংশ গ্রথিত আমার নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যেই। আমি খ্রিষ্টান কিন্তু আমার বাবা কেনিয়ার এমন একটি পরিবার থেকে এসেছিলেন যেখানে রয়েছে কয়েক প্রজন্মের মুসলমান। বালক বয়সে আমি ইন্দোনেশিয়ায় বেশ কয়েক বছর কাটিয়েছি এবং ভোরে, সন্ধ্যায় আমি আজানের আওয়াজ শুনেছি। তরুণ বয়সে আমি শিকাগোর জনগোষ্ঠীর মধ্যে কাজ করেছি যেখানে তাদের অনেকেই মুসলিম ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে শান্তি ও মর্যাদার সন্ধান পেয়েছে।

ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে, সভ্যতায় ইসলামের অবদানেরও কথাও আমি জানি। আলআজহার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মতো স্থানে, যা কিনা শত শত বছর ধরে শিক্ষার আলো বহন করেছে, ইউরোপে পুনর্জাগরণ এবং যুক্তি বিজ্ঞানের উন্মোষের পথ উন্মোচন করেছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের উদ্ভাবনের পথ ধরেই এলো অ্যালজেব্রা, আমাদের চৌম্বক কম্পাস এবং নৌচলাচলের সাজসরঞ্জাম, কলম ও ছাপাখানার বিষয়ে আমাদের দক্ষতা, রোগ সংক্রমণের কারণ এবং নিরাময়ের উপায় সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান। ইসলামি সংস্কৃতি আমাদের দিয়েছে রাজকীয় খিলান সুউচ্চ চূড়া, কালোত্তীর্ণ

www.nagorikpathagar.org

কাব্য, কাঙ্খিত সঙ্গীত, অভিজাত চারলিপি এবং শান্তির সাথে ধ্যান করার স্থান। আর গোটা ইতিহাসজুড়ে ইসলাম কথায় ও কাজে প্রমাণ করেছে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও বর্ণগত সাম্য।

আমি এও জানি যে, ইসলাম সব সময় আমেরিকার ইতিহাসেরও অংশ হয়ে থেকেছে। যুক্তরাষ্ট্রকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম দেশটি ছিল মরক্কো। ১৭৯৬ সালে ত্রিপোলি চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ে আমাদের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট জন অ্যাডামস দ্বিতীয় লিখেছিলেন, 'মুসলমানদের আইন, ধর্ম কিংবা তাদের শান্তির বিরুদ্ধে আমেরিকায় বৈরিতার লেশমাত্রও নেই।'

আর আমাদের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই, আমেরিকান মুসলমান যুক্তরাষ্ট্রকে সমৃদ্ধ করেছেন। তারা আমাদের যুদ্ধে লড়েছেন, আমাদের সরকারে কাজ করেছেন, নাগরিক অধিকারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন, ব্যবসা শুরু করেছেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়িয়েছেন, আমাদের ক্রীড়াক্ষেত্রে শীর্ষস্থান দখল করেছেন, নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, আমাদের উচ্চতম ভবন নির্মাণ করেছেন এবং অলিম্পিক মশাল প্রজ্বলিত করেছেন। আর এই প্রথম যখন একজন মুসলিম আমেরিকান কংগ্রেসে নির্বাচিত হলেন তখন তিনি আমাদের সংবিধান সংরক্ষণের জন্য সেই কুরআন স্পর্শ করে শপথ নেন, যেটি আমাদের অন্যতম একজন প্রতিষ্ঠাতা জনক টমাস জেফারসন তার ব্যক্তিগত পাঠাগারে রেখেছিলেন।

সুতরাং এই অঞ্চলে যেখানে ইসলাম প্রথমে নাজিল হয় সেখানে আসার আগেই আমি ইসলামকে জেনেছি তিনটি মহাদেশে। আর এই অভিজ্ঞতার কারণেই আমার এ রকম প্রত্যয় হয়েছে যে আমেরিকা ও ইসলামের মধ্যে অংশীদারিত্ব হওয়া উচিত- ইসলাম যা তার ওপর ভিত্তি করে, ইসলাম যা নয় তার ওপর ভিত্তি করে না। আর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি মনে করি এটা আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে বদ্ধমূল নেতিবাচক ধারণার বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়া।

তবে এই একই নীতি আমেরিকার সম্পর্কে ধারণার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হওয়া উচিত। মুসলমানরা যেমন ত্রুটিপূর্ণ গৎবাঁধা ধারণার মধ্যে পড়েন না, তেমনি আমেরিকাও একটি স্বার্থপর সাম্রাজের ক্রপূর্ণ গৎবাঁধা ধারণার মধ্যে পড়ে না। যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে বিশ্বে অগ্রগতির অন্যত একটি প্রধান উৎস। একটি সাম্রাজের বিরুদ্ধে বিপ্লবের মাধ্যমে আমাদের জন্ম। আমরা এই আদর্শের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হই যে সবাই জন্ম থেকে সমান এবং আমরা এসব শব্দকে অর্থবহ করে তোলার জন্য কয়েক শতাব্দী ধরে আমাদের সীমান্তের ভেতরে এবং বিশ্বব্যাপী সংগ্রাম করেছি এবং রক্তদান করেছি। আমরা বিশ্বের প্রতিটি প্রান্ত থেকে প্রত্যেকটি সংস্কৃতির উপাদানে নির্মিত এবং এই সহজ ধারণার প্রতি অনুগত, সবাই মিলে এক।

www.nagorikpathagar.org

বারাক হোসেন ওবামা নামের একজন আফ্রিকান আমেরিকার যে প্রেসিডেন্টহতে পারে এ নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছে। তবে আমার ব্যক্তিগত কাহিনী তেমন কোনো অনন্য ঘটনা নয়। আমেরিকায় সুযোগ পাওয়ার স্বপ্নটা প্রত্যেকের জন্য এখানো বাস্তবায়িত হয়নি তবে যারাই আমাদের তটভূমিতে আসেন তাদের সবার জন্যই রয়েছে সেই প্রতিশ্রুতি-তাদের মধ্যে আমাদের দেশের প্রায় ৭০ লাখ মুসলমানও রয়েছেন যাদের আয় ও শিক্ষার মান গড় আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।

তাছাড়া আমেরিকায় স্বাধীনতা ও নিজ নিজ ধর্মচর্চার স্বাধীনতা অবিভাজত বিষয়। সে জন্যই আমাদের দেশের প্রতিটি রাজ্যে মসজিদে রয়েছে এবং ১২০০-এরও বেশি মসজিদ আছে গোটা দেশে। সে কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের সরকার নারী ও মেয়েদের হিজাব পরার অধিকার সংরক্ষণের জন্য এবং যারা তা মানে না তাদের শাস্তির জন্য আদালতে শরনাপন্ন হয়েছে।

সুতরাং এ বিষয়ে কোনো সংশয় যেন না থাকে যে ইসলাম আমেরিকার অংশ। আর আমি বিশ্বাস করি, আমেরিকারভেতর সেই সত্যটি রয়েছে যে বর্ণ, ধর্ম এবং জীবনের অবস্থান নির্বিশেষে আমরা সবাই অভিন্ন আশা পোষণ করিঃ শান্তি ও নিরাপদে বসবাস করার, শিক্ষা অর্জন করার এবং মর্যাদার সাথে কাজ করার। আমাদের পরিবার, আমাদের জনগোষ্ঠী এবং আমাদের স্রষ্টাকে ভালোবাসার। এই বিষয়গুলো আমাদের মধ্যে অভিন্ন এবং এটি হচ্ছে সব মানবতার আশা।

আমাদের এই অভিন্ন মানবতাকে স্বীকার করা হচ্ছে আমাদের কাজের সুচনা। এই প্রয়োজনীয়তাগুলো তখনই কেবল মেটানো সম্ভব হবে যখন আমরা আগামী দিনগুলোতে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করি এবং বুঝতে সক্ষম হই যে আমাদের চ্যালেঞ্জগুলো অভিন্ন, সেগুলো মোকাবেলায় আমাদের ব্যর্থতা সবারই ক্ষতি করবো।

যখন একটি দেশে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে, সমৃদ্ধি ব্যাহত হয় সর্বত্র। যখন একটি নতুন ফ্লু একটি মানুষের দেহে সংক্রমিত হয়, তখন সবাই ঝুঁকির সম্মুখীন হন। যখন একটি রাষ্ট্র পারমাণবিক অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করে তখন সবার জন্য পারমাণবিক আক্রমণের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। যখন সহিংস উগ্রবাদীরা পর্বতের এক প্রান্তে অভিযান চালায়, তখন সমুদ্রের অপর পারের মানুষের জীবনও বিপন্ন হয়। আর যখন দারফুর ও বসনিয়ার নিরপরাধ লোকদের হত্যা করা হয়, তখন আমাদের সম্মিলিত বিবেকে সেই দাগ লেগে থাকে। এ-ই হচ্ছে একুশ শতকে এই বিশ্বের অভিন্ন বিষয়।

আর এই দায়িত্ব গ্রহণটা কঠিন। কারণ মানব ইতিহাস প্রায়ই নিজস্ব স্বার্থের জন্য জাতি ও উপজাতির এবং হ্যাঁ ধর্মের, একে অপরকে দমনের ইতিহাস। তবে এই নতুন যুগে 'এ ধরনের ইতিহাস। তবে এই নতুন যুগে এ ধরণের আচরণ হচ্ছে আত্মঘাতী। আমাদের পরস্পর-নির্ভরতার প্রসঙ্গে বলা যায়, কোনো বিশ্বব্যবস্থা যদি

www.nagorikpathagar.org

কোনো একটি জাতি বা জনগোষ্ঠীকে অপরের তুলনায় তুলে ধরা তা হলে তা অনিবার্যভাবে ব্যর্থ হবে। সুতরাং অতীত সম্পর্কে আমরা যাই-ই ভাবি না কেন, আমরা যেন অতীতের আবর্তে আবদ্ধ হয়ে না পড়ি। আমাদের সমস্যাগুলো সহযোগী মনোভাব নিয়ে মোকাবেলা করতে হবে, অগ্রগতিগুলো ভাগাভাগি করতে হবে।

এর অর্থ এ-ই নয় যে আমাদের উত্তেজনার উৎসগুলোকে অগ্রাহ্য করা উচিত। বরং এর অর্থ ঠিক বিপরীত, আমাদের সমানভাবে এসব উত্তেজনার মুখোমুখি হতে হবে। আর সেই চেতনা নিয়ে আমি কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয়ে পরিষ্কার ও সহজভাবে বলতে চাই যেসব ইস্যু আমি মনে করি শেষ পর্যন্ত আমরা একত্রেই মোকাবেলা করবো। যে প্রথম বিষয়টি আমাদের মোকাবেলা করতে হবে সেটি হচ্ছে সকল প্রকারের সহিংস উগ্রবাদ।

আঙ্কারায় আমি স্পস্টত বলেছি, আমেরিকা ইসলামের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত নয়, কখনোই লিপ্ত হবে না। আমরা অবশ্য সহিংস উগ্রবাদীদের নিরন্তর মোকাবেলা করব যারা আমাদের নিরাপত্তার প্রতি বড় রকমের হুমকি। কারণ আমরাও সেসব বিষয় প্রত্যাখান করি যেগুলো যেমন নারী, পুরুষ ও শিশুদের হত্যা সর্ব ধর্মবিশ্বাসের লোকও প্রত্যাখ্যানকরেন। আর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমেরিকান জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হচ্ছে আমার প্রথম দায়িত্ব।

আফগানিস্তানের পরিস্থিতি আমেরিকার লক্ষ্য এবং একত্রে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে। সাত বছরেরও বেশি সময় আগে ব্যাপক আন্তর্জাতিক সমর্থন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র আলকায়েদা ও তালেবানকে তাড়া করেছে। আমরা ইচ্ছে করেই সেখানে যাইনি। আমরা প্রয়োজনের কারণেই গেছি। আমি জানি এখনোহ হয়তো কেউ কেউ আছে যারা হয়তো ৯/১১-এর ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন করবে এমনকি এর যৌক্তিকতাও তুলে ধরবে। তবে আসুন আমরা এ বিষয়টি পরিষ্কার করে বলি, আলকায়েদা ওই দিন প্রায় তিন হাজার লোককে হত্যা করে। এ ঘটনার শিকার হয়েছে আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের নিস্পাপ নারী, পুরুষ ও শিশু যারা কারো কোনো ক্ষতি করেনি। আর তা সত্ত্বেও আলকায়েদা নির্মমভাবে হত্যা করেছে এসব লোকজনকে, ওই আক্রমণের সাফল্য দাবি করেছে এবং এখনো ব্যাপকভাবে হত্যা করার জন্য তাদের পত্যয় প্রকাশ করেছে। অনেক দেশেই তাদের অধিকন্তু লোকজন আছে এবং তারা নিজেদের নাগাল সম্প্রসারণের চেষ্টা করছে। এটা কোনো মতামত নয় যে বিতর্ক হবে, এটা হচ্ছে বাস্তব সত্য যার মোকাবেলা করতে হচ্ছে।

এ নিয়ে ভুল করবেন না যে আমরা আফগানিস্তানে আমাদের সৈন্য রাখতে চাই। আমরা সেখানে কোনে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করতে চাই না। আমাদের তরুণ নারী-পুরুষকে হারানো আমেরিকার জন্য বেদনাবহ ঘটনা। এই সজ্ঘাত আমাদের জন্য ব্যয়বহুল এবং তা অব্যাহত রাখা রাজনৈতিকভাবেও কঠিন। আমরা প্রতিটি সৈন্যকে আনন্দের সাথে দেশে ফিরিয়ে আনতাম যদি আমরা নিশ্চিত হতে পারতাম যে আফগানিস্তানে এবং এখনকার পাকিস্তানে কোনো সহিংস উগ্রাবাদী নেই, যারা সম্ভব হলে যতসংখ্যক পারে, ততসংখ্যকা আমেরিকানকে হত্যা করবো। তবে এখনো সেই পরিস্থিতি আসেনি।

www.nagorikpathagar.org

সেই জন্যই আমরা ৪৬টি দেশের জোটের সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করেছি। আর এতে প্রচুর ব্যয় সত্ত্বেও এ ব্যাপারে আমেরিকার প্রতিশ্রুতি দুর্বল হবে না। বস্তুত আমাদের কারো এই উগ্রপন্থীদের সহ্য করা উচিত নয়। তারা বহু দেশে হত্যাকান্ড চালিয়েছে। বহু ধর্মবিশ্বাসের লোককে হত্যা করেছে এবং সবচেয়ে বেশি হত্যা করেছে মুসলমানদের। তাদের কর্মকান্ড মানবাধিকারের সাথে, দেশগুলোর উন্নয়নের সাথে সমাঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পবিত্র কুরআন আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, 'যারা নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করে, তারা যেন গোটা মানবজাতিকেই হত্যা করে।' আর পবিত্র কুরআনআরো বলছে, 'যারা কোনো ব্যক্তিকে রক্ষা করে তারা যেন গোটা মানবজাতিকেই রক্ষা করে।' একশ' কোটি লোকের এই চিরস্থায়ী ধর্ম কয়েকটি লোকের ঘৃণার চেয়ে অনেক বড়। ইসলাম উগ্রবাদে মোকাবেলায় সমস্যার অংশ নয়, এটি হচ্ছে শান্তিকে উৎসাহিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এখন আমরা এটিও জানি, শুধু সামরিক শক্তি দ্বারা পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সমস্যা সমাধান করা যাবে না। সে কারণে, আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি আগামী পাঁচ বছরের প্রতি বছর পাকিস্তানিদের সহযোগী করে ১.৫ বিলিয়ন ডলার দেয়া হবে স্কুল, হাসপাতাল, রাস্তা নির্মাণ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য এবং যাদের উচ্ছেদ করা হয়েছেতাদের সহযোগিতার জন্য শত শত মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করব। সেই কারণে আমরা আফগানদের তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ২.৮ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি সাহায্য দিতে যাচ্ছি, যাতে তারা অর্থনৈতিক উন্নতির মাধ্যমে জনগণকে এমন সেবা দিতে পারে যার ওপর জনগণ নির্ভর করতে পারবে।

আমি ইরাকের সমস্যা নিয়েও কথা বলতে চাই। ইরাক যুদ্ধ, যা আফগানিস্তান থেকে ভিন্ন। ইরাক যুদ্ধে আমরা নিজেদের ইচ্ছায় গিয়েছি যা আমরা দেশের ভেতরে এবং সমগ্র বিশ্বে চরম মতপার্থক্য গড়ে তুলেছে। তবে আমি বিশ্বাস করি সর্বোপরি ইরাকি জনগণ সাদ্দাম হোসেনের অত্যাচারী শাসনের চেয়ে অনেক ভালো আছে, আমি আরো বিশ্বাস করি, ইরাকের ঘটনাগুলো আমেরিকাকে কূটনৈকিতভাবে এবং আন্ত জার্তিক মতৈক্যের মাধ্যমে সমাধানের প্রয়োজনীয়তার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। সত্যিকার অর্থে, আমরা আমাদের একজন মহান রাষ্ট্রপতির একটি উক্তি মনে করতেপ পারি। থমাস জেফারসন, যিনি বলেছিলেন, 'আমি আশা করি আমাদের শক্তির সাথে জ্ঞানেরও বৃদ্ধি হবে এবং আমাদের শিক্ষা দেবে, আমরা যত কম শক্তি প্রয়োগ করব আমাদের শক্তি তত বৃদ্ধি পাবে।' আজ আমেরিকার ওপর দু'টি দায়িত্ব:ইরাককে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে সাহায্য করা, ইরাককে ইরাকিদের হাতে ছেড়ে দেয়া। আমি ইরাকি জনগণের কাছে এটা পরিষ্কার করে দিয়েছি, আমরা এখানে সামরিক ঘাঁটি গড়ার চেষ্টা করছি না এবং কোনো ভূমি বা সম্পদের দাবি করব না। ইরাকিদের সার্বভৌমত্ব তাদের নিজস্ব এবং সে জন্যই আমি আমাদের যুদ্ধে থাকা ব্রিগেডগুলোকে আগামী আগস্ট মাসের মধ্যে সরিয়ে আনতে আদেশ দিয়েছি। সে জন্য আমরা ইরাকের গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত সরকারের সাথে আমাদের চুক্তিকে মেনে চলব। সেই

www.nagorikpathagar.org

অনুযায়ী আমাদের সামরিক বাহিনীকে আগামী জুলাই মাসের ভেতর সব শহর থেকে সরিয়ে আনা হবে এবং ২০১২সালের মধ্যে আমাদের সব সৈন্য সরিয়ে আনা হবে।

আমরা ইরাকে তাদের নিরাপত্তা বাহিনী এবং অর্থনীতি গড়ে তুলতে সাহার্য করব। কিন্তু আমরা একটি নিরাপদ এবং স্থাতিশাল ইরাককে সহযোগী হিসেবে সহযোগিতা করব, অভিভাবক হিসেবে নয়। সবশেষে ঠিক যেমন আমেরিকা কখনোই উগ্রবাদীদের সহিংসতা সহ্য করবো না, তেমনি কখনোই আমাদের নীতি পরিবর্তনও করব না বা ভুলে যাব না। আমাদের দেশের জন্য নয়-এগারো একটি বিশাল আঘাত। এতে যে ভীতি ও ক্রোধের সৃষ্টি হয়েছিল তা বোধগম্য, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা আমাদের ঐতিহ্যও আদর্শের বিপরীতে তাড়িত করেছিল। আমি যুক্তরাষ্ট্রে শারীরিক নির্যাতন সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করি দিয়েছি এবং আগামী বছরের প্রথমেই গুয়ানতানামো বে কারাগার বন্ধ করার আদেশ দিয়েছি।

সব জাতির সার্বভৌমত্ব এবং আইনের শাসনের প্রতি সম্মান দেখিয়ে আমেরিকা নিজেকেই নিজে সুরক্ষিত করবে এবং আমরা সেটা মুসলমান সম্প্রদায়ের যারা হুমকির সম্মুখীণ তাদের সাথে সহযোগী হয়েই করব, যত তাড়াতাড়ি উগ্রপন্থীদের বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হবে, মুসলমান সম্প্রদায়ে তারা তত বেশি গ্রহণযোগ্য হারাবে এবং তত তাড়িতাড়ি আমরা সবাই নিরাপদ হতে পারব, আমেরিকার সেনাবাহিনীও তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে আসবে।

দ্বিতীয় প্রধান উত্তেজনড়া উৎস যা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে, ইসরাইল, ফিলিস্তিন ও আরব বিশ্বের মধ্যকার পরিস্থিতি। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইসরাইলের দৃঢ় বন্ধনের কথা সবারই জানা। এই বন্ধন ভাঙার মতো নয়। এটা ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সম্পর্ক, ইহুদিদের স্থায়ী নিবাসের জন্য উচ্চাভিলাষের স্বীকৃতি, যা একটি মর্মান্তিক ইতিহাস থেকে শুরু হয়েছিল, সেটাকে অস্বীকার করা যাবে না। ইহুদিরা সমগ্র বিশ্বে ধর্মীয় কারণে শত শত বছর থেকে নিগৃহীত হয়ে আসছে এবং এই ইহুদিবাদের বিরুদ্ধতার শেষ পরিণতি ছিল নজিরবিহীন হলোকাস্ট। আমি আগামীকাল বুচেনওয়ার্ল্ডে যাব, যেটি অনেক ছাউনির একটি অংশ ছিল যেখানে তৃতীয় রাইখ দ্বারা ইহুদিদের জোরপূর্বক দাসত্বে বাধ্য করা হয়েছিল, শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছিল তারপর গুলি করে এবং গ্যাস দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল । ৬০ লাখ ইহুদিকে হত্যা করা হয়েছিল যা আজকের ইসরাইলের মোট ইহুদি জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। এই সত্যকে অস্বীকার করা ভিত্তিহীন, জ্ঞানহীন এবং হিংসাত্মক। ইসরাইলকে ধবংশ করে দেয়ার হুমকি, ইহুদিদের সম্পর্কে বারবার একই ধরনের হীন মন্তব্য সম্পূর্ণ ভুল, এটা শুধু ইসরাইলিদের মনে সেই বেদনাদায়ক স্মৃতিকেই উঠিয়ে নিয়ে আসে, যা এ এলাকার মানুষের কাম্য শান্তি কে নষ্ট করে।

অন্য দিকে এ কথাও অনস্বীকার্য ফিলিস্তিনিরা মুসলমান ও খ্রিষ্টান-তারা তাদের আবাসভূমির জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। প্রায় ৬০ বছর থেকে তারা তাদের উচ্ছেদ

www.nagorikpathagar.org

অবস্থায় থাকার কষ্ট সহ্য করে আসছে, পশ্চিমতীরের শরণার্থী শিবিরে অপেক্ষা করছে, গাজা এবং অন্যান্য প্রতিবেশীদের ভূমিতে একটি শান্তিপূর্ণ নিরাপদ জীবনের জন্য অপেক্ষা করছে যা তারা কখনোই পায়নি। বড় বা ছোট যা-ই আসুক এই দখলদারির জন্য তারা প্রতিদিন এই হীনতা সহ্য করে। সুতরাং এখানে কোনো সন্দেহ থাকা চলবে না যে ফিলিস্তিনিদের অবস্থাও অসহনীয় এবং ফিলিস্তিনিদের নিজস্ব আবাসভূমিতে সম্মানের সাথে বাঁচা এবং সুযোগের আকাঙ্খা ও ন্যায্য পাওনা থেকে আমেরিকা কখনো ঘুড়ে দাঁড়াবে না।

কয়েক দশক থেকে আমরা অচলাবস্থায় আছি ঃদুই দল মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকারের দাবি, প্রত্যেকে তাদর বেদনাদায়ক স্মৃতি নিয়ে, যা তাদের আপসে আসা থেকে কৌশলে দূরে সরিয়ে রাখছে। আঙ্গুল তাক করা খুব সহজ ফিলিস্তিনিরা তুলে ধরতে পারে ইসরাইল গঠন হওয়ার কারণে তাদের মাতৃভূমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া এবং ইসরাইলিরাও তুলে ধরতে পারে নিয়মিতভাবে ইতিহাসজুড়ে তাদের ওপর নিজেদের সীমান্তের ভেরত থেকে এবং সীমান্তের ওপার থেকে সন্ত্রাসী হামলার কথা। কিন্তু আমরা এক দিক থেকে কিংবা অন্য দিকে থেকে যদি বিরোধটাই দেখি তাহলে আমরা সত্য থেকে অন্ধ থাকব। উভয় জাতির জন্য আকাঙ্খা মেটানোর একমাত্র সমাধান হচ্ছে নিজস্ব আবাভূমি, যেখানে ইসরাইলি এবং ফিলিস্তিনিরা নিরাপদ ও শান্তিতে থাকতে পারবে। সেটা ইসরাইলের স্বার্থ, ফিলিস্তিনিদের স্বার্থ এবং আমেরিকার স্বার্থ। সে জন্য আমি চাই ব্যক্তিগতভাবে এ ফলাফলের জন্য ধৈর্য নিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। রোডম্যাপ চুক্তি অনুযায়ী দলগুলো তাদের দায়বদ্ধতা পরিস্কারভাবে জানে। তাদের জন্য এবং আমাদের জন্য এখন সময় এসেছে শান্তি আনার জন্য নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করার।

ফিলিস্তিনিদের অবশ্যই সহিংসতা ত্যাগ করতে হবে। সত্য ও সহিংসতা দিয়ে প্রতিরোধ সৃষ্টি করা ভুল, এতে সফলতা আসে না। শত শত বছর থেকে আমেরিকায় কৃষাঙ্গরা দাসত্বের কশাঘাতে জর্জরিত হয়েছে, সমাজের ঘৃণ্য জাতি হিসেবে আলাদা জীবনযাপন করেছে। কিন্তু আজ তাদের এই সম অধিকার সহিংসতার মধ্য দিয়ে আসেনি। এসেছে আমেরিকার পত্তনের আদর্শের ওপর শান্তিপূর্ণ প্রত্যয় প্রকাশের মাধ্যমে। এই একই কাহিনী বলতে পারে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ এশিয়ার জনগণ: পূর্ব ইউরোপ থেকে ইন্দোনেশিয়ার জনগণ। এটা এমনই একটি কাহিনী যা একটি সহজ সত্য বলে দেয়, সহিংসতা সব প্রচেষ্টার শেষ ডেকে আনে। একটি ঘমন্ত শিশুকে রকেট মেরে উড়িয়ে দিয়ে এবং এজন বৃদ্ধ নারীকে বাসে উড়িয়ে দেয়ার মদ্যে কোনো শক্তি বা বীরত্বের নিদর্শন পাওয়া যায় না। এভাবে আদর্শের জোর দেখানো যায় না, এতে তার আত্মসর্মপণই ব্যক্ত হয়।

ফিলিস্তিনিদের জন্য এখনি এর দিকে দৃষ্টি দেয়ার সময় যে, তারা কি গড়তে পারে।

ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা তাদের জনগণের জন্য উপযুক্ত, তা দ্বারা পরিচালনা করার ক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে। হামাসের জন্য কিছু

www.nagorikpathagar.org

কিছু ফিলিস্তিনির সমর্থন আছে কিন্তু হামাসেরও মনে রাখতে হবে, তাদেরও তাদের সমর্থকদের প্রতি দায়িত্ব আছে। ফিলিস্তিনিদের আশা-আকাঙ্খা ও তাদের একতা বদ্ধকরার ভূমিকা পালন করতে হলে হামাসকে অবশ্যই হত্যা ও হানাহানি বন্ধ করতে হবে। অতীতের চুক্তিগুলোকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং দেশ হিসেবে ইসরাইলকে টিকে থাকার অধিকার দিতে হবে।

একইভাবে ইসরাইলকেও অবশ্যই মনে রাখতে হবে, তাদের যে রকম টিকে থাকার অধিকার আছে একইভাবে তাদেরও ফিলিস্তিনিদের অধিকারের কথাও অস্বীকার করলে চলবে না। যুক্তরাষ্ট্র যারা ইসরাইলকে সমুদ্রে ঠেলে দেয়ার কথা বলে তাদের বৈধতা মেনে নেয়া না, কিন্তু আমরা ইসরাইলের চলতে থাকা বসতি স্থাপনের বৈধতাও মেনে নেই না। এই বসতি নির্মাণ আগের চুক্তিকে ভঙ্গ করে, শান্তি অর্জনের চেষ্টাকে ছোট করে। এখন সময় এসেছে বসতি স্থাপন বন্ধ করার। ইসরাইলকে অবশ্যই ফিলিস্তিনিদের ভালোভাবে বেঁচে থাকার, কাজ করার এবং সামাজিক উন্নতির ব্যাপারে তাদের যে দায়বদ্ধতা আছে তা পালন করতে হবে। ঠিক যেমন গাজায় ফিলিস্তিনি পরিবারগুলোর অব্যাহত মানবিক সমস্যা ইসরাইলের নিরাপত্তার কাজ আসে না, একইভাবে পশ্চিমতীরের লেগে থাকা সুযোগের অভাবের ব্যাপারেও সাহায্য আসে না। ফিলিস্তিনি জনগণের জীবনযাত্রারমান বৃদ্ধি অবশ্যই শান্তি স্থাপনের পথে গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হতে হবে এবং ইসরাইলের উচিত একটি উন্নতিকল্পে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়া এবং সবশেষে আরব রাষ্ট্রগুলোকে বুঝতে হবে আরবের শান্তির পদক্ষেপ নেয়া ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সেখানেই দায়িত্বের শেষ হয়ে যায়নি। এই আরব-ইসরাইল বিরোধকে আরব জাতির জনগণের অন্যান্য সমস্যা থেকে দূরে রাখার জন্য আর ব্যবহার করা যাবে না। বরং এটাকে অবশ্যই একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে যাতে তাদের রাষ্ট্রকে টিকে থাকার মতো করে গড়ে তুলতে পারে; ইসরাইলের বৈধতা মেনে নিতে হবে, অতীতে নিজেকে পরাজিত হওয়ার পথ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে উন্নতির পথ বেছে নিতে হবে। যারা শান্তি খোঁজে, আমেরিকা সব নীতি নিয়ে তাদের পেছনে শামিল থাকবে। আমরা প্রকাশ্যে সেটাই বলব, যা আমরা ব্যক্তিগতভাবে ইসরাইলি, ফিলিস্তানি এবং আরবদেরও বলি। আমরা শান্তি চাপিয়ে দিতে পারি না। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে অনেক মুসলমান স্বীকার করে, ইসরাইল চলে যাবে না; ঠিক একইভাবে অনেক ইসরাইলি অনুধাবন করে যে একটি ফিলিস্তানি রাষ্ট্রের প্রয়োজন আছে। এখন সময় এসেছে, সেটার ওপর কাজ করার-যা সবাই সত্য বলে মনে করে।

অনেক অশ্রুপাত হয়েছে। অনেক রক্তপাত হয়েছে। আমাদের সবারই একটি দায়িত্ব আছে এর ওপর কাজ করার, যে দিন দেখা যাবে ফিলিস্তিনি ও ইসরাইলের মায়েরা দেখতে পারবেন, তাদের শিশুদের আর ভয়ভীতির মধ্যে বড় হতে হবে না, যখন দেখা যাবে যে তিনটি মহান বিশ্বাসের পবিত্র ভূমি একটি শান্তির স্থান, যা ঈশ্বর চেয়েছিলেন; যখন ইহুদি, খ্রিষ্টান এবং মুসলমানদের জন্য জেরুসালেম একটি মজবুত স্থান হবে এবং একটি স্থান যেখানে ইব্রাহিমের সব সন্তান নিরাপদে বিরচণ করতে

www.nagorikpathagar.org

পারবে ঠিক যেমনটি ইসরার কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছিল; যখন হযরত মূসা আঃ ঈসা আঃ এবং মুহাম্মদসাঃপ্রার্থনার জন্য একত্র হয়েছিলেন।

তৃতীয় উত্তেজনার উৎস হচ্ছে পারমাণবিক অস্ত্রের ওপর জাতিগত স্বার্থের অংশীদারিত্বের অধিকার ও দায়িত্ব। এই ব্যাপারটি কিছু দিন যাবৎ যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসলামিক ইরানি প্রজাতন্ত্রের মধ্যে উত্তেজনার কারণ হয়ে আছে। অনেক বছর হলো ইরান তার পক্ষ থেকেই নিজেকে আমার দেশের বিরুদ্ধে সংজ্ঞায়িত করেছে এবং সত্যিকার অর্থে আমাদের মধ্যে বিক্ষুদ্ধ ও আবেগপূর্ণ একটি ইতিহস আছে। স্নায়ুযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে ইরানের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে সরিয়ে দেয়ার পেছনে যুক্তরাষ্ট্য ভূমিকা নিয়েছিল।

ইসলামি বিপ্লবের পর থেকে ইরান জিন্মি নেয়ার ব্যাপারে এবং সামরিক ও বেসামরিক মার্কিন নাগরিকদের ওপর হামলার ব্যাপারে ভূমিকা নিয়েছিল। এই ইতিহাস সবার ভালো জানা আছে। অতীতের মতো এভাবে ফাঁদে পড়ে না থেকে,আমি এটা ইরানি সরকার এবং জনগণের কাছে পরিষ্কারভাবে বলেছি যে আমার দেশ এগিয়ে যেতে প্রস্তুত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ইরান কিসের বিরুদ্ধে তা নয়, বরং কী ধরণের ভবিষ্যৎ সে গড়ে তুলতে চায়?

কয়েক দশকের অবিশ্বাসকে ভুলে যাওয়া এত সহজ হবে না, কিন্তু আমরা সত্যনিষ্ঠ, সমাধান ও প্রত্যয়ের সাথে এগিয়ে যেতে চাই। আমাদের দুই দেশের মধ্যে আলোচনার জন্য অনেক বিষয় থাকবে, আমরা কোনো প্রকার পূর্বশত ছাড়াই একে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শণের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে আগ্রহী। কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্রের প্রশ্নে সবার জানা আছে যে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে এসেছি। এটা শুধু আমেরিকার স্বার্থেই নয়, এটা মধ্যপ্রাচ্যে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতা বন্ধ করার জন্য দরকার, যা এই এলাকাকে অত্যন্ত ঝুঁকির পথে টেনে নিয়ে যাব বিশ্বের অস্ত্রের বৃদ্ধি বন্ধ করার প্রয়াসকে বানাচাল করবে।

আমি বুঝি, অনেকে এর বিরুদ্ধাচরণ করেন কোন দেশের অস্ত্র আছে এবং কোন দেশের নাই। কোনো দেশেরই উচিত নয় বেছে নেয়া যে, কোনো দেশ পারমাণবিক অস্ত্র রাখতে পারবে। সে জন্য আমি খুব শক্তভাবে আমেরিকার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছি যে, এমন একটি বিশ্ব চাই যেখানে কোনো দেশই পারমাণবিক অস্ত্র রাখবে না এবং ইরানসহ যেকোনো দেশ শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের অধিকার পাবে যদি সে পারমাণবিক অস্ত্র বৃদ্ধির বিরুদ্ধে চুক্তির সব নিয়ম মেনে চলার দায়িত্ব নেয়। এই প্রতিশ্রুতি এই চুক্তির মূলেই আছে এবং সবার উচিত এই প্রতিশ্রুতি রাখা এবং আমি আশা করি যে এই এলাকার সব দেশই এই লক্ষ্যকে ব্যবহার করতে পারবে।

www.nagorikpathagar.org

এই চতুর্থ বিষয় যেটা নিয়ে আমি কথা বলব, সেটি হচ্ছে গণতন্ত্র। আমি জানি, গত কয়েক বছর যাবৎ এই মানধিকার উন্নয়ণের ব্যাপারে কিছু বিতর্ক দেখা দিয়েছে এবং এই বির্তকের বড় একটি অংশ ইরাক সম্পর্কিত। সুতরাং আমি পরিষ্কারভাব বলতে চাই, কোনো দেশের সরকারের কোনো নিয়ম অন্য কোনো দেশের ওপর চাপানো যাবে না বা চাপানো উচিত হবে না।

সেটি যেসব সরকার জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটায়, অবশ্য তাদের প্রতি আমার অঙ্গীকারকে খাটো করে না। প্রতিটি দেশই নিজ নিজ জনগণের ঐতিহ্যের ওপর দাঁড়িয়ে নিজেদের মতো করে এই মূল নীতিতে প্রাণসঞ্চার করেছে। আমেরিকার এটি ধরে নেয় না যে প্রত্যেকের জন্য সবচেয়ে ভালো কোনটা, যেমন আমরা একটি শান্তি পূর্ণ নির্বাচনের ফলাফল কি তা অনুমান করতে পারি না। কিন্তু আমার এই অনবনত বিশ্বাস আছে যে সম মানুষেরই আকুল আকাঙ্খা থাকে কিছু জিনিসের জন্য, আপনার মনের কথা বলার সক্ষমতা এবং কিভাবে আপনি শাসিত হবেন সে বিষয়ে আপনার মতামত দেয়ার,আইনের শাসনের প্রতি আস্থা রাখা এবং বিচার পরিচালানায় সাম্য আনা: স্বচ্ছ সরকার এবং যা জনগণের কাছ থেকে কিছু লুকায় না, আপনার পছন্দমতো জীবনযাপনের স্বাধীনতা। এগুলো শুধু আমেরিকান চিন্তাধারা নয়, এগুলো মানবিধাকার, সে কারণেই সর্বত্র আমরা এগুলোর প্রতি সমর্থন দিয়ে যাব।

যেসব সরকার এসব অধিকারকে রক্ষা করে পরিণতিতে তারা অনেক বেশি স্থিতিশীল, সফল ও নিরাপদ থাকে। দমনমূলক ব্যবস্থা কখনোই চিন্তাধারাকে তাড়িয়ে দিতে সফল হয় না। আমেরিকা পৃথিবীজুড়ে শান্তিপূর্ণ ও আইনশৃঙ্খলা মান্যকারী যেসব কণ্ঠস্বর শোনা যাবে তাদের সবার অধিকার শ্রদ্ধা করে, এমনকি যদি তাদের সাথে আমরা একমত না ও হই। আমরা সব নির্বাচিত, শান্তিপূর্ণ সরকারকে স্বাগতম জানাব এই শর্তে যে তারা তাদের জনগণকে শ্রদ্ধা করে শাসনকার্য পরিচালনা করবে।

এই শেষের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কিছু লোক আছেন যারা গণতন্ত্রের প্রবক্তা বনে যান তখনই যখন ক্ষমতা থেকে ছিটকে পড়েন; ক্ষমতায় থাকাকালে তারা নির্মমভাবে অন্যের অধিকারকে দমন করেন। যেখানেই বিষয়টি প্রযোজ্য হোক না কেন জনগণের এবং জনগণ দ্বারা পরিচালিত সরকার যারা ক্ষমতায় আছে তাদের জন্য একটি মাপকাঠিই নির্ধারণ করা আছে: আপনি আপনার ক্ষমতা বজায় রাখবেন সবার সম্মতি নিয়ে, নিপীড়ন করে নয়; আপনাকে অবশ্যই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকারগুলোকে সম্মান করতে হবে, এবং আপনার দলের উর্দ্ধে আপনার জনগণের এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বৈধ কাজের স্বার্থকে স্থান দিতে হবে। এই উপাদন ছাড়া, কেবল নির্বাচন সত্যিকার গণতন্ত্র আনতে পারে না।

www.nagorikpathagar.org

এরই সাথে পঞ্চম যে বিষয়টিতে আমরা মনোযোগ দেবো সেটা হচ্ছে ধর্মীয় স্বাধীনতা। ইসলাম ধর্মের আছে গর্ব করার মতো সহনশীলতার ঐতিহ্য। আমরা সেটা দেখতে পাই ধর্মবিচারের সময়ে আন্দালুসিয়া ও কর্ডোভায়। আমি প্রত্যক্ষভাবে সেটা দেখেছি আমার বালক বয়সে ইন্দোনেশিয়ায়, যেখানে ধর্মপ্রাণ খ্রিষ্টানরা উপাসনা করতে স্বাধীনভাবে একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে। সেই চেতনারই আজ আমাদের প্রয়োজন। প্রতিটি দেশের মানুষকে মুক্ত মনে বেছে নেয়ার এবং মন, হৃদয় ও আত্মার প্রণোদনার ওপর নির্ভর করা বিশ্বাসের ভিত্তিতে বেঁচে থাকার সুযোগ দিতে হবে। এই সহনশীলতা ধর্মের সমৃদ্ধির জন্য অপিহার্য, কিন্তু এটি বিভিন্নভাবেই বাধার সম্মুখীণ হচ্ছে।

কোনো কোনো মুসলমানের মধ্যে এমন ঝোঁক আছে যা ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী-নিজের ধর্মবিশ্বাসকে পরিমাপ করতে অন্যের ধর্মবিশ্বাসকে বাতিল করে দেয়। ধর্মীয় বৈচিত্র্যের প্রাচুর্যকে অবশ্যই বজায় রাখতে হবে, সেটা লেবাননের কোনে ম্যারোনইটের জন্য হোক বা মিসরের কোনো কপের জন্যই হোক। আর আমাদের সততার সাথে মুসলমানদের মধ্যেও ভ্রান্ত দলাদলি অবশ্যই বন্ধ করতে হবে, সুন্নি ও শিয়াদের মধ্যকার বিভাজনও বন্ধ করতে হবে, যা কিনা বিশেষত ইরাকে দুঃখজনক সহিংসাতর জন্ম দিয়েছে।

সব মানুষের একত্রে থাকার সক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ধর্মীয় স্বাধীনতা। আমাদের অবশ্যই সব সময় সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করে দেখতে হবে কিভাবে আমরা এটা সুরক্ষা করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, মুসলমানদের জন্য তাদের ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা পূর্ণ করার লক্ষ্যে দরিদ্র সোব-দানের ব্যবস্থাকে কঠোরতর করা হয়েছে। সে কারণে আমি আমেরিকার মুসলমানদের সাথে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এটা নিশ্চিত করতে যে তারা যেন জাকাতের শর্ত পূর্ণ করতে পারেন।

অনুরূপভাবে পশ্চিমা দেশগুলোর জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে মুসলমান নাগরিকদের তাদের মতো করে ধর্ম অনুশীলন করতে বাধা প্রদান না করা। উদাহরণস্বরূপ, মুসলমান নারীরা কী পোশাক পরবেন তা নিয়ে আদেশ না দেয়া। আমরা কোনো ধর্মের প্রতি আমাদের বৈরিতাকে উদারতার ভন্ডামি দিয়ে গোপন করতে পারব না।

ধর্মবিশ্বাস আমাদের একত্র করবে। সে কারণেই যুক্তরাষ্ট্রে আমরা দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাচ্ছি সেবামূলক উদ্যোগ নিয়ে-যা খ্রিষ্ট্রান, মুসলমান ও ইহুদিদের একত্র করবে। এ কারণেই আমরা স্বাগত জানাই সৌদি আরবের বাদশাহ আবদুল্লাহর বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যকার সংলাপ অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টা সভ্যতার জোটে তুরস্কের নেতৃত্বকে। দুনিয়াজুড়ে, আমরা এই সংলাপকে পরিবর্তন করতে পারি বিভিন্ন

www.nagorikpathagar.org

ধর্মবিশ্বাসীদের সেবামূলক কাজে, যাতে যেসব মানুষ কর্মোদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে যায় তাদের মধ্যে সেতুবন্ধ রচিত হয়।

ষষ্ঠ বিষয় যেটি নিয়ে আমি বলব সেটি হচ্ছে নারীর অধিকার। আমি জানি এ বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক আছে। পশ্চিমা দুনিয়ার কারো কারো এই দৃষ্টিকোণকে আমি প্রত্যাখ্যান করি, যে নারী তার চুল ঢেকে রাখে সে কোনো না কোনোভাবে কম যোগ্যতাসম্পন্ন। তবে আমি এটা বিশ্বাস করি, যে নারীর শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করা হয় তাকে সমযোগ্যতা থেকে বঞ্চিত করা হয়। এটা কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয় যে যেসব দেশে নারীরা ভালোভাবে শিক্ষিত তাদের অনেক বেশি সমৃদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

আমি পরিষ্কারভাবেই বলছি: কোনো অবস্থাতেই নারীর সমযোগ্যতার প্রশ্নটি শুধু ইসলামের জন্য একটি বিষয় নয়। তুরস্ক, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ায় আমরা দেখেছি মুসলিম অধ্যুষিত এই দেশগুলো নারীকে নেতৃত্ব দানের জন্য নির্বাচিত করেছে।

আমি নিশ্চিত যে সমাজে আমাদের কন্যারা আমাদের পুত্রের মতোই অবদান রাখতে পারেন। আমাদের অভিন্ন সমৃদ্ধি আসতে পারে সব মানুষকে নারী-পুরুষ সবাইকে তাদের পূর্ণ সম্ভাবনা বিকশিত করার সুযোগ দিয়ে। আমি এটা মনে করি না যে পুরুষের সমকক্ষতা অর্জনের জন্য পুরুষের মতো নারীদেরও একই জিনিস বেছে নিতে হবে এবং আমি সম্মান জানাই সেই সব নারীকে যারা তাদের ঐতিহ্যবাহী ভূমিকা পালনে তাদের মতো জীবনযাত্রা বেছে নেন। সেটা তাদের পছন্দের বিষয়। সে কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেকোনো সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশের সাথে অংশীদার হতে চায় বালিকাদের সাক্ষরতা বাড়ানোর উদ্যোগে সমর্থন দিয়ে ও তরুণীদের সাহায্য করতে চায় ক্ষুদ্র পরিসরে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের জীবনের স্বপ্নকে সতেজ রাখতে।

পরিশেষে আমি আলোচনা করতে চাই অর্থনৈকি উন্নয়ন ও সুযোগ সম্পর্কে।

আমি জানি যে অনেকের জন্য, বিশ্বায়নের চোহারাটা অসঙ্গতিপূর্ণ। ইন্টারনেট ও টেলিভিশন জ্ঞান তথ্য এনে দিতে পারে, কিন্তু সেই সাথে বাড়িতে অশোভন যৌনতা এবং বিবেকহীন হিংস্রতাকেও আনে। ব্যবসা-বাণিজ্য নতুনতর নতুন সম্পদ ও সম্ভাবনাগুলো এনে দিতে পারে, কিন্তু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশাল ভাঙনও পরিবর্তনও আনে। আমেরিকাসহ সব জাতির মধ্যেই এই পরিবর্তন আনতে পারে ভীতি। ভীতি কারণ আধুনিকাতর ফলে আমরা আমাদের অর্থনৈতিক পছন্দগুলোর ওপর, রাজনীতি

www.nagorikpathagar.org

এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের পরিচিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাব বলে মনে করি। এই পরিচিতির মধ্যে হচ্ছে আমাদের কাছে সর্বাধিক কাঙ্খিত আমাদের সমাজ, পরিবার, ঐতিহ্য ও ধর্মবিশ্বাস।

উন্নয়ন ও ঐতিহ্যের মধ্যে কোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই। দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের মতো দেশগুলো তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি বজায় রেখেই অর্থনীতির প্রভূত উন্নয়নসাধন করেছে। একই কথা প্রযোজ্য কুয়ালালমপুর থেকে দুবাই পর্যন্ত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে বিস্ময়কর অগ্রগতির ক্ষেত্রে। প্রাচীনকালে আমাদের নিজেদের কালেও মুসলমান সমাজ উদ্ভাবন ও শিক্ষার পুরোভাগে ছিল।

তেলের কারণে উপসাগরীয় রাষ্টগুলোর বিশাল সম্পদের অধিকারী হয়েছে এবং কোনো কোনো দেশ এখন আরো ব্যাপক উন্নয়নের ওপর আলোকপাত করছে। কিন্তু আমাদের সবাইকে এটা স্বীকার করতে হবে যে শিক্ষা ও উদ্ভাবনই হবে একুশ শতকের মূল বিষয়। অনেকগুলো মুসলিম রাষ্ট্রে এসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ যৎসামান্য। আমি আমার নিজের দেশে এ ধরনের বিনিয়োগের ওপর জোর দিচ্ছি। আর আমেরিকা যদিও অতীতে এ অঞ্চলে গ্যাস ও তেলের ওপরই নজর দিয়েছে, আমরা এখন ব্যাপক ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত হতে চাই। শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা বিনিময় কর্মসূচী সম্প্রসারিত করব এবং বৃত্তি বৃদ্ধি করব, যে রকম বৃত্তিতে আমার বাবা এসেছিলেন এই দেশে। একই ভাবে বেশি আমেরিকানদের উমরা উৎসাহিত করব মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে গিয়ে অধ্যয়ন করতে। আমরা প্রতিশ্রুতিশীল মুসলমান ছাত্রদের যুক্তরাষ্ট্রে কাজের প্রশিক্ষণ দেবো, গোটা বিশ্বের শিক্ষক ও শিশুদের জন্য অনলাইন শিক্ষাক্রমের ওপর বিনিয়োগ করব; সৃষ্টি করব নতুন অনলাইন নেওয়ার্কের, যাতে ক্যানসাসের এক তরুণ মুহূর্তের মধ্যে কায়ারোর এক তরুণের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর, আমরা একটি নতুন ব্যবসায়ী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সৃষ্টি করব যারা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে আমাদের সহপক্ষদের সাথে কাজ করবে। আর আমি এ বছরই উদ্যোক্তাদের একটি শীর্ষ বৈঠকের উদ্যোগ নেবো যাতে চিহ্নিত করা হবে কিভাবে যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বব্যাপী মুসলিম দেশগুলোর ব্যবসায়িক, প্রাতিষ্ঠানি ও সামাজিক উদ্যোক্তাদের নেতাদের মধ্যে যোগাযোগ গভীরতর করা যায়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য আমরা একটি নতুন তহবিলের সূচনা করব মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য এবং তাদের চিন্তাভাবনাকে স্থানান্তর করা বাজারে নিয়ে আসব যাতে তারা কর্মসংস্থান করতে পারে। আমরা আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ কেন্দ্র খুলব, এবং নিযুক্ত করব নতুন বিজ্ঞান-দূতদের যারা সেই সব কার্যক্রমে সহযোগী হিসেবে কাজ

www.nagorikpathagar.org

করবে যা নতুন জ্বালানির উৎসগুলো গড়ে তুলবে, প্রকৃতিবান্ধক কাজের সৃষ্টি করবে ডিজিটাল-নির্ভর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ব্যবস্থা করবে এবং সুপেয় পানি ও নতুন নতুন ফসল ফলানোর উন্নয়ন করবে। আজ আমি ঘোষণা করছি ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সাথে মিলে সমূলে পোলিও উৎপাটনের বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টার কথা এবং আমরা মুসলমান সম্প্রদায়ের সাথে সহযোগিতা সম্প্রসারিত করে শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্যসেবাকে উন্নত করব। মানুষের উন্নতর জীবন অন্বেষায় আমেরিকানরা প্রস্তুত আছে নাগরিক এবং সরকার; সম্প্রদায়গত সংগঠন, ধর্মীয় নেতা এবং সমগ্র পৃথিবীর মুসলমান ব্যবসায়ীদের সাথে যোগ দিতে।

যেসব বিষয়গুলো আমি বর্ণনা দিলাম সেগুলো বাস্তবায়ন করা কোনো সহজ কাজ হবে না। তবে আমাদের একটি দায়িত্ব আছে এক সাথে মিলে সেই কাঙ্খিত বিশ্ব গড়ার, সেই বিশ্ব যেখানে উগ্রপন্থীরা আর কখনোই আমাদের জনগণকে হুমকি দেবো না, মার্কিন বাহিনী ঘরে ফিরে আসবে; সেই পৃথিবী যেখানে ইসরাইল ও ফিলিস্তিনিরা নিজস্ব রাষ্ট্রে নিরাপদে বসবাস করবে এবং পারমাণবিক শক্তি ব্যবহৃত হবে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে, সেই পৃথিবী যেখানে সরকার তার নাগরিকদের সেবা দান করবে, স্রষ্টার সন্তানের অধিকারগুলোকে সম্মান দেখানো হবে। এই গুলো পারস্পরিক স্বার্থ।

আমি জানি অনেকেই আছেন-মুসলমান এবং অমুসলমান-যারা প্রশ্ন করবেন আমরা নবসূচনার পথে এগিয়ে যেতে পারব কিনা। অন্য অনেকেই বিভাজনের অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতে ও অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাড়াবেন। অনেকে পরামর্শ দেন যে এই প্রচেষ্টার কোনো মূল্য নেই কারণ আমাদের এই বিরোধ নিয়তি নির্দিষ্ট এবং সভ্যতার অনিবার্য বিপর্যয়ের জন্য এই সংঘর্ষ। আর অনেকেই পুরোপুরিভাবে সংশয়বাদী যে প্রকৃত পরিবর্তন আসবে কিনা। সেখানে আছে এত বেশী ভীতি, এত বেশি অবিশ্বাস যে বছরের পর বছর ধরে তা গড়ে উঠেছে। কিন্তু আমরা যদি বেছে নিই যে অতীতেই বন্ধনেই পড়ে রইব আমরা তাহলে কিছুতেই সামনে এগিয়ে যেতে পারব না। এবং আমি বিশেষভাবে এটা বলতে চাই প্রতিটি ধর্মবিশ্বাসী, প্রতিটি দেশের তরুণ-তরুণীকে আপনার, অন্য কারো চেয়ে অনেক বেশি, এই পৃথিবীকে নতুন করে কল্পনা করার, নতুন করে গড়ার সার্মথ্য রাখেন। আমরা সবাই সময়ের হিসব মুহূর্তের জন্য এই পৃথিবীর অংশে ভাগ বসাতে এসেছি।

যুদ্ধ বন্ধের চেয়ে যুদ্ধ শুরু করা খুবই সহজ। অন্যকে দোষ দেয়া সহজ নিজের ভেতরে দেখার চেয়ে; এটা সহজ অন্যের মধ্যে কী পাথক্য আছে সেটা দেখা আমাদের মধ্যকার অভিন্নতার চেয়ে। কিন্তু আমাদের বেছে নিতে হবে সঠিক পথটি, শুধু সহজ পথটিই নয়। প্রতিটি ধর্মের অন্তস্থলে একটি নিয়ম আছে, সেটা হলো-আমরা অন্যের

www.nagorikpathagar.org

প্রতি তা-ই করি যা আমাদের আমরা অন্যের কাছ থেকে প্রত্যাশা করি। এই সত্য জাতি ও মানুষের সীমানা ছাড়িয়ে গেছে। এই বিশ্বাস নতুন কিছু নয়; এটা কালো, সাদা বা বাদামী নয়;

সেটা খ্রিস্টান বা মুসলমান বা ইহুদিও নয়। এটা হলো সেই বিশ্বাস যা সভ্যতার দোলনাতেই স্পন্দিত হয়েছিল, এবং এটা হলো সেই বিশ্বাস যা স্পন্দিত হযেছে সভ্যতার দোলনায় এবং এখনো যা বিশ্বজুড়ে লাখে-কোটি মানুষের বুকি স্পন্দিত হয়ে চলেছে। এটা হলো অন্য মানুষেই প্রতি আস্থা, এবং এটা তা-ই-যা আজ আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।

আমাদের সেই সামর্থ্য আছে যে পৃথিবী চাই তাকে বানানোর,তবে শুধু যদি কি লিখা আছে সেটা মনে রেখে আমাদের মনে নবসূচনা সৃষ্টির সাহস থাকে।

পবিত্র কুরআন আমাদের বলে, 'হে মানবজাতি, আমি তোমাদের পুরুষ ও নারী হিসেবে সৃষ্টি করিয়াছি; আমি তোমাদের জাতি ও গোত্রে ভাগ করিয়াছি যাতে তোমরা একে অন্যকে জানিতে পারো।'

তালমুদ আমাদের বলেঃ সমগ্র তৌরাতের উদ্দেশ্য হচ্ছে শান্তি প্রবর্তন করা।

পবিত্র বাইবেল আমাদের বলে শান্তি প্রতিষ্ঠাকারীরনা আশীবার্দপ্রাপ্ত,তাহাদের বলা হইবে ঈশ্বরের সন্তান।

পৃথিবীর মানুষ একত্রে শান্তিতে বসবাস করতে পারে। আমরা জানি সেটি স্রষ্টার ইচ্ছা। এখন এই পৃথিবীতে এটি আমাদের কাজ।

ধন্যবাদ। এবং আপনাদের ওপর ঈশ্বরের শান্তি বর্ষিত হোক। অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।

(ভাষণটি দৈনিক 'নয়া দিগন্ত' ৭ জুন ২০০৯ থেকে সংকলিত)

www.nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট-১

মহাবিশ্বকোষ ও বিজ্ঞান

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আলী আজাদী

সূচনা ঃ

পরীক্ষা, নিরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে যাচাইকৃত জ্ঞানকেই বিজ্ঞান নামে অভিহিত করা হয়। সেই বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা থেমে নেই। বাড়ন্ত শিশুর মত প্রতিদিনই বিকশিত হচ্ছে এর প্রতিটি বিষয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর পর বিংশতম শতাব্দী পার হয়ে একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান আবির্ভূত হচ্ছে আরো উন্নত এবং নতুন নতুন কলা কৌশল নিয়ে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান মানুষকে নিয়ে যাবে আরো অনেক দূরে, যা এতদিনের পূঞ্জীভূত অনেক ভুল চিন্তাচেতনার মুলে কুঠারাঘাত করে, মানুষকে সত্য ও সুন্দরের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করবে। সময়ের সাথে উন্নত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানুষের সামনে সত্য উদ্ভাসিত হচ্ছে যা চিন্তা চেতনায় এবং বিশ্লেষণে প্রতিফলিত হচ্ছে। এতদিনের প্রতিষ্ঠিত অনেক ধারাণালব্ধ তত্ত্ব বা থিওরী পাল্টে যাচ্ছে এমনকি ভুল ও প্রমাণিত হচ্ছে। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হল আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে নাযিলকৃত এক মহাগ্রন্থে আজকের বিজ্ঞানের আবিষ্কারলব্দ তথ্যের উপস্থিতি। বর্তমান যুগে বহু সফিসটিকেটেড যন্ত্রের মাধ্যমে গবেষণালব্ধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উপস্থিতি ঐ ১৪০০ বছর আগের গ্রন্থে পাওয়া এক বিস্ময়কর ব্যাপার। কারণ বিজ্ঞান তখন তার শৈশব অবস্থাও অতিক্রম করেনি। এ কথা এটাই প্রমাণ করে যে এ গ্রন্থ কোন মানুষের রচিত নয়। বিজ্ঞান ও কোরআনের আলোকে এ রকম কিছু তথ্য [(যেমন-বস্তু ও জীবন কিভাবে অস্তিত্বে আসল? বস্তু আগে না ইনফরমেশন আগে? ইনফরমেশন কি? ইনফরমেশন কি বস্তু না অন্য কিছু? বস্তু, শক্তি, স্পেইস এবং সময় (mass, energy, space and time) কখন ও কিভাবে সৃষ্টি? এই মহাবিশ্ব কি সবসময় ছিল এবং সবসময় থাকবে? বিশ্বের সর্ববৃহৎ DNA Encyclopedia এবং এর লেখক কে? কোষে কিভাবে জ্ঞানের অবস্থান? বিবর্তনবাদ বৈজ্ঞানিকভাবে ভুল কেন? মাদার অব দি বুক (উম্মুল কিতাব) কী? কোথায় তার অবস্থান এবং তা কত বড়?] এ প্রবন্ধে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

কোনটি আগে বস্তু না ইনফরমেশন?

বর্তমান যুগ ইনফরমেশনের যুগ। ইনফরমেশন টেকনোলজী ছাড়া বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থা কল্পনাও করা যায় না। ইনফরমেশন টেকনোলজীর ব্যাপক ব্যবহার এবং এর বহুবিধ কার্যকারিতা ও উপকারিতা মানুষের সাম্প্রতিক আবিষ্কার মাত্র। ইনফরমেশন বলতে এখন অনেক কিছু বুঝায় যা অর্ধশতাব্দী আগেও মানুষের জানা ছিল না। বিজ্ঞানীরা ইনফরমেশনকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য সূত্র তৈরী করেছেন। সমাজবিজ্ঞানীরা

www.nagorikpathagar.org

ইনফরমেশন এজ (information age) নিয়ে কথা বলছেন। মহাবিশ্ব ও জীবনের উৎপত্তির মূলে রয়েছে ইনফরমেশন-এই আবিষ্কার ইনফরমেশন কনসেপ্টকে অত্যন্ত মূল্যবান হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। বিজ্ঞানীরা গেবষণার মাধ্যমে অনুধাবন করেছেন যে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির মূলে রয়েছে বস্তু, শক্তি এবং ইনফরমেশন। বস্তুবাদীরা মনে করেন বস্তু ও শক্তিই সব কিছু এবং এ দুটি সব সময় ছিল ও সব সময় থাকবে। বস্তুর শুরু এবং শেষ নেই। ১৯২৯ সালে California Mount Wilsin Observatory- তে কর্মরত আমেরিকান বিজ্ঞানী এডউইন হাবল তাঁর শক্তিশালী টেলিস্কোপের মাধ্যমে প্রমাণ করলেন যে এ মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং এ মহাবিশ্ব সবসময় ছিল না। জিরো ('O') ভলিউম অর্থাৎ অস্তিত্ববিহীন থেকে এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে (The Big Bang Therory) দেড় থেকে দুই হাজার কোটি বছর আগে এই মহাবিশ্বের সূচনা এবং যাত্রা শুরু হয় এবং তা ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে (The Expanding Universe Theory)। মহাবিস্ফোরণের সময় যে Radiation হয়েছিল প্রকৃতিতে সে Radio Noise এখনও আছে। ১৯৬৪ সালে Arno Penzias এবং Robert Wilson তাঁদের পরীক্ষাগারে এই Background Radio Noise ধরার মাধ্যমে নোবেল প্রাইজে ভূষিত হন। Princetion বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক P.J.E. Peebles ১৯৬৯ সালে তার ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে ঐ Background Raido Noise হল মহাবিস্ফোরণের ইকো বা প্রতিধ্বনি। ১৯৮৯ সালে NASA স্যাটেলাইট COBE (Cosmic Background Explore) পাঠিয়ে মাত্র ৮ মিনিটের পরীক্ষায় Penzias এবং Wilson এর আবিস্কৃত Cosmic Background Raido Noise সত্য বলে প্রমাণ করে চিহ্নিত করে এবং কনফার্ম করে যে জিরো ভলিউম থেকে N

Big Bang- এর মাধ্যমে বস্তু ও সময় সৃষ্টি হয়েছে। উপরের তথ্য থেকে বোঝা গেল বস্তু ও সময় তথা এ মহাবিশ্ব সব সময় ছিল না। তা সৃষ্টি করা হয়েছে। 'বস্তু ও সময় (Time and Space) সব সময় ছিল' বস্তুবাদীদের ধারণা নির্ভর এ কাহিনী ভুল বলে প্রমাণিত হল। বস্তু এবং সময় সব সময় থাকবেও না। সম্প্রসারণশীল ফোর্স যখন শেষ হয়ে যাবে তখন মহাসংকোচন (Big Crunch Theory) শুরু হবে, যার মাধ্যমে বস্তু ও সময় নিঃশেষ হয়ে যাবে। এটি বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক আবিষ্কার মাত্র। আমরা সম্প্রসারণশীল বিশ্বে বস্তু ও সময়ের গন্ডীতে আবদ্ধ বলে এর বাইরের ডাইমেনশন নিয়ে চিন্তা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। কোন কিছু না থাকা থেকে বা বিনা অস্তি ত্ব থেকে অস্তিত্বে আনাকেই সৃষ্টি বলে। বস্তুবাদীরা বলেন লক্ষ লক্ষ বছর ক্রিয়াবিক্রিয়ার ফলে প্রথমে হঠাৎ এক কোষী জীব পানিতে আবির্ভূত হয় এবং ঘাতপ্রতিঘাত, অভিযোজন, পরিবর্তন এবং বিবর্তনের মাধ্যমে নিম্নশ্রেণীর প্রাণী থেকে ক্রমান্বয়ে উচ্চতর প্রাণীর উদ্ভব ঘটে প্রশ্ন হল-যখন সময় ও বস্তু (Time and Space) ছিল না তখন বস্তু তৈরীর ক্রিয়া-বিক্রিয়া কোথায় হল এবং কোন সময়ে হল? লক্ষ লক্ষ বছর ক্রিয়াবিক্রিয়ার কল্পকাহিনী এখানে বৈজ্ঞানিকভাবেই অবাস্তব। কারণ যখন সময়

www.nagorikpathagar.org

ও স্পেস ছিল না তখন সময়ের ধারণা এবং বস্তুর ধারণা অবান্তর। কোন কিছুই না থাকার থেকে অস্তিত্বে আনাকে বলা হয় সৃষ্টি। আর যিনি সৃষ্টি করেন তিনিই হলেন সৃষ্টিকর্তা। বস্তুবাদীরা এখানে নির্বাক। তাদের চিন্তা বস্তু আর সময় নিয়ে। এর বাইরে তাঁরা যেতে পারেন না।

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের চরম আবিষ্কার [(The Big Bang Theory, The Expanding Universe Theory and The Big Crunch Therory; From no being to being (that are matter, energy, time, space and all other creations)] বস্তুবাদীদের চিন্তা চেতনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে সময় ও বস্তুর অস্তিত্ব সৃষ্টি। সুতরাং সৃষ্টিকর্তা বস্তু ও সময়ের গন্ডীতে আবদ্ধ নয়। সময় এবং বস্তু তাঁরই অধীন। বিজ্ঞানের আজকের এই চরম আবিষ্কার ১৪০০ বছর আগের গ্রন্থ আলকোরআনে আল্লাহ বলে দিয়েছেন-"যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি তাহাদিগের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহেন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহা স্রষ্টা, তাঁহার ব্যাপার শুধু এই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি বলেন 'হও' ফলে ইহা হইয়া যায়" (from no being to being) (আলকোরআন ৩৬:৮১-৮২;১৬:৪০)। "আমরা আকাশ নির্মাণ করিয়াছি ক্ষমতার বলে এবং আমরা অবশ্যই মহা সম্প্রসারণকারী" (আলকোরআন ৫১:৪৭) (The Expanding Universe)। "সেইদিন আকাশমন্ডলীকে গুটাইয়া ফেলিব, যে ভাবে আমরা প্রথম সৃষ্টির সূচনা কারয়াছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করিব। প্রতিশ্রুতি পালন আমাদের কর্তব্য, আমরা ইহা পালন করিবই" (আলকোরআন ২১:১০৪) (The Big Crunch Theory)" এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে (এটি শিঙ্গার প্রথম বারের শব্দ), ফলে যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন তারা ব্যাতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে। অত:পর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে (এটি দ্বিতীয়বারের শব্দ বা ফুৎকার) তৎক্ষনাৎ উহারা দন্ডয়মান হয়ে তাকাতে থাকবে" (আলকোরআন ৩৯:৬৮)। এখানে প্রতীয়মান হয় যে পবিত্র কোরআনে শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে পৃথিবী ও আকাশমন্ডলী ধ্বংস ও পুনরায় সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। এবং প্রথমবারের সৃষ্টিও অনুরূপভাবে করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় সুরা আম্বিয়ার ১০৪ নং আয়াতের আলোকে (... যে ভাবে আমরা প্রথম সৃষ্টির সূচনা করিয়াছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করিব.... আলকোরআন ২১:১০৪)।

অর্থাৎ আল্লাহ বিনা অস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন। জিরো ('O') ভলিউম থেকে এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি, বিজ্ঞানিদের এ আবিষ্কার, কোরআনের কথারই প্রতিধ্বনি। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ বলেন, "অবিশ্বাসীরা কি ভাবিয়া দেখে না আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া ছিল (As one unit of creation, United together, singularity আদিতে আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর অস্তিত্ব ছিল না) আমরা উহাদেরকে পৃথক করিবার পূর্বে। এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছি পানি হইতে; তবুও কি উহারা বিশ্বাস করিবে না" (আল কোরআন ২১:৩০)। বিগ ব্যাং, এক্সপানডিং

www.nagorikpathagar.org

ইউনিভার্স, এবং বিগ ক্রাঞ্চ তত্ত্বসমূহের মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞানীরা যা প্রমাণ করেছেন ১৪০০ বছর আগে আল কোরআনে এই সব তথ্যের উপস্থিতি বিজ্ঞানীদের শুধু হতবাক করে না অবনত মস্তকে মহা শক্তিধর মহান সৃষ্টিকর্তার সর্বময়ক্ষমতা, সদা উপস্থিতি এবং সবকিছু তার নিয়ন্ত্রনে চলছে এ কথা মেনে নিতে বাধ্য করে।

শুধু কসমোলজী নয় সম্প্রতি জীববিজ্ঞানের জিনতত্ত্বের মাধ্যমেও প্রমাণিত হয়েছে জীবকেও সৃষ্টি করা হয়েছে from no being থেকে এবং এক সুনিপুন সুশৃঙ্খল প্রি-প্রোগ্রামড তথা পূর্বলিখিত-ইনফরমেশন অনুযায়ী তা পরিস্ফুরিত হয়ে পরিচালিত হচ্ছে। দৈবাৎ বা বাইচান্সে বা অটোমেটিক জীব সৃষ্টি হয়নি এবং প্রোগ্রামবিহীন চলবেও না। নিম্নে জিনতত্ত্বের DNA-র মাধ্যমে তা উপস্থাপন করা হল।

DNA-র গুপ্ত রহস্য কি?

DNA কি? DNA বলতে Deoxyribonucleic acid কে বুঝায়। জীবনের একক কোষ। মাত্র কোষ থেকে আমাদের তৈরী করা হয়েছে এবং একটি মাত্র কোষের ভিতরেই একটি পুর্ণাঙ্গ মানব শরীরের শত ট্রিলিয়নস কোষের তথ্য ছিল। প্রতিটি কোষের কেন্দ্রে রয়েছে একটি নিউক্লিয়াস। প্রতিটি মানব কোষের নিউক্লিয়াসে রয়েছে ৪৬টি ক্রোমোজোম (জনন কোষ বাদে)। প্রতিটি ক্রোমোজোমের উপর রয়েছে DNA অণূসমূহ। মানুষের প্রতি কোষের DNA- তে রয়েছে প্রায় ২,০০,০০০ জিন। জিন হল DNA অণুতে বেসের (Base) সিকুয়েন্স বা অনুক্রম। DNA is delicately protected in the nucleus located in the center of the cell. এই DNA অত্যন্ত ক্ষুদ্র। একটি মানব কোষের আয়তন ১০ মাইক্রন (১ মাইক্রন = ১/১০০০০০ মিটার বা ১০-৬ মিটার)। আর DNA কোষ থেকে আরও অনেক ক্ষুদ্র। এটি এক অলৌকিক মাস্টার মলিকিউল (অনু)। কারণ ১টি কোষের DNA'র উপর রয়েছে প্রায় ২,০০,০০০ জিন। প্রতিটি জিন তৈরী হয়েছে বিশেষ অনুক্রমে সাজানো নিউক্লিওটাইডস দিয়ে। প্রোটিনের সাথে সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে যার সংখ্যা ১,০০০ থেকে ১,৮৬,০০০। এই সমস্ত জিন প্রায় ২,০০,০০০ প্রোটিন-এর সংকেত বা কোডস ধারণ করে যা মানব শরীরে কর্মরত এবং ঐ সমস্ত প্রোটিন উৎপাদনরত। ২,০০,০০০ জিনের উপর যে ইনফরমেশন জমা আছে তা DNA'র মোট ইনফরমেশনের মাত্র ৩%। বাকী ৯৭% এখন পর্যন্ত রহস্যাবৃত। জানা গিয়েছে বাকি ৯৭% এর মধ্যে কোষ বেঁচে থাকার ভাইটাল ইনফরমেশন-এর জটিল কার্যক্রম কৌশল আছে। সম্পূর্ণ জানতে আরও অনেক দূর যেতে হবে।

ইনফরমেশন কি? মানব শরীরের ডিজাইন বা নক্সা কোথায় অবস্থিত?

আগে বলা হয়েছিল DNA শুধু অণু এবং পরমাণু দিয়ে তৈরী। এখন দেখা যাচ্ছে DNA শুধু অণু ও পরমাণু সর্বস্ব নয় তৃতীয় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে এতে, তা হল কোডেড ইনফরমেশন। একটি মানব শরীরকে একটি বিল্ডিং এর সাথে

www.nagorikpathagar.org

তুলনা করলে বলতে হয় একটি মানব শরীর গঠনের সম্পূর্ণ মাস্টার প্ল্যান বা নক্সা এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কলা-কৌশলসমূহ DNA তে Coded information হিসেবে রয়েছে। মাতৃজঠরে বর্ধনের দশাগুলো থেকে শুরু করে জন্মের পরের সকল দশা ঐ DNA তে নির্ধারিত পূর্ব-প্রোগ্রাম অনুযায়ী সংগঠিত হয়। মাতৃজঠরে নিষিক্ত দশায় উচ্চতা, চামড়ার রং, রক্তের উচ্চ ও নিম্ন চাপ ইত্যাদি যা আমরা ৩০ বছর পরে জানতে পারব তা আমাদের উদ্বোধনী কোষের নিউক্লিয়াস ৩০ বছর ৯ মাস আগেই জানে (এনকোডেড ছিল), ইনসেমিনেশান (শুক্রাণু ও ডিমের মিলন) এর মুহূর্ত থেকেই।

বিশ্বের সর্ববৃহৎ এনসাইক্লোপিডিয়া : মানবকোষের DNA

এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে যে মানুষের একটি DNA অণুর ভিতর যে ইনফরমেশন আছে তা দিয়ে এনসাইক্লোপিডিয়ার ১০ লক্ষ পাতা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। অর্থাৎ একটি মাত্র কোষের নিউক্লিয়াসে যে ইনফরমেশন আছে তা একটি এনসাইক্লোপিডিয়ার ১০ লক্ষ পাতা পরিপূর্ণ করে ফেলবে যার মাধ্যমে মানব শরীর নিয়ন্ত্রিত হয়। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে বিশ্বের সব চাইতে বড় একটি এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় রয়েছে ২৩ ভলিউমে (খন্ড) ২৫,০০০ পাতা মাত্র।

সুতরাং আমাদের সামনে এখন একটি মহা বিস্ময়কর ব্যাপার উপস্থাপিত হয়েছে। নিউক্লিয়াসের একটি অণু (মালিকুল), যা আণুবীক্ষনিক কোষের চেয়ে অনেক অনেক গুণ ছোট, সেখানে রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম এনসাইক্লোপিডিয়ার চেয়ে ৪০ গুণ (25000X40= 10,00,000 পাতা) বড় ডাটার গুদামঘর (Data ware house), যার মধ্যে রয়েছে লক্ষ লক্ষ ইনফরমেশন। এর অর্থ হল সেখানে আছে ৯২০ ভলিউম বিরাট এনসাইক্লোপিডয়া যা বিশ্বে অদ্বিতীয়, যার সমতুল্য নেই। গবেষণার হিসাবে দেখা গেছে এই বিরাট এনসাইক্লোপিডায়ায় ৫ কোটি বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন আছে। মানব জিনসমূহের এক টুকরা করে তথ্য প্রতি সেকেণ্ডে, নন্-স্টপ ২৪ ঘন্টা পড়লে পূর্ণ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগেই ১০০ বছর পার হয়ে যাবে। DNA তে যে ইনফরমেশন আছে তা যদি বইতে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং বইগুলো একটি উপর একটি করে রাখা হয় তাহলে এটি উচ্চতায় ৭০ মিটার স্থান দখল করবে। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের ও চিন্তার বিষয় যে আমরা যে ইনফরমেশন এর কথা বলছি তা কিন্তু কোন কম্পিউটার বা লাইব্রেরীতে ষ্টোর করা নেই, এটি এমন এক কিউব এ আছে যা আয়তনে এক মিলিমিটারের ১০০ ভাগের চেয়ে ও ছোট। যা প্রোটিন, চর্বি এবং পানির অণু দিয়ে তৈরী। এটি এক বিস্ময়কর ব্যাপার যে একটি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র মাংসের টুকরা যা একটি একক ইনফরমেশন বিট ধারণ করতে পারার কথা নয়, অথচ সেখানে ধারণ করে আছে লক্ষ লক্ষ ইনফরমেশন, আজ থেকে ২০ বছর আগেও মানুষের তৈরি কম্পিউটার (যেখানে ডাটা ধারণ করে) এর সাইজ ছিল একটি কক্ষের সমান। মানুষের শত শত বছরের সঞ্চিত জ্ঞানের ব্যাপক গবেষণায় এবং বুদ্ধিমত্তায় আধুনিক সময়ে যে microchips আবিষ্কার হয়েছে তার মানব শরীরের একটি একক কোষের

www.nagorikpathagar.org

নিউক্লিয়াসের DNA-র ধারণ ক্ষমতা থেকে কল্পনাতীত দূরে। DNA যে কত ছোট তা নীচের একটি উদাহরণ থেকে বোঝা যায়:

G.G. Simpson (cited in Denton 1985) এর মতে পৃথিবী এ যাবত এক হাজার মিলিয়ন বা একশত কোটি (১০,০০,০০০ ১০০০ = ১০০, ০০, ০০, ০০০) প্রাণীর নিবা (লুপ্তসহ) স্থল। এই একশত কোটি প্রাণিগোষ্ঠীর প্রত্যেক প্রজাতির ডিজাইন স্পেসিফাই করার জন্য যে পরিমাণ ইনফরমেশন দরকার তা একিট চা চামচে রাখার পরে আরও জায়গা খালি থাকবে। সকল কৃতিত্ব এবং প্রশংসা সেই অকল্পনীয় এক মহাশক্তিধর মহাজ্ঞানী মহাপ্রকৌশলীর যিনি এত ক্ষুদ্র জায়গায় কল্পনাতীত বিশাল লিখা রাখার ব্যবস্থা করেছে। এখন প্রশ্ন হল একটি শিকল যা খালি চোখে দেখা যায় না, যা পাশাপাশিভাবে এটমস দিয়ে তৈরি, যার ব্যাস এক মিলিমিটারের এক কোটি ভাগের এক ভাগ, তা কি করে অবিশ্বাসী রকম এত বিশাল ইনফরমেশনের (মেমরীর) অধিকারী হল? শত ট্রিলিয়নস কোষের প্রত্যেকটি কোষে দশ লক্ষ পাতার ইনফরমেশন আছে, আমরা বুদ্ধিমান এবং সেচতন মানুষ সারা জীবনে কয়টি এনসাইক্লোপিডিয়া মুখস্ত করতে পারি? কোষের মধ্যে রয়েছে মানবের সার্বিক গঠন ও ক্রিয়াকলাপের প্রোগ্রাম তথা কলাকৌশল। কোষে রয়েছে এক মহাজ্ঞানের অবস্থান যা মানুষের পক্ষে তৈরী করা দুঃসাধ্য। উপরোক্ত আলোচনায় এবং বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এটাই প্রমাণিত হল যে বিশ্বের সর্ববৃহৎ এনসাইক্লোপিডিয়া হল মানবকোষের DNA।

কোষের মধ্যে জ্ঞানের অবস্থান:

তাহলে আমাকে আপনাকে স্বীকার করতে হয় আমাদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথা যকৃত, পাকস্থলী বা চোখের কোষ আমাদের চেয়ে অনেক অনেক গুণ জ্ঞানী, যেহেতু এরা ঐসব ইনফরমেশন অত্যন্ত সঠিক এবং নিখুঁতভাবে ব্যবহার করতে পারে। আসলে এ সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গই কি জ্ঞানী? তাহলে এই জ্ঞানের (wisdom) উৎস কোথায়? শত ট্রিলিয়নস কোষ এই অবিশ্বাস্য জ্ঞানের অধিকারী কি করে হল? যাই কিছু বলুন এই সমস্ত কোষত শেষমেশ কতগুলো এটমের স্তুপ এবং যারা অচেতন। সকল ইলিমেন্টের এটমসমূহ নিয়ে বিভিন্ন ফরমে এবং সংখ্যায় মিশালে বিভিন্ন অণু পাওয়া যাবে, কিন্তু কোন wisdom বা জ্ঞান পাওয়া যাবে না। ঐ অণু কত বড়, কত ছোট, কত সরল, কত জটিল তা কোন বিষয় নয়। তাহলে একটি কোষের ভিতর এনজাইম এবং DNA অণু যা নির্দিষ্ট সংখ্যক অজ্ঞান এবং অচেতন পরমাণু দিয়ে অনুক্রমে সাজানো তা সুসামঞ্জস্যভাবে কোষের ভিতর কি করে অসংখ্য জটিল ও বৈচিত্রপূর্ণ ক্রিয়া সঠিকভাবে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে? এ প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ। এই প্রিপ্রোগ্রামড জ্ঞান এই সকল DNA মলিকুল বা এই DNA কে যে সকল কোষ ধারণ করে আছে তাদের নয়, এটি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে ইহা তারই বুদ্ধিমত্তা বা জ্ঞান যিনি এই DNA মলিকুলসমূহকে অস্তিত্বে এনেছেন এবং তারা যেভাবে কাজ করছে সেভাবে কাজ করার জন্য প্রোগ্রামিং করেছেন (বিধান দিয়েছেন) (আল-কোরআন ৮৭:৩)। জ্ঞান কাজের

www.nagorikpathagar.org

মধ্যে নয় কাজের সৃষ্টিকর্তার মধ্যে। অতি উন্নত কম্পিউটারের পিছনে রয়েছে অতি উন্নত জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তা, যিনি উন্নত প্রোগ্রাম লিখেছেন এবং অপারেট করার জন্য প্রোগ্রামসমূহ ইনস্টল করেছেন এবং তার ব্যবহার করেছেন। ঠিক এরই মত এবং তার মধ্যে প্রিপ্রোগ্রামড লিখা কোষ, DNA এবং RNA সমূহ এবং এই সমস্ত কোষ দিয়ে তৈরী মানুষের এবং তাদের কাজের পিছনে রয়েছে একজন সৃষ্টিকর্তা। কত উন্নত, কত সঠিক, কত নির্ভূল, কত জটিল কাজ সম্পন্ন হল তা ঐ কাজের কোন জ্ঞান নয়, জ্ঞান সব সময় থাকবে ঐ কাজের মালিকের সাথে। সুতরাং কোন তারিফ, প্রশংসা বা বাহবা যদি দিতে হয় তাহলে সেই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকেই দিতে হবে।

একটি উন্নতমানের প্রোগ্রামপূর্ণ একটি Computer CD পেলে সর্বাগ্রে প্রশ্ন আসে এত উন্নত প্রোগ্রাম কে লিখেছেন? সুতরাং আমরা কেন প্রশ্ন করি না কোষের DNA-তে এই প্রোগ্রাম কে লিখেছেন? যা Computer Technology থেকেও কোটি কোটি গুণ উন্নত নিখুঁত প্রকৌশল দিয়ে তৈরী যা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোষের ভিতর ইনস্টল করা হয়েছে। সৃষ্টির পর থেকে হাজার হাজার বছর ধরে এই DNA প্রোগ্রাম এর কোন গুণাগুণ নষ্ট হয়নি, কোন virus attack করতে পারেনি, হুবহু এখনও আছে। এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল কে এবং কেন এই সমস্ত কোষ অস্তিত্বে এনেছেন যা অনবরত আমাদের জন্য পড়ার, লেখার, দেখার, নিশ্বাস নেয়ার, জটিল ক্রিয়াকর্ম করার এবং বেঁচে থাকার কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে? চিন্তা করুন গভীরভাবে।

DNA এর প্রোগ্রাম সমূহের Language বা ভাষা কি?

বর্তমান বিশ্বে একটি রাষ্ট্র তত উন্নত যত তার তথ্য প্রবাহ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত। মানুষের সাথে মানুষের বংশ পরম্পরায় ভাষাই হল তথ্য প্রবাহের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বা টুল। ভাষা চিহ্নিত হয় নির্দিষ্ট কোডস দিয়ে, আর তা হল অক্ষর। এ রকম ২৬টি অক্ষর বা কোডস দিয়ে ইংরেজি ভাষা তৈরি হয়েছে। এই কোসই শব্দ তৈরী করে এবং শব্দ বাক্য তৈরী করে। তথ্য প্রবাহ এবং তথ্য জমা রাখা হয় এই কোডস দিয়েই। কোষের ভাষা এ রকমই। একটি মানুষের প্রতিটি ভৌতিক কাজ (physical traits) এই ভাষা কোডস দিয়েই কোষের মধ্যে জমা থাকে এবং এই ভাষার মাধ্যমেই কোষ তা পুনরায় ব্যবহার করতে পারে। মাষ্টার অণুর ভাষাকে বলে DNA। DNA'র ভাষা তৈরী হয়েছে ৪টি অক্ষর A, T, G এবং C দিয়ে। প্রতিটি অক্ষর ৪টি বিশেষ বেস(Base) যথা A-Adenine, T-Thymine, C-Cytocine, G-Guanine এর প্রতিনিধিত্ব করে যাকে নিউক্লিওটাইডস বলে। লক্ষ লক্ষ এই বেস অর্থবহ অনুক্রম সারিবদ্ধ (লাইন) হয়ে DNA অণু তৈরি করে। জিন হলো DNA অণুতে বেসের (Base) সিকুয়েন্স বা অনুক্রম। DNA অণুর একটি অংশই হল জিন।

এভাবেই নিউক্লিয়াসের ডাটা ব্যাংকে তথ্য জমা হয়। তথ্য লিখার জন্য প্রতি ক্ষেত্রে দুটি অক্ষর মিলে এক জোড়া বেস তৈরী করে। যেমন A-T, G-C ইত্যাদি। এই বেস জোড়া একটির উপর আর একটি যোগ হয়ে জিনসমূহ তৈরী করে। প্রতিটি

www.nagorikpathagar.org

জিন একটি DNA অণুর একটি অংশ দিয়ে তৈরী যা মানব শরীরের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। এভাবে অগণিত গুণাগুণ (properties) যেমন উচ্চতা, চোখের, নাখের, কানের এবং করোটির বস্তু এবং আকার ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট জিনের নির্দেশ (command) অনুযায়ী গঠিত হয়। এসব জিনের প্রতিটিকে একটি বইয়ের পৃষ্ঠাসমূহের সঙ্গে তুলনা করা যায়। পৃষ্ঠাসমূহের উপর স্ক্রিপ্টস (লিখা) রয়েছে যা তৈরি হয়েছে A-T, G-C অক্ষর সমূহ দিয়ে। এভাবে একটি মানব কোষের DNA তে প্রাঃ ২,০০,০০০ জিন আছে। প্রোটিনের প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত বিশেষ অনুক্রমে সাজানো ১০০০ থেকে ১,০০,০০০ জিন আছে। প্রোটিনের প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত বিশেষ অনুক্রমে সাজানো ১০০০ থেকে ১,৮৬,০০০ নিউক্লিওটাইডস দিয়ে প্রতিটি জিন গঠিত। এই জিনগুলো প্রায় ২,০০,০০০ প্রোটিনের কোডস ধারণ করে যা মানব শরীরে কাজ করে এবং এই সমস্ত প্রোটিন উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। পূর্বেই আলোচনা হয়েছে যে যদি প্রতিটি কোষের এক একটি ক্রোমোজমকে এক একটি বইয়ের সাথে তুলনা করা হয়। তাহলে শুধু একটি কোষেই ৪৬ ভলিউম কোষ এনসাইক্লোপিডিয়া আছে যা একজন মানবের সমস্ত বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে পূর্বের আলোচনা মোতাবেক এই ৪৬ ভলিউম কোষ এনসাইক্লোপিডিয়া ৯২০ ভলিউম Encyclopedia Britannica-র সমতুল্য। প্রতিটি মানুষ যদিও একটি কোষের বিভাজনের ফলে তৈরী হয়েছে কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যজনক যে প্রতিটি মানুষেরই DNA এর অক্ষরসমূহের Sequence (অনুক্রম) ভিন্ন ভিন্ন। এ কারণেই বিশ্বে এ যাবত যত মানুষ ছিল, আছে এবং থাকবে তাদের সবার চেহারা এবং কার্যক্রম আলাদা আলাদা। যদিও প্রতিটি অঙ্গের মৌলিক গঠন এবং কার্যক্রম প্রতিটি মানুষে একই।

জিনের মধ্যে যে রকম নির্দেশিক (প্রোগ্রাম) দেয়া আছে আমাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ সেভাবেই নির্মিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা যে জিন ম্যাপ (মানচিত্র) তৈরী করেছেন সেখান থেকে কিছু উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিস্কার হবে। যেমন চামড়া নিয়ন্ত্রণের জিন সংখ্যা ২৫৫৯, মস্তিস্ক নিয়ন্ত্রিত হয় ২৯,৯৩০টি জিন দিয়ে, চক্ষু ১৭৯৪, লালাগ্রন্থি ১৮৬, হৃদপিন্ড ৬১২৬, বুক ৪০০১, ফুসফুস ১১৫৮১, যকৃত ১৩০৯, অন্ত্র ৩৮৩৮, কঙ্কাল পেশী ১৯১১, এবং রক্ত কোষ ২২,৯০২ টি জিন দিয়ে। DNA এর অনুক্রম সাজানোই পুঙ্খানুপুঙ্খরুপে নির্ধারণ করে একটি মানুষের গঠন যেমন উচ্চতা, চোখ, চুল বা চামড়ার রং ইত্যাদি। তা ছাড়া একটি একক কোষের DNA তে আছে ২০৬টি হাড়ের ডিজাইন (নক্সা), ৬০০ মাংস পেশীর ডিজাইন, ১০ হাজার অডিটরী মাংসপেশীর নেটওর্যাক, ২০ লক্ষ চক্ষু স্নায়ুর নেটওর্য়াক, ১০০ কোটি স্নায়ু কোষের ডিজাইন এবং ১০০ ট্রিলিয়নস শরীর কোষের ডিজাইন।

লিখক ছাড়া লিখা কি সম্ভব?

একথা অনস্বীকার্য যে প্রতিটি অর্থবহ অক্ষর একজন লিখকের লিখা ছাড়া আসতে পারে না। উপরে বর্ণিত জটিল অথচ সুশৃঙ্খল অর্থবহ ইনফরমেশন নিয়ে চিন্তা

www.nagorikpathagar.org

করলে এ কথা পরিস্কার যে তাহলে কোষের মধ্যে কোটি কোটি অর্থবহ অনুক্রমে সাজানো অক্ষর কি করে লিখা হল? এমনকি অনুক্রমে সাজানো লিখার মধ্যে একটু সিকুয়েন্সের ব্যতিক্রম হলে বা ভুল হলে চোখ বর্তমান স্থানে না হয়ে হাটুর উপর হতো, হাত পিঠের উপর হতো। চিন্তা করুন এ অকল্পনীয় এবং মানবের অসাধ্য প্রোগ্রামিং কে লিখেছেন?

আপনার বর্তমান নিখুঁত গঠন, চেহারা এবং বেঁচে থাকার পিছনের রহস্যঃ

উপরের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে আমাদের সবার সঠিক গঠন এবং বেঁচে থাকার পিছনে রয়েছে এক অতি উন্নত প্রোগ্রামিং যা লিখা রয়েছে কোটি কোটি অক্ষরের মাধ্যমে ৪৬ ভলিউম DNA এনসাইক্লোপিডিয়ার উপর। এদের সাজানো অনুক্রমের সামান্যতম ওলটপালট হলে বিকলাঙ্গ হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

DNA এর চ্যালেঞ্জ:

অংকের মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে DNA'র মধ্যে কোডেড ইনফরমেশন তৈরীতে Coincidence (বিনা প্রোগ্রামে মিলে যাওয়া) কোন ভূমিকা পালন করে না। এমনকি DNA তৈরির ২০০,০০০ জিনের মধ্যে ১টি মাত্র জিন Coinicidence এর মাধ্যমে তৈরি হওয়া অসম্ভবের অসম্ভব।

এই অসাম্ভব্যবতা নিয়ে নামকরা বিবর্তনবাদী বায়োলজিস্ট Frank Salisbury বলেন ঃ "একটি মাঝারি ধরনের প্রোটিনের ৩০০ এমাইনো এসিড থাকে। এই সব নিয়ন্ত্রণকারী DNA জিনের শিকলে ১০০০ নিউক্লিওটাইড আছে। যেহেতু একটি DNA শিকলে ৪ ধরনের নিউক্লিওটাইড আছে, তাই ১০০০ লিংকবিশিষ্ট একটি DNA $৪^{১০০০}$ আকারে থাকতে পারে। একটি ছোট এলজেবরার (লগারিদম) মাধ্যমে বলা যায় $৪^{১০০০} = ১০^{৬০০}$। অর্থাৎ একটি DNA ৪ ধরনের নিউক্লিওটাইড নিয়ে ১ এর পাশে ৬০০টি শূন্য দিলে যে সংখ্যা দাঁড়ায় তত রকমে থাকতে পারে। এই সংখ্যাটি সম্পূর্ণরূপে আমাদের ধারণার বাইরে" (Frank Salisbury 1971).

অর্থাৎ দেখা যায় যে একটি মিডিয়ামে যদি প্রয়োজনীয় সব নিউক্লিওইটাইড থাকে এবং এদের সংযুক্ত করার জন্য সমস্ত জটিল পরমাণুসমূহ (molecules) এবং উৎসেচক (enzymes)-এর যোগান থাকে, তারপরও সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় নিউক্লিউটাইড সজ্জিত হতে $৪^{১০০০}$ বার সাজালে ১ বার অন্যকথায় $১০^{৬০০}$ বার সাজালে হলে হয়ত ১ বার হতে পারে। অন্যকথায় মানবশরীরে DNA তে একটি এভারেজ প্রোটিনের কোড তৈরি হওয়ার দৈবাৎ সম্ভাবনা $১০^{৬০০}$ বারের মধ্যে ১ বার। এই সংখ্যা এস্ট্রনমিক্যাল (জ্যোর্তিবিদ্যার) ধারণারও বাইরে অর্থাৎ তা ঘটার সম্ভাবনা জিরো বা শূন্য।

www.nagorikpathagar.org

এ ধরনের অনুক্রমে DNA languagage কোটি কোটি বার প্রতিবার ভিন্নভাবে সাজাতে এর পিছনে মহাশক্তিধর এক মহাজ্ঞানী রয়েছেন। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে এ ধরণের অকল্পনীয় সিকোয়েন্সের পিছনে রয়েছে এক জ্ঞানী, এবং সচেতন শক্তির নিয়ন্ত্রণ, এখানে দৈবাৎ, সুযোগমত, অথবা এমনি এমনি মিলে যাওয়ার সম্ভাবনা জিরো বা অসম্ভবেবর অসম্ভব।

একটি বইয়ের কথাই ধরুন না যা আপনি পড়ছেন, এর শব্দগুলো, লাইনগুলো কি দৈবাৎ এসেই বইটি হয়ে গেলো? না এর পিছনে এক বুদ্ধিমান ব্যক্তির মনমগজ কাজ করেছে। DNA এর Coded inforamtion লিখার status এর সাথে এর কোন পার্থক্য নেই। নোবেল বিজয়ী বৈজ্ঞানিক ফ্রানসিস ক্রিক (Francis Crick) যিনি DNA এর ডাবল হেলিক্স গঠন আবিষ্কারক, যিনি উদ্দীপনাময় বিবর্তনবাদী ছিলেন, তিনি DNA এর অলৌকিক গঠন আবিষ্কার ও বর্ণনা করার পর একটি বইতে লিখেছেন "আমাদের কাছে এখন মওজুদ সব ধরনের জ্ঞানের অধিকারী একজন সৎলোক শুধু কিছু সচেতনে বলতে পারেন যে জীবনের ুৎপত্তির মূহূর্তটি সবকিছুই অলৌকিক" "An honest man, armed with all the knowledge available to us now, could only state that, in some sense, the origin of life appeacs at the moment to be almost a miracle" (Francis Crick 1981).

সুতরাং DNA'র উপর সবচেয়ে বড় বিশেষজ্ঞ ক্রীক বলেছেন যে পৃথিবীতে জীবন স্বেচ্ছা প্রণোদিত (Spontanceously) হয়ে উৎপত্তি লাভ করেনি। DNA তে যে ডাটা রয়েছে তাতে ৫ কোটি (বিরিয়ন) অক্ষর রয়েছে। যা বিশেষ এবং অর্থবহুল অনুক্রমে সাজানো ৪টি অক্ষর A-T-G-C দিয়ে তৈরী এই অনুক্রমের একটি অক্ষরের ও ভুল উপস্থাপন চলবে না। একটি মানবরচিত এনসাইক্লোপিডিয়ায় এরকম একটি বানান ভুল বা একটি অক্ষর ভুলকে বিবেচনা না করলে কিছু যায় আসে না, কিন্তু DNA'র যে কোন এক জোড়া বেস এ একটি মাত্র ভুল হলে অর্থাৎ ১ বিলিয়ন ৭১৯ মিলিয়ন ৩৪৮ হাজার ৬৩২ বেস জোড়ায় যদি শুধু ৬৩২ নং বেস জোড়ায় মিসকোডেড অক্ষর থাকে তাহলে শুধু কোষটির ভয়ঙ্কর পরিণতি ঘটবেনা, ঐ মানুষটিরও পরিণতি হবে ভয়ঙ্ক। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় একটি মাত্র ভুল বা মিসকোডিং ইনফরমেশন এর ফল হল haemophilia (শিশু লিউকোমিয়া)। তবে এক্ষেত্রে এটাকে ভুল বা `erroneous coding' বললে ভুল হবে। কারণ এ বিশ্বের কোন কিছুই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ অনর্থক সৃষ্টি করেনি এবং সকল কিছুই তাঁর গোচরীভূত। সুতরাং তিনি ভুল করে তা করেননি। মাঝে মধ্যে ঐ রকম কোডিং এর পিছনে কোন গুপ্ত কারণ (Divine purpose) রয়েছে। ক্যানসার যা কোডিং ভুলের জন্য হয় তা বিশেষভাবে তৈরী ডিসঅর্ডার। এটি কিছু গুপ্ত কারণের জন্য বিশেষভাবে তৈরী করা হয়েছে যা মানুষকে তার দূর্বলতা এবং অক্ষমতাকে দেখানোর জন্য, তাকে দেখানোর জন্য যে তার সৃষ্টি নির্ভর করছে কত ডেলিকেট ভারসাম্যের উপর। সেসঙ্গে এ কথা বুঝানোর জন্য যে এই অতিসূক্ষ্ম ডেলিকেটা ভারসাম্যের একটু তারতম্য হলে তাকে কত ধরনের

www.nagorikpathagar.org

অসহনীয় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। শুধু সমস্যা নয় জীবনের প্রিয় স্বাদকে বিষময় করে তুলে এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয়।

বিবর্তন তত্ত্ব (Theory of Evolution) বৈজ্ঞানিকভাবেই ভুল এবং অযৌক্তিক:

প্রতিটি কোষের ক্রোমোজোমের উপর DNA Encyclopedia তে যে লিখা রয়েছে তা লিপিবদ্ধ করতে ৯২০ খন্ড (ভলিউম) বাইয়ের প্রয়োজন। Encyclopedia Britannic'র পাতার হিসাবে ১০ লক্ষ পাতার দরকার। সুতরাং প্রতিটি কোষে ১০ লক্ষ পাতার লিখা কে লিখ? কোন বুদ্দিমান সত্ত্বা ছাড়া কোডেড লিখা বা ইনফরমেশন আসতে পারে না। এই কথা পূর্বের আলোচনাতেই প্রমাণিত হয়েছে। মিউটেশন এর মাধ্যমে DNA তে পরিবর্তন হয়ে নতুন নতুন তথ্য আসতে পারে বিবর্তনবাদীদের এ মন্তব্যও ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কারণ "Mutations are changes which take place in DNA as a result of rediation or chemical action". Radiation অথবা রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে মাঝে মাঝে DNA শিকলের অনেক বেস্ জোড়া (A-T, G-C) ধ্বংস হয়ে যায় বা লুপ্ত হয়ে যায়। অন্যদিকে বিবর্তনবাদীরা বলেন মিউটেশনের ফলে বিভিন্নরকমের বৈচিত্র্যময় পরিবর্তনের ফলে জীবগোষ্ঠী বর্তমান পারফেক্ট ফরমে এসছে। এটাও চরম ভুল। কারণ এ কথা বুঝতে গেলে পূর্বের বই তৈরীর কথায় ফিরে আসতে হয়। একটি বইয়ের লিখন যদি কোন কারণে মুছে যায় বা মাঝে মাঝে টাইপ করার সময় (দৈবাৎ) এদিক সেদিক করে আগের লিখাকে পরে এবং পরের লিখাকে আগে নিয়ে আসা হয় তাহলে বইটি পড়লে অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হবে এবং অর্থবহ হবে না। পূর্বেই বলা হয়েছে DNA'র লিখনীত সে রকম ভুল হলে জীবটির চোখ কপালে না হলে পেটে হবে, হাত চলে যাবে পিছনে। আরও অনেক বিকলাঙ্গতা দেখা দিবে। অর্থাৎ জ্ঞানী বুদ্ধিমান সত্ত্বা (Sisdom intellect) কর্তৃক সুচিন্তিত সাজানো DNA ছাড়া দৈবাৎ DNA তে Mutation করে নতুন Perpect জীব তৈরী সম্ভব নয়। মজার ব্যাপার হলো গবেষণায় Mutation ঘটিয়ে ফ্রুট ফ্লাই 'ড্রসোফিলাতে' দেখা গেছে চোখের উপর পা হয়েছে। যে সমস্ত বাছুরের পা পাঁচটি হয়, তাও জিনের সিকুয়েন্সের অসঙ্গতির ফলে হয়। এ যাবত Mutation এর মাধ্যমে যা হয়েছে তা জীবের বিকলাঙ্গ ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই হয়নি। সুতরাং জীবনের উৎপত্তি নিয়ে বিবর্তনবাদীরা (Evolutionist) যে সব ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তা বৈজ্ঞানিকভাবেই ভুল এবং অযৌক্তিক।

ইনফরমেশন এর আগমন ঃ বিবর্তনবাদের পতন

জার্মান ফেডারেল ইনস্টিটিউট অব ফিজিক্স এন্ড টেকনোলজীর ডাইরেকটর এবং প্রফেসর ড. ওয়ারনামর গিট (Dr. werner Gitt) বলেন "A coding system always entails a nomaterial intellectural process. A physical matter cannot producer an information code. All experiences show that every piece of creative information represents some mental effort

www.nagorikpathagar.org

and can be traced to a personal idea giver who exercised his own free will, and who is endowed with an intelligent mind--- There is no known law of nature, no known process and no known sequence of events which can cause information to originate by itself in matter".

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জানা গেছে বস্তুর দুটি মৌলিক স্বত্ত্বা রয়েছে: বস্তু এবং শক্তি (mass and energy)। একবিংশ শতাব্দিতে জানা গেছে বস্তুর তৃতীয় আরেকটি সত্ত্বা আছে তা হল ইনফরমেশন। যা বস্তুতে বা শক্তিতে রূপান্তর সম্ভব নয়।

প্রফেসর Johnson বলেন-"Information is not matter, although it is imprinted on matter. It comes from elsewhere, from an intelligence-- ". (Phillip Johnson, 2000).

"ইনফরমেশন বস্তু নয়, যদিও তা বস্তুর উপর খুদিত হয, এটি অন্যত্র বুদ্ধিমান সত্ত্বা থেকে আসে..."।

ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দার্শনিক Stephen C. Meyer যিনি বিবর্তন তত্ত্ব এবং বস্তুবাদের সমালোচক, তিনি এক ইন্টারভিউতে বলেন "ছাত্রদের ধারণা পাওয়ার জন্য ক্লাশে আমি একটি কাজ করি তা হল ছাত্রদের মাঝে ২টি কম্পিউটার ডিস্ক (একটি Information (Software) যুক্ত, অন্যটি খালি) দিয়ে জিজ্ঞাসা করি-বস্তুগত দিক দিয়ে ২টি ডিস্কের মধ্যে পার্থক্য কি? ছাত্ররা বলেন-- জিরো অর্থাৎ কোন পার্থক্য নেই। কারণ ইনফরমেশন হল ওজন বিহীন (massless quantity), ইনফরমেশন কোন বস্তুগত ব্যাপার নয় (Stephen Meyer, 2002).

বস্তুর আগে কি ছিল?

একবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ আবিষ্কার জানিয়ে দিল প্রকৃতিতে বস্তু নিজেই ইনফরমেশন নয়। ইনফরমেশন এর উৎস বস্তু নয় বরং সুপ্রা মেটিরিয়াল মন। এই মন বস্তুর আগে ছিল। ঐ মনই বস্তুগত সারা বিশ্বকে সৃষ্টি করেছে। আকৃতি দিয়েছে এবং নিয়ন্ত্রিত করেছে। ইসরাইলী বিজ্ঞানী Gerald Schroeder যিনি আমেরিকার MIT (Mas-sachusetts Institutge of Technology) তে পদার্থ বিদ্যা এবং জীববিদ্যায় অধ্যায়ন করেছেন এবং The Science of God নামক বই লিখেছে এবং তার লিখা নতুন আর একটি বইতে (The Hidden Face of God: Science Reveals the Ultimate Truth) তিনি বর্তমান সময়ের পরমাণু জীববিদ্যা এবং কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা যে উপসংহারে পৌঁছেছে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই ভাবে "A single consciousness, a universal wisdom, pervades the universes. The discoveries of science, those that search the quantum nature of subatomic matter, have moved us to the brink of a startling realization: all existence is the expression of this wisdom. In the laboratories we experience it as information that first physically

www.nagorikpathagar.org

articulated as energy and then condensed into from of matter. Every particle, every being, from atom to himan, appears to represent a level of information, of wisdom" (Gerald Schroeder, 2001).

বিজ্ঞানী Schroeder এর মতে বর্তমান সময়ের বৈজ্ঞানিক ফলাফল বিজ্ঞান এবং ধর্মতত্ত্বকে একটি সাধারণ সত্যে মিলিত করেছে। এটি হল সৃষ্টির সত্যতা। বিজ্ঞান বর্তমানে এই সত্যতা পুনরায় আবিষ্কর করছে যা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ধর্ম লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মানুষকে শিখিয়েছে। অর্থাৎ সৃষ্টিজগত কোন দৈবাৎ, সুযোগে, বা কাকতালীয় ভাবে বিবর্তনের মাধ্যমে আসে নাই। অর্থাৎ বস্তু সৃষ্টি হয়েছে পূর্ব নির্ধারিত ইনফরমেশন অনুযায়ী।

বস্তুর পূর্বে ইনফরমেশন কোথায় ছিল ঃ লওহে মাহফুজ বা উম্মুল কিতাব কি?

পূর্বের আলোচনা আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত করেছে যে-এই মহাবিশ্ব এবং জীবন সৃষ্টি হয়েছে একটি চমৎকার নীল নকশা অনুযায়ী যা পূর্বে ছিল। আধুনিক বিজ্ঞানের এই উপসংহার অত্যান্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে ১৪০০ বছর আগে নাযিলকৃত আসমানী কিতাব আল কোরআনের বর্ণিত হয়েছে। কোরআনকে পাঠানো হয়েছে মানুষের গাইয বা পথ নির্দেশক হিসাবে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন লওহে মাহফুজ (সংরক্ষিত ফলক-The Preserved Tablet) মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগে ছিল এবং এতে মহাবিশ্বের সকল সৃষ্টি এবং ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করে লিপিবদ্ধ আছে।

এই লওহে মাহফুজ গার্ডেড' (মাহফুজ) করা আছে, যাতে এতে যা লিখা বা প্রোগ্রাম আছে তা পরিবর্তন বা নষ্ট না হয়। কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা Computer এর প্রোগ্রোম বা লিখন যাতে দুষ্ট মানুষের সৃষ্ট Virus প্রোগ্রাম দ্বারা নষ্ট না হয় তার জন্য antivirus guard দিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। তারপরও মাঝে মাঝে মারাত্মক অজানা ভাইরাস অজান্তে কম্পিউটারে ঢুকে কোটি কোটি টাকার ক্ষতি সাধন করে। Computer প্রোগ্রাম রক্ষার জন্য antivirus guard কম্পিউটার বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক আবিষ্কার মাত্র। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এই লওহে মাহফুজকে বিভিন্ন নামে বিশেষিত করেছেন, যেমন-উম্মুল কিতাব (কোরআন ১৩: ৩৯, ৪৩:৪) (The Mother of the Book-বইয়ের মা), কিতাবুন হাফেজুন (কোরআন ৫০:৪) (ভবিষ্যত গটনাবলীর বই-The Book of Decrees)-ও বলা হয়েছে, কারণ এ বইতে ভবিষ্যতে মানবতা যে সব ঘটনাবলীর মুখোমুখি হবে তাও ওয়েছে। এই লওহে মাহফুজ এর বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দিতে গিয়ে আল্লাহপাক কোরআনের বহু আয়াতে বলেছেন এটি এমন এক গ্রন্থ যাতে কোন কিছুই বাদ যায়নি। "অদৃশ্যের চাবি তাঁরই হাতে, ঐ সব তিনি ছাড়া কেউ জানেনা। স্থলে এবং জলে যা আছে সবই তিনি জানেন। তাঁর অজান্তে গাছের কোন পাতা ঝরে না। পৃথিবীর (মাটির) অনধকারে কোন বীজ নাই (গজায় না) এবং কোন আর্দ্রতা (রসযুক্ত বস্তু) বা শুষ্কতা (শুষ্ক বস্তু) নাই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই" (কোরআন ৬:৫৯)। একটি আয়াতে আছে পৃথিবীর সকল জীব

www.nagorikpathagar.org

ঐ লওহে মাহফুজে রেকর্ড করা আছে: "পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই যারা বুকে ভর দিয়ে চলে বা কোন উড়ন্ত জীব নেই যারা ডানায় ভর দিয়ে উড়ে, যারা সম্প্রদায় (উম্মত) ভুক্ত নয় তোমাদের মত। কিতাব থেকে কোন কিছুই আমরা বাদ দেইনি। তার পর তাদেরকে তাদের প্রভুর সামনে একত্রিত করা হবে (কোরআন ৬:৩৮)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন "পৃথিবীতে এবং আকাশসমূহে, সমগ্র মহাবিশ্বের, সব সৃষ্টিকূল এবং সব জিনিষ, একটি ক্ষুদ্র দাগ পর্যন্ত সকল কিছুই আল্লাহ জানেন এবং লওহে মাহফুজে রেকর্ড করা আছে: "তুমি যে কোন কার্যে রত হও অথবা কোরআন থেকে কোন আবৃতি করনা অথবা কোন কার্য করনা-আমাদের অদেখায় (অসাক্ষাতে) যখন তুমি ওতে প্রবৃত্ত হও। পৃথিবী ও আকাশমন্ডলীর এমনকি একটি অণুপরিমাণও তোমার প্রভুর অগোচরে নয়। নতুবা এর থেকে ছোট অথবা বড় কিছুই নাই যা ঐ সুস্পষ্ট কিতাবে নেই (কোরআন ১০:৬১)। এর থেকে ছোট অর্থাৎ অণুর থেকেও ছোট অর্থাৎ সাব-এটমিক লেভেলের ধারণা কোরআনেই প্রথম দেয়া হয়েছে। সাব-এটমিক লেভেলের ধারণা বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক আবিষ্কার মাত্র।

সকল মানুষের জেনেটিক কোডস এবং তাদের গন্তব্যস্থলসহ মানবতার সকল ইনফরমেশন লওহে মাহফুজে আছে। সুতরাং মৃত্যুর পর কবরে মাটির সাথে মিশে গেলে বা পুড়ে গেলে বা পানিতে ডুবে গেলে বা মাছে বা কোন জানোয়ারে খেয়ে ফেললেও লওহে মাহফুজে সব (DNA কোডস) রক্ষিত আছে এবং সেখান থেকে সব পূনরায় সৃষ্টি করা হবে। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা এর সত্যতা সবেমাত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছে-ডাইনোসরের Fossil ডিমের DNA থেকে পূর্ণাঙ্গ ডাইনোসর তৈরি সম্ভব (যদি প্রয়োজনীয় কলা-কৌশলগত সকল যন্ত্রপাতি পাওয়া যায়)। কারণ DNA encyclopedia তে সকল ইনফরমেশন (Blue print) সৃষ্টিকর্তা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। অবৈধ যৌন কাজ করলে সেই প্রকৃত ব্যক্তিকে সনাক্ত করার জন্য ধর্ষিতার কাপড়ে নির্গত ঐ ব্যক্তির অতি সামান্য বীর্জের DNA Test করে ইদানিং তা সনাক্ত করা হচ্ছে। এমনকি মৃত ব্যাক্তির মুখাবয়ব নষ্ট হলে বা কোন কারণে চিনা না গেলে, শরীরের যে কোন অংশের সামান্য DNA Test করে তা সহজে সনাক্ত করা হচ্ছে।

সকল সৃষ্টিকূলের ইনফরমেশন বা তথ্যাদি (DNA Codes) ঐ লওহে মাহফুজে আল্লাহপাক রের্কড করে রেখেছেন, তা পবিত্র কোরআনে বলা আছে। শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (সঃ) কে তখনকার অবিশ্বাসী মানুষেরা প্রশ্ন করেছে "মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে গিয়ে ধূলায় পরিণত হলে, আমরা কি আবার তৈরী হব?" অবিশ্বাসীদের সেদিনকার সে প্রশ্ন ও উত্তর আল্লাহপাক কোরআনে দিয়েছেন:"... ইহা তো এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! যখন আমরা মরে যাব এবং ধূলায় পরিণত হব (আমরা কি পুনরায় জীবিত হব?) সূদুর পরাহত সেই প্রত্যাবর্তন। আমরা ইহা পূর্বেই জানি তাদের কতটুকু মৃত্তিকা ভক্ষণ করে, এবং আমাদের আছে সকল সংরক্ষণকারী কিতাব" (কোরআন ৫০:২-৪)।

www.nagorikpathagar.org

লওহে মাহফুজ বা সকল সংরক্ষণকারী কিতাব কোথায় অবস্থিত?

পবিত্র কোরআন শরীফে আল্লাহ বলেন এই কোরআন পৃথিবীতে নাযিল বা প্রেরণ করা হয়েছে এক মুবারক রজনীতে, মানবজাতিকে সতর্ক করার জন্য (কোরআন ৪৪:১-৩)। সুদীর্ঘ ২৩ বছর ফিরেশতা হযরত জিবরাইল (আ:) এর মাদ্যমে হযরত মুহম্মদ (স:) এর কাছে লওহে মাহফুজ থেকে কোরআন প্রেরণ করা হয়েছে। "বস্তুতঃ ইহা সম্মানিত কোরআন, (যা এছ) সুরক্ষিত ফলকে" (লওহে মাহফুজ) (আল কোরআনঃ ৮৫:২১-২২)। মেরাজের রাত্রিতে (১৭:১) নবীজীকে (স:) একাই গিয়েছিলেন আল্লাহর আরশে-আজিমে, আল্লাহর অসীম কুদরতে। হাদিস শরীফে আছে "সপ্ত আকাশ ভ্রমণ করার পর (মেরাজের সময়) আমাকে (নবীজীকে স:) অতি উচ্চে নিয়ে যাওয়া হল। আমি (হযরত মুহাম্মদ স:) একটি মসৃণ সমতল জায়গায় পৌঁছলাম, যেখানে শুধু লওহে মাহফুজের শব্দ শোনা যাচ্ছিল।" কোরআন ও হাদিসের আলোকে বুঝার গেল লওহে মাহফুজ আমাদের এই ইউনিভার্সের বাইরে। যিনি স্পেস ও টাইম সৃষ্টি করেছেন স্বভাবতই তিনি তার বাইরে আছে। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লা স্পেস ও টাইম এর গন্ডীতে আবদ্ধ নন। আমরা স্পেস ও টাইম স্ব গন্ডীতে শুধু আবদ্ধ নই, Expanding Universe এর স্পেস এবং টাইম এর বাইরে চিন্তা করার কোন যোগ্যতাও আমাদের নেই। কোরআনে বর্ণিত স্পেস ও টাইম এর গন্ডীর সামান্য কিছুই আমরা বিজ্ঞানকে দিয়ে বুঝতে পেরেছিল, কোরআনে বর্ণিত অসংখ্য ইনফরমেশন যেমন হাশরের মাঠ, আমলনামা, বেহেস্ত, দোযখ, পুলসেরাত ইত্যাদি আরও অনেক তথ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞান এখনও কিছুই বলতে পারে না। উপরের আলোচনায় এটাই পরিষ্কার হল যে-লওহে মাহফুজ এই ইউনিভার্সের (সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী) বাইরে অবস্থিত।

লওহে মাহফুজ বা সংরক্ষিত সেই ইনফরমেশন এর পরিধি কত বড়?

লওহে মাহফুজ সীমাহীন। কি রকম সীমাহীন তা সহজভাবে বুঝানোর জন্য আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে তার উত্তর এভাবে দিয়েছেন-"পৃথিবীর সমস্ত গাছপালা যদি কলম হয়, সকল সমূদ্রের সহিত আর ও সাত সমূদ্র যুক্ত হইয়া কালি হয়, তবুও আল্লাহর কথা (বাণী) নিঃশেষ হবে না। আল্লাহ পরাক্রমাশালী, সকল জ্ঞানের অধিকারী" (কোরআন ৩১:২৭) এ বিষয়ে গভীর চিন্তার অবকাশ রয়েছে।

উপসংহারঃ

এই প্রবন্ধের আলোচনায় এটা পরিষ্কার হয়েছে যে আধুনিক বিজ্ঞান বহু গবেষণার মাদ্যমে ইনফরমেশন নিয়ে সবেমাত্র যা অনুধাবন এবং অনুমোদন করেছে ঐশী ধর্ম তা বহু পূর্ব থেকেই মানুষকে শিখিয়ে আসছে। এতদিন বস্তুবাদী ধারণা যা বিজ্ঞানের নামে বিজ্ঞানের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান তা নিজেই বাতিল করে দিল। বস্তুর পিছনের রহস্য উন্মোচিত হল।

www.nagorikpathagar.org

বস্তুবাদী চিন্তা এবং ধর্মের মধ্যে বিবাদ হাজার বছরের। বস্তুবাদীদের দাবী কোন কিছু শুরুর আগে বস্তু ছিল এবং বস্তুর আগে কোন কিছুই ছিল না। অন্য দিকে ধর্ম বলছে বস্তুর আগে আল্লাহ ছিলেন, এবং আল্লাহর সীমাহীন জ্ঞানে বস্তু তৈরী হয়েছে ও পরিচালিত হচ্ছে। আল্লাহ বলেন: "তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যকে অবহিত" (He is the First and the Last, and the Manifest and the Hidden, and He knows all things full well") (কোরআন ৫৭:৩)। আল্লাহ প্রদত্ত ধর্ম সভ্যতার শুরু থেকে মানুষকে সৃষ্টি তত্ত্ব (from no being to being) সম্বন্ধে যা শিখিয়ে আসছে অধুনা বিজ্ঞানের আবিষ্কারে তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। নি:সন্দেহে এতে বুঝা যায় নাস্তিকতার অবসান আসন্ন। চিন্তাশীল মানবসম্প্রদায় ক্রমান্বয়ে সত্যের কাছাকাছি হচ্ছে এবং অনুধাবন করছেন আল্লাহ আছেন এবং তিনি সবই জানেন। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন: "তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে আল্লাহ তাহা অবগত আছেন? এই সকলই আছে এক কিতাবে; ইহা আল্লাহর নিকট সহজ" (কোরআন ২২:৭০)।

পৃথিবীতে সত্যের সাথে মিথ্যার সংঘাত চলছে। কোরআন ও হাদিসের আলোকে ও ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী পরকালের কৃষিক্ষেত্র বা পরীক্ষাক্ষেত্র। মহাবিশ্বের গ্রালাক্সীসমূহ যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর নির্ধারিত আইনের নিয়ন্ত্রণেই তা নিখুঁতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। একটু হেরফের হলেই সব লন্ডভন্ড হয়ে যাবে। মানুষের শরীরের ভিতরেও রয়েছে মহাবিশ্বের গ্যালাক্সীসমূহের মত অগণিত কোষে অগণিত রহস্যময় 'ডি.এন.এ.' এর মেলা। যা সম্পূর্ণরূপে সৃষ্টিকর্তার নিয়ন্ত্রণেই (প্রিপ্রোগ্রাম) সুচারুরূপে চলছে। কম্পিউটারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের পরও সামান্য কয়েকটা গাড়ী, রেল, বা এরোপ্লেন এর চলাচল মানুষ সঠিকভাবে এখনও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। দুর্ঘটনায় প্রতিবছর চলে যাচ্ছে হাজারো মানুষের জীবন। মানুষ ছাড়া সমস্ত জীবকুলের জীবনের গতিবিধি সৃষ্টিকর্তার নির্ধারিত নিয়ন্ত্রণে চলছে। পরকালে শেষ বিচারের পরে কেবল মানুষ ও জ্বীনেরাই পুরস্কার বা শাস্তির সম্মুখীন হবে। তাই কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের দুনিয়ার জীবনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের জন্য ফেরসতা হযরত জিবরাইল (আ:) মাধ্যমে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স:) এর নিকট আল্লাহ পাক পাঠিয়েছেন এক আলোকিত নির্ভেজাল সন্দেহাতীত দিক নির্দেশনা-আলকোরআন। পবিত্র গ্রন্থ আল-কোরআন সেই গাইড বুক যা মানব বা জীন রচিত নয়। কোন মানব বা জীবন একাকী বা সম্মিলিত ভাবে আল-কোরআনের অবিকল একটি সূরাও (অধ্যায়) রচনা করতে পারবে না। এ চ্যালেঞ্জ আল্লাহ পাক নিজেই আল-কোরআনের বহু সূরাতে দিয়েছেন (আল-কোরআন দেখুন ২:২৩, ২৪,;১০:৩৭, ১১:১৩, ১৪; ১৭:৮৮; ৫২:৩৩,৩৪)। অদ্যাবধি কেউ এ চ্যালেঞ্জ গ্রহন করতে পারেননি এবং পারবেও না। ধর্মছাড়া কর্ম নাই, কর্মছাড়া জগত নাই। দুনিয়ার জগতের মানুষের যাবতীয় কর্ম সুচারুরূপে বৈজ্ঞানিকভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য (জীবের ডি.এন.এ এর কলাকৌশলরে মত) জগতসমূহের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিধানদাতা আল্লাহ আমাদের জন্য তৈরী করে পাঠি দিয়েছেন এক বিধান (যার নাম মহাগ্রন্থ আল-কেরআন)। ইসলাম ইজ কমপ্লিট কোড অব লাইফ। ইসলামে প্রত্যেকটি কর্ম (নিজস্ব, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক) পরিচালনার পরিস্কার বিধান রয়েছে। এবং প্রাত্যহিক জীবনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই নবীজীর আগমন। শুধু মসজিদে অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্ম পালন করলে আরবের তৎকালীন মানুষদের (মুশরিকদের) সাথে নবীজীর সংঘাত হত না। মদীনা রাষ্ট্রে তিনি কোরানিক আইন তথা আল্লাহর বিধানের উপরই প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। আল্লাহর বিধানের

www.nagorikpathagar.org

পাশাপাশি পৃথিবীর কিছু মানুষ তৈরী করেছে মানুষের কর্ম পরিচালনার জন্য আর এক বিধান (মানবগড়া মতবাদ)। তাদের বক্তব্য ধর্ম আর কর্ম হবে পৃথক। ধর্ম হবে যারযার ব্যাক্তিগত এবং পালন হবে অনুষ্ঠানসর্বস্ব, সময় সময় মিলাদ মাহফিলে, ঈদে-চাঁদে এবং থাকবে মসজিদের চৌহদ্দীতে আর কর্ম (পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক) চলবে আমাদের বানানো নিয়মনীতি অনুযায়ী। এখানেই সংঘাত, কোনটা মানবেন-আল্লাহ্ প্রদত্ত না মানবরচিত? মানবরচিত বিধান দেশে দেশে অকার্যকর তথা শান্তি দিতে অক্ষম প্রমাণিত হয়েছে। নতুন নতুন রোগ এইড এর মহামারী প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিবেশ ধ্বংস পরিবারকে অশান্তি, আত্যহত্যা তখন নিত্য নের্মাতক ব্যাপর তখন এদর ফলে আমাদেরও নিজদেশে নিজেদের সৈন্যদের হাতে আশ্রয়শিবিরে আশ্রিত অসহায় নারীদের উপর (তথাকথিত সুশিক্ষিত সভ্যদেশের সৈন্যদের দ্বারা) ধর্ষন এবং সবলের লুটপাট। নিজদেশে যারা শান্তি দিতে অক্ষম, সারা বিশ্বে তারা শান্তি দিতে চায়। সেটা শান্তি না শান্তি নামে শোষণ-নির্যাতন, চিন্তা করুন। আমাদের বাংলাদেশে এখনও ঘন্টার পর ঘন্টা বিদ্যুত চলে গেলেও দোকানপাট তথা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলোতে লুটপাট হয় না। কেন বলতে পারেন? জন্মগত তথা পরিবেশগত কিছুটা ধর্মীয় মূল্যবোধ কাজ করে বলে। আর যদি সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় নীতিতে সেই মহান সৃষ্টিকর্তার বিধান কার্যকর থাকত তাহলে অবস্থা কি হত একবার চিন্তা করুন। খুন, ধর্ষন, দূর্নীতি, অন্যায়, অবিচার, দারিদ্রতা, অসাম্যতা চিরতরে বন্ধ হয়ে যেত। যেমনটি প্রেকটিক্যালি রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে তৎকালীন বিশ্বের সেরা বর্বরতায় নিমজ্জিত মানুষগুলোকে (অন্ধকারের যুগকে) কোরআনের বিধান দ্বারা আলোকিত করে গেছেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (স:)। তাই বলি আসুন জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিধানদাতা (আল্লাহ্) প্রদত্ত জ্ঞানভান্ডারে পরিপূর্ণ বিজ্ঞানীদের বিস্ময় সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ আল-কোরআন অর্থসহকারে পড়ি এবং যাবতীয় বিষয় (বস্তু ও জীবনের পিছনের ও ভবিষ্যতের রহস্য) সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহর নির্দেশিত (আল-কোরআন) এবং শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুরলাহ্ (স:) কর্তৃক প্রদর্শিত সঠিক পথে পৃথিবীর যাবতীয় পরীক্ষায় (কাজ-কর্ম) অবতীর্ণ হই এবং আল্লাহর দেওয়া নিয়মেই জীবনের সার্বিক চলার পথকে নিয়ন্ত্রিত করি। তাহলেই কেবল ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর স্বল্পকালীন পরীক্ষার জীবনে যেমন শান্তি পাওয়া যাবে তেমনি মৃত্যুর পরে অসীম জীবনেও পুরস্কার (জান্নাত) লাভ করে চিরস্থায়ী শান্তি পাওয়া যাবে।

(কিছুটা সংক্ষিপ্ত)

প্রাবন্ধিক
প্রফেসর ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
Email:maazadi@yahoo.com
প্রবন্ধটি বস্তু ও জীবনের পিছনে রহস্য: বিজ্ঞান ও কুরান নামে ছিল।

www.nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট-২

সর্বকালের সর্ব শ্রেষ্ঠ মহামানব নবী মোহাম্মদ (সাঃ)

দার্শনিক কে. এস. রামাকৃষ্ণ রাও (ভারত)

অনুবাদ ঃ আবু জাফর

মুসলিম ঐতিহাসিকদেগর মতে মোহাম্মদ (সা:) ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল তারিখে মরুময় আরবভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন। 'মোহাম্মদ', এ ই নামের অর্থ 'সর্বোচ্চ প্রশংসিত'। আসলেও তাই, আমার বিবেচনায় আরবের শ্রেষ্ঠতম ও সুউচ্চতম ও মহত্তম আত্মার অধিকারী এই সন্তান। এবং এই কথার অর্থ, তাঁর আগে ও পরে রক্তাভ বালুকাকীর্ণ অপরাজেয় আরব্য মরুভূতে যত কবি কি সম্রাট জন্মগ্রহণ করেছেন, কোন সন্দেহ নহে, তাঁদের মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁরই স্থান সর্বশীর্ষে।

নবী মোহাম্মদ (সা:) এর আবির্ভাবকালে আরবদেশে একটি মরুভূমি মাত্র-নিতান্ত ই শূন্য বিশুষ্ক এক মরুভূমি। কিন্তু এই নিরঙ্কুশ শূন্যতার মধ্যে থেকে মোহাম্মদ (সা:) এর সর্বজয়ী পরম আধ্যত্মিকতার কল্যাণস্পর্শে জেগে উঠলো এক নতুন পৃথিবী, জেগে উঠলো নতুন জীবন ও সংস্কৃতি, এক নবীনতমম সভ্যতা, যে প্রভাব ছড়িয়ে পড়লো তিনি মহাদেশ, এশিয়া আফ্রিকা ও ইয়োরোপের চিন্তায় ও জীবনে ও মানসতায়; এবং প্রতিষ্ঠিত হলো এমন এক নতুন সাম্রাজ্য যা মরক্কো থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত ব্যাপ্ত ও সম্প্রসারিত।

ধর্মবিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রটি বুদ্ধি ও আবেগের পারস্পরিক বৈরিতাহেতু এতটাই পিচ্ছিল যে, সততই শুধু মনে পড়ে দেবদূতেরা যে পথে চলতে আতঙ্ক বোধ করে নির্বোধেরা সেখানে ভীড় জমায়'। অবশ্য অন্য একদিক থেকে কাজটা খুব জটিল ও নয়, কারণ এমন এক ধর্মের নীতিসমূহ আমার আলোচনার বিষয়-যে ধর্ম ঐতিহাসিক এবং যার প্রবর্তক একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। এমনকি স্যার উইলিয়াম মূরের মত একজন বৈরী সমালোচকও কোরআন শরীফ সম্পর্কে বলতে বাধ্য হন, 'পৃথিবীতে সম্ভবত এমন আর একটিও গ্রন্থ নেই যা বারো'শ বছর ধরে এমন বিশুদ্ধ ও অবিকৃত রূপ নিয়ে বিরাজমান'। আমি এই সঙ্গে এই কথাও যুক্ত করতে পারি যে, নবী মোহাম্মদ (সা:) এমন এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, যাঁর জীবনের প্রতিটি ঘটনা অতীব যত্ন ও সীমাহীন সতর্কতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ, এমনিক তাঁর জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্ম ও অচারণগুলিও উত্তরকালের জন্য সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় সংরক্ষিত। তাঁর জীবন এবং কর্ম কিছুই কিছুমাত্র রহস্যের আবরণে আচ্ছাদিত নয়; সবকিছুই এত সুস্পষ্ট অবিকৃত ও তথ্যানুগ, এত সুরক্ষিত ও সুবিন্যস্ত যে, সঠিক তথ্যের জন্য আজ আর কাউকে গবেষণায় প্রবৃত্ত হতে হয় না, সত্য-উদ্ধার কি উদঘাটনে দুরূহ কোন অভিযানেও

www.nagorikpathagar.org

নামতে হয় না। প্রাপ্ত তথ্যাদি এত নির্ভুল এত খাঁটি যে, খোসা ছাড়িয়ে কি আবর্জনা মুক্ত করে সত্যের দানা গুলিকে আলাদা বেছে নেবার দরকার পড়ে না।

তাছাড়া আমার এই কাজ এখন কিছুটা সহজ কারণ রাজনৈতিক কি অন্য কোন কারণে কিছু কিছু সমালোচক একদা ইসলামের বিরুদ্ধে যে অপব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছিল, সেই ভূমিকা এখন নিষ্প্রভ এবং ইসলাম সম্পর্কিত প্রমাদবহুল আলোচনার সেই দিনগুলিও এখন দ্রুত অস্তমিত হচ্ছে। প্রফেসর বেভান তাঁর 'ক্যামব্রীজ মধ্যযুগের ইতিহাসে' যথার্থই উল্লেখ করেন, 'উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত মোহাম্মদ (সা:) এবং ইসলাম সম্পর্কে ইয়োরোপে যা কিছু ছাপা হয়েছে তা সবই এখন শুধু সাহিত্যিক কৌতুহলের উপজীব্য মাত্র'। অতএব এই নিবন্ধ রচনায় আমার যে সমস্যা, সেই ভার আজ অনেকখানি লঘু ও সহজ অনুভব করি, কারণ ওই ধরনের ইতিহাস আজ আর বিশেষ গুরুত্ব বহন করে না এবং তা নিয়ে বেশি সময় নষ্ট করারও প্রয়োজন নেই।

উদহরণত, ইসলাম যে তরবারি-নির্ভর এই ধরনের মন্তব্য কোন উল্লেখযোগ্য মহল থেকে আজ আর তেমন শোনা যায় না। ধর্মে কোন প্রকার জবরদস্তি নেই-এটাই ইসলামের একটি সুপরিচিত নীতি। অথচ বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক গীবন বলেছিলেন, 'ইলামের একটি ক্ষতিকর নীতি হলো তরবারির সাহায্যে সকল ধর্মকে উৎখাত করা'। উল্লেখ করা বাহুল্য, এই অভিযোগ নিতান্তই গোঁড়ামি ও অজ্ঞতাপ্রসুত। এবং বিখ্যাত ঐতিহাসিকেরাও এই কথাই বলেন যে, এই ধরনের কোন অভিযোগের সামান্যতম ভিত্তিও কোরআন শরীফে নেই। এবং খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি বিজয়ী মুসলিম জাতির যে সার্বিক আচরণ, আইন ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যে সহিষ্ণুতা তা থেকেও প্রমাণিত হয়, এই অভিযোগ কত অসার ও অন্ত:সারশূন্য। প্রকৃতপক্ষে মোহাম্মদ (সা:) এর জীবনের যে অসাধারণ সাফল্য তার সঙ্গে তরবারির কোন সম্পর্ক নেই; সেই সাফল্য একমাত্র তাঁর নৈতিক শক্তির উপরই পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত। সত্য যে তাঁকে জেহাদের অবতীর্ণ হতে হয়েছে, কিন্তু সে কেবল আত্মরক্ষার্থে ও সকল শান্তিপ্রচষ্টা বার বার ব্যর্থ হওয়ার কারণে পরিস্থিতি তাঁকে রণক্ষেত্রে যেতে বাধ্য করেছে। কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক নবী মোহাম্মদ (সা:) যুদ্ধনীতি ও যুদ্ধক্ষেত্রের পুরো চেহারাটাই বদলে দিয়েছিলেন। স্মরণ করতে পারি, সম্পূর্ণ আরব উপদ্বীপ ইসলামের পতাকাতলে আসা পর্যন্ত তাঁর সমগ্র জীবনে যত যুদ্ধ হয়েছে তাতে সর্বমোট হতাহতের সংখ্যা কয়েক'শত অধিক নয়। এবং এই যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি বর্বর আরববাসীকে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে আবর্শিকভাবে রীতিমত জামানতবদ্ধ হয়ে নাজাম পড়বার শিক্ষা দিচ্ছেন। এমনকি যুদ্ধের ভয়াবহ প্রচণ্ডতার মধ্যেও দিনে পাঁচবার এই জামাতবদ্ধ নামাজ আদায়ের কোরূপ ব্যত্যয় ঘটেনি। একদল মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে যখন সেজদারত অন্যদল তখন শত্রুর

www.nagorikpathagar.org

মোকাবিলা করছেন: নামাজশেষে নামাজীরা যুদ্ধে যাচ্ছেন আর যাঁরা ছিলেন যুদ্ধরত তাঁরা আসছেন নামাজে। কী বিস্ময়কর কল্পনাতীত এই দৃশ্য। অথচ এই সেই আরবদেশ যেখানে ভুলক্রমে এক গোত্রের একটি উট অপর গোত্রের চারণভূমিতে প্রবেশ করার মত তুচ্ছ কারণে পরস্পরের বিরুদ্ধে এমন ভয়াবহ লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, যা একাদিক্রমে চল্লিশ বছর ধরে চলে, যে যুদ্ধে সত্তর হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটার পরেও আক্রোশ প্রশমিত হয় না এবং উভয় গোত্রেরই প্রায় নিশ্চিহ্ন হবার মত অবস্থা হয়। ইলামের নবী সেই আরববাসীকে সর্বোচ্চ আত্মনিয়ন্ত্রন ও শৃঙ্খলার এমন শিক্ষা দান করলেন যার মহিমা এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও নামাজের মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। চরম বর্বরতার যুগে রণক্ষেত্রও আলোকিত হয়ে উঠে মানবিক মহিমায়। নবী মোহাম্মদ (সা:) এর কঠোর নির্দেশ প্রতারণা করা যাবে না, বিশ্বাসভঙ্গ করা যাবে না, নিহত ব্যক্তির অঙ্গচ্ছেদ করা যাবে না। তাঁর নির্দেশ: শিশু নারী বৃদ্ধদের হত্যা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, কোন ফলের গাছ বিনষ্ট কি কর্তন করা নিষিদ্ধ; নিষিদ্ধ, শত্রু হলেও প্রার্থনারত কোন ব্যক্তিকে আঘাত করা। নিকৃষ্টতম শত্রুর প্রতিও তাঁর নিজের আচরণ তাঁর অনুসারীদের জন্য এক অদৃষ্টপূর্ব মহত্তম দৃষ্টান্ত। মক্কা জয়ের পর তিনি ক্ষমতার সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত। এই সেই মক্কা নগরী যেখানে তিনি প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন, তাঁর কথায় কেউ কণামাত্র কর্ণপাত করে নি: এই সেই মক্কা, যে নগর তাঁকে ও তাঁর অনুগামীদের উপর সীমাহীন অত্যাচার করেছে, তাড়িয়ে দিয়েছে, নির্দয়ভাবে বয়কট করেছে, এমনকি দু'শো মাইল দূরে গিয়েও তিনি রেহাই পান নি। সেই মক্কা আজ তাঁর পদতলে। যুদ্ধের নিয়মানুযায়ী তিনি সংগতভাবেই তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে যা-কিছু শত্রুতা ও নির্দয়তা ও প্রতিহিংসা আজ তার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু কী ব্যবহার তিনি প্রদর্শন করলেন? কোন প্রতিশোধ কি প্রতিহিংসা নয়, মোহাম্মদ (সা:) এর হৃদয় আজ মমতাপ্লুত; তিনি ঘোষনা করলেন, 'তোমাদের কারো বিরুদ্ধে আজ আর কোন অবিযোগ নেই, তোমরা সবাই মুক্ত'। ঘোষণা করলেন, 'মানুষে মানুষে বিভেদ ও ঘৃণা আজ আমার এই দুটি পদতলে পিষ্ট ও বিনষ্ট হোক'। কোন সন্দেহ নেই, এই ঐক্যবদ্ধ মানবসমাজই ছিল তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। তাই তিনি আত্মরক্ষার্তে যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছেন বটে, কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছনোমাত্র নিকৃষ্টতম শত্রুও তাঁর ক্ষমা ও মার্জনা লাভ করে। এমনকি যারা তাঁর প্রিয়তম পিতৃব্য হজরত হামজা (রা:) কে হত্যা করে তাঁর বক্ষপিঞ্জর ভেঙ্গে কলিজা চর্বন করেছে তারাও তাঁর ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হয় নি।

বিশ্বভাতৃত্বের নীতি ও মানবসাম্যের যে মতবাদ তিনি ঘোষণা করেছিলেন, মানবতার বাস্তব ও সামাজিক উত্তরণে বিশ্বসভ্যতার সে এক বিরাট অবদান। অবশ্য যে কোন উল্লেখ্যযোগ্য ধর্মই এই একই আদর্শবাদ ব্যক্ত করে, কিন্তু ইসলামের এই নবীর

www.nagorikpathagar.org

মধ্যেই কেবল আমরা তার প্রকৃত ও পরিপূর্ণ বাস্তব প্রয়োগ অবলোকন করি। এবং এই বাস্তব ও ব্যবহারিক প্রয়োগের যে মূল্য ও মহত্ব তা অবশ্যই স্বীকার্য, বিশেষ করে যখন আজ পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক বোধ জাগ্রহ হচ্ছে; যখন বর্ণ গোত্রের সকল কুসংস্কার ও ভেদরেখার অবসানে আজ অস্তিত্বময় হয়ে উঠছে মহত্তর মানবিক ও ভ্রাতৃত্বচেতনা। এবং ইসলামের এই বিশেষ দিকটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে মিস সরোজিনী নাইডু যথার্থই উল্লেখ করেন, 'ধর্ম হিসাবে ইসলামে মধ্যে গণতন্ত্রের সর্বপ্রতম উন্মেষ ও প্রচার ও রূপায়ণ। কারণ আজানের সঙ্গে সঙ্গে যখনই নামাজীরা মসজিদে এসে প্রত্যহ পাঁচবার সমবেহন হন, তখন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এমন এক বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে যেখানে রাজাপ্রজা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একই কথা ঘোষণা করেন যে-একমাত্র আল্লাহই সকল মহত্বের অধিকারী'। ভারতবর্ষের এই বিশিষ্ট মহিলা কবি আরো বলেন,'ইসলামের এই অবিচ্ছেদ্য ঐক্যবোধ অবলোকন করে আমি বার বার মুগ্ধ হই কারণ এ এমন এক ঐক্য যা মানুষের মধ্যে সহজেই জাগিয়ে তোলে এক স্বাত:স্ফুর্ত ভ্রাতৃত্ববোধ। কেউ যখন লণ্ডনে কোন মিশরবাসী কি আলজিরীয়, ভারতীয় কি তুর্কী মুসলমানের সাক্ষাৎ পায়, সে বুঝতে পারে মাতৃভুমির বিভিন্নতায় কিছু এসে যায় না, সবাই মুসলমান, সবাই এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ'। মহাত্মা গান্ধী তাঁর অননুকরনীয় ভঙ্গিতে বলেন, 'কে একজন একদা বলেছিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসরত ইয়োরোপীয়দের কাছে আতঙ্কের ছিল ইসলামে আগমন, সেই ইসলাম যা স্পেনকে সুসভ্য করেছে, সেই ইসলাম যা মরক্কোতে বহন করে এনেছিল জ্ঞানে আলোকবর্তিকা এবং পৃথিবীকে শুনিয়েছিল বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী। দক্ষিণ আফ্রিকার ইয়োরপীয়রা ইসলামকে ভয় পেয়েছিল, পাওয়ারই কথা। কারণ তারা সাদা চামড়ার মানুষের মধ্যে সাম্য কি ভাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার দাবী করতে পারে কিন্তু সর্বমানবিক ভাতৃত্ব যদি পাপ হয় তার একটু বেশিই ভীত হবে। এবং যদি সাম্যের অর্থ হয় সকল বর্ণ গোত্রের সাম্য যা তাদের কাছে আতঙ্কজনক, তাহলে সন্দেহ নেই তাদের আতঙ্ক বেশ শক্তভাবেই সুপ্রতিষ্ঠিত'।

পৃথিবী সাক্ষী, প্রতি বছর হজ্জ্ব মৌসুমে ইসলামী সাম্যের কী বিস্ময়কর আন্ত র্জাতিক দৃশ্যই না ফুটে ওঠে, যেখানে বর্ণ গোত্র ও মর্যাদার সকল ভেদরেখা নি:শেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কেবল ইয়োরোপীয়রা নয়, আফ্রিকান, আরবি, ইরানী, ভারতীয়, চৈনিক সবাই এক স্বর্গীয় পরিবারের সদস্য হিসাবে মিলিত, সবার একই পোষাক, দুই প্রস্থ সাদা সেলাইবিহীন কাপড়, একটি কোমর পেঁচিয়ে পরা ও অন্যটি কাঁধের উপর দিয়ে ছড়িয়ে রাখা, সম্পূর্ণরূপে সাজসজ্জাহীন নগ্ন মস্তক, মুখে একই উচ্চারণ, 'প্রভু আপনার আদেশ পালনার্থে আমি উপস্থিত। আপনি এক এবং উদ্বিতীয়, প্রভু, আমি উপস্থিত'। এইভাবেই সেখানে উচ্চনীচের কোন ভেদ আর অবশিষ্ট থাকে না। এবং তারপর সকল তীর্থযাত্রী-স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন, সঙ্গে নিয়ে যান ইসলামের এক তাৎপর্যময় আন্তর্জাতিক মহিমা ও সৌরভ।

www.nagorikpathagar.org

প্রফেসর হার্গরোনজ (Hurgronje) এর বিবেচনা মতে 'ইসলামের নবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (League of Nations) তা আন্তর্জাতিক ঐক্য এবং সর্বমানবিক ভ্রাতৃত্বকে এমন এক বৈশ্বিক ভিত্তিভূমির উপর দণ্ডায়মান করে যা অন্য বহু জাতির কাছে আলোকবর্তিকা স্বরূপ'। এই অধ্যাপক আরো বলেন, 'আসলেই বহু জাতিক ঐক্যের যে বৈশ্বিক ধারণা ও উপলব্দি ইলামা উপহার দিয়েছে তার তুল্য কোন উদাহরণ পৃথিবীর অন্য কোন জাতির ইতিহাসে নেই'। সন্দেহ নেই, গণতন্ত্রের যে সর্বোৎকৃষ্ট রূপ তা ইসলামের নবীই পৃথিবীকে প্রদর্শন করেছেন। খলিফা ওমর (রা:), মোহাম্মদ (সা:) এর জামাতা খলিফা আলি (রা:), খলিফা মনসুর, আব্বাস মামুনসহ বহু খলিফা এবং বাদশাহকে একজন সাধারণ অপরাধীর মত বিচারকের সম্মুখীন হয়ে ইসলামী আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। আমাদের কারো অজানা নয়, আজকের দিনেও কালো নিগ্রোদের প্রতি সভ্য সাদা মানুষদের কী আচরণ। অথচ আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে হজরত মোহাম্মদ (সা:) এর সময়ে একজন নিগ্রো ক্রীতদাস হজরত বেলাল (রা:) কী মর্যাদা পেৌছিলেন তা স্মরণ করলে বিস্মিত হতে হয়। ইসলামের প্রথম যুগে মুয়াজ্জিনের কাজটা ছিল অতীব মর্যাদাপূর্ণ। এই সম্মান লাভ করেছিরেন হজরত বেলাল (রা:)। মক্কা বিজয়ের পর নবী মোহাম্মদ (সা:) তাঁকে নামাজের জন্য আজান দিতে বললেন। কৃষ্ণবর্ণ পুরু ঠোঁটের এই নিগ্রো মানুষটি ইসলাম জগতের সর্বাধিক গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহাসিক ও পবিত্রতম কাবা শরীফের ছাদে গিয়ে যখন দাঁড়ালেন, কিছু গর্বিত আরব তখন আর্তনাদ করে উঠলো যে, 'কী নিদারুণ, কী বেদনাদায়ক। আজ এক কালো নিগ্রো ক্রীতদাস পবিত্র বাকাগৃহের ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আজান দেবার জন্য'। সেই মুহূর্তে মোহাম্মদ (সা:) কোরআন পাকের আয়াত থেকে ঘোষণা করলেন:

'হে মানবজাতি,
নিশ্চয়ই তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে
বিভিন্ন পরিবার ও গোত্রে,
যাতে একে অপরকে তোমরা জানতে পারো।
নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে
সেই সেই ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত,
যে সর্বাপেক্ষা অধিক পূর্ণবান।
নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সুপরিজ্ঞাত।'

এবং কোরআন শরীফের এই ক'টি পংক্তি এতই শক্তিশারী প্রভাব বিস্তার করেছিল, সাধন করেছিল এমন মানসিক রূপান্তর যে, এমনকি ইসলাম খলিফারা পর্যন্ত,

www.nagorikpathagar.org

যাঁরা জন্মসুত্রে বিশুদ্ধ আরব, এই নিগ্রো দাসের হাতে নিজ কন্যা সম্প্রদান করতে আগ্রহী হন। এবং ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আমিরুল মুমেনীন হজরত ওমর (রাঃ) ও এই নিগ্রো ক্রীতদাসের সঙ্গে দেখা হলেই দাঁড়িয়ে এই বলে সশ্রদ্ধ স্বাগত জানান, 'আসুন, আমাদরে সর্দার, আমাদের নেতা'। সমসাময়িক জগতে যে আরব ছিল সর্বাপেক্ষা আভিজাত্য-গর্বিত, কোরআন সেই আরবদের মধ্যে কি অলৌকিক পরিবর্তনই না সাধন করেছিল। হৈ হেতুই জার্মানে শ্রেষ্ঠতম কবি গ্যেটে কোরআন শরীফ সম্পর্কে নির্দ্বিধায় বলেন, 'এ এমন এক গ্রন্থ যার মহিময় প্রভাব ও অনুশীলন যুগ যুগ ধরে একইভাবে অব্যহত থাকবে'। এবং বর্নার্ডশ বলেন, 'আগামী এক শতাব্দীর মধ্যে কোন একটি ধর্মের দ্বারা যদি ইংল্যাণ্ড তথা ইয়োরোপ শাসিত হবার ঘটনা ঘটে, সে ইসলাম'।

এবং ইসলামের এই একই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নারীজাতিকেও পুরুষের নিগড় থেকে মুক্তি দিয়েছিল। স্যার চার্লস আর্চিবাল্ড হ্যামিল্টন বলেছেন, 'মানুষ যে জন্মগতভাবে নিস্পাপ এই কথা ইসরামই শিখিয়েছে। ইসালামই বলেছে, নারী পুরুষ একই উপকরণ থেকে সৃষ্ট, উভয়ে একই আত্মার অধিকারী কোন তারতম্য নেই উভয়ের মধ্যে। তারা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক একটা বড় ঐতিহ্য ছিল, যে সন্তান অস্ত্রচালনায় দক্ষ সেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। কিন্তু ইসলামের আগমেনই দুর্বল নারীজাতির সুরক্ষার ব্যবস্থা হলো, এবং তারা লাভ করলো পিতামাতার সম্পদের উত্তরাধিকার। নারীদের যে সম্পদের মালিকানা, বহু শতাব্দী পূর্বে ইসলামই তা নিশ্চিত করেছে। এবং বিস্ময়কর, যে ইংল্যাণ্ড আজ গণতন্ত্রের সুতিকাগার বলে অভিহিত, সেই ইংল্যাণ্ড মাত্র এক'শ বছর আগে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইসলামের এই আদর্শ রূপায়নে 'বিবাহিত মহিলা বিধান' নামে একটি আইন পাশ করেছে। কিন্তু বহু শতাব্দী পূর্বেই ইসলামে নবী (সাঃ) স্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করেছিলেন, 'পুরুষ ও নারী পরস্পরের পরিপূরক, একে অপরের অর্ধাংশ। অতীব পবিত্র অধিকার, লক্ষ রেখো তাদের জন্য সংরক্ষিত অধিকার যেন পূর্ণরূপে অক্ষত থাকে'।

রাজনীতি কি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে ইসলামের যোগ খুব প্রত্যক্ষ নয়, কিন্তু এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতি ইসলাম নির্ধারণ করেছে যা মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। প্রফেসর ম্যাসাইনন এর মতে ইসলাম দুই চরমতম বিপরীতের মধ্যে রচনা করে হিতকারী ভারসাম্য, এবং যে উন্নত চরিত্র সভ্যতার ভিত্তিস্বরূপ, তা গঠন ইসলামের ভূমিকা খুবই সহায়ক। কিন্তু কি করে সম্ভব হয় এই লক্ষ্য অর্জন? সম্ভব হয় ইসলামের ভূমিকা খুবই সহায়ক। কিন্তু কি করে সম্ভব হয় এই লক্ষ্য অর্জন? সম্ভব হয় ইসলামের উত্তরাধিকার আইন ও বাধ্যতামূলক জাকাত-

www.nagorikpathagar.org

এর যে বিধান, তার ব্যত্যয়হীন প্রয়োগের মধ্য দিয়ে; এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সব ধরনের অপতৎপরতা, যেমন একচেটিয়া বাজার, সুদ, পুর্বনির্ধারিত অনর্জিত আয় ও মুনাফা, কৃত্রিম অভাবসৃষ্টির মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি-এসব সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধকরণের মধ্য দিয়ে। ইসলামে জুয়া বেআইনী। অন্যদিকে স্কুল মসজিদ হাসপাতাল, পানীয়জলের ব্যবস্থা এতিমখানা, এ-সকল ক্ষেত্রে অর্থব্যয় ইসরঅমে অত্যন্ত উচুমানের উদ্ভব। বস্তুত এতিমদের জন্য ব্যবস্থাপনার যে ধারণা, তা পৃথিবী এই নবী (সাঃ) এর নিকট থেকেই লাভ করেছে যিনি নিজেও ছিলেন একজন এতীম। এই মোহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে কার্লাইলের একটি বিখ্যাত উক্তি, 'যা কিছু উৎকৃষ্ট সেই সাম্য করুণা ও মানবতার এক স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর, যেন প্রকৃতির মধ্য থেকে উঠে আসা সন্তানটির জবানে প্রকৃতিগতভাবে উচ্চারিত'।

একদা এই ঐতিহাসিক বলেছিলেন, কোন মহামানবকে যদি বিচার করতে হয়, তিনটি বিষয়কে পরীক্ষা করো। এক, তিনি কি তাঁর সমসাময়িক কালে পরিপূর্ণরূপে খাঁটি ও অকৃত্রিম বরে গৃহীত হয়েছেন? দুই, তিনি কি এতটা বড় ছিলেন যে তাঁর আপন সময়ে প্রতিষ্ঠিত মানদণ্ডের উর্ধে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন? এবং তিন, তিনি কি এমন কোন অবদান রেখে গেছেন যা পরবর্তী পৃথিবীর জন্য স্থায়ী সম্পদ? এই তালিকা আরো বাড়ানো যায় কিন্তু তা অনাবশ্যক। কারণ মহত্ব নিরূপণের এই তিনটি পরীক্ষাই যথেষ্ট, যা দিয়ে নবী মোহাম্মদ (সাঃ) এর শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করা সম্ভব। শেষোক্ত দু'টি বিষয়ে ইতিমধ্যেই কিছু আলোচনা হয়েছে; এখন প্রথম শর্তটির দিকে লক্ষ করি; নবী মোহাম্মদ (সাঃ) কি তাঁর সমসাময়িক জনগণের কাছে অকৃত্রিম ও খাঁটি বলে গৃহীত হয়েচেন? ঐতিহাসিক তথ্যবলী থেকে এটা প্রমাণিত, শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সবাই একমত যে, মোহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন উৎকৃষ্টতম গুণাবলী ও অনুপম চরিত্রের অধিকারী। তাঁর ছিল নিরঙ্কুশ সততা নিষ্কলুষ নির্মলতম চরিত্র, তিনি ছিলেন, সর্ববিধ মহত্তম গুণের আধার, জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিটি পদক্ষেপে পুর্ণতম বিশ্বস্ততার প্রতীক। এমনকি যারা তাঁর কথায় আদৌ বিশাবাস করতো না, সেই ইহুদিরা পর্যন্ত তাঁর পূর্ণ পক্ষপাতহীনতার কারণে তাঁকেই নিজেদের যে-কোন বিবাদ মীমাংসার জন্য বিচারক মেনে নিতো। এবং যারা তাঁর কথায় কিছুমাত্র কর্ণপাত করে না, তারাও বলতে বাধ্য হয়েছে 'ওগো মোহাম্মদ, আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিনা, আমরা কেবল তাকে অস্বীকার করি, যে তোমাকে কেতাব দান করেছে এবং যে তোমাকে ওহি প্রেরণ করে'। আসলে তারা ভাবতো, তিন ছিলেন কোন অশুভ ভূতগ্রস্ত। এবং তারা তাঁকে এই অশুভ আত্মার আচ্ছন্নতা থেকে নিরাময় করবার জন্যই নিপীড়নের আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু সেই তাদেরই শ্রেষ্ঠতম অংশ কিছু মানুষ তখনই অবলোকন করেছিলেন মোহাম্মদ (সাঃ) এর মধ্যে দিয়ে এক নতুন আলোর অভ্যুদয়, যে প্রভাত-আলোয় অবগাহন করবার জন্য

www.nagorikpathagar.org

দ্রুত ছুটে এসেছিলেন তাঁরা। এবং ইসলামের এই নবী মোহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন ও ইতিহাসের এটা একটা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিষয় যে, যাঁরা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন, তাঁর সেই নিকট আত্মীয়, ভাই বন্ধু পরিজন কেউই তার মহৎ উদ্দেশ্য কি কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ছুটে আসেন নি, এসেছিলেন তাঁর ঐশ্বরিক প্রেরণার যথার্থ্য অনুভব করে। যদি এই সকল মানুষ, যাঁরা ছিলেন শিক্ষিত বিজ্ঞ ও সম্ভ্রান্ত, ছিলেন সর্বোপরি নবী জীবনের সকল কিছু সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ওয়াকিবহাল, তাঁদের চোখে সামান্যতম বিচ্যুতি চালাকি ফাঁকিবাজি, কিঞ্চিত্তম জাগতিক লোভ কি বিশ্বাসভঙ্গের ক্ষুদ্রতম লক্ষণও ধরা পড়তো, মোহাম্মদ (সাঃ) এর যে আশা, মানুষের মধ্যে নবজন্ম নবপ্রেরণার সঞ্চার ও আধ্যাত্মিক জাগরণের যে প্রচেষ্টা, সমাজ সংস্কারের যে কার্যক্রম তা সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতো, তাঁর স্বপ্নসৌধ খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়তো, সব কিছু ধুলিসাৎ হয়ে যেতো মুহুর্তের মধ্যে। অথচ কী দেখি আমরা? দেখি, তাঁর অনুগামীদের ভক্তি ও আণুগত্য এতই অপরিমেয় যে, তাঁরা স্বতঃস্ফুর্তভঅবেই আপনাপন জীবনের একমাত্র পরিচালক হিসাবে গ্রহণ করেছেন মোহাম্মদ (সাঃ) কে। সকল বিপদ ও নিগ্রহকে তাঁরা বরণ করে নিয়েছে তাঁরই জন্য; অত্যাচারের কঠিনতম মুহুর্তে, শারীরিক-মানসিক পীড়নের দুঃসহতম অবস্থায়ও, এমনকি নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে, তাঁরা তাঁদের আস্থায় ও শ্রদ্ধায় ও আনুগত্যে অটুট অবিচল। আর এই রকমই যদি হয়, ইতিহাস যদি এই কথাই বলে, তাহলে এটা কি সম্ভব যে তাঁরা অধিনায়কের মধ্যে কখনো সামান্যতম স্খলনও লক্ষ নিয়।

ইসলামে যাঁরা নবদীক্ষিত, সেই তাঁদের ইতিহাস যদি লক্ষ করি, দেখবো কী মর্মস্পর্শী দৃশ্য, কী নির্মমতমম পীড়নই না জর্জরিত করেছে সেই সব নিরাপরাধ-মানব-মানবীকে। সুমাইয়া (রাঃ) নাম্মী এক নির্দোষ মহিলা, তাকে বল্লমের আঘাতে আঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে। ইয়াসির (রাঃ) যাঁর দুটি পা দুই উটের সঙ্গে বেঁধে উট দুটিকে দুইদিকে তাড়া করা হলো। খাব্বাব (রাঃ) কে জ্বলন্ত কয়লার উপর শোয়ানো হয়েছে, তাপর অত্যাচারীরা তাঁর বুকের উপর এমন সজোরে পা তুলে দাঁড়িছে যাতে তিনি নড়াচড়া করতে না পারেন, তাঁর অগ্নিদগ্ধ পিঠের চামড়া ও চর্বি পুড়ে গলে গেছে। খাবান বিন আদী (রাঃ) র শরীরের মাংস কেটে কেটে এমন নৃশংস অত্যাচার করা হয়েছে যা লোমহর্ষক। এবং এই অত্যাচারের এক পর্যায়ে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'তুমি কি চাওনা, তোমার স্থলে মোহাম্মদকে এই শাস্তি প্রদান করা হোক'? খাবান (রাঃ) আর্তনাদ করে উঠলেন, 'অসম্ভব। মোহাম্মদ (সাঃ) কে রক্ষার জন্য আমি নিজে, আমার পরিবার, আমার সন্তান-সন্ততি সবকিছু হাসিমুখে উৎসর্গ করতে আমি বদ্ধপরিকর'। একটি দু'টি নয়, এ-রকম শত শত হৃদয়বিদারক ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। কিন্তু এইসকল ঘটনা কী প্রতিফলিত করে, কোন সত্য প্রমাণিত হয়

www.nagorikpathagar.org

এখানে? প্রমাণিত হয়, ইসলামের এই প্রথম কালের সন্তানেরা কেবল নিছক আনুগত্যই প্রকাশ করেন নি, মোহাম্মদ (সা:) এর পদপ্রান্তে তাঁরা তাঁদের সমগ্র প্রাণমন, হৃদয় আত্মা ও অন্তর নি:শেষে উৎসর্গ করেছিরেন। অনুগামীদের এই যে গভীর বিশ্বাস, এই যে, প্রস্তারকঠিন আস্থা, এ-থেকে কি প্রমাণিত হয় না যে মোহাম্মদ (সা:) ছিলেন কত ঐকান্তিক ও বিশ্বস্ত, ছিলেন অর্পিত দায়িত্বের প্রতি কত সৎ ও নিষ্ঠাবান।

বলা বাহুল্য, এই সকল নবদীক্ষিতরা কেউই নিম্নবংশের কি নিম্নমানের ছিলেন না। ইসলামের সেই উন্মেষকালে যাঁরা মোহাম্মদ (সা:) এর পাশে সমবেত হয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন মক্কার সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সম্ভ্রান্ত মানুষ; অর্থ সম্মান ও সামাজিক অবস্থান, রুচি ও আভিজাত্রে তাঁরাই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অনেকে তাঁর নিকট আত্মীয়ও বটে, যাঁরা তাঁকে আদ্যোপান্ত্ম আপাদমস্তক চিনতেন। উল্লেখযোগ্য, সুউচ্চ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ইসলামের যে প্রথম চারজন খলীফা তাঁরা সকলে এ্ সময়েরই মুসলমান। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে আছে, 'পৃথিবীর সকল নবী ও ধর্মবেত্তার মধ্যে মোহাম্মদ (সা:) ই সর্বাপেক্ষা সার্থক ও সফল'। এই উক্তি নি:সন্দেহে যথাযথ। কিন্তু উল্লেখ করা আবশ্যক, এই সাফল্য কোন কাকতারীয় ঘটনা নয়। এই সাফল্যের প্রকৃত কারণ, তাঁর সমসাময়িক কালের মানুষ তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিল নিখাদ অকৃত্রিমতা ও খাঁটিত্ব। এই সাফল্য তাঁর উচ্চ-প্রশংসিত ও বিস্ময়করূপে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বেরই ফসল। সত্যই কী অলৌকিক অসাধারণ ও বিস্ময়কর এই মোহাম্মদ (সা:) এর ব্যক্তিত্ব, যার সঠিক পরিচয় তুলে ধরা বাস্তবিকই অত্যন্ত দুরূহ। আমরা কিঞ্চিৎ আলোকপাত করতে পারি মাত্র কিন্তু এটাই সমধিক সত্য যে, এই ব্যক্তিত্বের অতি সামান্যই কারো পক্ষে প্রতিফলিত করা সম্ভব। সত্যই তাঁর জীবন ও চরিত্রের মধ্যে কী নাটকীয় বহুবর্ণ দৃশ্যের সমাহার, জীবনের সর্ববিধ ঐশ্বর্যে কী চিত্রোপম সুষমা। একাধারে তিনি আল্লাহর সংবাদবাহী পয়গম্বর, তিনি সেনাধ্যক্ষ, তিনি বাদশাহ, তিনি যোদ্ধা ব্যবসায়ী ও ধর্মপ্রচারক, তিনি বাগ্মী সমাজসংস্কারক, তিনি অসহায় এতীমের আশ্রয়স্থল, উৎপীড়িত ক্রীতদাসের রক্ষক, নারীসমাজের মুক্তিদাতা, তিনি আইনপ্রণেতা বিচারক ও জাগতিক মোহমুক্ত এক আধ্যাত্মিক মুক্তিদাতা, তিনি আইনপ্রণেতা বিচারক ও জাগতিক মোহমুক্ত এক আধ্যাত্মিক তাপস। এবং আশ্চর্য, সকল ভুমিকা ও জীবনের সর্ববিধ ক্ষেত্রেই তিনি সাফল্যের শ্রেষ্ঠতম প্রতীক, এক অদ্বিতীয় মহানায়ক।

এতীম মানেই অসহায়ত্বের চুড়ান্ত, এই ভূপৃষ্ঠে এতীম অবস্থায়ই তাঁর জীবনের শুরু; বস্তুগত ক্ষমতার উচ্চতম শীর্ষ হলো বাদশাহী, এই বাদশাহী দিয়েই তাঁর জীবনের সমাপ্তি। এতীম বালক থেকে উৎপীড়িত মুহাজির ও তারপর এক মহাসম্রাটরূপে অভিষিক্ত! কি আধ্যাত্মিক কি নশ্বর-তজাগতিক সকল ক্ষেত্রেই মোহাম্মদ (সা:) একটি

www.nagorikpathagar.org

জাতির অবিসংবাদিত অধিনায়কও ভাগ্যনিয়ন্তা, যিনি সকল পরীক্ষা ও প্রলোভন, জীবনেরসব উত্থান পতন পরিবর্তন, আতঙ্ক কি উজ্জ্বলতা সবকিছুর মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন জগৎসমক্ষে এক অনির্বাণ দীপশিখা; এবং তিনি বেরিয়ে এলেন বিজয়ীর বেশে সার্বিক মানবজীবনের অক্ষত অনাহত এক আদর্শরূপে। তাঁর সাফল্য জীবনের কোন ক্ষেত্রে কেবল সীমাবদ্ধ নয়, মানবজীবনের সর্ববিধ ক্ষেত্রেই তিনি অত্যুত্তম আদর্শ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নিরঙ্কুশ নৈতিক অন্ধকার ও সর্বপ্লাবী বর্বরতা থেকে কোন জাতিকে মুক্ত ও পবিত্র করে তোলা যদি মহত্বের একটি পরিচয় বলে বিবেচিত হয়, তাহলে মোহাম্মদ (সা:) অবশ্যই মহৎ। কারণ তাঁর প্রখর ও অনবদ্য ব্যক্তিত্বের স্পর্শই আরবদেরকে অধ:পাতের নিম্নতম স্তর থেকে তুলে এনে পবিত্র পরিশুদ্ধ উন্নত এক মহান জাতিতে পরিণত করলো, যারা উঠে দাঁড়ালো গভীর অন্ধকুপ থেকে শিক্ষা ও সভ্যতার কে আলোকবর্তিকা হাতে। মহত্ব বলতে যদি একটি বহুধাবিভক্ত মানবমণ্ডলীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও করুণা, প্রেম ও সখ্যের বন্ধনে এক নিবিড় ঐক্যরচনা বোঝায়, উষর মরুভূমির বুকে আবির্ভুত এই নবী মোহাম্মদ (সা:) নি:সন্দেহে মহত্বের মুকুট পরিধানের যোগ্য। মহত্বের অর্থ যদি হয় অন্ধ কুসংস্কার ও অহিতকর সকল কর্মধারার সমূল উৎখাত ও সংস্কারসাধন, তাহলে বলতেই হয়, লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তর থেকে তিনি নি:শেষে উৎপাটন করেছিলেন এই কুসংস্কার, এই অলীক ও অতিপ্রাকৃতিক শঙ্কা। যদি বলি,মহত্ব এক উচ্চতর নৈতিক মান তাহলেও স্মরণ করতে পারি,মোহাম্মদ (সা:) শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সবার কাছেই ছিলেন আল আমীন অর্থাৎ পরম বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী। যদি ধরা যায়, দেশবিজয়ী কোন রাষ্ট্রনায়কই 'মহৎ' অধিধায় আখ্যায়িত হবার যোগ্য তাহলে উল্লেখ করতে পারি, নিতান্তই করুণার পাত্র সহায় সম্বলহীন এতীম অবস্থা থেকে মোহাম্মদ (সা:) মাথা উঁচু করে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন সমুদয় আরবের শাসনদণ্ডের অধিকর্তারূপে; যদি ছিলেন যুগপৎ খসরু ও সিজরের যে যোগফল তার সমতুল্য, যিনি এমন এক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা যা চৌদ্দ'শ বছর ধরে এখনো অক্ষত। নেতার প্রতি যে প্রশ্নাতীত আনুগত্য, তাকেও যদি মহত্বের অভিজ্ঞান বলে বিবেচনা করি, দেখবো এই নবীর নামের মধ্যেই কী ঐন্দ্রজালিক শক্তি ও মহিমা, যা আজো পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের কোটি কোটি হৃদয়কে সম্মোহিত ও অভিভুত করে রেখেছে। এই নবী মোহাম্মদ (সা:) এথেন্স কি পারস্য, ভারতবর্ষ কি চীনের কোন বিদ্যাপীঠে দর্শনশাস্ত্রে অধ্যয়ন করেননি কিন্তু কি বিস্ময়কর, তিনি যা ঘোষণা করলেন তা মানবজাতির জন্য অনন্তকালের প্রেক্ষাপটে চিরকল্যাণকর এক মহাসত্যের বাণী। নিরক্ষর, কিন্তু তাঁর বাকশৈলীতে বাঙময় হয়ে ওঠে এমন সৌরভ ও শিল্প ও বাগ্মিতা যা শ্রোতার বিমুগ্ধ চোখ দুটিকে করে তোলে অশ্রুসজল। জাগতিকভাবে একেবারেই রিক্ত এক এতীম কিন্তু সকলের প্রিয়পাত্র, সবার প্রাণের মনিকোঠায় তাঁর স্থান। তিনি ভয়াবহতম অবস্থা, ক্রুরতম

www.nagorikpathagar.org

বৈরিতার বিরুদ্ধেও নিপুণ ও নির্ভুলভাবে সুবিন্যস্ত করতে জানেন; এবং তাঁর অধিনায়কত্বে শুধু নৈতিক শক্তি ও দৃঢ়তার কারণে জয়ও পুন: পুন: করায়ত্ব হয়।

মৌলিক প্রকৃতিদত্ত শক্তির অধিকারী এবং সর্বতোভাবে প্রতিভাবান, এমন প্রচারক পৃথিবীতে খুবই বিরল। হিটলারও তাঁর মেইন ক্যাম্পে এই একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন, 'বড় কোন তাত্ত্বিক খুব কমই একজন বড় মাপের নেতা হতে পারেন্ বরং একজন আন্দোলনকারীর মধ্যে এমন একজন বড় মাপের নোত হতে পারেন। বরং একজন আন্দোলনকারীর মধ্যে এমন সব গুণ পরিদৃষ্ট হয় যা তাকে এজন উৎকৃষ্ট নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। কারণ নেতৃত্ব মানে জনগণকে আন্দোলিত ও চালনা করার শক্তি। অথচ তত্ত্বজ্ঞের মধ্যে সাধারণত নেতৃত্বেদানের এই যোগ্যতার বিশেষ স্ফুরণ লক্ষ করা যায় না। তাই একই ব্যক্তির মধ্যে যুগপৎ তাত্ত্বিকতা, সাংগঠনিক শক্তি ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতা, এই তিনটি গুণের সার্থকব সমন্বয় ঘটেছে এমন মানুষ পৃথিবীতে দুলভতম; এবং একেই বলে মহত্ব। ধরাপৃষ্ঠে বিচরণশীল একটি রক্তমাংসের মানুষ এই নবী মোহাম্মদ (সা:) এর মধ্যে পৃথিবী সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছে এই দুর্লভতম মহত্ব।' এবং আরো বেশি বিস্ময়কর, রেভারেণ্ড বসওয়ার্থ স্মিথ যা বলেন, 'তিনি ছিলেন একই সঙ্গে রাষ্ট্র এবং গীর্জা দুটোরই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, একই সঙ্গে সিজর এবং পোপ। কিন্তু পোপ হয়েও তিনি কখনো পোপের দাবী করেন নি; এবং তিনি সিজর বটে কিন্তু সম্পূর্ণ রিক্ত অনাড়ম্বর এক সিজর, যাঁর না ছিল কোন সদাপ্রস্তুত সৈন্যবাহিনী, না কোন দেহরক্ষী, না রাজপ্রসাদ, না কোন নির্দিষ্ট বেতন ভাতা। কখনো কোথাও যদি এমন দাবী করবার মত কেউ থাকেন যে, তাঁর শাসন ও প্রশাসন সম্পূর্ণরূপে এক অপার্থিব ঐশ্বরিক অধিকরপ্রসূত, তাহলে তিনি মোহাম্মদ (সা:)। কারণ ক্ষমতার সকল পার্থিব আনুষঙ্গিকতা ও ভিত্তি ও সহায়তা ছাড়াই তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। ক্ষমতার কোন আভরণ তাঁর প্রয়োজন নেই, ক্ষমতার সকল বাহ্যিক জৌলুষমুক্ত তিনি সম্পূর্ণরূপে নিরাভরণ; তাঁর ব্যক্তিগত ও প্রশাসনিক জীবন একইরকম অনাড়ম্বর সরলতার মধ্যে স্থাপিত ও আবর্তিত।

মক্কাজয়ের পর দশলক্ষ বর্গমাইলেরও অধিক এক বিশাল এলাকা তাঁর পদানত, অথচ সমগ্র আরবের একচ্ছত্র অধিপতি এই নবী (সা:) নিজ হাতে নিজের জুতো ও মোটা পশমের কাপড় সেলাই করছেন, ছাগলের দুধ দোহন করেছেন, ঘর ঝাড়ু দেয়া, আগুন জ্বালানো ইত্যাদি পরিবারের সব কাজই তিনি করেছেন নিজ হাতে। যে মদীনায় তিনি বাস করেছেন, তাঁর জীবনের শেষ দিকে সেই মদীনা হয়ে উঠেছে বিপুলভাবে সম্পদশালী, সর্বত্রই ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি। অথচ এমন প্রাচুর্যের মধ্যেও একাদিক্রমে অনেক দিন অনেক সপ্তাহ এই সম্রাটের গৃহে কোন উনুন জ্বলে নি, দিন অতিবাহিত

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে শুধু শুকনো খেজুর আর পানি খেয়ে। তাঁর পরিজনের উপর্যুপরি অনেক রাত কেটেছে খাদ্যাভাবে অনাহারে ক্ষুদার্ত অবস্থায়। তিনি কখনো নরম বিছানায় শয়ন করেন নি, তাঁর শয্যা ছিল খেজুর আর পানি খেয়ে। তাঁর পরিজনদের উপর্যুপরি অনেক রাত কেটেছে খাদ্যাভাবে অনাহারে ক্ষুধার্ত অবস্থায়। তিনি কখনো নরম বিছানায় শয়ন করেন নি, তাঁর শয্যা ছিল খেজুর পাতার মাদুর। এবং ব্যস্ত পরিশ্রান্ত দিনের শেষে তিনি খুব কমই বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন। তাঁর অধিকাংশ রাত কেটে যেত নামাজে এবাদতে; আপন স্রষ্টার কাছে কেঁদে কেঁদে শুধু এই শক্তি ও সাহায্য প্রার্থনা করেছেন, যাতে সুচারুভাবে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হন। এবং জানা যায়, তিনি স্রষ্টার কাছে কান্নায় এমনভাবে ভেঙ্গে পড়তেন, কান্নার আবেগে তাঁর কন্টস্বর এমনভাবে রুদ্ধ হয়ে যেত, যেন মনে হতো ফুটন্ত কোন জলপাত্র থেকে শব্দ উত্থিত হচ্ছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়,তিনি যেদিন মৃত্যুবরণ করলেন সেদিন তাঁর সম্পদ বলতে ছির মাত্র কয়েকটি মুদ্রা, যার কিয়দংশ ঋণ পরিশোধ ও কিছু অংশ অভাবী লোকের মধ্যে বিতরণেই নি:শেষ হয়ে যায়; যে কাপড় পরে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন সেই কাপড় ছির বহুস্থানে তালিযুক্ত। এবং যে গৃহ থেকে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল আলো সেই গৃহ ছিল অন্ধকার, সেই গৃহে সেদিন তৈলাভাবে কোন প্রদীপ জ্বলে নি। অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু নবী (সা:) এর কোন পরিবর্তন নেই। জয়ে কি পরাজয়ে, ক্ষমতায় কি রিক্ততায়, সংকটে প্রাচুর্যে কি দারিদ্র্যে সবৃদা একই মানুষ, চরিত্রের একই প্রকাশ। সত্যই, ঈশ্বরের সকল নিয়ম ও বিধানের মত নবী পয়গম্বরেরাও অপরিবর্তনীয়।

কথা আছে, একসন সৎ মানুষ ঈশ্বরের মহত্তম সৃষ্টি। মোহাম্মদ (সা:) ছিলেন সততার সর্বোচ্চ উদাহরণ। তিনি ছিলেন সর্বাংশে একজন মানুষ; মানবপ্রেম ও মানুষের জন্য করুণা ছিল তাঁর আত্মার সঙ্গীত। মানুষের সেবা, মহত্তম লক্ষ্যে মানুষের উত্তরণ, মানুষকে শিক্ষিত পুত পবিত্র করে তোলা- এক কথায় মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করাই ছিল তাঁর আদর্শ, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর সমগ্র জীবনের লক্ষ্য। এবঙ কথায় ও কর্মে ও চিন্তায় সব কিছুতেই তাঁর যে মানবকল্যাণকামিতা ও ব্রত, সে তাঁর আত্মা থেকে উৎসরিত প্রেরণা ও আত্মা-নির্দেশিত পথরেখারই বিহ:প্রকাশ। তিনি ছিলেন সর্বান্তকরণে সর্বাধিক অনাড়ম্বর ও স্বার্থশূন্য। কিন্তু কী পরিচয় তিনি আখ্যায়িত হতে চেয়েছেন? প্রথমে আল্লাহর একজন বান্দাহ (দাস), তারপর পয়গম্বর। এবং তিনি বলেন নি, তিনিই একমাত্র পয়গম্বর; বরং বান্দাহ (দাস) তারপর পয়গম্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। এবং তাঁর এ-সকল কথার কোন একটিতে যদি কেউ অবিশ্বাস কি সন্দেহ পোষণ করে সে আর মুসলমানই থাকে না, এটা ঈমানেরই একটি অপরিহার্য শর্ত। একজন পশ্চিমী লেখক বলেছেন, 'সমসাময়িক অবস্থা এবং অনুগামীদের সীমাহীন শ্রদ্ধা

www.nagorikpathagar.org

ও আনুগত্য দেখে বলা যায়, মোহাম্মদ (ষা:) এর সর্বাপেক্ষা যে অলৌকিকত্ব তাহলো তিনি কখনোই কোন অলৌকিক শক্তির দাবী করে নি। কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে কিন্তু তা কাউকে আকৃষ্ট কি প্রভাবিত করার জন্য নয়; সে কৃতিত্ব সম্পূর্ণ আল্লাহর এবঙ আল্লাহরই কোন রহস্যময় প্রক্রিয়া অধীন বলে ঘোষণা করেছেন তিনি। তাঁর সরল ও সুস্পষ্ট ঘোষণা, তিনিও অন্য সকলের মত একজন মানুষ মাত্র। পৃথিবী কি স্বর্গের কোন ধনভাণ্ডার তাঁর হাতে নেই, এবং ভবিষ্যতের গর্ভে কী রহস্য লুক্কায়িত সে বিষয়ও তাঁর অজানা। এবং এসব কথা তিনি এমন এক সময়ে বলেছেন, যে কালে অলৌকিকত্বের প্রতি বিশ্বাস ও দুর্বলতা একটি সাধারণ ঘটনা, যা এমনকি সাধারণ সাধু পুরুষদেরও আয়ত্তাধীন বলে মানুষের ধারণা এবং যে-কালে আরব ও আরবের বাইরে এমন পরিবেশ বিরাজমান, অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক বিশ্বাস যেখানে ঘনবদ্ধ। বরং তিনি তাঁর অনুগামীদের দৃষ্টি ও মনোযোগ ফিরিয়ে দিলেন প্রকৃতি ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের চর্চা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে, যাতে তাঁরা প্রকৃতিকে অনুধাবন করতে সক্ষম হন এবং সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন ঈশ্বরের মহিমা। কোরআন পাক ঘোষণা করছে, 'আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা বর্তমান কিছুই তা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করা হয় নি, সকল সৃষ্টির মধ্যেই নিহিত রয়েছে এক পরম সত্য কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা অনুধাবন করে না'। পৃথিবী অলীক ও অর্থহীন নয়; এই সৃষ্টির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত এক গভীল সত্য ও তাৎপর্য দ্বারা মণ্ডিত।

উল্লেখযোগ্য, পবিত্র কোরআন শরীফে প্রকৃতিবিজ্ঞানের চর্চা ও পৃকৃতি পর্যবেক্ষণের দিকে আহ্বান জানিয়ে যত বাক্য নাজিল হয়েছে, তার সংখ্যা নামাজ রোজা হজ্জ্ব ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট বাক্যসমূহের যোগফল থেকে কয়েকগুণ বেশি। এবং এই প্রভাবহেতুই মুসলমানদের হাতে এমন এক বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণার সুত্রপাত ঘটলো যা গ্রীকদের নিকট ছিল অজ্ঞাত। ইবনে বাইতার নামে একজন মুসলিম উদ্ভিদবিজ্ঞানী পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে সংগৃহীত উদ্ভিদ নিয়ে এমন গ্রন্থ রচনা করেন যাকে অতুলনীয় বলে মেয়ার তাঁর 'Gesh der Botanicca-s' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে আলবিরুনী দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে দেশে দেশে ভ্রমন করেন শুধু নানা প্রকার খনিজধাতুর নমুনা সংগ্রহের জন্য; এবং মুসলিম জ্যোতির্বিদরাও গবেষণাকর্মে যে দীর্ঘ অখণ্ড সময় ও শ্রম নিবেদন করেন তা স্মরণযোগ্য। অথচ এ্যারিস্টটল পদার্থবিজ্ঞানের উপর বই লিখেছিলেন কিন্তু জীবনে তিনি একবারও কোন বিষয় পরীক্ষা করে দেখেন নি। তিনি প্রাকৃতিক ইতিহাস নিয়েও লিখেছেন কিন্তু লিখেছেন খুবই অসতর্কভাবে; এইটুকু যাচাই করবার কষ্টও স্বীকার করেন নি যে, অন্য প্রাণীদের তুলনায় মানুষের দন্ত সংখ্যা সত্যই বেশি না কম। গ্যালেন, যিনি ধ্রুপদী শবব্যবচ্ছেদ বিদ্যার শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ বলে স্বীকৃত, বলেছিলেন মানুষের নীচের যে-চেয়াল তা দু'টি অস্থি দ্বারা গঠিত; এবং

www.nagorikpathagar.org

এই ধারণাই বহু শতাব্দী ধরে প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়ে আসছিল। কিন্তু আবদুল লতীফ নামে একজন মুসলিম বিজ্ঞানী যখন নরকঙ্কাল নিয়ে রবার্ট প্রিফল্ট তাঁর বিখ্যাত 'The Marking of Humanity' গ্রন্থে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, 'আমাদের যে বিজ্ঞান, আরবদের কাছে তার ঋণ কেবল বিস্ময়কর কিছু আবিস্কার ও বিপ্লাবাত্মক তত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সেই ঋণ আরো গভীর ও অপরিমেয়। বিজ্ঞান তার অস্তিত্বের প্রশ্নেই আরবদের কাছে ঋণী'। এবং এই রবার্ট প্রিফল্ট আরো বলেন-তত্ত্বীয় নিয়মমালা রচনা, নানা বিভাগে জ্ঞানের সুবিন্যাস ও শ্রেণীকরণ ও-সব গ্রীকদের অবদান কিন্তু ক্লেশসাপেক্ষ অধ্যবসায়ী অনুসন্ধান, জ্ঞানের প্রত্যক্ষ উপাদান সমূহের সংগ্রহ ও একত্রীকরণ, দীর্ঘ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ, গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এ-সবই ছিল গ্রীকদের স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। আসলে আমরা যাকে বিজ্ঞান বলে জানি- পরীক্ষা ও গবেষণার নবতর পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণ, পরিমাপ, অঙ্কশাস্ত্রের উন্নয়ন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যে ইউরোপীয় আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশ, তা গ্রীকদের অজ্ঞাত ছিল। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ইয়োরোপে বিজ্ঞানচর্চায় এই বোধ ও প্রবণতা এই ধরনের গবেষণা- পদ্ধতি প্রথম সূচীত হয়েছে আরবদের দ্বারা। এবং মোহাম্মদ (সাঃ) এর শিক্ষাপ্রসূত এই একই বাস্তব চারিত্র্য, নবতর বিজ্ঞান-চেতনার যেমন জন্ম দিয়েছে তেমনি তথাকথিত পার্থিব ও প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্মকে নতুনভাবে মহিমান্বিত করেছে। ইসলামে এই 'এবাদত' কথাটি একটি বিশেষ তাৎপর্যে মণ্ডিত। এবাদত কেবল উপাসনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্য ও মানবকল্যাণে কৃত সব কাজই এবাদত বলে গণ্য। ইসলাম মানুসের জীবন ও কর্মধারাকে অতি পবিত্র বলে ঘোষণা করে, যদি তা সুবিচার ও সততা ও সৎ নিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। পাপ পুণ্যের যে বহু শতাব্দী-বাহিত ভেদরেখা ইসলাম তা মুছে দিয়েছে। কোরআন বলে, তুমি যদি হালাল খাদ্য খাও এবং আল্লাহর শোকর কর সেটাও এবাদত। মোহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীস-কেউ যদি তার স্ত্রীর মুখে এক টুকরো খাবার তুলে দেয় সেটাও একটি পুণ্যের কাজ, আল্লাহ যার পুরষ্কার প্রদান করবেন। অপর একটি বর্ণনামতে রসুল (সাঃ) বলেছেন, 'কেউ যদি আর তার আপন অন্তরের আকাঙ্ক্ষা-বাসনাকে পূর্ণ করে, তার জন্যও সে পুরস্কৃত হবে; শর্ত এইটুকু যে তার ইচ্ছাপুরণের উপায় হবে বৈধ'। এই কথায় উপস্থিত একজন শ্রোতা বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, হুজুর, সেই ব্যক্তি-তো আসলে প্রবৃত্তির ডাকে সাড়া দিয়ে নিজ বাসনাকেই তৃপ্ত করলো। সঙ্গে সঙ্গে মোহাম্মদ (সাঃ) জবাব দিলেন- 'মনের কোন কামনাকে অন্যায় পথে পূর্ণ করার জন্য কেউ যদি শাস্তি পায় তাহলে ন্যায় ও বৈধ পথে পূর্ণ করলে পুরস্কৃত হবে না কেন?' পার্থিব সংশ্রবশূন্যতা থেকে মুক্ত করে জীবনের মহিমাকে উচ্চে তুলে ধরার এই যে ধর্মের এক নবতর ধারণা, এই ধারণাই সৃষ্টি করলো নৈতিক মূর‍্যবোধের ক্ষেত্রে এক নয়া মেরুকরণ। প্রাত্যহিক ও পারস্পরিক

www.nagorikpathagar.org

মানবসম্পর্কের উপর ধর্মের এই-যে গভীল প্রভাব সর্বমানবচিত্তের উপর তার এই যে শক্তিমালী কার্যকারিতা, দায়িত্ব ও অধিকারবোধের এই যে ধারণা ও সীমারেখা এবং একই সঙ্গে সুবিজ্ঞ দার্শনিক প্রাজ্ঞতা ও শিক্ষাদীক্ষাহীন অজ্ঞ মানসপট, উভয়ত একটি ধর্মের এই যে একই রকম উপযোগিতা ও গ্রহণযোগ্যতা, এটা ইসলামের এই নবী প্রবর্তিত শিক্ষার একটি বড় বৈশিষ্ট্য।

অবশ্য এটাও বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে মনে রাখা আবশ্যক যে, সৎকর্ম সমূহের উপর জোর ও গুরুত্ব প্রদানের যে-অর্থ, তা কিন্তু কোনক্রমেই বিশ্বাস বা ঈমানের শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দেয় না। দেখতে পাই চিন্তার ক্ষেত্রে নানা ধরনের দার্শনিক মতবাদ কোথাও কর্মের তুলনায় বিশ্বাসকেই বড় বলে বিবেচনা করা হয়, আবার কোথাও কর্মই বড়। কিন্তু ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, খাঁটিবিশ্বাস ও তদনুায়ী সৎকর্মানুষ্ঠান এই দুটোরই উপর। এখানে লক্ষ্য এবং লক্ষ্য অর্জনের পথ দু'টোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। দুইয়ে মিলে এটা এমন এক সুসংবদ্ধ ঐক্যের গ্রন্থনা যা একত্রে খুবই প্রাণবান ও কার্যকর ও সমৃদ্ধি সঞ্চারক; কিন্তু পরস্পর বিচ্ছিন্নতা মানেই উভয়ের ক্ষয় ও মৃত্যু। ইসরামে বিশ্বাস কখনো কর্ম থেকে আলাদা নয়। সঠিক ফলাফলের লক্ষ্যে সঠিক বিশ্বাস এখানে রূপলাভ করে সঠিক কর্মসাধনে। কোরআন শরীফে কত পুনঃ পুনঃই না ব্যক্ত হয়েছে এই কথা 'যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল একমাত্র তারাই প্রবেশ করবে জান্নাতে'। পঞ্চাশবারে কম নয়, পুনঃ পুনঃ এই একই কথার এমন পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যেন বিষয়টির প্রতি সম্যক গুরুত্বপ্রদানে ভুল না হয়। ধ্যান নিমগ্ন উপাসনাকে উৎসাহিত করা হয়েছে সত্য, কিন্তু সেই উপাসনা কোন প্রকৃত লক্ষ্য কি গন্তব্য নয়। কর্মের সাথে সম্পর্কহীন কোন বিশ্বাসীর স্থান ইসলামে নেই; এবং যার বিশ্বাসী অথচ অন্যায়কর্মে লিপ্ত এমন ব্যক্তির বিশ্বাসীর স্থান ইসলামে নেই; এবং যারা বিশ্বাসী অথচ অন্যায়কর্মে লিপ্ত এমন ব্যক্তির কথা ইসলামে অচিন্তনীয়। কারণ ঐশ্বরিক যে বিধান, তা নিছক বিশ্বাস কি আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তা কার্যকারণের সাতে সম্পর্কিত। এই বিশ্বাস মানুষের অনন্তযাত্রায় এমন এক পথরেখা নির্দেশ করে, যেখানে জ্ঞান থেকে কর্ম এবং কর্ম থেকে সাফল্যের পরিপূর্ণ তৃপ্তিলাভ সম্ভব হয়। কিন্তু কী সেই খাঁটি বিশ্বাস যা থেকে স্বতঃস্ফুর্তভাবে সঠিক আমল (কর্ম) পূর্ণতম সাফল্যের দিকে ধাবিত হয়? ইসলামী বিশ্বাসের যে প্রাণকেন্দ্র তাহলেঅ আল্লাহর একত্ব। এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপার্স নাই, এই বিশ্বাসই কেন্দ্রবিন্দু, যা ইসলামের সকল শিক্ষা ও সাধনাকে ধারণ করে আছে। এবং তিনি (আল্লাহ) কেবল তাঁর ঐশ্বরিক ও অবিনশ্বর অস্তিত্বের কারণে নয়, উৎকৃষ্ট অনুপম গুণাবলীর কারণেও মহিমময়। এবং অন্য অনেক ক্ষেত্রে যেমন, আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কেও ইসলাম গ্রহণ করেছে সঠিক মধ্যপন্থা। আল্লাহর উৎকৃষ্ট ও মহত্তম গুণসমূহ বিস্মৃত থাকা যেমন ইসলাম অনুমোদন করে না, তেমনি অন্যদিকে এমন

www.nagorikpathagar.org

ধারণাও প্রত্যাখ্যান, করে যা তাঁকে বস্তুগত বিষয়বুদ্ধির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে। কোরআন একদিকে ঘোষণা করে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গেতুলনা হয় এমন কিছুই নেই এবং অন্যদিকে এইকথাও বলে যে, তিনি সর্বদর্শী ও সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। কিছুই নেই, যা তাঁর জানাশোনার বাইরে। তিনি এমন এক মহাসম্রাট যিনি সকল ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত ও পবিত্রও ও নিষ্কলঙ্ক। তাঁর অসীম ক্ষমতার অপরাজেয় জলপোত সততই সাম্য ও সুবিচারে মহাসমুদ্রে ভাসমান। তিনি করুণাময় ও দয়ালু; তিনিই সবার প্রতিপালকও অভিভাবক। এবং আল্লাহ সম্পর্কে ইসলাম শুধু এই সকল ইতিবাচক বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত হয় না; বিপরীত দিক থেকেও ইসলামে বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ইসলাম বলে, আল্লাহই একমাত্র অভিভাবক, তিনি ছাড়া কারো আর কোন অভিভাবক নেই; যে কোন ধংসের তিনিই একমাত্র সংশোধক ও ত্রাতা, তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন ত্রাতা কি মেরামতকারী নেই; সকল ক্ষতির তিনিই নিরাময়কারী এবং তিনি ছাড়া এমন কেউ নেই যে ক্ষতি পূরণ করতে পারে। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তিনি অভাবমুক্ত, তিনি শরীর ও আত্মার সৃষ্টিকর্তা, বিচারদিবসের মহ্যপ্রভু, এককথায় কোরআনের ভাষ্যনুযায়ী সকল মহত্তম উৎকৃষ্টতম গুণাবলীর তিনি আধার।

কিন্তু বিশ্বজগতের প্রেক্ষাপটে মানুষের কী অবস্থান? কী তার মর্যাদা ও পরিচায়? কোরআন বলে, 'বিশ্বজগতের যা-কিছু তা সবই মানুষের সেবায় নিয়োজিত।' সমগ্র বিশ্বব্রাহ্মাণ্ড মানুষেরই শাসনাধীন। কিন্তু মানুষকে নিয়ে সৃষ্টিকর্তার কী অভিপ্রয়? এই প্রেক্ষিতে কোরআন শরীফে আল্লাহ বলেন, 'হে মানুষ, আল্লাহ তোমাকে সর্বোৎকৃষ্ট গুণাবলসিহ সৃষ্টি করেছেন, দান করেছেন জীবন ও মৃত্যু কিন্তু এ-সবই পরীক্ষার নিমিত্ত; দেখা হবে, কে সৎকর্মশীল আর কে পথভ্রষ্ট'। মানুষ যদিও কিছু পরিমাণে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী কিন্তু প্রত্যেকেরই জন্ম ও জীবন এমন একটি পূর্বনির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও পরিবেশের অধীন যার উপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এবং এই প্রেক্ষিতে ইসলামে দেখতে পাই, আল্লাহর ঘোষণা হলো সবকিছু আমার ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণাধীন, আমি যা ভালো মনে করি সেটাই মানুষের নির্বন্ধ। মানুষের অস্থায়ী নশ্বরতার সঙ্গে মিলিয়ে এই মহাজাগতিক রহস্যময় পরিকল্পনা পুরোপুরি উপলব্ধি করা কঠিন, কিন্তু এটা সত্য যে, সম্পদে কি দারিদ্র্যে, স্বাস্থ্যে কি রুগ্নতায়, উত্থানে-পতনে আমি অবশ্যই মানুষকে পরীক্ষা করে দেখবো। নানা সময়ে নানা মানুষে এই পরীক্ষার ধরন ভিন্ন কিন্তু কোন সংকটেই তোমরা অধৈর্য কি হতাশাগ্রস্ত হয়ে না এবং অবলম্বন করো না কোন অবৈধ পন্থা। এটা এক ক্রান্তিকাল। ঐশ্বর্যে তোমরা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়ে না; মনে রেখো, আল্লাহর সকল নেয়ামতের তোমরা বিশ্বস্ত আমানতদার। তোমরা সততই পরীক্ষাধীন; প্রতিটি মুহুর্তে চলছে তোমাদের পরীক্ষা। পার্থিব জীবনের এই নশ্বর অধ্যায় এই পরীক্ষার কোন ছেদ নেই, এবং এমন প্রশ্ন উত্থাপনেরও কোন অবকাশ নেই যে, কোন এই পরীক্ষা? মনে রেখো, তোমরা জীবন ও মৃত্যু আল্লাহরই জন্য।

www.nagorikpathagar.org

অবশ্য কেউ কেউ এটাকে অদৃষ্টবাদ বলতে পারে। কিন্তু এই ধরনের অদৃষ্টবাদ মানুষের জন্য শক্তিবর্ধক ও কর্মোদ্দীপক এবং সর্বদা সতর্কতা রক্ষার ও সহায়ক। পৃথিবীর এই ক্ষণস্থায়ী জীবন মানব-অস্তিত্বের শেষ কথা নয়; মৃত্যুর পর অন্য এক অনন্ত জীবন অপেক্ষমান। এই জীবন এই মৃত্যু একটি দ্বার, একটি মধ্যবর্তী যোজক মাত্র, যা অনন্ত জীবনের এক অদৃশ্য বাস্তবতাকে উম্মোচন করে। যত ক্ষুদ্র কি তুচ্ছই হোক প্রতিটি কর্মই রচনা করে এক-একটি স্থায়ী অভিঘাত; এবং এই কর্মের সঠিক হিসাবও কোন-না-কোন উপায়ে নির্ভুলভাবে সংরক্ষিত। আল্লাহর রহস্যময় প্রক্রিয়ার কিছু সামান্য বুঝা গেলেও অধিকাংশই মানববুদ্ধির অগম্য। আজ যা কিছু মানুষের দৃষ্টিসীমার বাইরে বুঝা গেলেও অধিকাংশই মানববুদ্ধির অগম্য। আজ যা কিছু মানুষের দৃষ্টিসীমার বাইরে রাখা হয়েছে তা সবই একদিন উম্মোচিত হবে। এবং তখন যারা পুণ্যবান তারা আল্লাহ পাকের এমন করুনা ও পুরস্কারলাভে ধন্য হবে, যা কোন চক্ষু কখনোদর্শন করে নি, কোন কর্ণ কেখনো শ্রবণ করে নি এবং কোন হৃদয়ও কখনো কল্পনা করে নি। তারাই পর্যায়ক্রমে উত্তীর্ণ হবে উচ্চ থেকে উচ্চতর অবস্থানে। কিন্তু জীবনে প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে যারা ব্যর্থ হয়েছে, এক অনিবার্য নিয়মে তার তাদের প্রতিফল পাবে; তারা এমন করে কঠিবন আত্মিক শস্তির মধ্যে নিপাতিত হবে, যা তাদেরই নিজস্ব উপার্জন। এ-এক ভয়াবহতম অগ্নিপরীক্ষা। দৈহিক যন্ত্রণা তবুতো কোনভাবে সহনীয় কিন্তু আত্মিক যন্ত্রণা অসহ্য। যে ইচ্ছা ও প্রবণতা অন্যায় কর্মে প্রবৃত্ত করে, প্রলুব্ধ করে, বিরুদ্দে নিরন্তর সংগ্রামের জন্যই এই জীবন। এবং এই পথেই জেগে উঠে জাগতিক মোহমুক্ত বিবেকের উপলব্ধি; এই পর্যায়েই আত্মা তার পারমার্থিক উৎকর্ষতা লাভের জন্য হয়ে ওঠে ব্যাকুল ও সর্বপ্রকার আত্মবিনাশী অপশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। এবং এইভাবেই সেই চূড়ান্ত পর্যায়ে উত্তরণ, যেখানে আত্মা লাভ করে অবিচল স্থৈর্য, স্রষ্টার তৃপ্তিময় নৈকট্য, অনন্ত আলোকময় শান্তি। আত্মার সম্মুখে আর কোন প্রতিরোধ নেই, সংগ্রামে দিন শেষ; সত্য হয়েছে জয়ী, মিথ্যা পরাভুত। সকল সংকট ও জটিলতা ও আত্মবিভক্তির অবসান। মানুষের সম্পূর্ণ সত্তা আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সমর্পিত, পরম অনুগত্যের মধ্যে বিলীন ও একাকার। সমস্ত সংগুপ্ত শক্তির উম্মোচন, আত্মার স্থিতি তখন এক পরম শান্তির আলয়ে। আল্লাহ তখন বলবেন, 'হে পুণ্যাআগণ এই সেই নিরবচ্ছিন্ন শান্তি, প্রভূর কাছে প্রত্যাবর্তনের এই সেই পুর্ণতম শান্তি ও পরিতৃপ্তি। তোমরা আজ আনন্দিত, তোমাদের প্রভুও সন্তুষ্ট, আমার অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং প্রবেশ করো জান্নাতে'। মানবজীবনের এই হলো চুড়ান্ত গন্তব্য। একদিকে বিশ্বজগতের উপর তার আধিপত্য অন্যদিকে মহাপ্রভুর নৈকট্যের মধ্যে তার স্থিতি ও প্রশান্তি। এই পর্যায়ে প্রভুর সন্নিধানে সেও আনন্দিত প্রভুর আনন্দিত। এখানেই পরিতৃপ্তি, পুর্ণতম পরিতৃপ্তি; প্রশান্তি, পুর্ণতম প্রশান্তি। এবং এই

www.nagorikpathagar.org

পর্যায়ে স্রষ্টার প্রতি প্রেমই তার আত্মার খাদ্র এবং জীবনের গভীলতম স্তর থেকে উৎসরিত সলিল তার তৃষ্ণা-নিবারক পানীয়। দু:খ কি পরাজয় তাকে আর বিচলিত করেনা এবং সাফল্যও করে না গর্বিত কি উল্লসিত। বলতে হয়, পশ্চিমা জাতিসমূহ আজ শুধু মহাজাগতি প্রভুত্ববিস্তারে সচেষ্ট এই দার্শনিকতায় অভিভুত টমাস কার্লাইল লিখেছেন- 'এবং তারপরও ইসলাম, সৃষ্টার কাছে আমাদের সবাইকে সমর্পন করতেই হবে, আমাদের সমস্ত শক্তি তাঁরই চরণে নিবেদতি। মৃত্যু হোক কি মৃত্যুর চেয়েও গুরুতর কিছু হোক, তিনি যা করেন, আমাদের জন্য যা প্রেরণ করেন তা সবই কল্যাণকর ও উত্তম। স্রষ্টার পদপ্রান্তে নিজেকে নি:শেষে নিবেদন করাই আমাদের কাজ'। এই লেখক একই সঙ্গে আরো উল্লেখ করেন- 'গ্যেটে যে-কথা বলেছেন, একে যদি ইসলাম বলে, আমরা কি সবাই ইসলামের মধ্যে সম্পৃক্ত হয়েই বেঁচে নেই'? গ্যেটের এই প্রশ্নের জবাবে কার্লাইল নিজেই আবার বলেন- 'অবশ্যই। কোন সন্দেহ নেই যে আমাদের জীবন ইসলামে মধ্যেই নিজজ্জিত ও পরিক্রমারত। এই এই মানব-অধ্যুষিত ধরাপৃষ্ঠে স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ ও পকাশিত যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, এখনো পর্যন্ত ইসলামই তার সর্বোচ্চ শীর্ষদেশ'।

(কিছুটা সংক্ষেপিত)

(**দৈনিক ইনকিলাব** ঃ জুলাই ২৮, আগষ্ট ৪, ১১, ১৮'৯৪)

এটি একটি প্রবন্ধ–ভাষণ

অনুবাদকঃ জনাব আবু জাফর

এ পদ্মা এ মেঘনা এ যমুনা সুরমা নদী তীরে

বিখ্যাত গানের গীতিকার।

www.nagorikpathagar.org

The Complete Code of Life

Muhammad Qutb
Professor Islamic Studies King Aldul Aziz University, Makka. K.S.A

DAZZILED by the achievements of science during the 18th and 19th centuries, many westerners thought that religion had exhausted all its usefulness and surrendered to science once for all. Almost all the eminent western psychologists and sociologists expressed themselves in similar terms. Freud, the renowned psychologist, for instance, while demonstrating the futility of religion in modern times, says that the human life passes through three distinct psychological phases: superstitution, religion and science. This being the era of science, so all religion was pronounced out of date.

There is no denying that there were certain causes which led the men of science in Europe to adopt a view of life antagonistic to religion. It was mainly due to the great controversy, that raged between men of science and the Christian church, which made them think-quite justifiably of course-that whatever the church stood for was reactionary, retrogressive, backward and superstitious, and that therefore it must vacate its seat for science so as to enable humanity to move ahead on the path of civilization.

RELIGION AND SCIENCE

Without appreciating the difference between the peculiar conditions of life obtaining in Europe at the time of this unhappy conflict and

* This chapter is excerpted from the author's book *Islam: The Misunderstood Religion, Kuwait:* Darul Bayan Bookshop which is an English translation of his *Shubuhal Hawl al-Islam.*

www.nagorikpathagar.org

The translation has been throughly revised by the editor. those in the Islamic world, a section of people has been demanding the renunciation of religion and of the sacred traditions that have come to us from our earlier generations. This move has been strengthened by the puerile imitation of the West that is gaining currency in in the Muslim land. Many a natve people fancy that the only way to progress is to follow the dominant nations of Europe, intellectually and culturally. To achieve this they have to discard their religion just as Europe had done failing which they fear they would be trapped in an abyss of reactionism, backwardness and himbug.

But such people overlook the fact that even in the West, not all the outstanding scholars were antagonistic towards religion; nor do their works exhibit anything of this sort. On the other hand we find some of these eminent intellectuals who were never under the spell of Europe's Godless materialism and who affirmed that religion is a psychological as well as an intellectual necessity for mankind.

The most noted figure among them is the astronomer Sir James Jeans, who started his intellectual career as a Godless sceptic but was led finally by his scientific explorations to the conclusion that the greatest problems of science could not be resolved without believing in God. The famous sociologist Jeans Bridge went so far as to eulogize Islam for achieving a successful amalgam of the temporal with the spiritual into a harmonious system of thought blended with a practical code of life. The well-known English writer Somerset Maugham epitomized the whole attitude of modern Europe towards religion when he remarked that Europe had in the present era discovered a new god-Science, in place of the old one.

The god of science has, however, turned out to be extremely fickle, everchanging and constantly shifting

www.nagorikpathagar.org

positions, upholding one thing as a fact and reality today and rejecting it the other day as false and spurious. Consequently its `worshippers' are doomed to a perpetual state of restlessness and anxiety, for how can they find rest and peace of mind under such a capricious god? That the modern west is afflicted with this uncertainty and restlessness is borne out by the large number of psychological and nervous disorders that are so common in modern society today.

Yet another result of this deification of modern science is that the world we live in had become devoid of all meaning and purpose with no higher order or power to guide it. Tension and conflict between different foreces have become the order of the day. As a result everything in this world suffers change: economic and political systems change; relations between states and individuals alter; even scientific `facts' change. What can man expect save misery and perpetual restlessness in a world with such a sombre setting where no Higher Power exists whom he should turn to for support, strength and comfort in this ruthless struggle of life.

It is religion and religion alone that can bring peace and tranquillity to the world. It instils in man love for goodness and the courage to stand up to the forces of evil and tyranny was a necessary condition of obtaining God's pleasure and to make His will predominant on this earth awaiting with patience for his reward in the Herefter. Doesn't mankind really need peace, tranquillity and comfort, in a word, religion.'

MANWITHOUT RELIGION

What will become of man if his life is devoid of belief in an eternal life in the hereafter. Belief in the continuity of life in the next world is a revolutionary concept. Under its impact, man's life upon earth assumes new dimensions opening higher

www.nagorikpathagar.org

horizons of progress before him, in the absence of which he is inevitbly oppressed by a torturous sense of nothingness, as it means a virtual cutting short of man's total life span, making him a mere plything in the hands of his whims and caprices which teach him nothing but to derive the maximum possible amount of pleasure during this short sojourn upon the earth. Mutual rivalries, savage battles and conflicts over the possession of material gains follow, as there is no Higher Power to control and restrian one's desires. Blinded by greed and lust, man tries to gain whatever he can in the shortest span of time. His total perspective of life and its mission is lost altogether. This degrades man to lower planes of fellings and thought. His imagination sinks low and so do his ideals and the means to achieve them. Mankind is doomed to a perpetual life of hideous internecine wars that scarcely permit it to pursue higher and nobler ends in life. In such a world there is hardly any room for love or sympathy, as men are obsessed with carnal pleasures, and spurred by uncontrolled passions. In such a context, how can they strive for lofty aspirations or even appreciate genuine human feelings.

In such a world men do gain some material profits. But of what use are these when their fellowmen are constantly wrangling over them, each ready to cut his brother's throat only to enhance his own material welfare? Materialism so spoils life that even man's material achievements are rendered useless and senseless. Men are enslaved by greed, lust and avarice. Blind appetites gain control over them. They lose their grip on them and become their slaves. This results in the dehumanization of man.

The predicament of the nations is not different. They, for similar reasons, get entangled in devastating wars which spoil all harmony in life. And science, with all its dreadful weapons,

www.nagorikpathagar.org

is employed for the extermination of the human race rather than to contribute towards man's well-being and his moral advancement.

Viewed in this context religion means broadening the mental hoirzon of mankind, for life is not confined to this world alone but continues even beyond it-towards eternity. This inspires hope in man's heart, encourages him to live and strive for the achievement of higher ideals and to remain steadfast against evil and oppression. Religion teaches love, sympathy and universal brotherhood and is thus the only. way to peace, prosperity and progress, It equips man in the best possible way for the hard struggle of life.

Furthermore it is faith and faith alone that can inspire man to rise above his self and suffer for noble and lofty ideals. Deprived of faith, he is left with nothin else to look up to outside his own self. He is torn away from the total reality of the creation and is rendered into an isolated being. This reduces him to an unsocial animal, a brute.

Many a man fell fighting in the noble cause of truth spending the whole of their lives in the struggle yet achieving nothing in the materialistic sense of the word. What inspired these noble souls to engage in a battle that brought them no material rewards, that caused them the loss of whatever little they happended to possess? This has been one of the products of faith. Such behaviour can never be produced in pursuit of selfish motives. Avarice, greed, lust, etc., can never make a man achieve anything really good and noble. That is why the material trumphs won by selfish avarice are self-centred, short-lived and temporary. The incentive of immediate gain cannot equip a man with a noble character, nor can it give him the courage to stand fast suffering patiently for long for a lofty ideal.

www.nagorikpathagar.org

There are some so-called reformers who seek inspiration from hatred rather than love. The hatred may be personal in character or it may be based on class, or region or nation. Such rancour-inspired people may realizė some of their objectives, may even muster courage to sacrifice for such ends, but a doctrine based on malevolence and hatred can never lead humanity to anything good. They may remove certain evils and put an end to the existing state of injustice but would generate new evils and injustices and fail to remedy the ailments of mankind.

On the other hand a creed that does not aim at the immediate gains of this world, nor derives inspiration from malevolence but fosters in men noble passions of love, fraternity and the determination to lay down their lives serving their fellowmen can heal the festering soures of humanity and pave the way for future progress and prosperity. The essence of such a creed is faith in God and His love. This produces a virtuous mode of living that helps man get nearer to his Creator, and become a true servant of humanity. Belief in the Hereafter gives man a firm sense of security, banishing from his heart the fear of extinction with his physical death and promising him an eternal life. This in other words means that his efforts shall not be wasted but shall be crowned with fullest reward in the life to come, even if he is unable to achieve anything in this world. This is a natural corollary of belief in God and the Hereafter. It is true of religion as such, But as far as Islam is concerned it does not stop here, it goes a long way ahed: it has a far more fascinating story to tell.

www.nagorikpathagar.org

ISISLAM OUT OF DATE

Those who may imagine that Islam has become outmoded and is no longer needed, do not know as to what it stands for, nor do they seem to understand its real mission in human life. The image of Islam that emerges from books on Islam and Islamic history written mostly by Western orientalists and their disciples and taught ever since the colonial period is something like this: Islam was revealed merely to put an end to idolatry and guide man to the worship of God alone; that the Arabs were torn into antagonistic tribes, Islam came and united them and made them a strong and unified nation; that they were addicted to drinking and gambling and led depraved lives; Islam stopped them from these depravities and abolished other evil customs prevalent among them such as burying alive their daughters and wasting away their strength in acts of revenge; and that Islam called upon Muslims to disseminate its message, which they did, this in turn leading to the battles that ultimately determined the boundaries of the Islamic world as we know it today. This, according to these people, was the sole purpose of Islam in human life! This being its historical mission, it has long sicnce been fulfilled: there is no idol-worship in the Islamic world; the once antagonistic tribes have been more or less subject to a process of absorption losing their identity in the larger nationalities or communities. As far as gambling and drinking are concerned let us bear in mind that human civilization has advanced to such an extent now that it is useless to declare such pastimes unlawful as we see that despite all religious taboos they still persist. It is no use insisting on their abolition. Thus they conclude that Islam has served its purpose in this world; it has had its day but is no longer needed. It has nothing new to offer. We must, therefore, turn towards the modern civilization and seek progress through it.

www.nagorikpathagar.org

One listens to this prattle from all quarters. Even seome educated and otherwise enlightened persons repeat these assetions like a parrot. This case against Islam is, howerver, a product of sheer ignorance and prejudice, We must not judge Islam on hearsay. Let us try to understand what Islam is and what it stands for.

Islam, in a word, means liberation from all sorts of slavery such as may inhibit the progress of humanity or may not allow it to follow the path of virtue and goodness. It means man's freedom from dictators who enslave him by force or fear, make him do what is wrong and deprive him of his dignity, honour, property or life. Islam liberates man from such tyranny by telling him that all authority vests in God and God alone; He alone is the Real Soveregin. All men are His subjects and as such He alone controls their destinies, none of them having the power to cause any benefit or avert any distress form his ownself independent of the Divine Will. All men shall be presented before Him on the Day of Judgement to account for their performance in this life. Thus Islam brings to man freedom form fear or oppression inflicted on him by men like himself and who, in reality, are as helpless as he is and who are no less subject to the Will of God Almighty than he himself is.

Islam also means freedom from lust, including the lust for life, as it is this very weakness of man which is exploited by tyrants and dictators intentionally or otherwise in enslaving their fellowmen. But for it no man would silently accept subservience to men like himself or sit idle to watch tyranny on the rampage and dare not challenge it. It is a great blessing of Islam that it taught man to fight tyranny and oppression bravely rather than cringe before them in abject servitude. Says the Qur'an: `Say: If it be that your fathers, your sons, your brothers, your mates, or your kindred, the wealth that you have

www.nagorikpathagar.org

gained, the commerce in which you fear a decline, or the dwellings in which you delight-are dearer to you than God, or His Apostle, or the striving in His cause-then wait until God brings about His Decision: and God guides not the rebellious.' (al-Qur'an, 9:24).

As asgainst blind passions and appetites, the love of God generates in life the values of love, virtue, truth, and striving hard in His way, the way of all that is good and lofty in life. Islam subjects human passions in the service of these noble goals of life. The love of God becomes the dominant and real directing force in man's life. Without this no man can claim to be a true Muslim.

A man steeped in sensual pleasures may entertain the mistaken belief that he enjoys life more than others do. But soon he has to realize his mistake, for he is gradually reduced to a mere salve to his blind passions. He is doomed to a perpetual life of deprivation and restlessness, for animal desires once run rampant become insatiable: the appetite increases with every effort to satisfy it. The result is a craze for the maximization of sensual pleasure. Such an attitude towards life is not conducive to prigress, material or spiritual. Humanity cannot approach higher realms of nobility unless it is freed from the dominance of the blind animal appetites. It is only through control of the animal self that man is freed to make progress-in the fields of science, arts or religion.

It is for this very reason that Islam attaches such a great importance to the freeing of man from his animal passions. For this purpose it neither favours monasticism nor gives man unbridled freedom to serve the demands of the flesh. It aims at the attainment of a blance between these two extremes. Whatever is there in the world is for man. It is there to serve him and not to dominate or rule over him. He should not allow himself to be made a slave to these, rather he should use them

www.nagorikpathagar.org

as means to a higher end, i.e. his spiritual perfection by disseminating the word of God amongst his fellowmen. Thus Islam has a twofold objective in view:

(a) in the individual life it aims at providing to each and every individual a just and adequate share so as to enable him to lead a decent and clean life; and

(b) in the collective sphere it arranges things in such a way that all the social forces of a society are directed towards the enhancement of progress and civilization in accordance with its basic outlook upon life and in such a way that the balance between the constituent units and the whole, between the individuals and the community, is established.

Islam has had a most liberalizing effect on human intellect as it is diametrically opposed to all sorts of supertitions. Humanity has, in the course of history, fell a prey to a number of absurdities, in theory and practice. Some of these were even described to have some divine origin. All these acted as shackles for the human minds, which groped about in the dark before the advent of Islam. With Islam it attained maturity and freedom from this hotch-potch of nonsense, symbolized in the so-called gods, distorted Jewish traditions, and the imbecilities of the Christian Church. Islam freed man from all superstitions and brought him back to God and established direct relation between man and his Creator.

Islam uses a very simple terminology. Its teachings are very easy to understand, perceive and believe in. It invites man to make use of the faculties given to him and to seek the fullest possible understanding of the world around him. It does not admit of any inborn hostility between reason and religion or for that matter betwen science and religion. Islam impresses upon man in clear and unequivocal terms that it is God and God alone who has in His immense mercy subjected all the things on this earth to man, and that all the facts that are discovered by scientific investigation and the material benefits that flow form that to man, are in fact blessiogs from God, for

www.nagorikpathagar.org

which man should ofter his thanks to God, and strive hard so as to become worthyservant of so Merciful and Beneficient a Master. Thus Islam holds knowledge and science as a part of faith rather than regard them as an evil intrinsically. opposed to genuine belief in God.

What is the state of the world today. Has man freed himself from all superstition, imbecilities and absurd beliefs? Has he discovered the man within himself? Has he liberalized himself from the yoke of worldly tyrants indulging in the expolitation of man by man? If such a millenium has not been achieved despite all developmets in science and technology, then Islam has still a great and glorious part to play.

THE CHALLENGE FROM SCIENCE

Half of the inhabitants of the world today remain idol-worshippers. India, China, Japan and a great many other parts of the world are instances in view. The other half is engaged in the worship of a new found deity whose corrupting influence on man's thoughts and feelings is no less significant. This deity is styled as Modern Science.

Schience is powerful instrument to help us increase our knowledge of the world around us. As such it has an impressive record of achievements to its credit. All these brilliant achievements were, however, vitiated by one fatal mistake of the westerners: they installed science as supreme God, declaring that it alone had the right to claim the adoration and submission of man to it. Thus they denied themselves all means of acquiring knowledge save that recognized by empirical science which let humanity wander further away rather than bring it nearer to its real destination. Consequently the otherwise vastly immense range of human endeavour and progress was shrunk and made co-extensive with the limitations of empirical sciences. The total dimensions of the human situation are not taken care of within the scope of science whose domain is limited. It is of immense help in discovering the knowledge of the means of life, but fails to

www.nagorikpathagar.org

guid us in the realm of objectives of life, its values and norms, and the nature of the ultimate reality.

Some protagonists of science claim that science alone can introduce man to the secrets of this universe and life, and conclude that only that which is upheld by science is true; the rest is all trash! But while making such a statement they overlook the fact that science with all its brilliant and impressive record is still in its infancy and ever hersitant to commit itself as regards the veracity or otherwise of many things, for the simple reason that it cannot penetrate deep into the heart of reality beyond attempting a mere superfluous survey of it. Yet its votaries assert in the authoritative way that there is no such thing as human soul. They deny that man, confined as he is within the limitations of his sensory organs, can ever have any contact with the Unkonown-not even a glimpse of it through telepathy* or dreams. They repudiate all these not because they have proved them to be mere illusions but simply because the experimental science with its inadequate instruments has not yet been able to fathom their mystery. That they belong to a higher order of things not subject to man's observation was however sufficient to make these gentlemen turn their backs on them and pronounce their nonexistence. Non-existence is one thing, non-susceptible to one instrul. ment of investigation a very different matter. But they fail to see the difference between the two.

*Telepathy is defined as the communication of impressions from one mind to another without the aid of the senses. The most notable example of this is the incident when the Caliph `Umar called out to Sariyah, a Muslim commander, syaing: `Sariyah! To the Mountain! To the mountain!' Sariyah heard this warning coming from hundreds of miles away. So he led his contingent to the mountain, escaped the enemy lying in ambush and won a victory over them. Although telepathy is now recognized as a scientific fact yet the modern scientist is so biased that its having anything to do with `soul' is denied outrihgt. It is explained as a manifestation of a sixth but yet not fully explained faculty of the human mind.

www.nagorikpathagar.org

Such then is the `enlightenced ignorance' man suffers from today, which shows how desperately he stands in need of Islam to blow away these allegedly scientific cobwebs of knowledge. Idol-worship was the older form wherein human folly found expression; the cult of science worship is its latest version. To liberate human reason and spirit, both of these yokes must be shaken off. It is in this perspective that Islam emerges as the only hope for humanity, for it alone can restore peace between religion and science, bring back once more the tranquillity and concord to our distressed world and enable man to satisfy his both cravings, the desire for knowledge and the search for truth, the need to control the forces of nature, and to integrate with the Ultimate: God.

WHAT ISLAM STANDS FOR

Islam establishes not only peace and harmony but also rids mankind of tyranny and oppression. The contemporary world presents in this respect no better view than it did fourteen hundred years ago, when Islam freed it from all false gods. Tyranny still on the rampage in the guise of haughty kings, insolent demagogues and heartless capitalists who are busy in sucking the blood of the millions, subjugating them and manking capital out of their helplessness and misery. There is still another class of dictators who rule with sword, usurp peoples' liberties and claim that they are merely instruments in enforcing the people's or the proletariat's will.

Islam brings to an end man's rule over man. It makes the rulers as much subject to the Divine Law as are all other men and women. Islam does not allow any man to subjeugate others or impose upon them his will. Only God's commands are to be obeyed and only the Prophet's examples are to be followed. The ruler, in such a community, shall, as a part of his obligations towards men and God, be required to enforce

www.nagorikpathagar.org

Divine Law failing which he may no longer have any lawful claim to the people's obedience. This was explicitly stated by the first Caliph Abu Bakr (May God be pleased with him) when he said that `Obey me only so long as I obey God with respect to you; and if I should happen to deviate from God's obedience, then in that case my obedience shall no longer be incumbent upon you.' As such the ruler in Islam has no priviliged right to use the Public Exhequer or to formulate state legislation in defiance of the Shari'ah. Moreover, it is only the trustworthy people who have any right to rule, who are elected to a post of authority through a free, just and impartial election with no checks on voters save those of justice, virtue and decency.

Such an Islamic State will not only liberate its citizens from all tyrants at home but shall safeguard their freedom against any outside aggression as well. This is so because Islam itself is a religion of glory and power and as such it cannot tolerate that men should degrade themselves by prostrating at the feet of the false god of imperialism. Islam prescribes a very simple code of life for man. It exhorts him to strive hard to gain the pleasure of his Creators, surrender his will to that of his Lord, follow His commandments and come forward with all the sources at his disposal to fight against the spectre of imperialism and tyranny.

Let Man therefore turn towards Islam for this is the time for all human beings to flock together under its banner so as to wipe out from the face of the earth all the vestiges of imperialism and exploitation of man by man. Here is the way to real freedom, one which allows no serfdom, promises all men freedom in thought, action, property and religion, jealously safeguarding their integrity as well as honour. For only thus can we become Muslims worthy of our God, the

www.nagorikpathagar.org

object of our adoration-in Whose path we tread, the path He chose for us: `This day I have perfected for you religion and completed my favour on you and chosen for you Islam as religion.' (al-Qur'an, 5:3).

Such a radical reformation effected by Islam is by no means a parochial one confined to the Muslim community alone, but is, on the other hand, by its very nature universal in character. It is nothing less than a blessing for the world of today afflicted as it is with internecine wars, with a still another and far more terrible world war looming large on the horizon.

Islam is the only future hope of humanity; and its victorious emergence out of the present ideological warfare is the only guarantee of man's salvation. But important as the triumph of Islam is for the future of mankind, its realization is not easy to come by. It can be effected only if the people who are already in its folds and profess loyalty to it should pledge themselves for its glory and triumph. Islam freed mankind from the tyranny of animal appetites fourteen hundred years ago; now it can once again shake off the shackled of lust and free man to direct all his faculties to reach a higher spiritual plane and establish virtue and goodness in life.

ISLAMIC REVIVAL

The revival of Islam is a practical and realizable undertaking. The history of Islam proves beyond any doubt that it is quite capable of raising man above a purely animal level. What was possible in the past is quite possible in the present and what is possible in the case of individuals is equally realizable in the case of nations. Mankind has not undergone any temperamental change ever since. The human society in the sixth century was at as low a level and was as

www.nagorikpathagar.org

much taken up with sensual pleasures as it is today. There is no difference in the nature of the basic human ailment, although some of the symptoms, the outwardly forms or names of the vices indulged in, are dissimilar. Ancient Rome was no less rotten morally than its modern counterparts. Similarly in ancient Persia, moral anarchy was as widespread as is in the present day world. Dictators of today are not very different from the dicators of the past. It was in this historical perspective that Islam was revealed to the world. It was in this historical perspective that Islam was revealed to the world. It was in this historical perspective that Islam was revealed to the world. It brought about a complete change, lifted mankind from the abyss of moral degradation, gave human life a lofty purpose, dynamism, movement and infused into it a spirit to strive hard in the way of truth and goodness. Humanity under Islam flourished, prospered and there was set afoot a dynamic intellectual and spiritual movement that encompassed the East as well as the West. The world of Islam became the mainspring of light, excellence and progress in the world for a long time to come. During this long period of its dominance never did the Islamic world find itself lagging behind materially, intellectually or spiritually. Its followers were looked upon as symbols of goodness and excellence in all spheres of human activity till they ceased to reflect in their lives the noble and exalted ideals of Islam and became mere slaves to their whims and animal desires. It was then that all their glory and power came to an end in accordance with the immutable law of God.

The modern Islamic movement that is still gathering momentum derives its strength from the past and makes use of all the modern available resources with its gaze fixed on the future. It has great potentialities and as such has a bright future ahead, for it is fully capable of performing that great miracle which has once changed the face of history.

www.nagorikpathagar.org

This does not, however, mean that Islam is a mere spiritual creed, or a plea for morality, or just a scheme of intellectual research in the kingdom of heavens and earth. It is a practical code of life that fully embraces worldly affairs. Nothing escapes its penetrating eyes. It takes notice of all the diverse patterns of relationships binding men together irrespective of the fact that such relationships fall under the economic, political and social categories. It regulates them by prescribing suitable laws and norms of behaviour and enforces them in human life. Its most outstanding characteristic is that it establishes a unique harmony between the individual and society, between reason and intuition between work and worship, between this world and the Hereafter.

WHY THE WORLD NEEDS ISLAM TODAY

We have tried to examine briefly the threats that confront man today and to show how relevant in fact how necessary Islam is to mankind in our own times. Let us conclude by summing up some of the distinct features of Islam which make it all the more necessary for the modern man to seek his salvation through this ideology.

Firstly, it must be well understood that Islam is not a mere ideological vision. It is a practical system of life that fully appreciates all the genuince needs of mankind and tries to realize them.

Secondly, in trying to meet the genuine requirements of man Islam effects a perfect balance between all areas of life and activity. It starts with the individual maintaining a balance between his requirements of body and soul, reason and spirit and in no case allows one side to predominate the other. It does not suppress the animal instincts in order to make the soul ascend the higher planes, nor does it allow man, in his efforts

www.nagorikpathagar.org

to fulfil his bodily desires, to stoop down to the low level of animalism and hedonism. On the contrary, it makes them both meet on a single higher plane doing away with all the internal psychological conflicts that thereaten the human soul or set a part of it against the other parts. In the social sphere, it proceeds to achieve an equilibrium between the needs of the individual and those of the community. It does not allow an individual to transgress against other individuals, or against the community. Nor does it allow the community to commit transgression against the individual. It also does not approve of one class or group of people to enslave another class or group of people. Islam exercizes a beneficient constraint on all these mutually opposed forces, prevents them from coming into collision with one another, and harnesses them all to co-operate for the general good of mankind as a whole.

Thus Islam strikes a balance between different sectors of society and between different aspects of existence, spiritual as well as material. Unlike communism, it does not believe that economic factors, i.e. the material aspect alone, dominate the human existence. Nor does it contribute to what the pure spiritualists or idealists say claiming that spiritual factors or high ideals alone are sufficient to organize human life. Islam rather holds that all these diverse elements put together form what is called human society; and that the best code of life is that which takes note of all these, making full allowance for body as well as reason and spirit and arranging them all in the framework of a harmonious whole. Thirdly, it must always be kept in mind that Islam has an altogether independent existence of its own as a social philosophy as well as an economic system. Some of its outward manifestations may on the surface appear to resemble those of capitalism or socialism, but in fact it is far from being the one or the other. It retains all the good characteristics of these systems, yet is free form their

www.nagorikpathagar.org

shortcomings and perversions. It does not extol individualism to that loathful extent which is the characteristic of the modern West. It was from this germ that modern capitalism sprang and instituionalized that concept of individul's freedom where man is allowed to exploit other individuals and the community only to serve his personal gain. Islam guarantees personal freedom and provides opportunities for individual enterprise but not at the cost of society or ideals of social justice. The reaction to capitalism has appeared in the form of socialism. It idolizes the social basis to an extent that the individual is reduced to an insignificant cog of the social machine, with no existence whatever of its own outside and independent of the herd. Therefore, the community alone enjoys freedom as well as power; the individual has no right to question its authority or demand his rights. The tragedy of socialism and its variants is that they assign to the state absolute powers to shape the lives of the individuals.

Islam strikes a blance between the two extremes of capitalism and socialism. Being appreciative of their role Islam harmonizes the individual and the state in such a way that individuals have the freedom necessary to develop their potentialities and not to encroach upon the rights of their fellowmen. It also gives the community and the state adequate powers to regulate and control the socio-economic relationships so as to guard and maintain this harmony in human life. The basis of this whole structure as envisaged by Islam is the reciprocity of love between individuals and groups; it is not erected on the basis of hatred and class conflict as is the case with socialism.

It may also be pointed out here that this unique system of life as envisaged by Islam, did not originate as a result of any economic pressure, nor was it an outcome of some mutually

www.nagorikpathagar.org

conflicting interests of antagonistic groups of people. NO. It was revealed to the world ad the ordained system of life at a time when men attached no particular importance to the economic factors, nor did they know anything about social justice in the sense we know it in modern times. Both socialism and capitalism are much later developments. Islam presented its scheme of social reform much before any of the social movements of our times. It guarnateed the basic needs of man-food, housing, and sexual satisfaction-more that thirteen hundred years ago. The Holy Prophet (peace be upon him) said that: `Whosoever acts as a public officer for us (i.e. the Islamic State) and has no wife, he shall have a wife; if he has no house, he shall be given a house to live in; if he has no servant, he shall have one; and if he has no animal (a conveyance), he shall be provided with one.' This historical announcement of fundamental human rights not only contains those rights voiced by many a revolutionary in our times, it adds to them some more as well, without, however, necessitating any inter-class hatred, bloody revolutions, and without of course rejecting all those human elements in life that do not fall under the above there heads: food, housing and family.

These are some of the salient features of the Islamic code of life. They are sufficuent to show that a religion with such laws and principles, and so comprehensive as to include the whole of the human existence, emotions, thoughts, actions, worship, economic dealings, social relationships, instructive urges and spiritual aspirations-all arranged in the framework of single harmonious but unique system of life, can never lose its usefulness for mankind. Nor can such a religion ever become obsolete, as its objectives are the same as those of life itself and therefore destined to live on so ling as there is life on this planet.

www.nagorikpathagar.org

Considering the existing state of affairs in the contemporary world, mankind cannot resonably afford to turn its back upon Islam or reject its system of life. Mankind is still affairs in the contemporary world, mankind cannot reasonably afford to turn its back upon Islam or reject its system of life. Mankind is still afflicted with the most savage and odious forms of racial prejudices. America and South Africa may offer a case in point in this respect. Surely the twentieth century world had yet a great deal to learn from Islam. Long ago Islam freed humanity from all racial prejudices. It did not content iself with the presention of a beautiful vision of equality alone but it achieved in practice an unprecedented state of equality between all people, black, white or yellow, declaring that none enjoyed any superiority over the others except in virtue and piety. It not only freed the black from slavery but also fully recognized their rights to aspire even to the highest seat of authority in the Islamic State. They could become the heads of the Islamic State. The Holy Prophet (peace be upon him) said: `Listen and obey even if a negro slave be appointed as your superor so long as he should enforce amongst you the Law of God.'

How can also the world of today ignore the message of Islam stricken as it is with the evils of imperialism and tyranny with all their barbar ous attributes, for Islam alone can help mankind shake off these chains. It is opposed to imperialism and all forms of exploitation. The way Islam treated the peoples of the countries it conquered was so generous, just and sublime that the eyes of the `Civilized' Europe can hardly pentetrate those heights. We may in this regard cite the famous decision of the Caliph `Umar to whip the son of `Amr ibn al-`As, the victorious general and honoured governor of Egypt as he had beaten an Egyptian Copt without any legal justification, while the renowned father himself had a very narrow escape

www.nagorikpathagar.org

from the whip of the Caliph. This shows what social liberty and human rights were enjoyed by the subjects of the Islamic State.

Then there is the evil of capitalism that has poisoned all life. Its abolitions and the need to rid humanity of its evil consequences again calls for Islam. For, Islam prohibits usury and hoarding which taken together form the mainstay of the capitalist economy. This in other word means that Islam alone can effectively check the evils of capitalism as it did check them fourteen hundred years ago.

Similarly the world dominated by the materialistic, godless communism stands in need of Islam, which achieves and maintains social justice of the highest order without destroying the spiritual mainsprings of human life. Nor does it confine man's afforts to the narrow world of the seneses. Above all, it neither endeavours nor aims at the imposition of its own creed on mankind forcibly with the iron rod of a proletarian dictatorship, for, `There is no compulsion in religion; indeed the righteousness has been differentiated from the wickedness. (al-Qur'an, 2:256).

Finally, the world with the shadows of war still hanging over it cannot but turn towards Islam-the only way to establish and maintain real peace on this earth.

The era of Islam has in a way just started, not ended; it is not a spent force, but a living dynamic force, Its future is as bright as its great historical past is glorious when it illumined the face of earth at the time when Europe was still groping its way in the dark recesses of medievalism.

(সূত্র: Islam and the crisis of the modern world; The Islamic Faundation. 223, London Road, Leicester.)

---

www.nagorikpathagar.org

তোমার মত দয়াল বন্ধু আর পাবনা
দেখা দিয়া ওহে রসূল ছেড়ে যেওনা।।
তুমি হে খোদায় দোস্ত
ওপারের কান্ডারী সত্য
তোমা বিনা পারের লক্ষ্য আর দেখা যায় না।।
আসমানী আইন দিয়ে
আমাদের সব আনলে রাহে
আজ মোদরে ফাঁকি দিয়ে ছেড়ে যেওনা।।
তোমার বিনে এরূপ শাসন
কে করবে আর দ্বীনের কারণ
লালন বলে আর তো এমন বাতি জ্বলবে না।।

------------------ ফকির লালন শাহ্

সমাপ্ত

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

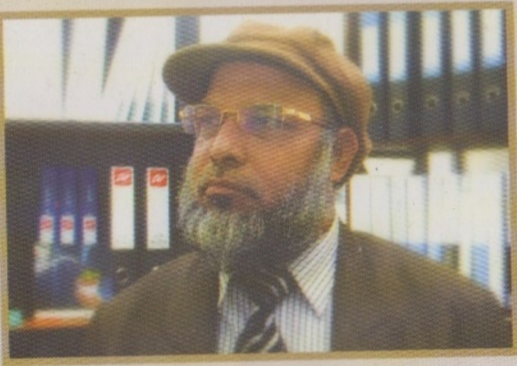

ইঞ্জিনিয়ার এ কে এম মুজিবুর রহমান

জন্ম ১০ নভেম্বর ১৯৫৮, গ্রাম পলাশগড়, পৌর পশ্চিম এলাকা, জেলা জামালপুর, পিতা মরহুম সাগর আলী সরকার, মাতা সালমা খাতুন। লেখাপড়া বগাবাইদ ও দেওরপাড় চন্দ্রা প্রাইমারী স্কুল, সিংহজানী বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়, সরকারী আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর, বি.এস.সি ইঞ্জিনিয়ারিং (এগ্রিল) বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, এম. ইউ. আর. পি (কোর্স সমাপ্ত) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)।

প্রকাশনা ঃ কাব্য-বন্যায় ভেলায় (১৯৮৮), রুদ্র পলাশ (২০০৫, একুশে বইমেলা)। সম্পাদনা-সাহিত্য সাময়িকী, প্রসূন, লাইট ইত্যাদি।

এছাড়া বেশ কিছু কবিতা, প্রবন্ধ, নাটিকা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি গনপ্রজাতন্ত্রী চীন থেকে কবিতার জন্য 'রেডিও বেইজিং' পুরস্কার লাভ করেন, ১৯৮৩ সালে।

লেখকের সম্পাদিত এই বিশ্ববরেণ্যদের কালজয়ী ভাষণ বইটি দীর্ঘ বিশ বৎসর যাবৎ সংগৃহীত বিভিন্ন বই, সাময়িকী, পত্রপত্রিকা হতে উদ্ধারকর্ম ও গ্রন্থিত ফসল।

জনাব রহমান ব্যক্তি ও কর্মজীবনে খুবই বন্ধুবৎসল সহজ-সরল মনের অধিকারী। তিনি দুই মেয়ে ও এক ছেলের জনক।

e-mail : muzib34@yahoo.com

আলোকচিত্র :: জহুরুল হক জুয়েল

www.nagorikpathagar.org

Bishwa Borenyeder Kaljoyee Bhasan
(a collection of con-supersede speeches by the world great celebrities)

by Engr. AKM Muzibur Rahman
price Bdt 350.00 only
US $ 20.00
cover design :: Hamidul Islam

anyaprokash<< dhaka<< bangladesh
www.anyaprokash.net

an ANYAPROKASH publication

Bdt 350

ISBN 984 868 555 3